রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা

প্রথম খণ্ড

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

পরমপূজনীয়—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু—

প্রথম খণ্ড

প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'—তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ করিবার পরিকল্পনা লইয়া এই দুরূহ ও শ্রমসাধ্য কার্যে ব্রতী হইয়াছি। শারীরিক অসুস্থতা ও নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া প্রথম খণ্ডটি শেষ করিলাম। রবীন্দ্র-সাহিত্য বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় অপার সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। প্রত্যেক সমালোচকই একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে এই বিপুল সাহিত্য-পরিমাপের চেষ্টা করেন। আমিও সেই চেষ্টাই করিয়াছি। আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ না হইলে উহার আলোচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য লেখকের নিকটও বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। কাজেই আমার অবলম্বিত রীতি সম্বন্ধে এখনও কিছু বলার সময় হয় নাই বলিয়াই মনে করি। সমালোচকের প্রধান কর্তব্য কবির কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণ ও পাঠকের মনে সৌন্দর্যানুভূতির সঞ্চার। যদি সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎ-পরিমাণে সফল হইয়া থাকে, তাহা হইলেই সমালোচকের কার্য অনেকটা সুসিদ্ধ হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। আশা করি রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষজ্ঞগণ ও রবীন্দ্রসাহিত্যামোদী পাঠকবৃন্দ আমার এই প্রয়াস অনুমোদন করিবেন ও তাঁহাদের অভিমত প্রকাশের দ্বারা গ্রন্থের অপূর্ণতা হ্রাসে সহায়তা করিবেন।

ফর্মা সাজাইবার সময় ভ্রান্তিবশতঃ 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' কাব্য দুইটির আলোচনা নাটকের পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠকের মার্জনা প্রার্থনা করি।

২৫শে বৈশাখ ১৩৭২
৩১, সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা ২৯

ভূমিকা

আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইংরেজি সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'নব-ভারত'-পত্রিকায় বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে, কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া বাংলা সমালোচনায় নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। তাঁহার এই প্রবন্ধগুলি শুধু সাহিত্য-বিচার বা সাহিত্যসমালোচনা নহে, সাহিত্যের মর্ম-উদ্ঘাটনও বটে। এই প্রবন্ধগুলি ভিত্তি করিয়াই তিনি 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'-নামক অতিকায় গ্রন্থে আমাদের সমগ্র উপন্যাস সাহিত্য পরিক্রমণ করেন। এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান অংশ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ও ছোটগল্পের বিস্তারিত আলোচনা। ইহা ছাড়া নানা উপলক্ষ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাটক সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। জীবনের শেষভাগে নিজের প্রবর্তনায় এবং বন্ধু ও ছাত্রসমাজের অনুরোধে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনাভাণ্ডারের সামগ্রিক ও ধারাবাহিক আলোচনায় ব্রতী হন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল প্রস্তাবিত সমীক্ষা তিন খণ্ডে সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু এই বিরাট সঙ্কল্প তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভার রশ্মি সংহরণ করিয়া তিনি ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা দেশে নানা ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে; বাংলা সাহিত্যেও রবীন্দ্রসমালোচনার কলেবর দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। কিন্তু গুণগত বিচার বাদ দিলেও পরিকল্পনার সামগ্রিকতায়, আয়তনের বিশালতায় ও বিশ্লেষণের পুঙ্খানুপুঙ্খতায় এই গ্রন্থ অনন্য। বাংলা সাহিত্য ছাড়িয়া অন্য দেশের সমালোচনাসাহিত্যেও ইহার সঙ্গে তুলনীয় খুব বেশি গ্রন্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পূর্বেই 'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'র প্রথম পর্বের নূতন সংস্করণ প্রকাশনের প্রয়োজন হয় এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু অদলবদল ও নূতন সংযোজন করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু তাঁহার মৃত্যুর পর এই সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে সেইজন্য প্রকাশক আমাকে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এইরূপ ভূমিকার কোন সার্থকতা আছে কিনা সেই বিষয়ে সন্দিহান হইলেও এই অনুরোধ আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই। সেইজন্য এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গি ও আলোচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দুই এক কথা বলিতে অগ্রসর হইতেছি।

(১)

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার অসাধারণ বৈচিত্র্য। কাব্য, নাটক (ট্র্যাজেডি ও কমেডি), গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরি, চিঠিপত্র—এক মহাকাব্য ছাড়া সাহিত্যের এমন কোন বিভাগই নাই যেখানে তাঁহার প্রতিভা তাহার স্বাক্ষর রাখিয়া যায় নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে গ্যেটে ও ভিক্টর হুগো সব্যসাচী ছিলেন, কিন্তু ইঁহাদের রচনাসম্ভারেও এত বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। এই বহুধাবিস্তারিত সৃষ্টিসমারোহের মধ্যে কোন ঐক্যসূত্র বাহির করা কি সম্ভব? কেহ কেহ বলিবেন যে এই অনুসন্ধানই অনাবশ্যক, শুধু অনাবশ্যক নয় বিভ্রান্তিকরও। ইঁহাদের মতে, কবির প্রত্যেক সৃষ্টির মূল্যই তংস্থানিক ও তৎকালিক; তাহার সঙ্গে তাঁহার অন্য সৃষ্টির কোন নিগূঢ়, শিল্পগত সাদৃশ্য নাই। যেমন কোন উপন্যাসের বা নাটকের চরিত্র সেই উপন্যাস বা নাটকের মধ্যেই জীবন্ত, তাহাকে যেমন সেই পরিবেশ হইতে বাহির করিয়া অন্য কোন চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায় না—এই প্রসঙ্গে একদা প্রচলিত ভ্রমর ও সূর্যমুখীর বিভ্রান্তিকর তুলনা স্মরণীয়—তেমন প্রত্যেকটি শিল্প-কর্মই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অনন্য। সুতরাং কোন কবির একই সময়কার বিভিন্ন সৃষ্টিকে একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঐক্যসন্ধানের চেষ্টা কখনই ফলপ্রসূ হইতে পারে না। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টান্ত শেক্সপীয়র। শেক্সপীয়রের বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্য হইতে একক কবিমানস খুঁজিয়া বাহির করা যায় না; ড্রাইডেন প্রভৃতি যাঁহারা সেই চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা এক কল্পিত কবিপুরুষ আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার বিরুদ্ধে শেক্সপীয়রের নিজের রচনাই সাক্ষ্য দেয়। তর্কে প্রবেশ না করিয়াও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় এই সমস্যা ও সন্দেহের সমাধান করিয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বিভিন্ন রচনার সমীক্ষার মধ্য দিয়া একক কবিসত্তার সন্ধান করিয়াছেন যে সত্তা বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে এবং তাহার আলোকে বিচার করায় কবির বিচিত্র সৃষ্টি নূতন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'র যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার সাহায্যে তাঁহার এই সার্থক প্রচেষ্টার বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। পঞ্চভূত ক্লাবের পাঁচটি সভ্য একটি মনেরই বিভিন্ন চেতনার প্রতীক এবং সভাপতি ভূতনাথ সব মত ও অনুভূতির সমন্বয় করেন; তিনি পক্ষপাতশূন্য হইলেও নিরপেক্ষ নহেন। এই জাতীয় সভ্য ও সভাপতির সম্মিলনেই কবিসত্তার সৃষ্টি। এই অংশেই গ্রন্থকার

রবীন্দ্রনাথের শেক্সপীয়র-সমালোচনায় তাৎপর্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে এই ভাবটি স্পষ্ট করা যাইতে পারে। শেক্সপীয়রের চরিত্রগুলির অশেষ বৈচিত্র্যসত্ত্বেও—রবীন্দ্রনাথের মতে—তাহাদের কেন্দ্রস্থলে এক 'অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্সপীয়র' আছে যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন রচনাগুলিকে সঞ্জীবিত ও কেন্দ্রানুগত করে। এই অমূর্ত ভাবশরীরী কবিসত্তা রক্তেমাংসে-গড়া মানুষ শেক্সপীয়র বা মানুষ রবীন্দ্রনাথ হইতে পৃথক আবার অমূর্ত হইলেও ইহা অশরীরী ভাবমাত্র নহে।

(২)

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে কবিসত্তার সঙ্গে কবির জীবনী ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক সহজবোধ্য হইবে। শেক্সপীয়র জন্মিয়াছিলেন চারশত বৎসর পূর্বে এবং তাঁহার জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে আমাদের কাছে যে প্রামাণ্য তথ্য আছে তাহা যৎসামান্য। রবীন্দ্রনাথ অনেক কাছের মানুষ এবং শুধু তিনি নিজেই যে তাঁহার জীবনকথা লিখিয়াছেন তাহা নহে; তাঁহার প্রামাণ্য জীবনচরিতও আমাদের সামনে আছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে যে সংযম ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা খুব কম লেখকের রচনায়ই পাওয়া যায়। তিনি বাহিরের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির সংযোগও দেখাইয়াছেন কিন্তু কোথাও সমালোচকের স্থূল হস্তাবলেপের দ্বারা অমূর্ত ভাবশরীরী কবিসত্তা আচ্ছন্ন হয় নাই। এই প্রসঙ্গে একটিমাত্র বিষয়ের উল্লেখ করিলেই তাঁহার আলোচনার সংযম ও গভীরতার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী শুধু রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়া ছিলেন না, তাঁহার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। আমার মনে হয় তিনিই রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম বোদ্ধা পাঠক, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে যাহাকে বলা হয় সহৃদয়। তাঁহার প্রভাবকে অবহেলা করিলে বা বাড়াইয়া দেখিলে মানুষ রবীন্দ্রনাথের অন্তরালে যে কবি-পুরুষটি ছিল, যাহার স্বরূপনির্ণয় সমালোচকের প্রধান কর্তব্য, তাহা অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে অথবা অতিভাষণে ইহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যাইবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা হইতে মনে হয় যে, কাদম্বরী দেবীর প্রভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যে তিন ভাবে অনুভূত হয়। কতকগুলি কবিতায় তিনি প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন—যেমন 'স্নেহস্মৃতি', 'নববর্ষে', 'মৃত্যুর পর', 'দুঃসময়'

প্রভৃতিতে। ইহার অপেক্ষা গভীরতর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কবিসত্তার ভাবস্তরে উন্নতিতে। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'এই আঘাতেই কবি আবেশমত্ত কৈশোর ও রূপমুগ্ধ যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বের সর্ববিধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়কারী জীবনসত্যে স্থির আশ্রয় লাভ করিলেন।' এই পরিণত মননশীলতা শুধু তাঁহার কাব্যে নয়, গদ্য রচনায়ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তৃতীয় লক্ষণটিও স্মরণীয়; কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সূক্ষ্মতর প্রভাব 'পরবর্তী কবিতায় কোথাও কোথাও অতর্কিতভাবে ও আত্ম-গোপনকারী ইঙ্গিতে অস্তিত্বের স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছে।' বক্ষ্যমাণ সমীক্ষায় পরিধির বাহিরে কোন কবিতার নাম গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে করেন নাই, কিন্তু 'ছবি' (বলাকা). এবং 'নিমন্ত্রণ' (বীথিকা) কবিতাদ্বয়ের কথা পাঠকবর্গের মনে আসিবে।

সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও তাহার প্রভাব সম্পর্কেও গ্রন্থকার তাৎপর্যময় মন্তব্য করিয়াছেন। কবি নিজেই বৈষ্ণব কবিতার কাছে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন এবং কবির প্রথম পর্বের কাব্যে কালিদাসের প্রভাব সর্বত্র দেদীপ্যমান। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের ভাবশরীরী কবিসত্তা এই দুই প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়া নূতন রসের সৃষ্টি করিয়াছে। কৈশোরে কবি যে বৈষ্ণব কাব্যের ভাষা ও ভঙ্গী অবলম্বন করিয়া 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই ধর্মতত্ত্বের অতীত, বৃহত্তর রূপককল্পনা আভাসিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে লেখা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যে এই অতিক্রমণের পরিচয় আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। সমালোচকের নিজের ভাষা উদ্ধার করিয়া বলিতে পারি, বৈষ্ণবকবিগোষ্ঠি দেহলাবণ্যকে অধ্যাত্মব্যঞ্জনার উপায়রূপে প্রয়োগ করিয়া উহার স্থূলতাকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রূপমোহকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ভাবস্তরে উন্নীত করিয়া উহার উপর কাব্যানুভূতির পেলব আবরণ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তাঁহার 'চিত্রাঙ্গদা', 'মানসসুন্দরী', 'বিজয়িনী', 'উর্বশী' প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা নূতন দ্যোতনায় মণ্ডিত হইবে। 'উর্বশী'তে তিনি সৌন্দর্যকে শুভাশুভের উর্ধ্বে স্থান দিয়া উহার মানবনিরপেক্ষ, অনবদ্যগঠন-সমন্বিত, ভাবব্যঞ্জনায় ভাস্বর অপূর্ব মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন। অনেকের মতে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা। আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণবকবিতার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু সেই ঐতিহ্যের পটভূমিকায়ই ইহার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিভাত হইবে।

কালিদাসের প্রভাব বিচার করিলেও এই অমূর্ত ভাবশরীরী কবিসত্তার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে কালিদাসের কাব্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কালিদাসের কাব্যের প্রভাব তাঁহার বহু কবিতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতীয়মান। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের জীবন-আদর্শ ও কালিদাসের কাব্যসাধনার যুগ্ম স্বর্ণসূত্র অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিজীবনে 'মানসী' হইতে 'কল্পনা-ক্ষণিকা-চৈতালি'তে এক নব পর্যায়ে উপনীত হইয়াছেন। ইহা হইতেও অধিক কৃতিত্বের কথা এই যে, তিনি একাধিক কবিতায় ও প্রবন্ধে কালিদাসের কাব্যের অন্তর্নিহিত বিরহবেদনার এক সার্বভৌম তাৎপর্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

(৩)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সৃষ্টির যে সমীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং যাহার দুই-তৃতীয়াংশ কাজ তিনি সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন তাহার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক্ আছে এবং বোধ হয় সেইখানেই এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রধান মৌলিকতা। তিনি কবিসত্তার—কবির ভাবশরীরের—কালানুক্রমিক পরিণতির স্তরনির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুজীবনে যেমন আরম্ভ এবং ক্রমিক পরিপুষ্টি দেখা যায় শিল্পের ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায় কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। শিল্পকর্ম হিসাবে ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্ব যে প্রথম পর্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত, কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব অধিকতর মননশীলতা ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় বহন করে। তিন পর্বে বিভক্ত ডিভাইনা কমেডিয়ার নিটোল গঠনসুষমা সর্বজনপ্রশংসিত, কিন্তু দান্তের ধর্মতত্ত্বের যে ব্যাখ্যাই দিই না কেন অধিকাংশ পাঠক মনে করেন, কাব্য হিসাবে প্রথমে লিখিত ইন্ফারনো পরবর্তী প্যারাডাইসো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন যে, কুমারসম্ভব রঘুবংশ অপেক্ষা সুন্দর এবং নিশ্চয়ই ইহা রঘুবংশের পরে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, রঘু কুমারের পরবর্তী রচনা। এমন খুব কম পাঠক আছেন যাঁহারা বলিবেন যে, 'সোনার তরী', 'অহল্যার প্রতি,' 'উর্বশী' অপেক্ষা 'বলাকা' বা 'মহুয়া'র কাব্য শ্রেষ্ঠ বা শিল্পকলার দিক্ দিয়া ইহাদের মধ্যে স্তরনির্দেশ সম্ভব।

এই মতটিকে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ইতালীয় নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদেত্তো ক্রোচে। ক্রোচে মনে করেন প্রত্যেক শিল্পকর্ম একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিশেষ মুহূর্তের সৃষ্টি, রসাস্বাদের দিক্ দিয়া সেই মুহূর্তের সঙ্গে অন্য মুহূর্তের কোন সম্পর্ক নাই। অবশ্য একই কবির বিভিন্ন রচনার মধ্যে বিষয়গত ঐক্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ঐক্যও সব সময় কালগত ঐক্যের ধার ধারে না। এই জন্য তিনি শেক্সপীয়রের নাটকবিচারে বিষয় বা ভাবগত পৌর্বাপর্যের সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্রোচের সমালোচনায় তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও কালানুক্রমিকতাকে একেবারে বাদ দিয়াছেন বলিয়া তিনি শেক্সপীয়রের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা অসম্পূর্ণ এবং কোন কোন জায়গায় বিকৃত বলিয়া মনে হয়।

'রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা'য় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কালানুক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহার সূক্ষ্ম, পুঙ্খানুপুঙ্খ, ভাবসমৃদ্ধ বিচারই ক্রোচে প্রভৃতির যুক্তির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর। তিনি দেখাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও মননশক্তি যে ভাবে বিকশিত হইয়াছে সেই ধারা অবলম্বন করিলে কবির বিচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ সময়ান্তরিত কবিতার বিপুলতর, পূর্ণতর তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। রবীন্দ্রকাব্যে জীবমদেবতার আবির্ভাব একটা সাময়িক, আকস্মিক খেয়াল বলিয়া মনে হইতে পারে। কবির কোন কোন উক্তি এই সন্দেহকে সমর্থন করে। কিন্তু 'মানসী' হইতে 'মানসী-সুন্দরী' এবং 'মানসসুন্দরী' হইতে 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা' এবং এইসব কবিতা হইতে 'ক্ষণিকা'র 'আবির্ভাব'—এই ভাবে রবীন্দ্রকাব্যের পরিক্রমা করিলে রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতা পরিকল্পনার স্থায়ী তাৎপর্য নির্ণয় করা যাইবে এবং কেমন করিয়া এই পরিকল্পনা ঈশ্বরানুভূতির মধ্যে মিশিয়া কবির ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক কবিতাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে তাহাও বোঝা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ একই বিষয়ে—যেমন, বর্ষা, সমুদ্র—বিভিন্ন সময়ে কবিতা লিখিয়াছেন। ইহাদের তুলনা করিলে তাঁহার কবিপ্রতিভার অগ্রগতি অনুধাবন করা যাইবে। অবশ্য ক্রোচে প্রভৃতি বলিবেন যে, কাব্যে বিষয়ের ঐক্য গৌণ, ইহার শিল্পমাহাত্ম্য স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পদ এবং তাহা তুলনার অনধিগম্য। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি অর্ধপরিণত গ্রন্থের সঙ্গে 'সোনার তরী' প্রভৃতি পরিণত কাব্যের তুলনা করিলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে এবং 'বলাকা' 'মহুয়া', প্রভৃতির অনেক কবিতার আভাস প্রথম যুগের রচনায় পাওয়া যায়।

ইহা অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আরও একটি বিষয়ের প্রতি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কালানুক্রমিক বিচারেই শ্রেষ্ঠ কাব্যের বহুধাবিস্তৃত ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা সম্ভব। হ্যামলেটের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া দার্শনিক স্যান্টায়ানা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির মধ্যে বিবর্তনের স্তরনির্দেশ করা যাইতে পারে; শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভায় বিধৃত হইবার পূর্বে তাহারা কিংবদন্তী, লোকসাহিত্য এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবির রচনায়ও তাহারা বারংবার আবর্তিত হইয়া আপনাদের খাঁটি রূপ পায়। শেক্সপীয়রের হ্যামলেট-পরিকল্পনা যে তাঁহার নিজের হাতেই রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য হ্যাম্‌লেট-গ্রন্থেই পাওয়া যায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা—যেমন, 'মানসসুন্দরী'—পূর্বতন ও পরবর্তী কবিতার সঙ্গে নিবিড় আশ্লেষে সম্বদ্ধ এবং এই পৌর্বাপর্য বিচার করিলেই কবিপ্রতিভার সম্যক্ বিচার ও বিশ্লেষণ সম্ভব হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ শুধু রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা নহে, সাহিত্যতত্ত্ব-বিচারেও স্মরণীয় পদক্ষেপ।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার ব্যাপ্তি ও বহুমুখীনতার সামগ্রিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয় এইখানেই রবীন্দ্রপ্রতিভা তাহার যোগ্য সমালোচক পাইয়াছে। ভূমিকার সীমাবদ্ধ পরিধিতে এই গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আমি শুধু ইহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, প্রিজ্‌ম্ বা তিনকোণা কাচের মাধ্যমে যেমন রবিরশ্মির বর্ণচ্ছটা বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় তেমনি এই গ্রন্থদ্বয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার অপরিসীম শিল্পসমারোহ পরিপূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ইতি

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা

প্রথম খণ্ড

রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যজীবনের উন্মেষপর্ব ১১৮১-৮৪ (১২৮৮-১২৯০)

১

মহাকবিদের প্রথম অর্বাচীন রচনাসমূহে তাঁহাদের পরিণত প্রতিভার কতটা পূর্বাভাস মিলে তাহা সাহিত্যসমালোচনায় একটি বহু-জিজ্ঞাসিত, কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। যে বৃক্ষ সমস্ত জগতে উহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিবে তাহার প্রথম কচি কিশলয়ে এই বিশ্বব্যাপী মহিমার কোন অস্পষ্ট সূচনা আবিষ্কার করিতে পারা যায় কি না তাহা প্রতিভা-রহস্যের একটি মূলগত তত্ত্ব। জগতের প্রথম শ্রেণীর মহাকবিগোষ্ঠীর বাল্যরচনা-আলোচনায় এই প্রশ্নের বিভিন্ন রকম উত্তর পাওয়া যায়। মোটামুটি এই কথা বলা চলে যে প্রতিভার প্রথম বিকাশ যুগরীতির অনুকরণের মধ্য দিয়া। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভাবসম্পদ ও রীতিবৈশিষ্ট্যের আত্মসাৎকরণের দ্বারাই স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভা নিজ জয়যাত্রা আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের মধ্যযুগের মহাকবি চসার ও বিশ্বকবি শেক্‌সপিয়র তাঁহাদের অপরিণত প্রথম রচনায় প্রচলিত কাব্যরীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। শেক্‌সপিয়রের মৌলিকপ্রতিভাদীপ্ত রচনাসম্ভারের মধ্যেও পূর্বলেখকগোষ্ঠীর বিষয়উপাদান ও মানসঅভিপ্রায়ের প্রভাব সুপরিস্ফুট। নিরঙ্কুশ ও যথেচ্ছ ঋণের মধ্যে অভাবনীয় ঐশ্বর্যপ্রকাশের, গোষ্ঠীমানস-প্রবণতাকে গভীরতম ব্যক্তি-অনুভূতিতে রূপান্তরিত করার কৌশলটি তিনি আশ্চর্যভাবে আয়ত্ত করেন। উনবিংশ শতকের রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁহার প্রথম রচনায় পোপের নীতিবাদ ও নিসর্গবর্ণনার সাধারণীকৃত বহিরঙ্গপ্রধান ভঙ্গীটির নিখুঁত অনুকারকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শেলী ও কীট্‌স তাঁহাদের কাব্যবিবর্তনপ্রক্রিয়ায় স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট, অমার্জিত আতিশয্য ও রুচিবিকার হইতে মার্জিত, রুচিবিশুদ্ধ সংযম, ভাবালুতা হইতে প্রগাঢ়, মর্মোৎসারিত ভাবানুভূতির দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কাব্যকৃতিতে

হঠাৎ মোড় ফেরার কোন নিদর্শন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপরিণতি কতকটা শেলী ও কীট্‌সেরই অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনার একটা কালানুক্রমিক তালিকার সাহায্যে বিষয়টির আলোচনা করার সুবিধা। তাঁহার 'সন্ধ্যাসংগীত' ১২৮৮ সালে (ইংরাজী ১৮৮১) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত—ইহা পূর্ব দুই বৎসরের রচনার সমষ্টি। তাহার পর 'প্রভাতসংগীত' (১২৯০ বৈশাখ, ইংরাজি ১৮৮৩) ও 'ছবি ও গান' (১২৯০ ফাল্গুন, ইংরাজি ১৮৮৪) একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। অবশ্য পরবর্তী সংস্করণে ইহাদের কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন হইয়াছে, প্রথম প্রয়াসের ত্রুটি-অপূর্ণতা কিছু কিছু সংস্কৃত ও মার্জিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে দুই বৎসরের একটু অধিক সময়ের মধ্যে তরুণ কবি তিন-তিনটি কাব্যপ্রকাশের মাধ্যমে তাঁহার মানস-পরিবর্তন ও কাব্যরচনারীতি-সংস্কারের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছেন।

গদ্য ও নাট্যরীতির মাধ্যমেও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাঁহার অস্পষ্ট, বাষ্প-কুহেলিকাচ্ছন্ন মানস অনুভূতির কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ১২৮৮ সালে (ইংরাজী ১৮৮১), 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর প্রায় একই সময় প্রকাশিত হয়। ইহা ভ্রমণকাহিনী এবং বিষয়বস্তুর সুস্পষ্টতা ও লেখকের বিচারবুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রয়োগের জন্য ইহা তরুণ কবির কাব্যের দোষ ও গুণ, উহার সর্বগ্রাসী মাদকতা ও বাষ্পবিহ্বল আত্ম-কেন্দ্রিকতা হইতে মুক্ত। ইহাতে তরুণ লেখকের যেরূপ মন্তব্য ও জীবন-সমালোচনা, ও মাঝে মাঝে যেরূপ সরস বর্ণনাকুশলতা দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে ইহা পরবর্তী কালের পরিণত মানুষের কিছুটা সংমার্জনা লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' ১২৮৯ পৌষ-এ (ইংরাজি ১৮৮৩) প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে ঘটনাবিন্যাসের তাগিদে লেখককে তাঁহার কাব্যের হৃদয়-অরণ্যের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইয়াছে। তথাপি চরিত্র-পরিকল্পনা ও জীবন-জল্পনার ভিতর কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক অস্পষ্টতা ও চক্রভ্রমণের পরিচয় ঢাকা থাকে না। লেখক বাহিরের জীবনের প্রতি যে দৃষ্টি পাঠাইয়াছেন তাহা অন্তর-জগতের ঘূর্ণ্যমান বাষ্পপুঞ্জে কিছুটা আচ্ছন্ন। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের বিভিন্নধর্মী পাত্র-পাত্রীর উপর তাঁহার মনোলোকের ছায়া কিয়ৎ-পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কবির আত্মরতিময় মায়াজগৎই যেন ঔপন্যাসিকের বস্তুনিষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণকে কতকটা কল্পনামোহাবিষ্ট করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরীতিক রচনাগুলিই—'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১২৮৭, ইংরাজী ১৮৮০), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১২৯১, ইংরাজি ১৮৮৪) ও 'মায়ার খেলা' (১২৯৫, ইংরাজি ১৮৮৮)—তাঁহার কাব্যের সহিত সর্বাপেক্ষা বেশী সহধর্মী ও ঘনিষ্ঠসম্পর্কিত। সময়ের দিক দিয়া 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'সন্ধ্যাসংগীত'-এরও পূর্ববর্তী; 'মায়ার খেলা' অনেক পরবর্তী রচনা ও উভয়ের মধ্যবর্তী 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' দুই পার্শ্বস্থিত গীতিনদীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্ত মৃত্তিকা-উপাদান-গঠিত নাট্যদ্বীপের ন্যায় সর্বপ্লাবী স্রোতের উপর মাথা তুলিয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম শিল্পরীতিপার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমটিতে ঘটনার মধ্যে যে নাট্যবীজ আছে তাহাই প্রবহমান গীতিপরম্পরার সূত্রে গ্রথিত; দ্বিতীয়টিতে ভাবপ্রধান গানই নাট্যবস্তুর খুব পাতলা বহিরাবরণের সংযোগে আত্মপরিচয়জ্ঞাপনে উৎসুক। প্রথমটির উৎস নাট্য-প্রেরণা, দ্বিতীয়টির গীতপ্রেরণা; কিন্তু উৎসের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় গুণের বিসদৃশ সংমিশ্রণে উভয়েই এক মিশ্র, অনির্দেশ্য কলারূপে উদ্ভব হইয়াছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বস্তুপ্রাধান্য গীতের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে গিয়া নাট্যসত্তা হারাইয়াছে, কিন্তু বিশুদ্ধ গীতিসত্তা অর্জন করিতে পারে নাই। বাল্মীকির নিজের অন্তর্বিপ্লব ও তাহার অনুচর দস্যুদলের রূঢ়, ইতর মনোবৃত্তি ও নৃশংস কার্যকলাপ গানের ভিতর দিয়া একপ্রকার অবাস্তব ছায়ারূপের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছে; তাঁহাদের ভাবভঙ্গী যেন তাহাদের সত্যপরিচয়কে বিড়ম্বিত করিয়াছে। বাল্মীকির চিত্তপরিবর্তনের বিবরণ অত্যন্ত আকস্মিক, পঞ্চম দৃশ্যে তাহার অস্থির উদ্‌ভ্রান্তি যেন 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর নিঃসঙ্গ কবিপ্রেমের অন্তর-ব্যাকুলতারই প্রতিরূপ। বনদেবী ও বালিকার ছদ্মবেশিনী সরস্বতীই কেবল এই ইতর কোলাহলের জগতে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সুরটি বহন করিয়া আনিয়াছেন। শুধু এই একটি বিচ্ছিন্ন বাক্যে নহে, সরস্বতীর সমগ্র পরিকল্পনায় ও বাল্মীকি-চিত্তের উপর তাঁহার দ্রবকারী কাব্যানুভূতি-উদ্বোধক করুণা-স্পর্শের বর্ণনায় বিহারীলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে বিহারীলালে যাহা গভীর, মর্মকোষনিঃসারিত, প্রকাশসার্থক অনুভূতি, রবীন্দ্রনাথে তাহা ক্ষণিক, হঠাৎ-উত্তেজিত উচ্ছ্বাস মাত্র। আদি কবি বাল্মীকিকে অবলম্বন করিয়া এই যে তাঁহার অতর্কিত বাণী-উৎসার তাহাই কিন্তু তাঁহার সমগ্রজীবনব্যাপী ভাবসাধনার অবিচ্ছিন্ন প্রেরণা-রূপে দেখা দিয়াছে।

'মায়ার খেলা' 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দীর্ঘ আট বৎসর পরে প্রকাশিত। ইহার মধ্যে নাট্যকল্পনা নামমাত্র, গানেরই অসপত্ন একাধিপত্য। নদীপ্রবাহ যেমন বহিয়া যাইতে যাইতে নিজ উচ্ছল গতিবেগের লীলাতেই ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌বিম্ব রচনা করিয়া মুহূর্তের জন্য পাক খাইতে থাকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গীতপ্রবাহ নিজ চলার আনন্দেই যেন নাট্যকল্পনার মায়াবিভ্রমে অন্তরপ্রেরণাকে মুক্তি দিয়াছে। এখানে পাত্রপাত্রীগুলি—শান্তা, প্রমদা, অমর, অশোক, কুমার—সবাই প্রেমের থরথর-কম্পমান আবেগাতিশয্যের বিভিন্ন দিকের কায়াহীন ছায়া। বিমূর্ত প্রমত্ত প্রেমের এক একটি খেয়ালী কল্পনা যেন ইহাদের নাম ধার করিয়া একটা ক্ষীণ ভাবসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছে। কিন্তু গানগুলি সত্যই আপেক্ষিক ভাব-পরিণতি ও রূপসংহতির পরিচয় বহন করে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় যাহা বিন্দুরূপে ক্ষরিত, 'মায়ার খেলা'য় তাহার উচ্ছ্বসিত জোয়ার। বনদেবীগণের অক্ষম করুণা ও ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস মায়াকুমারীগণের অন্তরলোকচারী কুহকমন্ত্রে রূপান্তরিত। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রগীতিগুলি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে বহুল প্রচারিত হয়। মনে হয় যেন এই গানসমূহ প্রথম প্রেমানুভূতির মাদকতা-বিহ্বল তরুণ বাঙলার হৃদয়-উৎসারিত ভাবনির্ঝর। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর 'সুখের বিলাপ', 'অসহ্য ভালোবাসা' এবং 'ছবি ও গান'-এর 'জাগ্রত স্বপ্ন', 'বিদায়', 'রাহুর প্রেম' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের যে স্বপ্নকল্পনাময়, অভিমান-ব্যথাতুর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আভাস-জড়িত, অস্পষ্ট রূপ কবিচিত্তকে মোহাবিষ্ট করিয়াছিল, তাহাই যেন এখানে সর্বপ্রথম মানবসত্তার সুস্পষ্ট আবেগে ও প্রকাশের বাষ্পজড়িমাহীন মাধুর্যে আত্মোপলব্ধিতে স্থির হইয়াছে। এগুলি সত্যই গান, বিশৃঙ্খল ভাব-ভাবনাপুঞ্জের মধ্যে অর্ধলুপ্ত খানিকটা বাষ্পাবেশ মাত্র নহে। ইহারা অতিবিস্তারের স্থানে সীমা-সুমিতি, মিশ্রভাবের অসংলগ্নতা হইতে একনিষ্ঠ ভাবকেন্দ্রিকতা, গুমরিয়া-মরা অর্ধব্যক্ততা হইতে আত্মপ্রত্যয়শীল সুরমাধুর্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রসংগীত এখানে আসিয়া ঘূর্ণ্যমান বস্তু ও ভাবপিণ্ড হইতে, অস্পষ্ট উপলব্ধির অস্থির আবর্তন হইতে এক স্নিগ্ধ-সুদূর নক্ষত্র-দীপ্তির স্থিররশ্মিজালে সংহত হইয়াছে। নূতন যুগের প্রেমকবিতা এখানে উহার নিজস্ব সুরে আকাশ-বাতাসকে মাতাল করিয়াছে, অবিশ্রান্ত গীতিনির্ঝরে বাংলার মনোভূমি ও কাব্যলোককে সরস-শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। হয়তো দূর অতীতের বৈষ্ণব পদাবলীর স্মৃতি ও ভাবাদর্শ ইহাতে মাখানো আছে, কিন্তু গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাংলা কাব্যে যে নূতন আবেগ সঞ্চিত হইতেছিল, সুরের যে

অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি প্রকাশ-ব্যাকুলতায় কবিমনকে চঞ্চল করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের গানে ও গীতিকবিতায় এই যুগব্যাপী প্রস্তুতির একটা ফলশ্রুতি পাওয়া গেল।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' একটি যথার্থ কাব্যাশ্রিত নাটক ; ইহাতে গানের টানে নাটকের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া আসিয়া হাজির হয় নাই। এখানে বিষয়বস্তু নাটকোচিত ও নাট্যকলারীতিরও কিছুটা সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মূল প্রেরণা কাব্যধর্মী। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ যে অবরোধকারী আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁহাকে নিঃসঙ্গতার বেদনায় বিষণ্ণ ও বহির্জগৎবিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল ও 'ছবি ও গান'-এ যাহার ঈষৎ আভাস মুক্তির আনন্দকে মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন করিতেছিল, সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে তাহাই একটা অধ্যাত্মসাধনার দৃঢ় জীবননীতিরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ কবি-হৃদয়ের আকুল ক্রন্দন কোথাও জমাট বাঁধে নাই, টিপিটিপি কুয়াসাবিন্দুবর্ষণে ইহা জগৎসংসারকে ঢাকিয়াছে ও কবির গমনপথকে পিচ্ছিল করিয়াছে। এই দৃষ্টিবিভ্রমকারী কুয়াসা কখনই দৃঢ় কাঠিন্য লাভ করে নাই, পর্বতের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই। কবি ইহাকে খেয়াল-খুশীমত ফুৎকারে উড়াইয়াছেন বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কথা খুব বিরল ক্ষেত্রেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে। এরূপ একটি বিরল উপলক্ষ 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর 'সংগ্রাম-সংগীত'-এ উদাহৃত হইয়াছে। এই কবিতাটির মধ্যেই হয়তো আমরা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর বীজ পাই। কবির এই ক্ষণস্থায়ী সংগ্রাম-প্রেরণাই সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও বালিকার অনুসরণের দৃঢ়সংকল্পে অন্তর্জীবন হইতে বহির্জীবনে নাট্যরূপায়িত হইয়াছে। অবশ্য এই কাব্যধর্মী নাটকে সন্ন্যাসীর মানস বিক্ষোভ ও চলচ্চিত্ততা প্রকাশিত হইয়াছে সুদীর্ঘ কাব্যগুণসমৃদ্ধ সংলাপ-স্বগতোক্তিতে ; ইহাদের মধ্যে কোন দ্রুতসঞ্চারী, পরস্পর-প্রভাবিত ঘাত-প্রতিঘাতের বিশেষ চিহ্ন নাই। বহির্জীবনের কোন তরঙ্গ অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত মিশিয়া উহার গতিবেগ বৃদ্ধি করে নাই। গ্রাম্যজীবনের খণ্ড খণ্ড ছবিগুলি ও পল্লীবাসীদের আলাপের কৌতুককর অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথের আত্মকেন্দ্রিকতামুক্ত জীবনপর্যবেক্ষণের পরিচয় দেয়, কিন্তু এগুলি ছাড়া-ছাড়া, নাট্য-ঘটনাবিন্যাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত নহে। সন্ন্যাসীর বিলম্বিত ক্রমোপলব্ধি ও বালিকার করুণ মৃত্যু বিশেষভাবে নাট্যরস-উদ্বোধনে সহায়তা করে নাই। রচনাটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নাটক অপেক্ষা কাব্যের পথেই অগ্রগতি সূচনা করে। কবি যে নিজ অনুভূতিকে আত্মরতিনিরপেক্ষ চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে কিছুটা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন ও উহাকে যথোচিত কাব্যমর্যাদা

দিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহাতেই যেন তিনি কৈশোরোত্তীর্ণ পরিণতির প্রথম সোপানে পা দিয়াছেন মনে হয়।

সন্ধ্যাসংগীত ১৮৮১-৮২ (১৮৮৮)

৩

এইবার রবীন্দ্রনাথের খাঁটি কাব্য তিনটির আলোচনা করিলেই তাঁহার কৈশোর রচনার কক্ষ-পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। এই কাব্যগুলির সর্বোৎকৃষ্ট সমালোচক রবীন্দ্রনাথ নিজে। তাঁহার পরিণত মননের আলোকে তিনি ইহাদের মধ্যে আলো ও ছায়া, দুর্বলতা ও যথার্থ কাব্য-প্রেরণা কেমন অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়াছিল তাহার চমৎকার, আত্মজ্ঞানে উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসংগীত'কে কবি তুলনা করিয়াছেন কষায়স্বাদ কচি আমের গুটির সঙ্গে, কিন্তু ইহা তাঁহার প্রথম স্বকীয় রচনা। রসাল ফলের পরিপূর্ণ মিষ্টতা ইহারই মধ্যে কবির অজ্ঞাতসারেই প্রচ্ছন্ন ছিল। 'প্রভাতসংগীত' সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য এই যে ইহাতে মননের রূপ ও একটা অস্পষ্ট বিরাট দার্শনিক অনুভূতি প্রথম দেখা দিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার এক অস্ফুট, পৌরাণিকস্মৃতিমণ্ডিত পূর্বাভাস তাঁহার মানস পরিণতির ভবিষ্যৎ দিক্‌নির্ণয় করিয়াছে। 'ছবি ও গান'-এ কবি অনুদ্দিষ্ট বেদনার প্রলাপ-বাণী অতিক্রম করিয়া সুরের সঙ্গে রূপের প্রত্যক্ষতা যোগ করিতে চাহিয়াছেন, এবং এইখানে পৌঁছিয়াই কবি রেখাচিত্রের দ্বারা ভাবের কুহেলিকাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসলোকে উত্তীর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইখানে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের সহিত রূপচেতনার সংযোগ-সাধনের একটা অপটু প্রয়াসের সূত্রপাত হইয়াছে।

কবির এই আশ্চর্য স্বচ্ছ আত্মসমীক্ষা অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রথম তিনটি কাব্যের সহিত তাঁহার পরিণত প্রতিভার সম্পর্কবিচার চলিতে পারে। 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এ কবিপ্রাণের পরিচয়টিই মুখ্য, বিষয় এখানে গৌণ। যেমন কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে সমস্ত দৃশ্যবৈচিত্র্য কুহেলিকার অবগুণ্ঠনতলে একাকার হইয়া যায়, সেইরূপ কবিমনের বাষ্পকলুষ দৃষ্টির তলে সমস্ত বিষয়বস্তু ও ভাব-ভাবনা স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ভেদহীন, ছেদহীন ধূসরতায় বিলীন হইয়াছে। এক অবিচ্ছিন্ন ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস সমস্ত কাব্য ব্যাপিয়া অনুরণিত। হৃদয়-অরণ্যের সব কয়টি আঁকা-বাঁকা পথ এক গভীর

শূন্যতার গহ্বরমুখে আসিয়া গতি শেষ করিয়াছে। তথাপি কবিধর্মের যে সাধারণ ধারণা এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে প্রতিফলিত তাহার মধ্যে উহার যথার্থ আদর্শটি অপটু হাত ও অস্ফুট উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও আভাসিত হইয়াছে। কবি যে 'টলমল মেঘের মাঝারে' তাঁহার কবিতার ঘর বাঁধিয়াছেন তাহাতে কাব্যের জীবন-বৈদ্যুতীশক্তি স্ফুরিত। কবি তাঁহার কবিতার নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ সুর সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু উহার করুণ কাতর রেশটি, অচেতন প্রকৃতির মধ্যে উহার নিগূঢ় চেতনা-সঞ্চারের শক্তিটিও তাঁহার অনুভূতি এড়ায় নাই। 'অনুগ্রহ' কবিতায় তিনি কবিসুলভ দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত ভগবানের অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করিয়া যে অফুরন্ত ভালবাসা তাঁহার কবিত্বের উৎস, ভগবানের সহিত সেই প্রীতিসম্পর্কই যাচ্ঞা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ ধর্মসাধনার জোরে বিশ্বনিয়ন্ত্রী মাতৃশক্তির সহিত যে একাত্মতার দাবী জানাইয়াছেন, তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আত্মানুভূতির প্রেরণায় জোর গলায় সেই দাবীরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কোন্ কবির প্রথম রচনায় এইরূপ মতবাদের দৃঢ়তা ধ্বনিত হইয়াছে?

যে কবিপ্রকৃতি এই কবিতাগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা অতি কোমল, অতি স্পর্শকাতর, নিঃসঙ্গতার বেদনায় মুহ্যমান, ভালবাসার কাঙাল ও সহানুভূতির অভাব-আশঙ্কায় ব্যাকুল ও অশ্রুছলছল। 'আবার' কবিতায় কবি সায়াহ্নের কোণে যে গোধূলি-নিকেতন রচনা করিয়াছেন তাহাতে কোন অবাঞ্ছিত, কঠোরহৃদয় অতিথির প্রবেশাধিকার নাই। 'পাষাণী' কবিতাতেও সেই সহানুভূতি-বুভুক্ষু হৃদয়েরই অভিব্যক্তি। 'শিশির' কবিতায় কবি শিশিরবিন্দুর সঙ্গে ইচ্ছা বদল করিয়াছেন। শিশির যখন নিজ ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য খিন্ন, তখন কবি কিন্তু শিশিরের সৌন্দর্যসার ক্ষণপরমায়ুটুকুর জন্য ব্যগ্র। 'গান-সমাপন'-এ কবি নিজ সংসারবিমুখ, জ্ঞানসঞ্চয়রিক্ত, ভীতকুণ্ঠিত দীন প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন—উৎসুক শ্রোতা না পাইলে গান গাহিবেন না বলিয়াছেন। শেষ কবিতা 'উপহার'-এর সমপ্রাণ সাক্ষীর অভাবে তাঁহার কাব্য-উৎস রুদ্ধ হইবে তাহাও সকাতরে নিবেদন করিয়াছেন। অবশ্য এই সমস্ত উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে একটা আত্মমুগ্ধ ভাবাতিশয্য আছে তাহা ঠিকই, তথাপি এই দোষ গুণেরই বিপরীত দিক। বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর পর আর এরূপ কোমল-অনুভূতিময়, সৌন্দর্যাকুল, জগতের পিছনকার রহস্যের প্রতি উন্মুক্ত-চিত্ত কবিসত্তা আবির্ভূত হয় নাই। এই ভাববস্তুই সংযত, বিশ্ব-রহস্যে গভীরতর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট, মনন-সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যযাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত হইলে যাহা দাঁড়াইবে তাহাই রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু যে বিশ্ব-অবরোধকারী নিবিড় কুয়াশাজাল বিদীর্ণ করিয়া তরুণ রবি দিগন্তে উদ্ভাসিত হইতে প্রয়াস পাইতেছিলেন তাহার অস্বচ্ছ নিদর্শনও কবিতার মধ্যে কম নাই। 'প্রভাতসংগীত'-এ কবির উল্লসিত মুক্তি বুঝিতে হইলে 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এ তাঁহার হৃদয়-অরণ্যে পথ-হারা ও পথ-খোঁজার কাহিনীও অনুধাবন করিতে হইবে। 'তারকার আত্মহত্যা' হইতে 'ছবি ও গান'-এ 'রাহুর প্রেম' পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ তরুণ কবির অসুস্থ মনোবিকার ও দুঃস্বপ্নমথিত আবেগ-কল্পনার আবছা আঁধারে দুর্গম। 'তারকার আত্মহত্যা' তরুণ কবির আত্মনাশকল্পনার বিভীষিকাময় রূপক-আভাস। কবি এক নৈরাশ্যঘন মুহূর্তে নিজেকে তারকার সহিত এক করিয়া দেখিয়াছেন ও নিজের সদ্যোজাত কবিপ্রেরণার স্তিমিত দীপটি যে অনুরূপভাবে নির্বাপিত হইতে পারে এই ভাববিলাসটুকু লইয়া তিনি এক বিষাদের খেলা খেলিয়াছেন। কতকগুলি কবিতার নামের মধ্যেই সহজ ভাবের অপেক্ষা বিসদৃশমিলনজাত ভাবসাঙ্কর্যের প্রতি কবির অধিক রুচি দেখা যায়। 'আশার নৈরাশ্য', 'সুখের বিলাপ' প্রভৃতি কবিতায় তরুণ কবির মনোলোকে বিপরীত ভাবের সহাবস্থান, বিশেষতঃ অকারণ বিষাদের অতি-প্রাদুর্ভাব যে এক অনিশ্চিত উদ্‌ভ্রান্তির সৃষ্টি করিতেছিল তাহা পরিস্ফুট। 'শান্তিগীত'-এ কবি স্নেহময়ী মাতার ন্যায় এই দুঃখশিশুকে ঘুমপাড়ানিয়া গানে নিদ্রাবিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন।

অবশ্য এইরূপ দুঃখবিলাস সংসারানভিজ্ঞ, আত্মরতিনিষ্ঠ, কল্পনাপ্রবণ তরুণ কবির একটি প্রথাসম্মত মনোভঙ্গী (pose), অভিনেতার রং-ফলানো আড়ম্বর অকৃত্রিম অনুভূতির সঙ্গে বহু পরিমাণে মিশ্রিত। ইউরোপের দুইজন মহাকবির, Byron ও Goethe-র প্রথম রচনায় এই জাতীয় বিশ্বগ্রাসী দুঃখাভিনয় Byronism ও Wertherism সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া পাশ্চাত্য জগতের কবিচিত্তে একটা বিরাট আলোড়ন জাগায়। জীবনপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দুঃখবাদ বায়রনের ক্ষেত্রে তীব্র, সরস ব্যঙ্গশ্লেষ ও গ্যেটের ক্ষেত্রে সর্বসমন্বয়কারী প্রজ্ঞাঘন জীবন-দর্শনে পরিণতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবকে ঠিক pose বা ভঙ্গী আখ্যা দেওয়া যায় না, কেন না ইহা তাঁহার সমস্ত ভবিষ্যৎ মানস পরিণতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। তাহা ছাড়া তাঁহার মনে বদ্ধমূল এই দুঃখরতি হইতে তিনি কিরূপে মুক্ত হইলেন, এই বিকৃত মনোভাবের সহিত তিনি কি ভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার ইতিহাসও তাঁহার কাব্যে লিপিবদ্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রভাবাধীন থাকিয়াও ইহাকে যে একটি অশুভ বিকার বলিয়া

চিনিয়াছিলেন তাহার প্রমাণও সুস্পষ্ট। 'দুঃখ-আবাহন'-এ ও 'হলাহল'-এ তিনি দুঃখের অসাড়-করা, তন্দ্রালস গোধূলিছায়া অপেক্ষা তাহার খর রুদ্র রূপকেই আহ্বান জানাইয়াছেন ও উহার বিষময় প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। 'অসহ্য ভালোবাসা'-তেও কবি প্রেমের দুঃখস্পর্শহীন আবেশমুগ্ধতার পরিবর্তে উহার তীব্র জ্বালাকেই বরণীয় মনে করিয়াছেন। 'পরাজয়-সংগীত' ও 'সংগ্রাম-সংগীত'-এ কবির পরাজয়ে আত্মগ্লানি ও জয়লাভের দৃঢ় সংকল্প যেরূপ ঋজু ও ওজস্বী বাগ্‌ভঙ্গির দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা কোন স্বপ্নমূর্ছিত, আত্মভাবনিমগ্ন কবির পক্ষে সম্ভব হইত না। এখানে ভাব যে শুধু বস্তুনিষ্ঠ তাহা নয়, ভাষাও কল্পনানিষ্ঠ।

রবীন্দ্রপ্রতিভার আরও দুই একটি দিক এই প্রথম কাব্যে কিছুটা ক্ষীণ রেখায় ফুটিয়াছে। 'আমিহারা' কবিতায় প্রথম যৌবনে উপনীত কবি পরিণতবয়স্ক প্রৌঢ়ের ন্যায় তাঁহার বাল্যজীবনের স্মৃতিরোমন্থনে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাঁহার শৈশবের সহজ আনন্দ ও জীবনের সহিত আত্মীয়তাবোধ কেমন করিয়া যেন তাঁহার যৌবন-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল ও তিনি আপনার সঙ্কীর্ণ কল্পনাজালে বন্দী হইয়া বৃহত্তর জীবন-সংযোগ হারাইলেন। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ তাঁহার যে আত্মমগ্নতা তাহা তাঁহার মনের সাময়িক বিকার মাত্র, উহার সত্য পরিচয় নহে। 'অনুগ্রহ' 'পাষাণী' ও 'শিশির' কবিতাগুলিতেও কাঁচা কল্পনার অত্যুচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে রচনার স্বচ্ছতা ও প্রসাদগুণেরও পরিচয় মিলে। 'শিশির' কবিতাটি শিশিরবিন্দুর মতই স্নিগ্ধ ও নির্মল। ইংরাজ কবি ব্লেকের অতি সরল রূপকের ছোঁয়া-লাগা কল্পনারীতি এই কবিতাটিতে ও 'ছবি ও গান'-এর শিশু-বিষয়ক কবিতাগুলিতে অনুভব করা যায়। নিসর্গ-কবিতার প্রথম চিত্ররেখা ও অনুভবগূঢ়তারও এখানে অভাব নাই। যে বর্ষা রবীন্দ্রকাব্যে এরূপ মোহময় প্রভাব বিস্তার করিবে তাহার প্রথম ঝরঝর বারিপাত ও বিদ্যুৎ-স্ফূরণ এখানে ক্ষীণ কণ্ঠে অভিনন্দিত হইয়াছে। সন্ধ্যা কবির নিকট শুধু দিনের সমাপ্তি-চিহ্ন নহে; ইহা হৃদয়ের নিগূঢ় অনুভূতিতে, অতীত সুখ-দুঃখ আশা-কল্পনার স্মৃতিজালে পূর্ণ একটি মানসলোকের প্রতিচ্ছায়া। তরুণ কবি অনেক কথা বলিতে চাহিয়াছেন, অনেক ভাবের কণিকা ছড়াইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষা ও গ্রন্থন-কৌশল তাঁহার ভাবের অনেক পিছনে পড়িয়া আছে।

কবির হৃদয়ারণ্যে একটি ত্রস্ত, ভীরু কল্পনার মৃগশিশু পথের সন্ধানে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করিয়া মরিয়াছে; বড় বড় গাছের অন্ধকারে সে হারাইয়া গিয়াছে, তাহার অচিরোদ্গত শৃঙ্গে বনভূমির লতা-পাতা জড়াইয়াছে। তাহার

আয়াসস্পন্দিতবক্ষে ও করুণ নেত্রে এক অসহায়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তি-সমর্থিত সহজ সংস্কারের অভ্রান্ততার বলেই সে নিষ্ক্রমণের পথ আবিষ্কার করিয়াছে। এবং একবার সূর্যালোকিত জীবনাবেগের ঋজু পথে ছাড়া পাইয়া এই কম্পিতচরণ হরিণশাবকই দেখিতে দেখিতে দিক্‌দিগন্তজয়ী উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

প্রভাতসংগীত ১৮৮৩ ৮৪ (১২৯০)

৪

'প্রভাতসংগীত'-এ যে ভাবমুক্তির আনন্দ বিঘোষিত তাহা শুধু কবি-কল্পনার বিষয় নয়, কবির আত্মজীবনীর তথ্যভিত্তিক। এক সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে হঠাৎ কবির চোখ হইতে আঁধারের যবনিকা সরিয়া গেল ; পৃথিবীর সৌন্দর্য ও মানুষের প্রীতিময় সমপ্রাণতা, জীবনের অফুরন্ত, চিরনবীন আকর্ষণ তাঁহার অনুভূতি-তন্ত্রীতে নূতন সুরঝঙ্কার তুলিল। তাঁহার কাব্যে বেগবান গতিপ্রবাহ ও স্থির প্রত্যয়ের পিছনে এক প্রকার অভাবিত আনন্দবিস্ময় এই মানস পরিবর্তনের ছন্দোলিপি ও রূপকল্প রচনা করিল। 'প্রভাতসংগীত' এই নব জাগরণের পুলক-রোমাঞ্চিত উৎসব-গীতিকা।

'আহ্বান-সংগীত' কবিতায় কবির পূর্ব সত্তার বিসর্জন ও নূতন সত্তার প্রতি অভিনন্দন-জ্ঞাপন। ইহাতে কবি আপনার সদ্য-উত্তীর্ণ রুগ্ন অবস্থাটির যেরূপ সূক্ষ্ম স্বরূপ-পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার এই পূর্ব অবস্থা বর্ণনা কবিত্ব ও মনস্তত্ত্ব উভয় দিক দিয়াই আশ্চর্যরূপ সত্যনিষ্ঠ—

> দিবস রজনী মরীচিকা-সুধা
> কেবলি করিস্ পান।

বা,

> নিজের নিশাসে কুয়াশা ঘনায়ে
> ঢেকেছে নিজের কায়া,
> পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
> নিজের দেহের ছায়া !

অথবা

আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস্ কত।

এখানে শুধু বিশ্বজগৎ ও প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সঙ্গে কবিমনের মিলন ঘটিল না, জগৎ-অতীত আকাশ হইতে বাজা বাঁশির সুরও তাঁহার চেতনাকে স্পর্শ করিয়াছে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রবীন্দ্রকাব্যজীবনে একটি মহাপরিবর্তনের রূপক-রাগিণী রূপে স্বীকৃত হইয়াছে—সেখানেই তাঁহার প্রকৃত কবিচেতনার উন্মেষ। এই কবিতাটির ভাববস্তু ছাড়াও ইহার ছন্দ-উল্লাস, ইহার নব অনুভূতির উদ্দাম উত্তেজনা ও অসংবরণীয় আনন্দ-উচ্ছ্বাস ইহাকে কবির কাব্যস্রোতস্বতীর প্রকৃত উৎসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অবশ্য এখানেও অতিভাষণপ্রবণতা বিদ্যমান, কবির গুহার আঁধারে ঢাকা বিবিধরূপ আত্মসমীক্ষার ন্যায় তাঁহার গুহামুক্ত বেগবান আনন্দনির্ঝরও সীমালঙ্ঘনে উন্মুখ। মুক্তির প্রথম আনন্দ কলাসংযমের আধারে আবদ্ধ করা খুব দুরূহ কাজ এবং মুক্তিপাগল তরুণ কবিও তাহাতে কৃতকার্য হন নাই। তবুও এখানেই কবির জয়যাত্রা আরম্ভ ও নবদিগন্ত-উন্মোচনের সূচনা ও প্রতিশ্রুতি। 'প্রভাত-উৎসব'-এ সেই প্রথম বিস্ময়ের কিছুটা সংযত দার্শনিক উপস্থাপনার প্রয়াস, উহার সুদূর-প্রসারী ফলাফলের ব্যাপ্তিনির্ণয়-চেষ্টা। এখন কবির সহিত প্রকৃতির মিলন সন্ধ্যার অন্ধকারে, নিশীথের ভীতিশিহরণকারী স্তব্ধতায় বা স্বপ্নের পুঞ্জীভূত অসংলগ্নতার মধ্যে নয়, প্রভাতের প্রফুল্ল, প্রাণবেগচঞ্চল প্রীতি-উৎসারের মাধ্যমে। প্রকৃতির ছোটখাটো খণ্ডচিত্রগুলি যেমন বর্ণোজ্জ্বল, তেমনি প্রাণময়।

পূরব-মেঘমুখে পড়েছে রবি-রেখা,
অরুণরথচূড়া আধেক যায় দেখা।

অথবা

আপনি আসি ঊষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।
নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।

এই দৃষ্টান্তগুলি অনেকটা বহিরঙ্গমূলক ছবির বর্ণবিলাসের পর্যায়ভুক্ত হইলেও ইহাতে কবি যে আপনার কল্পনাবিকারের অন্ধকার হইতে মুক্ত জীবনের সহজ-

দৃষ্টিলব্ধ রূপজগতের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার নিদর্শন মিলে। 'পুনর্মিলন' কবিতাটিতে কবি অতিরঞ্জিত দুঃখবাদে ভারাক্রান্ত, পরিবেশভ্রষ্ট, আত্মরতির নিষ্ফল কক্ষাবর্তনে ক্লিষ্ট জগৎ হইতে নিজ বাল্যজীবনের সহজ ছন্দটুকুতে ফিরিয়া গিয়াছেন। বাতায়নের অন্তরালবর্তী জীবনে কেমন করিয়া চারিপাশের স্বতঃউৎসারিত আনন্দরস, প্রকৃতির ছোটখাট স্নেহভরা ইঙ্গিত বালকের অন্তরটিকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ কাব্যাভিষেকের ভূমিকা রচনা করিত, কবি তাহারই একটি সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ অথচ ভাবঘন বর্ণনা দিয়াছেন। এ বর্ণনাটি ঠিক তাঁহার পরিণত বয়সে লেখা 'আত্মজীবনী'র সুরের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। কবি এখানে কৃত্রিম ভাবস্ফীতির কাল মুখোশ খুলিয়া তাঁহার স্বভাবপ্রসন্ন মুখে তাঁহার অতীত জীবনের কাহিনী বিবৃত করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে যে কাব্য-উপাদান সঞ্চিত ছিল তাহারই সার্থক প্রয়োগ করিতে জানিলে তাঁহাকে কোন মিথ্যাসম্ভ্রমের আরোপিত মুকুট পরিতে হইবে না ইহা কবি বুঝিয়াছেন। এই কবিতায় যে কয়েক ছত্রে বর্ষাবর্ণনা আছে তাহা কবির কল্পিত বিষাদের পটভূমিকাবিন্যস্ত না হইয়া তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির পোষকতা করিয়াছে।

এই কাব্যগ্রন্থে কবিচেতনার একটি নূতন ধারা উন্মুক্ত হইয়াছে।—এইটি হইতেছে দার্শনিক উপলব্ধির ধারা। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যজীবনে যে জীবনদর্শন ও কাব্যানুভূতি অবিচ্ছিন্ন যুগ্মধারায় প্রবাহিত, এখানেই তাহাদের প্রথম সংযোগস্থল। অবশ্য এই প্রথম স্তরে ইহাদের সম্পর্কে কেবল সহাবস্থানের, অন্তরঙ্গ মিলনের নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যে মুহূর্তে রবীন্দ্রকাব্য হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উন্মুক্ত, বাধাহীন প্রবাহের অবসর পাইল, সেই মুহূর্তেই তাঁহার চিন্তা অনন্তাভিমুখী হইল, অনন্তের প্রতিবিম্ব তাঁহার কাব্যানুভূতিতে বিধৃত হইল। অবশ্য এই অনন্ত-কল্পনার মধ্যে পরিণত মনন বা নিজস্ব ধ্যানপ্রত্যয় এখনও প্রকট হয় নাই—ইহা অনেকটা প্রচলিত পৌরাণিক ধারণারই অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন রূপায়ণ। কিন্তু ইহা যতই প্রথানুসারী ও অপরিণত হউক, এই অনন্তাভিমুখীনতা কবির মানস বিবর্তনের একটি প্রধান সোপান ও রবীন্দ্রকাব্যে ইহার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। 'অনন্ত জীবন', 'অনন্ত মরণ', 'প্রতিধ্বনি', 'মহাস্বপ্ন', 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' এই নূতন প্রবণতার বহুমুখী নিদর্শন। এগুলির মধ্যে কবির নিজস্ব চেতনার সঙ্গে বিহারীলাল ও সম্ভবতঃ হেমচন্দ্রের বিশ্বরহস্যবিষয়ক কবিতার প্রভাব থাকিতে পারে। এই বিরাট বিশ্বরূপদর্শনস্পৃহা

যতটা কল্পনার দুঃসাহস হইয়াছে, ততটা পরিণত কাব্য হয় নাই। 'অনন্ত জীবন' ও 'প্রতিধ্বনি' এই দুই কবিতায় কবির একই রূপ প্রত্যয় প্রকাশ পাইয়াছে, দ্বিতীয় কবিতায় প্রকাশের মধ্যে আরও গভীরতর আকৃতি ও সূক্ষ্মতর উপলব্ধির পরিচয় আছে। পৃথিবীতে সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত ফুল-হাসি-গান অমর; উহাদের ক্ষণিক জীবন হয় আকাশে, না হয় কবির চিত্তের অবচেতনে না হয় জগতের অন্তরে তিলে তিলে উপচীয়মান সঞ্চয়-মহাসমুদ্রে রক্ষিত থাকে। এই বিশ্বাস কবির কাব্যজীবনের সূচনা হইতেই বদ্ধমূল হইয়াছে। নানারূপ চিত্রকল্পের বিচ্ছিন্নতায় এই ভাবটি প্রকাশের মধ্যে খানিকটা দৃঢ়তা হারাইয়াছে ও লঘু কল্পনাবিলাসের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই।

কত কি যে দেখেছিনু হয়তো সে-সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি।
তা বলে নাহি কি তা মনে,
ছবিগুলি মেশেনি জীবনে?

এই পংক্তিগুলিতে 'বলাকা'র বিখ্যাত 'ছবি' কবিতার দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি আমাদের মনে অনুরণিত হয় ও কবির প্রথম যৌবন ও পরিণত প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে এক রাখীবন্ধন বাঁধিয়া দেয়।

'অনন্ত মরণ' কবিতায় কবির মৌলিক চিন্তা এখন হইতেই সুপরিস্ফুট। তিনি জীবনকে অতিক্রান্ত মুহূর্তসমূহের মরণসমষ্টি নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং এক আশ্চর্য বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া মরণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও অধিকার বাড়িবে এই সাহসিক মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি মরণ-ডোর দিয়া সমস্ত বিশ্বজগৎকে ক্ষুদ্র মানবজীবনের সঙ্গে বাঁধিবেন এই আশায় উল্লসিত হইয়াছেন; জগতে মরণের অনন্ত উৎসব দর্শনে পুলকিত হইয়াছেন ও "শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু" মানবকে মাতৃস্তন্যপানে পুষ্ট করিবার জন্য মরণকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। কবির জীবনে অধ্যাত্ম সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই এই প্রত্যয়দৃঢ়তা সহজ উপলব্ধির বলেই তাঁহার মনে জাগরূক হইয়াছে।

'প্রতিধ্বনি' কবিতাটিও আরও সূক্ষ্ম অনুভূতিময় ও দার্শনিক চেতনার আরও সহজ, সাবলীল প্রকাশ। 'অনন্ত জীবন'-এ তিনি জগতের ক্ষণিক সৌন্দর্যের এক বিরাট আধারে রক্ষা ও সঞ্চয়ের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান কবিতায় তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের পিছনে এক আদর্শ সৌন্দর্যলোকের কল্পনা করিয়াছেন। মানব ও প্রকৃতিজীবনের বিচ্ছিন্ন সঙ্গীতগুলি এই সঙ্গীতের মূল প্রস্রবণের সহিত

মিলিত হইয়া এক গভীরতর তাৎপর্য লাভ করে ও এক মহান বিশ্বসঙ্গীতে পরিণত হয়। তরুণ কবি আর শুধু পাখী, নির্ঝর, অরণ্য, দিন-রাত্রি-সন্ধ্যা-প্রভাত, এমন কি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ও অন্ধকারের মধ্যে আলোকের পদধ্বনি—ইহাদের স্বতন্ত্র সঙ্গীতে তৃপ্ত নহেন—এই সকলের সম্মিলিত ঐকতান বিশ্বের আদি অতীন্দ্রিয় সুরের অনুরণনে এক অবিচ্ছিন্ন আবেদনে গ্রথিত হইয়া যে অনির্বচনীয়ের আস্বাদ আনিয়া দিবে তিনি তাহার জন্যই উৎসুক ও উৎকর্ণ। ইহার মধ্যে শেলীর Hymn to Intellectual Beautyর সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। একজন অপরিপক্ক শিক্ষানবীশী কবির পক্ষে এইরূপ মহৎ ও সূক্ষ্ম কল্পনার অধিকার যে এক অসামান্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয় সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। শুধু দর্শনতত্ত্ব নয়, কবিকল্পনার সমস্ত আবেগ দিয়া উহার উপলব্ধিও হয়তো অসম্পূর্ণ, অপরিণত গীতোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া উহার প্রকাশ—ইহাতেই কবির কৃতিত্ব।

সময় সময় কবিকল্পনা পুরাণ-কাহিনী আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতাটি এই প্রবণতার নিদর্শন। প্রথমতঃ ব্রহ্মার সৃষ্টিপূর্ব ধ্যানতন্ময়তা ও অন্ধকারের নব-আবির্ভাব-প্রত্যাশা পুরাণস্মৃতিপ্রভাবিত ভাবগাম্ভীর্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর নব সৃষ্টির অধীর, অশান্ত উন্মাদনা-বর্ণনা ও স্রষ্টার আনন্দবিভোর ভাবকল্পনায় কবির নিজস্ব রূপ-রেখার বিস্তার। এই বিশৃঙ্খল, উদ্দাম শক্তিতে ঘূর্ণ্যমান জগতে কাব্যসুষমা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তকরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাব। এই পালনকর্তা বিষ্ণুর সঙ্গেই কবির সমপ্রাণতা বেশী—মনোজগতে কবি ও সৃষ্টিজগতে বিষ্ণু একই ভূমিকায় অবতীর্ণ। বিষ্ণুর ক্রিয়া-বর্ণনাতেই কবি ঐতিহ্য-প্রভাব ছাড়াইয়া নিজ মৌলিক কল্পনাকে স্বচ্ছন্দ বিহারের অবকাশ দিয়াছেন। তাহার পালনী মন্ত্রে

সৌন্দর্য-কুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল।

এবং

কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি,
প্রেমের হৃদয়ে মহাবল
অশনির মুখে দিল হাসি।

শিবের প্রলয়নৃত্য তরুণ সৌন্দর্যবিভোর কবির ঠিক মনের মত বিষয় নয়। পরবর্তী কালেই কবি নটরাজের তাণ্ডবের সাঙ্কেতিক মহিমা আবিষ্কার করিয়াছেন।

সুতরাং প্রলয়ের যে বর্ণনা আমরা কবিতাটিতে পাই তাহা চিত্রসৌন্দর্যমূলক, গভীর-অর্থবাহী নয়। অমোঘ নিয়মশৃঙ্খলা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগতের ব্যাকুলতা যেন 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর অকারণ দুঃখবাদের সুরে ফিরিয়া-যাওয়া। যাহা হউক এই সমস্ত কবিতা খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও ও মাঝে মধ্যে অত্যুচ্ছ্বাসদুষ্ট হইলেও কবির নূতন প্রেরণা, তাঁহার দার্শনিক চেতনা, কল্পনার প্রসার ও মাঝে মধ্যে প্রকাশের কাব্যোত্তীর্ণ ভঙ্গী—সমস্তই তাঁহার অগ্রগতির নিদর্শন।

ছবি ও গান ১২৮৩-৮৪ (১২৯০)

৫

'ছবি ও গান'-এ কবির মধুর আবেশময়তা ক্রমশঃ একটা স্থির রূপের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর দীর্ঘশ্বাস ও বিষাদপ্রবণতা যেন ধীরে ধীরে বাষ্পাবরণমুক্ত হইয়া শান্ত ও ছন্দময় হইয়া উঠিতেছে। আকারহীন কুয়াসায় কল্পনাস্বপ্নের সুষমার ছোঁয়াচ লাগিতেছে। অপরিমিত হৃদয়োচ্ছ্বাস কলাবন্ধন স্বীকার করিয়া ভাবমাত্রিকতার সীমায় সুসংবদ্ধ হইতেছে। 'ছবি ও গান' অভিধাটি ভাল ও মন্দ দুই দিক দিয়াই সার্থকনামা হইয়াছে। কবির ইন্দ্রিয় ও মন যাহা গ্রহণ করিতেছে তাহা প্রকাশের মধ্যে ছবির রূপময়তা লাভ করিয়াছে, ক্বচিৎ বা গানের সুরেও বাজিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে ছবি ও গানের অন্তরঙ্গ মিলনে উচ্চাঙ্গের কবিতার জন্ম সেই রাসায়নিক সংশ্লেষ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। লেখকের ঝোঁক ছবি-আঁকার দিকেই বেশী; গানের সুর আকস্মিক আবির্ভাবের মতই কাব্যশাসন না মানিয়া নিজ খুশি-খেয়ালমত আসা যাওয়া করিতেছে। ছবি ও গানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন যৌগিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য মিলনে সংহত হয় নাই।

খুচরা উন্নতির আরও চিহ্ন ইতস্ততঃ ছড়ান আছে। প্রথমতঃ অশরীরী, কল্পনাস্ফীত ছায়ামূর্তির পরিবর্তে জীবন্ত নর-নারীর প্রতি কবি-কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে রক্তমাংসসমন্বিত ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা এক প্রকারের ক্ষীণ ভাবপ্রতিচ্ছবিই প্রকটতর হইয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকী পথ-চলা বালিকা, পূর্বদিগন্তে উদীয়মান সূর্যের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি ধ্যানমগ্ন যোগী, পোড়োবাড়ীর করুণ মানবিক স্মৃতি, একটি অভিমানিনী মেয়ে ভাবের কুহেলিকায়

আড়াল হইতে কবির মনে শিথিল রেখাপাত করিয়াছে। পাগল ও মাতাল দুই জাতীয় আত্মভোলা, ভাবমত্ত মানব জাতির প্রতিনিধিরূপে কবির সমবেদনা জাগাইয়াছে, তাহারা যেন মধ্যাহ্নের নিঃসঙ্গতা ও সন্ধ্যার গোধূলিচ্ছায়ার মানব প্রতিমূর্তি। দুইটি শিশুবিষয়ক কবিতায়—'খেলা' ও 'ঘুম'-এ আমরা ব্লেকের মরমী দৃষ্টি ও প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর সহিত শিশুমনে খেলার উপলব্ধির প্রভাব লক্ষ্য করি। প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতের সহিত মানবমনের সমপ্রাণতা সম্বন্ধে কবির অনুভূতি তাহাদের বাহিরের পার্থক্য ভেদ করিয়া অন্তরের ঐক্য পর্যন্ত পৌছিয়াছে। 'বিদায়'-এ সদ্যপ্রবাসগত প্রিয়ের স্মৃতিবিভোর রমণীর বাহ্যজ্ঞানহীন প্রতীক্ষা ছবিরূপে যতটা ফুটিয়াছে, মনের পরিচয়রূপে ততটা ফুটে নাই। 'রাহুর প্রেম' কবির একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা—ইহাতে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর মনোবিকার প্রত্যাখ্যান-না-মানা প্রেমের প্রচণ্ড অনুসরণ ও দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগরূপে অসাধারণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমকবিতার পর্যায়ে এই কাঁচা হাতের অত্যন্ত জোর দিয়া লেখা কবিতাটি অনন্য।

নিসর্গ-কবিতা ধীরে ধীরে ভাবরূপে সুস্পষ্টতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহা এখনও বেশীর ভাগই সামান্য অনুভূতিমিশ্রিত ছবি। তথা রবীন্দ্রনাথের বীণায় উহার নিজস্ব রাগিণী ধ্বনিত করিবার উপক্রম করিয়াছে।

মেঘের ঘটা আকাশভরা
চারিদিকে আঁধার করা,
তড়িংরেখা ঝলক মেরে যায়।
শ্যামল বনের শ্যামল শিরে
মেঘের ছায়া নেমেছে রে।

এই বর্ণনায় কবিমনের সহজ সুরটি দ্রুতরেখাঙ্কিত ছবির ন্যায় মনকে দোলা দিয়া যায়।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বর অলংকরণ-প্রয়াসও লক্ষিত হয়:—

জলন্ত বিদ্যুৎ-অহি ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি
অন্ধকারে করিছে দংশন। (আর্তস্বর)

'মধ্যাহ্নে', 'পূর্ণিমায়' প্রভৃতি কবিতায় ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য সহজ অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। 'মানসী', 'সোনার তরী' স্তরে না পৌছা পর্যন্ত কবির ভাবদ্যোতনা উপাদানবহুলতা ও মানস আসক্তির অভিভব হইতে মুক্ত হইয়া সুরবিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। 'সুখস্বপ্ন' ও 'জাগ্রত স্বপ্ন'-এ কবির

বিক্ষিপ্ত প্রণয়-ভাবনা কিছুটা সুরসংহতি লাভ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুসংবদ্ধ ভাবমণ্ডলবিধৃত হইয়াছে।

কিন্তু কবির ইন্দ্রিয়াতিসারী দৃষ্টি বিশেষভাবে উদাহৃত হইয়াছে 'আচ্ছন্ন' ও 'স্নেহময়ী' কবিতাদ্বয়ে। দেহসৌন্দর্যের মধ্যে অনুস্যূত হইয়াছে এক সূক্ষ্মতার বিদেহী সৌন্দর্যসার। রূপ যেন অরূপ-বিচ্ছুরিত জ্যোতির্মণ্ডলে আপনার বিশুদ্ধতর আত্মিক সত্তা প্রকাশ করিতেছে। যে কবিদৃষ্টি দিয়া রূপকে অনুভব করিলে উহার দিব্য রূপান্তর ঘটে, রবীন্দ্রনাথ আংশিকভাবে তাহাই লাভ করিয়াছেন। যে দার্শনিক চেতনা ইতিপূর্বে সমগ্র বিশ্বপরিধিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাই একটিমাত্র রমণীসৌন্দর্যসত্তায় কেন্দ্রীভূত হইয়া উহার একটি অতীন্দ্রিয় ভাবাবেদন ও রূপানুভূতি আবিষ্কার করিয়াছে।

আলোকবসনা যেন আপনি সে ঢাকা আছে
আপনার রূপের মাঝার ;
রেখা রেখা হাসিগুলি আশেপাশে চমকিয়ে
রূপেতেই লুকায় আবার।
আঁখির আলোক ছায়া আঁখিয়ে রয়েছে ঘিরে,
তারি মাঝে দৃষ্টি পথহারা,
যেথা চলে, স্বর্গ হতে অবিরাম পড়ে যেন
লাবণ্যের পুষ্পবারিধারা। (আচ্ছন্ন)

এবং

তোমাতে পুরেছে বন, পূর্ণ হল সমীরণ,
তোমাতে পুরেছে লতাপাতা।
ফুল দূর থেকে চায় তোমার পরশ পায়,
লুটায় তোমার কোলে মাথা।
তোমার প্রাণের বিভা চৌদিকে দুলিছে কিবা
প্রভাতের আলোক-হিল্লোলে,
আজিকে প্রভাতে এ কী স্নেহের প্রতিমা দেখি,
বসে আছ জগতের কোলে। (স্নেহময়ী)

এইখানে যেন 'মানসসুন্দরী'-র বিশ্বপ্লাবী কল্পনার প্রথম প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়।

'নিশীথ-জগৎ' ও 'নিশীথ-চেতনা'য় 'প্রভাতসংগীত'-এর অনুরূপ বিষয়ের

সহিত তুলনায় কবিকল্পনার নিম্নাবতরণেরই চিহ্ন লক্ষিত হয়। প্রথম কবিতায় 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর কবিই যেন পুনর্জন্মলাভ করিয়া তাঁহার পূর্বপরিচিত বিষয়কেই নূতন আবেগ ও ব্যঞ্জনা-গৌরব দিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। দিগন্তসঞ্চারী বাষ্পরাশি যেন বজ্রগর্ভ ও বিদ্যুৎবাহী মেঘে জমাট বাঁধিয়াছে। ছেলেভুলানো ভয় যেন শিরা-স্নায়ুতে অনুভূত, অন্তরে শিহরণ-জাগানো যথার্থ বিভীষিকায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এখানে শুধু ভয়েরই পুনরুদ্বোধন নয়, অপ্রত্যাশিত বিপরীত-ভাষণে আশারও নিরসন করা হইয়াছে। শক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম না হইলেও তিনি যে নূতন শক্তি অর্জন করিয়াছেন তাহা সুনিশ্চিত। কোমল, ভাবপ্রবণ কবির হাতে নিশীথ জগতের ভয়াবহ ব্যঞ্জনা যেমন ফুটিয়াছে তেমনি তীব্র আঘাত হানিবার খড়্গও ঝলসিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ভাবাতিশয্যের অতিনাটকীয়তা সম্পূর্ণ পরিহার করিতে কবি এখনও পারেন নাই।

ওই যে পূরবে হেরি তরুণ-কিরণে সাজে
মেঘ-মরীচিকা,
না রে না কিছুই নয়—পূরব শ্মশানে উঠে
চিতানলশিখা।

নিশীথ-চেতনা 'সন্ধ্যা-সংগীত'-এর রচনান্তরে নামিয়া গিয়াছে—ইহার আরম্ভ গাম্ভীর্যে, উপসংহার মৃদু ভাববিলাসে।

কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অগ্রগতি ভাবের স্পষ্টতা ও কলাকৃতির উন্নতি উভয় পথ ধরিয়াই সাধিত হইয়াছে। প্রকৃতি-পরিচয়ের অন্তর্মুখিতা দার্শনিক চেতনার ক্রমবিকাশ ও ইহারই অনুষঙ্গী রূপে প্রেমরহস্যের প্রথম অনুভূতি, সৌন্দর্যবোধের ক্রমোন্মেষ, গান ও গীতিকবিতার সূক্ষ্ম ভাবানুসারী প্রকাশ, ছন্দে আবেগ ও সঙ্গীতের স্পষ্টতর, মধুরতর মূর্ছনা—এই সমস্তই ধীরে ধীরে রবীন্দ্র-কাব্যের দেহে-মনে যৌবন-লাবণ্য সঞ্চয় করিতেছে। ইহার পর 'মানসী'—'সোনার তরী'—'চিত্রা'-যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিমন আত্মোপলব্ধির পরিপূর্ণ আনন্দ-মহিমায় প্রোজ্জ্বল ও দিব্যবিভাস্নাতরূপে অবতীর্ণ হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। কাব্যলক্ষ্মীর নেপথ্য-বিধান সম্পূর্ণ হইয়াছে ও তাঁহার পাদপ্রদীপের সম্মুখে আসন্ন আবির্ভাব-সম্ভাবনা সমস্ত রসিকচিত্তকে প্রতীক্ষাচঞ্চল করিয়াছে।

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১৮৮১-৮২ (১২৮৮)

৬

এইবার রবীন্দ্রনাথের এই যুগের দুইটি গদ্যরচনার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে তাঁহার কৈশোর পর্বের সমস্ত সাহিত্যকৃতির বিবরণটি পূর্ণাঙ্গ হয়। এই দুইটি গ্রন্থের নাম 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (১২৮৮ সাল, ইংরাজী :৮৮১) ও তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১২৮৯ সাল, ইংরাজী ১৮৮২)। এই দুইটি রচনাই, বিশেষতঃ প্রথমোক্তটির পরবর্তী কালে অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। সুতরাং এগুলিকে তরুণ রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ সত্য পরিচয়রূপে গ্রহণ করা যায় কি না সন্দেহ। পরিণত-মনন সাহিত্যকৃতি ইহাদের প্রথম অপরি-পক্বতা ও অত্যুচ্ছ্বাসের উপর কতকটা সংশোধন-প্রয়াস নিশ্চয়ই মুদ্রিত করিয়াছে। তথাপি ইহাদিগকে প্রাথমিক পযায়ের অন্তর্ভুক্ত ও উহারই ভাবপরিমণ্ডলে সন্নিবিষ্ট করাই ইহাদের যথাযথ মূল্যায়নের পক্ষে অনুকূল হইবে এরূপ মনে করাই সমীচীন।

'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' আমরা এখন যে আকারে পাই তাহা অনভিজ্ঞ যৌবনের হঠকারিতা, বুদ্ধির দম্ভ ও বিচারবিভ্রমের চিহ্ন হইতে অনেকাংশে মুক্ত। যখন এই পত্রগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় মাসে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন উহার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণ লেখকের ইংরাজী ও ভারতীয় সমাজের কতকগুলি প্রথার সম্বন্ধে যে তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহার শালীনতা ও যুক্তিযুক্ততার বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় প্রতিবাদ জানান। পরে অবশ্য ঐ সমস্ত আপত্তিকর অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মোটামুটি এই তরুণ বয়সের রচনাটি বর্ণনামূলক, মননপ্রধান নয়। ইউরোপে জাহাজ ও ট্রেনের ভ্রমণকাহিনীই লেখকের সরসতাগুণে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে। ইংলণ্ডের সাধারণ জীবন-যাত্রা, রীতিনীতি, সামাজিক আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য বিশেষ গভীর মননশক্তির পরিচয় দেয় না। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা উপরিভাগের চটুলতা—নাচগান, হাসি-তামাশা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীও নিছক প্রথম পরিচয়ের কৌতুহল-প্রভাবিত। বিশেষতঃ ইংরাজী সমাজ ও ইঙ্গবঙ্গ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা তাহা এখন অত্যন্ত

সেকেলে ঠেকে—আধুনিক যুগের ভ্রমণকাহিনী-লেখকেরা অতি পরিচিত জ্ঞানে উহাদিগকে তাঁহাদের বর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ বাদই দেন। বরং প্রকৃতি-বর্ণনায় তাঁহার কিছু নিপুণ পর্যবেক্ষণ ও রসসৃষ্টির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। জাহাজে সহযাত্রী ও ইংলণ্ডে পরিচিত কয়েকটি নর-নারীর চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে কিছু অন্তর্দৃষ্টি ও রসাল বর্ণনাভঙ্গীর পরিচয় মিলে। মোটের উপর বইখানি একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কিন্তু অপরিণত ছেলেমানুষের বিস্ময়-মাখান, কৌতুক-অতিরঞ্জিত, তথ্যসঞ্চয়ী কিন্তু জীবনসত্যের গভীরতা-পরিমাপে অক্ষম মনেরই চিহ্নাঙ্কিত।

কিন্তু কবির প্রথম কাব্য সমকালীন 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর ভাবপরিমণ্ডলে স্থাপিত করিয়া দেখিলে এই ভ্রমণকাহিনীটি লেখকের বিচিত্র সম্ভাবনার প্রতি আমাদিগকে সচেতন করে। এই কৌতুকস্মিত বাস্তবদৃষ্টিপ্রসূত রচনাটি 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর একেবারে বিপরীত কোটিতে অধিষ্ঠিত। কাব্যের অনির্দেশ্য বিষাদ-আকৃতি, ইহার বাষ্পবিহ্বল জীবনবোধ, ইহার অমূর্ত ভাবকল্পনার চিহ্নমাত্র এখানে নাই। এখানে আছে নূতন সমাজ-পরিবেশ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা ও অকুণ্ঠিত জীবনরস-পিপাসা। কাব্যরচনায় কবি স্বপ্নবিধুর ও অবাস্তব কল্পনায় আচ্ছন্নদৃষ্টি; ভ্রমণকাহিনীতে সেই একই লেখক সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ ও দৃশ্যবৈচিত্র্যের রস-আস্বাদনে উন্মুখ। কবিতা লেখার সময় হৃদয়-অরণ্যের গোলোকধাঁধায় পথহারা; গদ্য-রচনায় বাহিরের জগতে স্বেচ্ছাবিচরণে পূর্ণমাত্রায় আগ্রহান্বিত। কবির লাজুক ও মুখচোরা প্রকৃতির নিদর্শন মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু এই কুণ্ঠিত ভাবটি 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর আত্মরতিমগ্ন ভাবুকতার আতিশয্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কেবলমাত্র একটি স্থানে তাঁহার কবিমানসের ছায়াপাত দেখা যায়—"পর্বতের উপর রঙিন মেঘগুলি যেমন নত হয়ে পড়েছে যে, মনে হয় যেন অপরিমিত সূর্য-কিরণ পান করে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে" (রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৫৩২-৫৩৩)। এখানে যেন লেখক নিজ মনের কুয়াশার তুলি দিয়া বহির্জগতের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "ভাবগুলো যেন মাকড়সার জালের মতো, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্ছে" (পৃঃ ৫৩৩)—এই চিত্রকল্পটি অবিকল 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর ভাবাবহ হইতে গৃহীত মনে হয়। মাঝে মধ্যে মন্তব্যগুলির মধ্যে উপভোগ্য হাস্যরসিকতা ও পরিণত জীবনসমীক্ষা লেখকের অপ্রত্যাশিত মানসশক্তির প্রমাণ দেয়।

রবীন্দ্রনাথের এই যুগের উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট' তাঁহার ঔপন্যাসিক

জীবনচিত্রণের ক্ষমতা কতদূর বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহার দৃষ্টান্তস্থল। প্রথমতঃ জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল নর-নারী-সৃষ্টি এখনও তাঁহার ক্ষমতাতীত। তিনি নিজেই প্রধান চরিত্রগুলিকে যান্ত্রিক ও কলের পুতুলরূপে অভিহিত করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বিভা, সুরমা, এমন কি বসন্ত রায় পর্যন্ত এক একটি চিরতরে নির্দিষ্ট মনোভাবের প্রতিমূর্তি। তাহাদের মুখভাব, মানসক্রিয়া, প্রচেষ্টা-প্রয়াস সবই যেন এক-একটি ছাঁচে ঢালা—তাহারা যেন স্বপ্নজগতের অস্পষ্টতা ও জড়প্রকৃতির কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ ছন্দানুগামিতা লইয়া এই কর্মচঞ্চল সংঘাতময়, প্রাণশক্তির অতর্কিত স্ফুরণে বিস্ময়কর বাস্তব জগতে পদক্ষেপ করিয়াছে। তাহারা যেন পূর্বনির্ধারিত কতকগুলি মনোবৃত্তির মুখোশপরা, এককোষবিশিষ্ট জীব। প্রতাপাদিত্য তাহার সমস্ত পারিবারিক আচরণে এক ভাবলেশহীন, যন্ত্রবদ্ধ নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি—তাহার মানবিকতা যেন অপ্রতিহত প্রভুত্বপ্রিয়তার একমাত্র স্প্রিং-এ দম-দেওয়া যন্ত্রের অন্ধ অচেতন আবর্তন। পুত্রকে বন্দী করিতে, জামাতাকে বধ করিতে, পুত্রবধূকে নির্বাসিত করিতে ও স্নেহময় খুড়াকে হত্যা করিতে তাহার মুখের কোন শিরায় বা মনের কোন তন্ত্রীতে লেশমাত্র কম্পন জাগে না। উদয়াদিত্য সর্বদা বিষণ্ণ, সর্বদা অসহায়, জীবনযুদ্ধে সর্বদা পরাজিত এক একমুখী মানসিকতার মূর্ত রূপ। তাহার ও সরমার মধ্যে দাম্পত্যসম্পর্ক এই ম্লান নৈরাশ্যেরই দ্বিগুণিত ঘনচ্ছায়া। ভূতভয়ে ভীত দুই বালক-বালিকা যেন পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া নিজ নিজ বক্ষ-স্পন্দনে অপরের ভীতি-শিহরণের প্রতিধ্বনি শুনিতে পায়, তেমনি উদয়াদিত্য ও সরমা পরস্পরকে সাহস দিতে গিয়া উহাদের হতাশাকে আরও বাড়াইয়াছে। বিভা আবার এই সম্পূর্ণ অসহায় দম্পতির মুখাপেক্ষী—একটি অতি ক্ষীণ ছায়া যেন ঈষৎ সাবয়ব ছায়ার নিকট আলোকের অঞ্জলি পাতিয়াছে। ইহারা সকলেই যেন সন্ধ্যা-সংগীত-এর বাষ্পপুঞ্জ হইতে কাটিয়া-লওয়া এক একটি অংশ। প্রতাপ-মহিষীও অবাস্তব না হইয়াও অস্পষ্ট। বসন্ত রায় 'প্রভাতসংগীত'-এর আনন্দোচ্ছ্বাসের একটি মানবিক প্রতিরূপ, কিন্তু তাঁহার প্রিয়জনের দুঃখমোচনে একান্ত অক্ষমতা, সঙ্কট-মুহূর্তে তাঁহার বিমূঢ়, হতবুদ্ধি ভাব ও সর্বোপরি তাঁহার মর্মান্তিক শোচনীয় মৃত্যু প্রমাণ করে যে 'প্রভাতসংগীত'-এর আনন্দময় আবহাওয়াটি 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর ঘন বিষাদচ্ছায়ার দ্বারা অভিভূত হইয়াছে। বাস্তবিক বসন্ত রায়ের মৃত্যু যেন সমস্ত উপন্যাসের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। যে আলোকবিন্দু অন্ধকারের ঘন আবরণের নীচে লুপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, যে ভীরু কম্পিত

শিখাটিকে ফুৎকারে নিবাইয়া দেওয়া অতি সহজ, যাহা একটি শুভ্র ফুলের ন্যায় খরতাপে বিশুষ্ক, ম্রিয়মাণ ও বৃন্তচ্যুত হইবার প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাকে নিষ্ঠুর হত্যায় রক্তকলুষিত করা একেবারে নিরর্থক ও কলাসঙ্গতিহীন। সেইজন্য বসন্ত রায়ের মৃত্যু আমরা যেন ঠিক মানিয়া লইতে পারি না।

উপন্যাসে কবিচিত্তের সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী মন্ময়তার প্রক্ষেপ কয়েকটি বিচিত্র উপাদানের সংমিশ্রণে আরও অবাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। রুক্মিণী বা মঙ্গলা অবিশ্বাস্য ও একান্ত নিরর্থক অতিনাটকীয়ত্বের প্রবর্তনে আবহাওয়াকে আরও ঘোরাল ও লেখকের মাত্রাজ্ঞানকে আরও বিড়ম্বিত করিয়াছে। আবার বাস্তব জীবনের প্রতিও লেখকের একটা সচেষ্ট মানসপ্রবণতা ছিল। সুতরাং তিনি উপন্যাসে সাধারণ জীবনের ছবিও কিছু কিছু অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ও এই প্রসঙ্গে কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেরও প্রয়াস পাইয়াছেন। রামচন্দ্র ও রমাই ভাঁড় যেমন জীবনে অসঙ্গতির পরিচয়ে কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ রাম-মোহনও রাজবাড়িতে পুরাতন, বিশ্বস্ত ভৃত্যের বাস্তব অংশ পূর্ণ করিয়াছে। সীতারাম ও ভাগবতের ষড়যন্ত্রের মধ্যেও খানিকটা কুটিল বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঔপন্যাসিকের সরল-বুদ্ধি-প্রভাবিত এই কুটিলতা ছেলেমানুষি বলিয়াই ঠেকে। সমাবেশ-কৌশলের অভাবে এই সমস্ত বিসদৃশ উপাদানের একত্র সন্নিবেশ উপন্যাসের ফলশ্রুতিকে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিভার স্বামী-পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ বেদনাতুর জীবনের সুরটি উপন্যাসের সমস্ত নিষ্ঠুর সংঘাত, তাৎপর্যহীন কোলাহল ও উপাদানের বিশৃঙ্খল, স্থিরদৃষ্টিহীন যদৃচ্ছ বিকীর্ণতাকে ছাড়াইয়া ধ্বনিত হইয়াছে। এই কাহিনীর মধ্যে জনশ্রুতি যে রেশটুকু আগামী কালের স্মৃতিপটে ধরিয়া রাখিয়াছে, ঔপন্যাসিকও তাহাই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বেশী নিষ্ক্রিয় ও অসহায় ছিল, ঔপন্যাসিক ফলশ্রুতিতে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর কোমল পরিকল্পনা ঔপন্যাসিকের বস্তুনিষ্ঠা ও জীবনচেতনাকে একটি করুণ সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস-রচনায় তাঁহার কবিসত্তারই জয় হইয়াছে এবং এই জয় ভবিষ্যতেরও পথনির্দেশ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবভাব-ভাবিত কাব্য

১

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম কৈশোরে বৈষ্ণব ভাবধারা ও ব্রজবুলির পদ-লালিত্যের আকর্ষণ অনুভব করিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বর্ণময় প্রাদুর্ভাব-যুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত উহার জীবন-কাল প্রসারিত হইলেও উহার ভাব-উৎস ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিয়াছে ও উহার রচনা প্রথাবদ্ধ ভঙ্গীসর্বস্বতায় পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। এই কাব্যপ্রবাহ দীর্ঘকাল অবলুপ্ত-প্রায় থাকিয়া অকস্মাৎ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে যে নব জাগরণ-যুগের সূচনা হয় সেই যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবির—মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের—কবি-কল্পনাকে আকৃষ্ট করে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ও রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী' ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রকাব্যের তখন শৈশবাবস্থা—'ভানুসিংহের পদাবলী'র রচনাকাল 'সন্ধ্যাসংগীত'-এরও পূর্ববর্তী। ঠিক সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বৈষ্ণব-পদাবলী-সংগ্রহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া চৌদ্দ বৎসরের বালক রবীন্দ্রনাথের—কিশোর মনকে এক সৌন্দর্যের নেশায় অভিভূত করিয়াছিল। বিশেষতঃ পদাবলী-সাহিত্যে ব্যবহৃত ব্রজবুলি ভাষার অর্ধপরিচিত রূপের যাদু কিশোর কবিচিত্তকে এক অজানা সৌন্দর্যাভিসারের পথের সঙ্কেত দিয়াছিল। তাহার উপর একটু নির্দোষ জুয়াচুরির মতলব, এক অজ্ঞাতপূর্ব বৈষ্ণব কবির আবিষ্কারের ছলনা, বিশেষজ্ঞমহলে চমকসৃষ্টির উত্তেজিত কল্পনা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যমোহকে আরও ঘনীভূত করে। শিশুরা যেমন অকস্মাৎ-স্ফীত বর্ষার জলে কাগজের নৌকা ভাসাইয়া কৌতুক অনুভব করে, কিশোর কবিও সেইরূপ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত বৈষ্ণব ভাবস্রোতে নিজ শিশু-কল্পনার ক্ষুদ্র তরণীখানি এক অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ভাসাইয়া দিয়া একটা নিষিদ্ধ খেলার ফাঁকির আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। বালক রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ ঠিক বৈষ্ণব ভাবধারার প্রতি নয়, ব্রজবুলি ভাষার ছন্দঝংকার ও অর্ধ-অবাস্তব মায়ালোকের প্রতি। হয়তো বৈষ্ণব কবির প্রেমার্তি ও আত্মনিবেদনের গভীরতা তাঁহার অবচেতন মনে

রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়াছিল, কিন্তু যাহা সচেতনভাবে তাঁহার মনোহরণ করিয়াছিল তাহা ব্রজবুলির কোমল ভাবোদ্দীপন-শক্তি, উহার অনভ্যস্ত প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গীতধ্বনিময় মোহাবেশ। তাঁহার পরিণত কবিজীবনে তিনি বৈষ্ণব কাব্য-জগতের দ্বার অনেকবার উন্মোচন করিয়াছেন। কিন্তু এই উন্মোচনক্রিয়া সাধিত হইয়াছিল ভাব-সাধর্ম্যে, ধ্বনি-ইন্দ্রজালে নয়। ব্রজবুলির কৃত্রিম সহায়তা অবলম্বনে বৈষ্ণব কবিতার মর্মভেদে রবীন্দ্রকাব্যে এই প্রথম ও শেষ প্রয়াস।

মধুসূদনের বৈষ্ণবকাব্যপ্রীতি আরও বিস্ময়াবহ ও দুর্জ্ঞেয়। তিনি তাঁহার অমর অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ মেঘনাদবধ মহাকাব্য আরম্ভের পর, তাঁহার পরিণত প্রতিভার উন্নততম স্তরে আসীন থাকাকালীন এই সুমধুর ছন্দোবৈচিত্র্যে গ্রথিত 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রচনা করেন। তাঁহার 'তিলোত্তমা' ও 'মেঘনাদ'-এ রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অজস্র উপকরণের সার্থক কাব্যপ্রয়োগ দেখা গেলেও, রাধাকৃষ্ণলীলার উল্লেখ ও উহার ভাবমাধুরী আত্মসাংকরণের খুব কম দৃষ্টান্তই লক্ষিত হয়। হয়তো বীরত্বপ্রধান, ভাবগম্ভীর মহাকাব্যে উপমা ও আখ্যান বিবৃতির মাধ্যমেও মধুর রসস্ফুরণের নিতান্ত অল্প অবসরই ছিল। সংগ্রাম-ক্ষেত্রের ভেরী ও শঙ্খনিনাদের পর অকস্মাৎ প্রেমবিলাসকুঞ্জের বংশী-ধ্বনির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার তাঁহার কি কারণ ঘটিল তাহা জানা যায় না। কবির মনোজগতে কোন্ আকস্মিক বিপ্লবের ফলে তাঁহার কাব্যরীতির এই অভাবনীয় রূপান্তর, তাঁহার জীবনী হইতে তাহার রহস্য-উদ্ধার করা যায় না। তাঁহার বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা কয়েকখানি পত্রেই এ বিষয়ে যাহা কিছু সামান্য আলোকপাত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল তারিখে তিনি রাজনারায়ণকে তাঁহার 'মেঘনাদ'-এর প্রস্তাবনা-অংশ পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাধাবিরহ-বিষয়ক কয়েকটি জটিল ছন্দবিধি-গ্রথিত (Ode) কবিতা রচনার সংবাদ দেন। সুতরাং মনে হয় যে এই দুই প্রকার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কাব্য তাঁহার সব্যসাচিত্বের আশ্চর্য নিদর্শন স্বরূপ যুগপৎ খেলা হইতেছিল। ঐ বৎসরেই একখানা পরবর্তী পত্রে তিনি রাজ-নারায়ণের নিকট মিত্রাক্ষর সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় প্রকাশপূর্বক রাধাবিরহকাব্য-প্রকাশে তাঁহার সঙ্কোচের কথা জ্ঞাপন করেন। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে তাঁহার প্রতিভার সহজ-প্রবণতা-বিরোধী ছন্দবিন্যাস-প্রয়োগে কাব্য-রচনা সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। রাজ-নারায়ণের মনোভাব যে এই নূতন কাব্যের অনুকূল হইবে না এ সংশয়ও তাঁহার ছিল ও রাজনারায়ণের নীরবতায় তিনি কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

মধুসূদন Ode রচনা বিষয়ে অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাইয়া তাঁহার এই সংশয়কে চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে রাজনারায়ণের নিকট লেখা পত্রে রাজনারায়ণের বিরূপ মনোভাবের জন্য তিনি তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছেন ও তাঁহার ব্রাহ্মধর্মসুলভ নৈতিক কঠোরতাই যে ইহার জন্য দায়ী তাহাও জানাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাধার পক্ষে একটু মৃদু রকমের ওকালতিও করিয়াছেন। "রাধা নিতান্ত নষ্ট-দুষ্ট মেয়েমানুষ নয়; মধুসূদনের মত কবির হাতে পড়িলে তাহার কলঙ্কস্খালন হইতে পারিত। যে অপদার্থ কবিগোষ্ঠী রাধা-কাহিনী লইয়া কাব্যরচনা করিয়াছে তাহাদের দুষ্ট, অসংস্কৃত, রুচিহীন কল্পনাই রাধার বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী।" গোঁড়া নীতিবাদী ব্রাহ্ম বন্ধুর নিকট মধুসূদনের এই রাধাচরিত্রের পুনর্বাসন-প্রয়াস আমাদের মনে কৌতুকহাস্যের উদ্রেক করে।

এই বিবরণ হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে মধুসূদন কোন অনিবার্য ভাবাবেগের বশবর্তী হইয়া এই রাধাবিষয়ক কাব্যরচনায় ব্রতী হন নাই। মধুসূদনের কবি-মনে সব সময়ই এক বিপরীতমুখী স্রোতোধারার জোয়ার-ভাটা খেলিত। তাঁহার এই দ্বৈত সত্তা তাঁহার কাব্যরচনার ক্ষেত্রে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়মিত ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিত। কোমলে-কঠোরে, গম্ভীরে-সুন্দরে, দৃঢ় আত্মনিরোধে ও আবেগময় আত্মসমর্পণে, উত্তুঙ্গ মহিমায় ও সাধারণ সমতলতার মেশামেশি একটি যৌগিক কবিপ্রকৃতি তাঁহার কাব্যে পর্যায়ক্রমিক প্রকাশব্যাকুলতায় বিপরীত-রীতি-অবলম্বনে স্ফূর্ত হইত। মনে হয় যেন সুদীর্ঘ 'তিলোত্তমা' ও 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য লিখিয়া মধুসূদনের কবি-চিত্তে একটি অবশ্যম্ভাবী ক্লান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। মহাকাব্যের কঠোর শাসন, অস্খলিত ভাবগাম্ভীর্য ও অপ্রচলিত শব্দগঠিত ওজস্বী বাগ্‌ভঙ্গী হইতে সহজ নিঃসরণে মুক্তি পাইতে তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই 'মেঘনাদ'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রজাঙ্গনা'-র আবির্ভাব; রণাঙ্গনের রথচক্রনির্ঘোষ, মহাস্ত্রসমূহের শ্রবণ-বিদারী ঘাত-প্রতিঘাত ও উত্তেজনাময় দুন্দুভিনিনাদের অব্যবহিত পরে প্রেমবিলাসের উদ্দীপক মুরলীধ্বনি ও নৃত্যচপল নূপুরনিক্কণ শ্রুত হয়। বীর ও রৌদ্ররসের পর অবিমিশ্র মধুর রস কবিচিত্তকে সৌন্দর্য-উন্মুখ করে। মধুসূদন বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও অধ্যাত্মব্যঞ্জনাপূত বৈষ্ণব ভাবাদর্শে অলব্ধপ্রবেশ হইয়াও, মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকাকে প্রাকৃত নায়িকার ন্যায় বিরহখিন্না ও প্রণয়াতুরারূপে চিত্রিত করিয়া, নিজ দ্বিধাবিভক্ত কবি-চেতনার একটি দিকের অনিবার্য প্রকাশ-প্রেরণার বশ্যতা

স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণব ভাবরাজ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ কৈশোর-কৌতূহলসঞ্জাত ; মধুসূদনের অভ্যাগম কাব্যপ্রত্যয়হীন কিন্তু কবিসত্তার অপর প্রকারের নিগূঢ়-প্রয়োজন-প্রণোদিত। প্রমীলার পরে রাধা, সরমার করুণরসাপ্লুত সমবেদনার পরিবর্তে প্রণয়কলা-সহযোগিনী সখীদের অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত সহমর্মিতা, পঞ্চবটী বনের প্রীতিমধুর প্রকৃতিলীলার পরিবর্তে বৃন্দাবনের প্রণয়ভাবাসঙ্গমূলক, প্রাণচেতনাহীন প্রতিবেশ মধুসূদনের বিচলিত ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাব্য-প্রয়োজনে আমন্ত্রিত হইয়াছিল—তাঁহার সত্তার অবদমিত অংশ ইহাদের আশ্রয়েই পূর্ণ অভিব্যক্তি খুঁজিয়াছিল।

মধুসূদন তাঁহার পূর্বোল্লিখিত পত্রগুচ্ছে পুনঃ পুনঃ তাঁহার Ode রচনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় এই নব ছন্দবিন্যাসরীতিই তাঁহার ব্রজাঙ্গনা-রচনার মুখ্য প্রেরণা। বাস্তবিকই ছন্দনির্মিতির জটিল শিল্পচর্যা, পংক্তিসন্নিবেশ ও মিলসাধনের নূতন ছাঁদের বৈচিত্র্যই এই কাব্যে প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। এই ছন্দকুশলতায় মধুসূদন বাংলা কাব্যে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার,' 'আশাকানন,' 'ছায়াময়ী', প্রভৃতি কবিতায় কাব্যানুভূতি-হীন বিচিত্র ছন্দবিন্যাস মধুসূদনের প্রভাবের নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথও প্রবলতর কাব্যপ্রেরণা-প্রণোদিত হইয়া কিছুসংখ্যক Ode-জাতীয় কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি Ode-এর ছন্দশৃঙ্খল অতিক্রম করিয়া অনিয়মিত, অনির্দিষ্টসংখ্যক পংক্তি-পরম্পরার মধ্য দিয়া তাঁহার ভাবোচ্ছলতাকে প্রবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার 'বর্ষশেষে' বর্ষাবিষয়ক কবিতা, 'উর্বশী', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি Ode-লক্ষণবিশিষ্ট কবিতা 'বলাকা'তে আসিয়া কোন নির্দিষ্ট রূপের নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করিয়াছে। মধুসূদন Ode-এর ছন্দরূপগঠনে এতই নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন যে তিনি কেবল প্রথাগত বর্ণনার সাহায্যে এই শিল্পকৃতিটি সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব অনুভূতির বেগবান ধারা তিনি এই কাব্যে যথসম্ভব বর্জন করিয়াছেন ; পংক্তিগুলি অসম দৈর্ঘ্যে ও অপ্রত্যাশিত মিলগ্রন্থির, কৃত্রিম উপায়ে খনিত পয়ঃপ্রণালীর ন্যায় শান্ত, নিরুচ্ছ্বাস, প্রথানুগত ভাবধারাকে স্বচ্ছন্দে বহন করিয়াছে—বর্ষাস্ফীত স্রোতস্বতীর দুর্বার বেগ এই মসৃণ আধারের বহন-সীমাকে কোথায়ও উল্লঙ্ঘন করে নাই। রাধার বিরহ-বেদনা সনাতন খাত বহিয়া মধুসূদনের অন্তরে নিস্তরঙ্গ মন্থরতায় প্রবেশ করিয়াছে ; তাঁহার নিজস্ব অনুভূতিকে কোথায়ও উত্তেজিত করিয়া ইহার মধ্যে দুর্জয় ভাবোচ্ছ্বাস সঞ্চার করে নাই।

উভয় কবির উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য উভয়ের উপস্থাপনা-রীতিও পৃথক্ হইয়াছে। মধুসূদন বৃন্দাবনলীলার ভাবতাৎপর্য ও প্রতিবেশ-রমণীয়তার আশ্রয়ে একটি স্বাধীন প্রণয়-বিহ্বলতার চিত্র আঁকিয়াছেন। বিরহবিধুর প্রেমের কাব্যপ্রসিদ্ধ উদ্দীপন-বিভাবসমূহকে অবলম্বন করিয়া, ব্রজধামের তরুলতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতির প্রতি রাধিকার আর্ত ভাবনিবেদনে তাহার শোকদীর্ণ, আশামুগ্ধ ছলনাবিড়ম্বিত অন্তরবেদনাকে গীতচ্ছন্দে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কবিতাগুলি সবই রাধার বিরহাবস্থার বিভিন্ন পর্যায়-সম্বন্ধীয়। বংশীধ্বনি (দুইটি কবিতা), বসন্তে (দুইটি কবিতা), জলধর, যমুনাতটে, পৃথিবী, কুসুম, মলয়মরুত, উষা, গোধূলি, গোবর্ধন গিরি, কৃষ্ণচূড়া, নিকুঞ্জবনে প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য, ময়ূরী ও সারিকা এই দুইটি প্রেমকলা-সংশ্লিষ্ট পক্ষী, প্রতিধ্বনি ও সখী এইগুলি বিভিন্ন কবিতার বিষয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৈষ্ণব প্রেমের ভাবগভীরতা ও অধ্যাত্ম অনুভূতির আভাস আমরা মধুসূদনে প্রত্যাশা করিতে পারি না। তিনি ভক্ত নহেন, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ঐশী ব্যঞ্জনার দিকটি তিনি অনুভব করেন নাই। কিন্তু এই প্রেমের বহিরঙ্গমূলক দৃশ্যরূপ ও প্রেমবিহ্বল হৃদয়ের বহুমুখী প্রকাশ-ব্যাকুলতা তাঁহার কবিতাগুলিতে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। রাধিকা প্রাকৃত নায়িকার ন্যায় তাঁহার প্রণয়বুভুক্ষু অন্তরের অধীরতা, তাঁহার শতধারে উচ্ছ্বসিত কামনার সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা, স্মৃতিরোমন্থন ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর সমবেদনা-কল্পনার মাধ্যমে নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে প্রেমের কোন উচ্চতর ভাব-উদ্বর্তন নাই; প্রেমাকাঙ্ক্ষার দুর্বার আবেগই উহার চরিতার্থতার একমাত্র নীতিগত সমর্থন। তথাপি মধুসূদন যে বৈষ্ণব ভাব-জগতের অলঙ্করণে, উহার উপমা উৎপ্রেক্ষা পৌরাণিক উল্লেখ প্রভৃতি রূপসজ্জার প্রয়োগে, উহার কাব্যরীতি ও আবেগছন্দের বাহ্য অনুসরণে অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা অ-বৈষ্ণব জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত কবির পক্ষে বাস্তবিকই আশ্চর্য।

'বংশীধ্বনি'-শীর্ষক প্রথম কবিতায় কবি রাধিকার মুখে জড় ও জীবজগতের দৃষ্টান্তে যে নিঃসঙ্কোচ প্রণয়-অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবভাববিরোধী, কিন্তু সংস্কৃত প্রেমকাব্যানুযায়ী।

যে যাহারে ভালবাসে সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?

প্রণয়ের এই অধিকারনীতি আধুনিক Mrs. Radha-র উপযোগী নিঃসন্দেহ, কিন্তু বৈষ্ণবভাবসাধনায় ধ্যানতন্ময়া রাধার মুখে একান্তভাবে অসঙ্গত। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও ঋতুবর্ণনা সমস্ত প্রাচীন প্রেমকাব্যের প্রথাজীর্ণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়াছে, উহাদের কোন স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য নাই। 'ব্রজাঙ্গনা'-র মেঘ, যমুনা, পৃথিবী, কুসুম, মলয়মারুত, কৃষ্ণচূড়া, নিকুঞ্জবন, বসন্ত সবই প্রণয়কলাসাধনে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অংশ অভিনয় করিয়াছে, আধুনিক কবির সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও জীবনানুভূতি উহাদের কোন নূতন আবেদন আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সবই হয় শ্যামস্মৃতিউদ্দীপক, শ্যামের সঙ্গে তুলনায় হীন, অথবা রাধার প্রতিযোগিনী বা তাঁহার দুঃখে সমদুঃখিনী সখী। বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকৃতি ঠিক এইরূপ প্রেমের নেপথ্যসজ্জাবিধানে নিয়োজিত, কিন্তু সেখানে ভক্তির একাগ্রতা ও ভাবসাধনার নিবিড়তা এই কৃত্রিম বিন্যাসরীতিকে প্রেমবিহ্বলতার সার্থক পটভূমিকারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মধুসূদন একই উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গভীর অনুভূতির অভাবই ইহাদিগকে লঘু কল্পনা-বিলাসের পর্যায়ভুক্ত করিয়া ইহাদের কৃত্রিমতা আরও প্রকট করিয়াছে।

কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে গতানুগতিকতার প্রভাব অনেকটা ক্ষীণতর ও কল্পনার সরসতা কিয়ৎ পরিমাণে দৃশ্যমান। উষা ও গোধূলির বর্ণনা কতকটা কল্পনাবৈচিত্র্যের ছাপ বহন করে। গোবর্ধনগিরিকে ব্রজলীলার অঙ্গীভূতরূপে দেখানোতে ও পর্বতের নূতন কবিকল্পনামূলক, অথচ বাস্তব বর্ণনা-প্রয়াসে কবির কিছু নূতন দৃষ্টির সন্ধান মিলে। গোবর্ধন কেবল বীরত্বের প্রতীক নহে, সে প্রেমিক ও প্রেমরঙ্গের সহিতও সংশ্লিষ্ট। পৃথিবী তাহার প্রণয়িনী, সূর্য তাহার ছত্রধর ও তারকাখচিত রাত্রি তাহার পরিচারিকা। রাধা এই পর্বতরাজের নিকট ধৈর্য ভিক্ষা করিতেছে। ময়ূরী ও সারিকা অলঙ্কারশাস্ত্রমতে প্রেমের উদ্দীপনে সহায়ক—তাহারা নিজেরা প্রেমিকা বলিয়া মানবিক প্রেমের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন। মধুসূদন ময়ূরীকে মেঘ প্রণয়িনী করিয়াও তাহাকে শ্যামের বিশ্বমোহন রূপে আকৃষ্টচিত্ত ও শ্যামবিরহে দুঃখাভিভূতারূপে দেখাইয়াছেন। রাধা পিঞ্জরাবদ্ধ শারিকার দুঃখ নিজ অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াছে, কেননা শ্যামহীন সংসারযাত্রা তাহার পক্ষে পিঞ্জরে বন্দীত্বের ন্যায়। সর্বাপেক্ষা মৌলিক কল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে প্রতিধ্বনির প্রতি নায়িকার খেদোক্তিতে। রাধার আর্ত আহ্বান প্রতিধ্বনির কণ্ঠে পুনরাবৃত্ত হইতেছে, শ্যামের বংশীধ্বনি ও রাধানাম-উচ্চারণও প্রতিধ্বনি আত্মসাৎ করিয়াছে। সুতরাং রাধা তাহাকে আশ্বাস

দিতেছে যে সে শ্যামপ্রেমের অংশভাগিনী বলিয়া রাধার বিরাগভাজন হইবে না ও রাধার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া শ্যামকে আহ্বান করিবার জন্য করুণ মিনতি জানাইতেছে, কেননা তাহার মিষ্টস্বরে শ্যাম সাড়া দিতেও পারেন।

কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে।

শেষ পর্যন্ত প্রতিধ্বনির কণ্ঠস্বর অনুকরণের ছলনা বুঝিয়া রাধা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ও কবি তাহাকে প্রতিধ্বনির পরনির্ভরতার কথা বলিয়া তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন। প্রতিধ্বনি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার অংশভাক্ মধুসূদনসৃষ্ট একটি নূতন চরিত্র—কোন পূর্বকাহিনীতে উহার উল্লেখ নাই। ভনিতাপ্রয়োগে মধুসূদন মহাজন পদকর্তাদের রীতি অনুসরণ করিয়া আপনাকে রাধার পরিকরশ্রেণীভুক্তরূপে কল্পনা করিয়াছেন—নায়িকার দুঃখে সান্ত্বনা দিয়া ও আকাঙ্ক্ষার পোষকতা করিয়া তিনি রাধার ভাবধারার সহিত নিজ সহানুভূতি মিশাইয়াছেন।

মধুসূদনের কাব্যের প্রকৃত উৎকর্ষ ইহার বৈষ্ণব ভাবনিষ্ঠতায় নহে, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের বহিরঙ্গ লীলানুসরণে, নূতন ছন্দে ও সাবলীল পরিকল্পনাসংযোগে, একজন প্রাকৃত বিরহিণীর প্রেমাকুতির রমণীয় প্রকাশের মধ্যে। কল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, মানবিক অনুভূতির সুষম বিস্তার ও বিভিন্ন প্রকারের ছন্দবিন্যাসের সহিত অন্তরাকুতির সহজ সামঞ্জস্য এই কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারের মানদণ্ড। এই বিচারে কতকগুলি কবিতা উৎকৃষ্টের উচ্চস্তরে আসীন আছে। 'বংশীধ্বনি' (প্রথম), 'প্রতিধ্বনি', 'উষা', 'কুসুম', 'গোবর্ধনগিরি', 'সারিকা', 'বসন্তে' (প্রথম) কবিতাগুলিতে কল্পনার সাবলীল গতি, অলঙ্কার-প্রয়োগের সার্থক ভাবব্যঞ্জনা ও মনোভাবপ্রকাশক ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহ একসঙ্গে মিলিয়া এক রুচিকর মানসতৃপ্তি বিধান করিয়াছে। অবশ্য অন্যান্য কবিতায় কষ্টকল্পনা, যুক্তিশৃঙ্খলার শিথিলতা ও ছন্দগ্রন্থনে স্বচ্ছন্দগতির অভাব আপেক্ষিক অপকর্ষের হেতু হইয়াছে।

এই কাব্যগ্রন্থটি হয়তো মধু-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনরূপে দাখিল করা যায় না। কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি নূতন সম্ভাবনার বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল এবং কবির অকাল মৃত্যুতে যাঁহা অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পাইল না, তাহাই ইহাকে একটি বিশেষ তাৎপর্য দিয়াছে। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের দ্বারা অমরতালাভের পর মধুসূদন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশ করেন এবং তাহার পর চারি বৎসরের ব্যবধানে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার শেষ সম্পূর্ণ রচনা

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার কাব্যজীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। 'বীরাঙ্গনা'য় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের এক কোমলতর, নাটকীয়গুণমণ্ডিত, বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র ভাবপ্রকাশোপযোগী রীতির উদ্ভাবন ও উহার অভাবনীয়রূপে সার্থক প্রয়োগ করেন। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বিদেশে যে দারুণ দুরবস্থা ও জীবনবিষয়ক অনিশ্চয়তা ও দুর্ভাবনার মধ্যে লেখা হইয়াছিল তাহাতে ইহা যে কতটুকু সুচিন্তিত নূতন শিল্পরূপপ্রেরণা, কতটাই বা খণ্ডিত অবসরের অপ্রতিবিধেয় রচনা-সংক্ষেপ তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ। হয়তো দারিদ্র্য-পীড়িত অবকাশের ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ দিয়া কবির মনে যে ছোট ছোট ভাব-ভাবনাগুলি নিষ্ক্রমণ-মুক্তি খুঁজিয়াছিল, শিল্প-প্রতিভা সেই স্বল্প-পরিমিত মানস উপাদানগুলিকে এক অনবদ্য, গাঢ়বদ্ধ রূপসুষমায় সংহত করিয়াছে, আকস্মিক হৃদয়োচ্ছ্বাস ও করুণ স্মৃতিরোমন্থনকে এক স্মরণীয়, মর্যাদাময়, সর্ববাহুল্যবর্জিত অভিব্যক্তি দিয়াছে। ইহা যেন রিক্ততার রাজকীয় মহিমায় উন্নয়ন, রুদ্ধপ্রবাহ স্রোতস্বতীর হ্রদের অতল গভীরতায় অবরোধ।

এই পর্যালোচনায় যে অনুমান দৃঢ় প্রতীতিরূপে জাগিয়া উঠে তাহা এই—যে মধুসূদনের কবিমনে এক নূতন স্রোতঃধারা অলক্ষিতভাবে বেগ সঞ্চয় করিতেছিল ও বহিঃনিষ্ক্রমণের জন্য অনুকূল অবসরের প্রতীক্ষায় ছিল, ব্রজাঙ্গনা সেই অকৃতার্থ সম্ভাবনার, সেই অপরিণত মানস প্রেরণার একটি তাৎপর্যময় উৎসারণ। মধুসূদনের মনে যে গীতিকবিতার দুর্বার উচ্ছ্বাস অমিত্রাক্ষর ছন্দের বীররস-প্রবাহিণী, সংঘাতশিলাকীর্ণা প্রণালীর ভিতর দিয়া সঙ্কুচিত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল ও চতুর্দশপদাবলীর স্বল্পায়তন অবয়বে যাহা এক কষ্টনিরুদ্ধ বেগসংহরণে প্রশান্তির ছদ্মবেশে নিজ অশান্ত আত্মাকে সংযত করিয়াছিল, তাহা সময় পাইলে জলপ্রপাতের দুর্দম আবেগে আপনাকে উৎক্ষিপ্ত করিত। মধুসূদনের কবি-জীবনের সেই গীতিময় দিকটা অদৃষ্টের প্রতিকূলতায় অনুচ্চারিতই রহিয়া গিয়াছে। অমিত্রাক্ষরের সু-উচ্চ, প্রস্তরময় বাঁধ তুলিয়াও যে গীতিকবিতার গতিবেগকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই, ছন্দের মুক্তপথে ও সঙ্গীতময় আমন্ত্রণে তাহার উচ্ছ্বাস কিরূপ বিচিত্রগামী ও অসংবরণীয় হইত তাহা কল্পনা করা দুরূহ। ধূর্জটির জটাজালের মধ্যেও যাহার কুলুকুলুধ্বনি নীরব হয় নাই, সমতলভূমিতে অবতরণের পর সেই ভাগীরথীর সঙ্গীতস্রোত যে দুর্জয় ও কূলপ্লাবী হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য সেই মরুগ্রাসলুপ্ত দুর্বার স্রোতস্বিনীর প্রথম শীকরকণা—'ধীর সমীরে যমুনা-তীরে' বাজিয়া-ওঠা,

ধার-করা বাঁশীর প্রথম তান। এই নদী কবির অন্তর-উৎসারিত হইলে, এই বাঁশী তাঁহার হৃদয়কুঞ্জে ধ্বনিত হইলে বাংলা-কাব্য ক্ষেত্রে কি অপূর্ব সুধারসবৃষ্টি হইত তাহা কে বলিতে পারে?

৩

কিশোর রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ব্রজবুলি ভাষার শ্রুতিমাধুর্যের জন্য, বৈষ্ণবধর্মসাধনার প্রতি অনুরাগের জন্য নহে। তথাপি এই দুইএর মধ্যে এমন একটি নিত্য সম্পর্ক যে রাধাকৃষ্ণরসলীলার প্রতি উদাসীন বা বিরূপ থাকিলে উহার ভাষাবাহনের প্রতিও রুচি থাকা সম্ভব নয়। অবশ্য চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের ছেলের তত্ত্ব বা লীলার দুরূহতার মধ্যে প্রবেশ না করাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ ব্রজবুলির বাহ্য লক্ষণগুলির হুবহু অনুকরণ করিয়া ভানুসিংহের পদাবলী যে একজন অজ্ঞাতনামা প্রাচীন বৈষ্ণব কবির রচনা এই ধারণা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই অনুকরণ সর্বত্র নির্দোষ হয় নাই—বহুস্থানেই অপটু হস্তের চিহ্ন সুস্পষ্ট। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীও যে সবসময় খাঁটি ব্রজবুলি লিখিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত অনেক পদেই বাংলা বাগ্‌রীতির প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ব্রজবুলি নিজেই একটি কৃত্রিম, কবি-কল্পিত মিশ্র ভাষা। মৈথিলী, অবহট্ট ও বাংলা এই তিন প্রকার উপাদানই ইহার মধ্যে—কোন বৈয়াকরণিক বা কথিত ভাষার সাবলীলতায় নহে, কিন্তু ভাবমাধুর্যপ্রকাশের কাব্য-প্রয়োজনে, এক সহজ সৌন্দর্য-সংস্কারবশে গ্রথিত হইয়াছে। তথাপি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রভৃতি কবির হাতে ইহার অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্য উদাহৃত। বালক কবির অশিক্ষিতপটু প্রয়াসে অনেক উৎকট অপপ্রয়োগ, ভাষাগত অসামঞ্জস্যের বহু দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে। 'ঐস বৃথা ভয় না কর বালা' (৩), 'হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে, কনকাসন কর আলা' (৪), হৃদয়-জুড়াওন বদনচন্দ্র তব, হেরব জীবনশেষ' (১০), 'কুঞ্জবনে দুহুঁ দুহুঁ দোঁহার পানে চায়' (১), 'শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর' (১১), 'হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু, কাঁদিবার কো নাই' (১৬) প্রভৃতি ছদ্মবেশী বাঙালী বাগ্‌রীতি কবির অনভিজ্ঞতার প্রমাণ দেয়। কোন ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবির হাতে এরূপ অপপ্রয়োগ কখনই ঘটিত না।

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় বৈষ্ণব ভাবকে আধুনিক সূক্ষ্ম রূপক-প্রয়োগের দ্বারা কতকটা নূতন আবেদনমণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কবিতা বসন্ত-প্রশস্তির মাধ্যমে শুধু বনভূমি নয়, মনোভূমির মধ্যেও এক আন্তর শিহরণ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছে।

মরমে বহই বসন্ত-সমীরণ
মরমে ফুটই ফুল
মরম-কুঞ্জ 'পর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।

বসন্তের বহির্লক্ষণগুলি অন্তরে বিকশিত করার এই প্রয়াস আধুনিক কবির মনোধর্মদ্যোতক। পদাবলী-সাহিত্যে অন্তর ও বাহির মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ অনুপস্থিত।

মোদিত বিহ্বল চিত্ত-কুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

ঠিক একই রূপ প্রতীকধর্মিত্বের পরিচয়বাহী।

'শুনহ, শুনহ, বালিকা' (২), 'হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে' (৩) 'সজনি সজনি রাধিকা লো' (৫) প্রভৃতি পদগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর সম্প্রসারিত, ভাব-পল্লবিত রূপ বলিয়া মনে হয়। ইহারা আয়তনে বৃহত্তর ও ভাবপ্রকাশে সচেতন শিল্পপ্রভাবিত। 'গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে' (৮) পদে গোবিন্দদাসের ছন্দঝঙ্কার-মুখরিত, যুক্তাক্ষরবহুল কোন কোন পদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ১০নং পদে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি বৈষ্ণব ভাবপরিমণ্ডল অতিক্রম করিয়া আধুনিক মনের এক সূক্ষ্মতর, অনির্দেশ্য অতৃপ্তির সঙ্কেত দিয়াছে।

কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরাণ।
কত শত আশা পূরল না বঁধূ
কত সুখ করল পয়ান।
পহু গো কত শত পীরিত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয় নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।

রাধিকার আক্ষেপানুরাগে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বেদনানুভূতির রোমন্থন আছে,

কিন্তু এই প্রকার আধুনিক নায়িকাসুলভ অস্পষ্ট শূন্যতাবোধ ও অনির্দেয় স্মৃতি-বিহ্বলতা নাই।

১২নং পদে রাধার একটা নূতন প্রণয়-কৌতূহল প্রকাশিত হইয়াছে। নিদ্রিত শ্যামের মুখে ঈষদুদ্ভিন্ন হাসির রেখা দেখিয়া সে প্রণয়ীর স্বপ্নের বিষয় কি তাহা জানিতে চাহিয়াছে। কবি বলিতেছেন যে শ্যাম স্বপ্নে রাধার প্রণয়-স্বীকৃতি শুনিয়াই সুখের হাসি হাসিতেছে। বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি একটি নূতন রূপক-অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন।

নদী-মেঘ পর স্বপন-বিজলি-সম
রাধা বিলসত হাসি।

নিদ্রারূপ মেঘে স্বপ্নবিজলিরূপ রাধার হাসিমাখা মুখখানি বিলসিত হইতেছে। ১৫ সংখ্যক পদে মানের একটি পদাবলী-বহির্ভূত প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। রাধা শ্যামের কপট আদরে ঘোর অভিমানে প্রণয়ীর প্রতি পুরুষ ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু বাক্য-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুতাপ আসিয়া তাহার মানকে গলাইয়া দিয়াছে ও সে করুণ সুরে নায়কের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছে। একই পদের মধ্যে মান ও তাহার স্বয়ংনিরসন বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়। সেখানে মান-উৎপাদনের কারণ, উহার স্থায়িত্ব ও মানভঞ্জনের পর্যায়গুলি বিধিবদ্ধভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। নায়িকা মান করিয়াছেন, নায়ক সেই মানভঞ্জনের চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ ও নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন। নায়িকার মুখে অনুতাপ-চিহ্ন প্রকটিত কিন্তু তাহার নীরবতা অক্ষুণ্ণ। এই অবস্থায় সখিদের মধ্যবর্তিতায়, তাহাদের তিরস্কারে নায়িকা আত্মদোষ স্বীকার করিয়া সখীকে নায়কের খোঁজে পাঠাইয়াছে। অবশেষে দীর্ঘকাল ব্যবধানে নায়কের প্রত্যাবর্তনে নায়িকার রুদ্ধ প্রেম শতধারে উৎসারিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই মান ও উহার নিরসনের পালা দুই-তিনটি পদ ব্যাপিয়া প্রসারিত। কোন ক্ষেত্রেই নায়িকার মান আপনা হইতে ভাঙে নাই। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বৈষ্ণব রসতত্ত্বের গহনে প্রবেশ না করিয়া সাধারণ মনস্তত্ত্ব-অনুযায়ী নায়িকার ত্বরিত মনোভাব-পরিবর্তন সাধিত করিয়াছেন—সে একই নিঃশ্বাসে প্রবল বিমুখতা ও তাৎক্ষণিক প্রবলতর অনুরাগ অভিব্যক্ত করিয়াছে। একই পদে মান ও মানভঙ্গ সন্নিবিষ্ট করিয়া রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-অলঙ্কারবিধির অনুশাসন অতিক্রম করিয়া সার্বভৌম প্রেমের রীতির অনুবর্তন করিয়াছেন।

ছিদল তরী সম কপট প্রেম 'পর
ডারনু যব মন প্রাণ।

এই সুন্দর উপমায় রাধিকার আত্মধিক্কার মুখরিত হইয়াছে।

মিটল মান অব—ভানু হাসতহি
হেরই পীরিত-লীলা।
কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু
পীরিত-সাগর বালা।

ইহাই কবির উপসংহার-সূচক ভণিতা।

১৬ সংখ্যক পদে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রার প্রাক্‌কালে রাধা আধুনিক প্রাকৃত নায়িকার মত আচরণ করিয়াছে। সে সংকল্প করিয়াছে যে কোনও খেদবাক্য উচ্চারণ না করিয়া সে শ্যামকে হাসিমুখে বিদায় দিবে। কিন্তু বিদায়-মুহূর্তে এই কপট ঔদাসীন্য অনর্গল অশ্রুধারায় ও উচ্ছসিত আত্মহারা প্রেম-নিবেদনে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নায়িকার এই নির্লিপ্ততার অভিনয় বৈষ্ণব যুগের নহে, ইহা আধুনিক যুগের নব প্রবর্তনা। আবার এই পদে কবি আধুনিক কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে রাধার এই গভীর ব্যথা কি কিছুটাও শ্যামের বক্ষে সংক্রামিত হয় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে ভণিতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সহিত নিঃসম্পর্ক, সর্বকালীন জীবন-সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

বরখি আঁখি জল ভানু কহে অতি
দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই।

১৮ সংখ্যক পদে বিরহব্যথাতুরা নায়িকা আধুনিকা নারীর কল্পনা-প্রভাবিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে যে তাহার মৃত্যুর পর শ্যাম কি আকুল হৃদয়ে তাহার আগমন-প্রত্যাশা করিয়া রাধানাম ফুকারিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবে? এই প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই দিতেছে—শতগোপী-সেবিত শ্যাম রাধার অভাব অনুভই করিবে না। অতএব সে কেন বৃথাই প্রাণ বিসর্জন দিবে? পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ-সমর্পিতপ্রাণা রাধা কখনই এইরূপ মূঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইত না। ভানুর সান্ত্বনা-বাক্যও সেই হিসাবে অসাধারণ—

মিলবে শ্যামল থরথর আদর
ঝরঝর লোচন-বারি।

কিন্তু যে পদটিতে (১৬ নং) আধুনিক কবির সহিত পদাবলী-যুগের কবির দুস্তর ভাব-ব্যবধান সূচিত হইয়াছে তাহার আরম্ভ 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' এই পংক্তিতে। পদাবলীর রাধা অনেক সময় মৃত্যু কামনা করিয়াছে, কিন্তু কখনও মরণকে শ্যামস্থলাভিষিক্ত করিয়া দেখে নাই। মৃত্যুর এই সর্বগ্রাসী, একনিষ্ঠ প্রেমিকের ন্যায় চির-আলিঙ্গনোদ্যত, চিরশান্তিবিধায়ক রূপটি আধুনিক যুগের ভাবকল্পনাপ্রসূত। অবশ্য কবি বৈষ্ণবপদকর্তার জবানীতে রাধার এই আত্মঘাতী ইচ্ছার নিন্দা করিয়াছেন ও মরণ হইতে শ্যামের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। এই পদের দুইটি পংক্তি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনদর্শনের পূর্বাভাস দেয়।

ভয় বাধা সব অভয় মূর্তি ধরি
পন্থ দেখাওব মোর।

পদাবলীতে রাধার অভিসার-পথের বাধা-বিঘ্ন তাহার অন্তরের প্রেমশক্তিতে পরাভূত ও উত্তীর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভয়কেই অভয়ে রূপান্তরিত করিয়াছেন বৈষ্ণবভক্তির বলে নহে, আত্মজীবনোদ্ভূত অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের প্রেরণায়। সমস্ত কবিতাটি বৈষ্ণব পদাবলীর বহিরঙ্গ বস্তু-বিন্যাসের মধ্যে এক সূক্ষ্ম আধুনিক রূপক-কল্পনা সন্নিবেশ করিয়াছে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবির ভাবলোককে অতিক্রম করিয়া এক অনির্দেশ্য-আভাসময় অনুভূতিলোকে বিচরণশীল হইয়াছেন।

সর্বশেষের পদটিতে রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ-জিজ্ঞাসু হইয়া প্রকৃতপক্ষে প্রেমের রহস্যময় প্রকৃতিরই মর্মোদঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। পদাবলী-সাহিত্যে বিদ্যা-পতির একটি পদে রাধার মনোভাবের এরূপ আবেগময় পরিচয় আছে। কিন্তু সেখানে রাধার মনোভাবে কিছু অনিশ্চিত নাই—সে দয়িতকে গ্রীষ্মের শীতল বায়ু, বর্ষার ছাতা, পারাপারের নৌকা প্রভৃতি লৌকিক জীবনে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কতকগুলি বস্তুর সহিত তুলনা করিয়াছে—সেখানে অন্বেষণের ব্যাকুলতা নাই, আছে উপলব্ধির নিশ্চয়তা। আধুনিক কবি কোন নিশ্চিত ধারণায় আবদ্ধ না থাকিয়া প্রেমের স্বরূপ-নিরূপণের জন্য নানা সংশয়াত্মক মনোভাবের আশ্রয় লইতেছেন। ব্রজবুলির কাব্যরমণীয়তার কুহকে তিনি যে লীলাকুঞ্জে প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে বৈষ্ণব রসসাধনার আবেদন তাঁহার চিত্তে কিছু মোহের সঞ্চার করিলেও তিনি মুহুর্মুহু উহাকে অতিক্রম করিয়া এক বৃহত্তর, বিশেষ

ধর্মতত্ত্বের অতীত, সার্বভৌম প্রেমানুভূতির ইঙ্গিত দিয়াছেন। রবীন্দ্র-কবি-কল্পনা উহার শৈশব অপরিণতির যুগে বৈষ্ণব রসলীলাকে অবলম্বন করিয়া, উহার ভাব-সৌন্দর্যের ঈষৎ আস্বাদন-সাহায্যে আত্মস্ফুরণের একটা অস্পষ্ট পথরেখার সন্ধান পাইয়াছে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার ক্ষণিক সম্পর্কের আসল তাৎপর্য।

আধুনিক যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবি—মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—তাঁহাদের কাব্য-জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে বৈষ্ণব কবিতার স্পর্শলাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ইহা তাঁহার কবিসত্তা-স্ফুরণের প্রথম স্পন্দন, তাঁহার কাব্য-স্বাধীনতার দুঃসাহসের প্রথম বহিঃসমর্থন। মধুসূদনের ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষাকৃত পরিণত কাব্যানুশীলনের পরে উদ্বৃত্ত ভাবাবেগ ও সৌন্দর্যাকুলতার জন্য নূতন পথ-সন্ধান। মধুসূদনের ছন্দবৈচিত্র্য ও স্বাধীন কল্পনাবিলাস রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় অনেক বেশী; রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাবধারার যথাযথ অনুসরণের মধ্যেও হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারে কিছু নূতন অনুভূতির অস্ফুট শিহরণ অনুভব করিয়াছেন। মধুসূদনের কেবল বিরহের পালা; রবীন্দ্রনাথ বিরহ, মিলন, অভিসার, আত্মনিবেদন প্রভৃতি প্রণয়ের নানা পর্যায় পরিক্রমা করিয়াছেন। মধুসূদনে কেবল বসন্ত-ঋতু বর্ণনা; রবীন্দ্রনাথ বর্ষা, বসন্ত, জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী প্রভৃতি নানা বিচিত্র পরিবেশের রস-আবেদন ফুটাইতে চাহিয়াছেন। মধুসূদন সম্পূর্ণভাবে বাহ্য বৈচিত্র্য ও প্রাকৃত প্রেমের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ আছেন; রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বৈষ্ণবভাব-প্রভাব তুলনায় কিছু বেশী গভীরস্তরসঞ্চারী। মধুসূদনের কাব্যজীবনে বৈষ্ণব প্রেমলীলা দুর্ভাগ্যক্রমে কোন স্থায়িফলপ্রসূ হয় নাই—ইহা তাঁহার মুখ্য কাব্যধারার সহিত অসম্পৃক্ত রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে এই প্রভাব নানা বিচিত্র রূপান্তরের ভিতর দিয়া নিগূঢ়-ভাবে কার্যকরী হইয়াছে—বৈষ্ণবতত্ত্ব তিনি স্বীকার না করিলেও বৈষ্ণবগীতির সুরের অনুরণন তাঁহার কবিতার বিচিত্র রাগিণীর মধ্যে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও বা অস্পষ্ট রূপে শোনা যায়। উভয় কবিই যে তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও কবিকৃতির পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে একই বৈষ্ণব কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ইহা বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে ঐ কবিতার সর্বত্র প্রসারী, সকল আধারে ধারণযোগ্য প্রেরণার সাক্ষ্য বহন করে।

তৃতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পরিণতিপর্ব—আদি স্তর

কড়ি ও কোমল ১৮৮৬-৮৭ (১২৯৩)

১

কবিমাত্রেরই কাব্যজীবনের ইতিহাস তাঁহার কল্পনার ক্রমবিবর্তন ও পরিণতি, উহার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিন্নতার কাহিনী। এই উক্তি বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অনন্য কল্পনার অধিকারী কবির পক্ষে সত্য। তাঁহার কল্পনা কেমন করিয়া তাঁহার ক্রমবর্ধমান জীবন-আহরণ-সমূহকে পরিপাক করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে, তাঁহার ইন্দ্রিয়ানুগ রূপমুগ্ধতার সহিত অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনাকে মিশাইয়াছে, মর্ত্য জীবনের বিচিত্র আকর্ষণের মধ্যে এক দিব্য অনুভূতির দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়াছে, বিষয়ের নিগূঢ় গভীরতায় অনুপ্রবেশ করিয়া উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি বস্তু-আবরণের অন্তরাল হইতে প্রকটিত করিয়াছে তাহাই তাঁহার বিশিষ্টতাদ্যোতক কবি-পরিচয়। সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ কবিকল্পনা এক দৃঢ়বদ্ধ, অস্থিমজ্জাগত জীবন-প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়া উঠে। জীবনকে অনুভব করার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপরই উহার অনন্যতা ও অপরূপত্ব নির্ভরশীল। বহির্জগতের সাধারণ সৌন্দর্য, জীবনসমুত্থ স্বাভাবিক ভাব-মননগুলিই কবির স্বকীয় জীবনদর্শনের আলোকে গূঢ়সঞ্চারী ও তির্যক-অর্থবাহী হয়। এক নিজস্ব অনুভূতি ও ভাবকল্পনার অন্তর্ভেদী আলোকে জীবনরহস্যের স্তরে স্তরে উন্মোচনই শ্রেষ্ঠ কবির যথার্থ কাজ। তাঁহার সৌন্দর্যসৃষ্টি, তাঁহার ভাষা, ছন্দসংগীতের ইন্দ্রজাল, তাঁহার পরিণত, প্রজ্ঞাময় মনন—সবই তাঁহার এই জীবন-রহস্যানুভূতির সহিত সমসূত্রে গ্রথিত, তাঁহার এই দিব্যদৃষ্টিসঞ্জাত জীবন-সমীক্ষার গঠন ও প্রকাশের আয়োজন মাত্র। যে কবির জীবন সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই, তিনি কুশলী শব্দশিল্পী হইলেও রহস্যের অঞ্জন-মাখান, ধ্যাননেত্রবলে বিশ্ববিধান ও মানবজীবনের পরম সত্যটির মর্মজ্ঞ ও উহার প্রকাশ-সমর্থ কবির গৌরবময় অভিধানে অনধিকারী।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার প্রথম পরিণত প্রকাশ ঘটিয়াছে তাঁহার 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' এই কাব্যচতুষ্টয়ে। ইহাদের প্রকাশ

১৮৮৬ হইতে ১৮৯৬ এই একটি বর্ষদশকের মধ্যে সীমায়িত। এই দশ বৎসরের মধ্যে স্বপ্নবিভ্রমবিড়ম্বিত, আত্মহৃদয়নিঃশ্বসিত প্রতপ্ত কামনার ধূমে আবিলদৃষ্টি, ছায়াজগৎবিহারী, অর্ধস্খলিতবাক্ এক কিশোর কবির নবজন্ম ঘটিয়াছে। অতীত অনুভূতির যোগসূত্র পরিণতির শেষ স্তর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু কৈশোর বয়সের অস্পষ্ট বাষ্পোচ্ছ্বাস, ভাব-কুহেলিকার দিগন্তব্যাপ্ত, সীমাতিসারী ঘন আবরণ কল্পনাকুহকে ও অনুভূতির প্রগাঢ়তায় সংহত হইয়া, সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির দ্বারা সুবিন্যস্ত হইয়া, অসীম-বোধের নিবিড় উপলব্ধির দ্বারা রূপসুষমা লাভ করিয়া ধীরে ধীরে দিব্য ভাস্বরতায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। প্রেমের অতৃপ্ত, অসীম ব্যাকুলতা ও উহার দ্রুতপরিবর্তনশীল আবেগোৎকণ্ঠা, বহিঃপ্রকৃতির অফুরন্ত রূপবৈচিত্র্য, মানব-মনে অন্তর্লীন বহুবিসর্পিত ভাব-মনন—সমস্তই সর্বসমন্বয়কারী কবিচেতনার আকর্ষণে অন্তরঙ্গ মিলনে একীভূত হইয়াছে ও সকলে মিলিয়া এক অসীমব্যঞ্জনাময় প্রণয়াকৃতির রূপপ্রতিমা নির্মাণ করিয়াছে। মানবের মানস আকাশের দূরতম নক্ষত্রদীপ্তি, উহার শেষ দিগন্তলগ্ন জ্যোতির্বিন্দু, উহার অনন্তপ্রসারিত, রহস্যমগ্ন অস্তিত্বের অন্তিম ইঙ্গিতঝলক কবির মায়ামন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের পরিচিত জীবনযাত্রার সুনির্দিষ্ট কক্ষ-পরিক্রমার পশ্চাৎপটে এক লীলাচঞ্চল, দিব্যবিভায় উদ্ভাসিত নেপথ্যলোকের সন্ধান দিয়েছে। যে পারমার্থিক সত্য কেবল ঋষির ধ্যানে ও দার্শনিকের তত্ত্বালোচনায় বন্দী ছিল, কবি সেই অনির্বচনীয় বোধিরহস্যকে সর্বজন-আস্বাদ্য রূপলোকের প্রত্যক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অনুকরণাত্মক বিষয় ও রচনাভঙ্গীচিহ্নিত বাল্য রচনার স্তর উত্তীর্ণ হইবার পরই রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের রচনাগুলির মধ্যে কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কার ও জীবনের প্রতি বিশিষ্ট দর্শনপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাত-সংগীত' ও 'ছবি ও গান'-এ তাঁহার পরিণত মনন-অনুভূতির দুর্বল পূর্বাভাস তাঁহার কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছে। কতকগুলি অতিকায়, অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত দার্শনিক ভাব-কল্পনা, অনন্তের প্রতি একটা ভাববিলাস-মূলক আকর্ষণ, রং-এ ও রেখায় ক্ষীণভাবে আঁকা প্রকৃতির চিত্রসৌন্দর্যের মোহ, সর্বোপরি এক অকারণ, সর্বব্যাপী বিষাদ-যবনিকার তলে আত্মসংকোচন ও মাঝে মধ্যে বিপরীতমুখী উল্লাসের উচ্ছ্বসিত আতিশয্য—এই সমস্ত উপাদানই তাঁহার প্রথম যৌবনের কাব্যগুলির দেহে-মনে ঘনবাষ্পের ন্যায় পরিব্যাপ্ত। এই উপাদনগুলিই কবির পরিণততর কাব্য-নির্মিতির উপকরণ যোগাইয়াছে।

কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ঘটিয়াছে তাহাদের অভাবনীয় দিব্য রূপান্তর। যাহা কাব্য-দেহে শিথিল-সংলগ্ন ছিল তাহা উহার প্রাণলীলার মধ্যে নিগূঢ় ও সর্বাত্মক ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। যে বাষ্পোচ্ছ্বাসস্ফীত কল্পনা কাব্যাকাশে লঘু মেঘরাশির ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল ছিল তাহা প্রবল অনুভূতির মাধ্যাকর্ষণের টানে কেন্দ্র-সংহত অবয়ববিন্যাসে রূপশ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। যাহা অস্ফুট ভাবাভাসে অন্তরে ক্ষীণ আলোকরেখা টানিয়া অন্তর্হিত হইত, তাহা স্থির প্রত্যয়ের অচঞ্চল দীপ্তিতে নিখিলের অন্তরতম সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতৃপ্তির আবেগ, অপ্রাপ্তির বিষাদ, রহস্যানুসরণের মরীচিকা-বিভ্রান্তি—এক কথায় জীবনের সর্বব্যাপী নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধের মধ্যে বিশ্ববিধান ও আত্মপরিচয়ের রহস্যভেদী প্রত্যয় অঙ্কুরিত হইয়াছে। কবিমানসের আবর্তনক্রমের ভিতর দিয়া সংশয়ময় উদ্‌ভ্রান্তির উলটা পিঠে যে স্থির জীবনবোধের দীপ্তি উদ্‌ঘাটন-প্রতীক্ষায় ছিল তাহা অবারিত হইল।

কবির যৌবন-রচনার মধ্যে 'ছবি ও গান'-এ প্রেমচেতনার প্রথম বিহ্বল উন্মেষ তাঁহার কাব্যউপাদানসমূহকে এক অভিনব সংশ্লেষের অভিমুখী করিল। তরুণ কবির মন যে অতীন্দ্রির রহস্যের অনুসন্ধানে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া উঠিতেছিল, অপূর্ণ কামনার হাহাকারে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিতেছিল ও দুশ্ছেদ্য তত্ত্বজালে জড়িত হইয়া নিজ অক্ষমতাবোধ ও আত্মানুশোচনায় দগ্ধ হইতেছিল, প্রেম আসিয়া সেই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির জটিলতা আরও বর্ধিত করিল, কিন্তু সেইসঙ্গে উহার সমাধানেরও ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিল। প্রেমই যে কবিমানসের কেন্দ্রীয় অনুভূতি ইহা কবির মনে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আবেগের তীব্রতা আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল, তেমনি অন্য দিকে তাঁহার মানস বিকারের বহুবিসর্পিত জালটি সেই কেন্দ্রবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিয়া সংহত-নিবিড় রূপধারণের উপক্রম করিল। দিকৃচক্রহীন আকাশে নিরঙ্কুশভাবে আবর্তিত নীহারিকাপুঞ্জ এক সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে আবদ্ধ হইয়া উহার নাম-না-জানা ধূমকেতুজন্মকে অতিক্রম করিল ও এক জীবনসংশ্লিষ্ট নক্ষত্রের স্থির ও স্নিগ্ধ দীপ্তিতে নিজ নবজন্মপরিগ্রহের ঘোষণা করিল। অসীমের রহস্যদ্বার যে প্রেমের সোনার চাবিতে উন্মোচিত হইবে এই প্রত্যয়ই কবির কাব্যে এক যুগান্তরের সূচনা করিল। যে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী কবির শৈশবে তাঁহাকে নানামূর্তিতে সঙ্গদান করিত ও গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় তাঁহার সহিত খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত, সে যখন কবির মানসী প্রিয়ারূপে তাঁহার অন্তরলোকে অধিষ্ঠিত হইল, তখন তাঁহার সমস্ত

অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা প্রেমের এক লীলাময় কল্পসৌন্দর্যমূর্তি ধারণ করিয়াই তাঁহার কাব্যে ভাবসংহতি লাভ করিল।

'ছবি ও গান'-এ প্রেয়সীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু উহার উপযুক্ত সৌন্দর্য-পটভূমিকা ও আবাহনগান এখনও রচিত হয় নাই। কল্পনার যে মূর্তিনির্মাণ-কৌশলে, অন্তরের যে নিবিড় আবেগ-মূর্চ্ছনায়, বিশ্বপ্রকৃতির যে অন্তরঙ্গ রূপমায়া-সমাবেশে মানসসুন্দরী অপরূপ সত্তাস্বাতন্ত্র্যে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ হইতে বিকশিত হইয়া উঠেন, বাসনাবিহ্বল কবির সে উদ্বোধনশক্তি এখনও আয়ত্তাতীত। বসন্তবাতাসে অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ বা উষার অরুণ রাগের অন্তর্বর্তী উষাময়ী, রূপসাগর হইতে উত্থিতা লক্ষ্মীর মতই কবিচিত্তে চমক সৃষ্টি করে, কিন্তু ইহারা কবির নিসর্গ-শোভার মধ্যে রূপসন্ধানপ্রবণতার নিদর্শন মাত্র, তাঁহার প্রকৃতিসৌন্দর্যের অন্তঃসারগঠিত প্রাণময়ী রূপপ্রতিমা নির্মাণের পরিচয় নয়। বসন্তবাতাসের সহিত অজানা প্রিয়ার বা উষার সহিত উষাময়ীর কোন যৌগিক একাত্মতা নাই, আছে এক আকস্মিক, ভাবাতিশয্যমূলক শিথিল সম্বন্ধ। এই শিথিল ভাবকল্পনাই 'কড়ি ও কোমল'-এর যৌবনস্বপ্ন-এ আরও নিবিড় ও অনুভূতিগভীর হইয়া উঠিয়াছে। 'ছবি ও গান'-এর 'নিশীথ জগৎ' ও 'নিশীথ চেতনায়' প্রকৃতির আর এক দিক—উহার রুদ্র বিভীষিকা ও করাল সংহার-মূর্তির দিক—কবিকল্পনাকে অভিভূত করিয়াছে। কিন্তু ইহা কবিমানসের একটা সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র—'মানসী'র 'মরণস্বপ্ন', 'সিন্ধুতরঙ্গ' প্রভৃতি কয়েকটি মুষ্টিমেয় কবিতা ছাড়া 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর এই সুর কবির কাব্যে কোন স্থায়ী-চিহ্ন রাখিয়া যায় নাই।

২

'কড়ি ও কোমল'-এ রবীন্দ্রপ্রতিভা সর্বপ্রথম একটি সুসংহত, সুবিন্যস্ত রূপ গ্রহণ করিয়াছে। কবিচিত্তের বিভিন্ন ভাব-মননের মধ্যে একটি সমীকরণ-প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট হইতে আসিয়াছে। মৃত্যুর সহিত প্রথম পরিচয় কবির মনে গাঢ় ছায়া ফেলিয়া, নানা করুণ ও বিষাদময় চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক করিয়া তাঁহার কাব্যানুভূতিকে অধিকতর শক্তিশালী ও সমন্বয়ী করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের এই অন্তিম ও অন্তহীন রহস্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কবির স্বপ্নাবিষ্ট ভাববিলাস স্বতঃই অন্তর্মুখী হইয়াছে ও আপন লঘু সঞ্চরণশীলতাকে গুটাইয়া আনিয়া

মনন-কল্পনার দৃঢ়তায় স্থির আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাঁহার এই ভাবসঙ্কোচন ও প্রকাশগূঢ়তা-সম্পাদনের প্রয়াস তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ে রচিত সনেটগুচ্ছের পরিণত শিল্পবোধে উদাহৃত হইয়াছে—হৃদয়ের বহুপরিমাণ বাষ্প গলিয়া একটি নিটোল শিশিরবিন্দুতে জমাট বাঁধিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কবির যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়াকুলতা-উত্তরণের ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমস্বীকৃতির কাহিনীও স্বল্পাক্ষর সংযত প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই মানস পরিবর্তন ও শিল্পরীতি-সংশোধন মহত্তর কবিপ্রকৃতির জন্য প্রস্তুতি।

এই কাব্যখানিতে গীতিকবিতার প্রথম সূত্রপাত দেখি। 'বিরহ', 'বিলাপ', 'আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি কবিতায় বৈষ্ণবপদাবলীপ্রভাবিত, রাধাবিরহস্মৃতিবাহী ভাবাসঙ্গের সহিত কবিহৃদয়ের অনির্দেশ্য প্রণয়াকৃতি এক মিশ্র সুরগুঞ্জন তুলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মন্ময় আবেগ বিশুদ্ধভাবে ধ্বনিত হয় নাই। ইহারা গীতিকবিতার গঠন-সুষমার আদর্শলাভে অক্ষম ও অতিপল্লবিত ভাববিস্তারে কিছুটা সীমাসংযমহীন। তথাপি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা যে রূপরিক্ত দার্শনিকতা ও অতিপ্রসারিত ভাবোচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করিয়া গীতিকবিতার সংহত ও সুরময় প্রকাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা সুনিশ্চিত। যিনি ভবিষ্যতে জগতের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিগোষ্ঠীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন তাঁহার প্রথম গীতিকাকলী এখানেই শোনা যায়।

মানব ও প্রকৃতির প্রতিও যে তাঁহার আগ্রহ গাঢ়তর হইতেছে তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। 'খেলা'-তে একটি মেয়ের সরল, ক্রীড়ারসে বিভোর আত্মবিস্মৃতি, চারিপাশের দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাহার মনের স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগ অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে, কোনওরূপ ভাবানুরঞ্জনের চেষ্টামাত্র ব্যতিরেকে বর্ণিত হইয়াছে। 'কাঙ্গালিনী'-তে মানবের প্রতি সাধারণ সমবেদনা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘনীভূত করুণায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'মঙ্গলগীত' ও 'আহ্বানগীত' কবির গম্ভীরতর জীবনাগ্রহ, উদাত্ত জীবননীতির প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে। ইহাদিগকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের নীতিমূলক কবিতার সহিত সমধর্মী মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথের পরিণত নীতিকবিতা সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মরসনিমজ্জিত হইয়া, কল্পনা ও হৃদয়াবেগের প্রবহমানতার সহিত মিশ্রিত হইয়া উহার তত্ত্বকাঠিন্য হারাইয়াছে। নীতিতত্ত্ব ঐশী অনুভূতির আদিম উৎসের সহিত সংযোগে এক বৃহত্তর রহস্যদ্যোতনার মধ্যে বিলীন হইয়াছে। এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রকাব্যবিবর্তনের একটা তাৎকালিক স্তর নির্দেশ করিয়াছে।

প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার মধ্যে 'সমুদ্র' কবির এই রহস্যনিলয় মহাপারাবারের প্রতি দীর্ঘকালব্যাপী মানস ঔৎসুক্যের প্রথম উন্মেষ। এখানে কবি সমুদ্রের চির অশান্তি, উহার শিশুর মত অবোধ, অবিরত রোদনপরায়ণতা, নিজ হৃদয়ের অশান্ত আবেগ ও অতৃপ্ত প্রকাশব্যাকুলতার সহিত উহার গূঢ় সাদৃশ্যের অনুভবই ব্যক্ত করিয়াছেন, উহার অন্তর্লীন কোন মানববোধাতীত তত্ত্বের কথা এখনও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি নিজের ক্ষুদ্র বেদনাকে সমুদ্রের বিরাট, সীমাহীন ব্যাকুলতার মধ্যে লীন করিতে চাহিয়াছেন, সমুদ্রের ধ্বনিগম্ভীর তরঙ্গ-কল্লোলের ভাষার সহিত নিজ ক্ষীণ প্রকাশশক্তির মিলনসাধনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার সহিত 'মানসী'র 'সিন্ধুতরঙ্গ' ও 'সোনার তরী'-র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা দুইটি তুলনা করিলেই কবিকল্পনা ও মননের নিগূঢ় রূপান্তরটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রথম কবিতাটিতে কবি কেবল সমুদ্রের আচরণের অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াছেন ও উহার সঙ্গে নিজ মনের ছন্দানুবর্তনের মিল জুড়িয়াছেন। এখানে চোখের দেখার সঙ্গে কবিমনের ন্যূনতম সহযোগিতা লক্ষিত হয়। দ্বিতীয়টিতে সমুদ্রে ঝড়ের এক জীবন্ত বর্ণনা, এবং ঝটিকায় বিধ্বস্তপ্রায় বাষ্পযানের আরোহীদের নিদারুণ মানস বিপর্যয়ের নাটকীয় প্রকাশ ও বিশ্ব-প্রকৃতির মূল শক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক বিবেচনা—এই দুই ভাবস্তরের একত্র সমাবেশ। এখানে সমুদ্রের ঝটিকারুদ্র মূর্তি কবির বর্ণনাশক্তি ও তত্ত্বচেতনাকে যুগপৎ উদ্রিক্ত করিয়াছে। সমুদ্রতাণ্ডব কবিমনের গূঢ়ানুপ্রবেশী শক্তির প্রবেশপথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সমুদ্রতরঙ্গের উন্মত্ত ধ্বংসলীলা কবিচিত্তের সমবেদনার শান্তিবারিনিষেকে শান্ত হইয়া কবির রহস্যসন্ধানপ্রবৃত্তির পূর্ণ আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তৃতীয় কবিতাটিতে কবি সমুদ্রের উপর নিজ ভাবানুভূতি প্রয়োগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছেন—তটদেশের উপর উহার অশ্রান্ত ঝাঁপাইয়া পড়ার মধ্যে নিজ জন্মান্তরীণ স্মৃতির সমর্থন, সন্তানের প্রতি মাতৃহৃদয়ের উন্মত্ত স্নেহাতিশয্য, আদর ও পীড়নের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের নিদর্শন পাইয়াছেন। পূর্ব দুইটি কবিতার সমুদ্র যে কোন কবির সমুদ্র হইতে পারিত। তৃতীয় কবিতার সমুদ্র অবিসংবাদিতভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি; কবির জন্মজন্মান্তরের রহস্যময় অনুভূতি, নিখিলবিশ্বের সহিত প্রাণলীলার একাত্মতাবোধ, বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে নূতন পুরাণ-কল্পনার উদ্বোধন সমুদ্রের তরঙ্গিত বিস্ময়ের উপর কবিচিত্তের সৃষ্টিরহস্যোদ্ভেদী বিস্ময়বোধের অচঞ্চল স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে।

কবির প্রকৃতি-চেতনা মানবজীবনব্যঞ্জনার সহযোগে, অসীমোপলব্ধির চকিত আভাসে, প্রেমাকৃতির স্বপ্নিল অন্তর্লীনতায় ক্রমশঃ এক যৌগিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইল। 'সন্ধ্যার বিদায়' শুধু নিসর্গবর্ণনা নয়, প্রকৃতির দেহরূপের পাকে পাকে জড়ানো মানব-আবেগের ও স্বপ্নকল্পনার স্বর্ণসূত্রবয়নে সঙ্কেতভাস্বর। 'রাত্রি' কবিতাও নিদ্রার অসাড়তা, উষাগমে বিসর্পিত পলায়ন, সমুদ্রের অতলে আত্ম-গোপন ও জলতলের স্তিমিত আলোকে স্বপ্নজালবয়নের সমন্বয়ে এক নবকল্পনার রূপকরাগদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা ও রাত্রির যাদু যেন কল্পনার সূক্ষ্মতন্তু-নির্মিত জালে বন্দী হইয়া পাঠকচিত্তের গভীরে নিজ মায়া সঞ্চারিত করিয়াছে।

'যৌবন-স্বপ্ন' ও 'ক্ষণিক মিলন' ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিতে বিশেষ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। 'কড়ি ও কোমল'-এর যে প্রবল যৌবনাবেশ ও আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততার উল্লেখ রবীন্দ্ররচনাবলীর ভূমিকায় কবি করিয়াছেন, এই দুই কবিতা তাহারই সমর্থক কাব্যময় প্রকাশ। ইহাদের মধ্যে 'মানসসুন্দরী' ও 'অনন্ত প্রেম'-এর বীজ ভ্রূণ-সম্ভাবনারূপে সুপ্ত আছে। 'মানসসুন্দরী'র বিহ্বল, সর্বগ্রাসী প্রণয়-উচ্ছ্বাস, বিমূর্ত কাব্যপ্রেরণার প্রতি আবেগমূর্ছিত, মাধুর্যভাণ্ডার-উজাড়করা প্রেয়সী-সম্ভাষণ, একস্তরের সাধনার মধ্যে অন্তস্তরের অনুভূতির একাত্ম বিলয় এই 'যৌবনস্বপ্ন'-এর তরুণমনসুলভ ভাবাতিশয্য ও আত্মবিভ্রান্তির মধ্যে উন্মুখ হইয়া আছে। 'কড়ি ও কোমল'-এ যাহা খানিকটা কষ্টকল্পনা ও প্রণয়মূঢ়তার প্রলাপোক্তি তাহাই 'সোনার তরী'-তে পৌছিয়া কল্পনার শ্রেষ্ঠ রূপান্তর ও দিব্যভাষণের মহিমা লাভ করিয়াছে। পরবর্তী-কাব্যে কবির অধ্যাত্ম প্রত্যয় অরূপলোক ও রূপলোকের মধ্যে যে সীমালোপকারী অভেদ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা কাব্যতত্ত্বের একটি শাশ্বত সত্যের স্বর্গলোকে স্থান পাইয়াছে। যে অনন্তযৌবনা, নিখিলরূপসারনির্মিতা উর্বশী কবির কাব্যগগনে স্থির নক্ষত্রের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাহারই প্রথম কটাক্ষ এখানে কবি অনুভব করিয়াছেন। 'ক্ষণিক মিলন'-এ দুই ভাসিয়া-আসা মেঘখণ্ডের আকস্মিক ও অপূর্ণ মিলনে কবি রূপক-কল্পনার সার্থক প্রয়োগে তাঁহার জন্মজন্মান্তরব্যাপী প্রেম সম্বন্ধে যে মূলগত সংস্কার তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'ক্ষুদ্র অনন্ত' সনেটে অনন্তের ধারণা কবিচিত্তে অতি সহজ প্রতীতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—গলদ্‌ঘর্ম, অতিকথনপীড়িত প্রয়াস এখানে নিঃশ্বাসবায়ুর মত অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে ; নিমেষের মধ্যে অনন্তের অনুপ্রবেশ কবির মনে একটি স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বসত্যের রূপ লইয়াছে।

সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।

৩

'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' এই কাব্যত্রয়ীতে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি ও জীবনবোধ নিঃসন্দিগ্ধ স্বরূপপরিচয়ে স্থির হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তাঁহার জীবনদর্শন, প্রেমচেতনা, প্রকৃতিচেতনা ও অনন্তাভিমুখিতা আবেগের কূলপ্লাবী উৎসারে, সৌন্দর্যবোধের সর্বসমন্বয়কারী নিবিড়তায় ও অধ্যাত্ম সংস্কারের গভীর-মূলশায়ী আশ্রয়ে একটি আত্মস্থ যৌগিক কবিসত্তায় সংহতি লাভ করিয়াছে। এই তিনটি কাব্যে কবির অপূর্ব রূপনির্মিতি ও কল্পনার একদিকে জীবননিষ্ঠ, অন্যদিকে নভোসঞ্চারী লীলাবৈচিত্র্য দেহ ও আত্মার অচ্ছেদ্য মিলনে একীভূত হইয়াছে। এই রূপোচ্ছ্বাসময়, ভাবানুভূতির প্রাণোত্তাপপূর্ণ পরিমণ্ডলে কবির নিজস্ব জীবন-প্রত্যয়গুলি—তাঁহার বিশ্বাত্মবোধ, তাঁহার কাব্যপ্রেরণারহস্য, অসীমের সঙ্গে তাঁহার আত্মার মিলনৌৎসুক্য ও ভাববিনিময়—সবই পুষ্পের মত স্বতঃউৎসারিত সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ব এই রূপসাগরে স্নান করিয়া সদ্য সমুদ্রস্নানোত্থিতা আদিম বসুন্ধরার ন্যায় লাবণ্যলীলায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে; অরূপ এই ভূলোকদ্যুলোকব্যাপ্ত রূপের ইন্দ্রজালে বন্দী হইয়া মানবচিত্তের নিকট ধরা দিয়াছে; প্রকৃতি তাহার সমস্ত অনির্বচনীয় সৌন্দর্য-রহস্য লইয়া এই সীমা ও অসীমের মিলনে দৌত্যকার্য করিয়াছে। কাব্যপাঠকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন জগতের যবনিকা উন্মোচিত হইয়াছে। কবির পরিণত রচনার মধ্যে আরও অনেক বিচিত্র সৌন্দর্যসৃষ্টি, আরও নব নব জীবনরহস্য দেখা দিবে। প্রজ্ঞাঘন, পরিণত জীবনবোধ, ভগবানের সহিত অব্যবহিত আত্মিক সংযোগ, সাম্প্রতিক বিশ্বসমস্যার জটিলতম মানস উপলব্ধি, ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির মর্মভেদ, মৃত্যুরহস্যের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রভৃতি বহু নব নব সুর তাঁহার কাব্যাকাশে অনুরণিত হইবে ও তাঁহার কাব্যপাঠের আনন্দকে নানা রসের সমন্বয়ে পরম রুচিকর করিয়া তুলিবে। তাঁহার ধ্যানদৃষ্টি ও দিব্য কল্পনা তাঁহাকে যুগনিষ্ঠ হইতে যুগোত্তীর্ণ কবিপদবীতে উন্নীত করিবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপরিণতির প্রথম স্তর আমাদের মনে যে অভাবনীয় বিস্ময়-চমক জাগায়, তাহা পরিণতির পরবর্তী স্তরগুলিতে সমপরিমাণে

পুনরাবৃত্ত হইবে না। সমুদ্রগর্ভ হইতে নবশশিকলার প্রথম অভ্যুদয় যে মুগ্ধ উল্লাসের অভিনন্দন লাভ করে, ষোলকলায় পূর্ণ পূর্ণিমার চন্দ্র উহার উজ্জ্বলতম আলোকবৃত্ত লইয়াও সে বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসের উদ্রেক করে না। শৈশব হইতে যৌবনে বিকাশের মধ্যে যে রহস্য নিহিত, যৌবন হইতে পরিণত প্রৌঢ়ত্বে পরিপক্কতার মধ্যে সে রহস্য অনেকটা মন্দীভূত হয়। প্রথম স্তরে আছে অকল্পনীয় দেব-আশীর্বাদ, দ্বিতীয় স্তরে কেবল ক্রমবিবর্তনের প্রত্যাশিত নিয়ম-শৃঙ্খলা। এই কাব্যত্রয়ীয় মায়ামুকুরে রবীন্দ্রপ্রতিভা স্বর্গোদ্যানসরসীর স্বচ্ছ জলে আদি মানব-মাতা ইভের ন্যায় নিজ যৌবন-প্রফুল্ল মুখচ্ছবির প্রথম প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া শুধু অপরকে মুগ্ধ করে নাই নিজেও মোহিত হইয়াছে।

৪

'মানসী'র নামকরণের মধ্যেই উহার অন্তর-তাৎপর্য প্রতিফলিত। মানস-সুন্দরীর প্রতিমা-নির্মাণের জন্য উপকরণ-সংগ্রহ ও আবেগ ও কল্পনার সুরসঙ্গতি-সাধনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানসসুন্দরী এখনও প্রত্যক্ষতার সীমায় আবির্ভূত হন নাই—কিন্তু সমস্ত আকাশ-বাতাস এই আসন্ন আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় রাঙা হইয়াছে, কবিপ্রেয়সীর আগমনী-সংগীতের মূর্ছনায় এক রোমাঞ্চিত আবেশে থরথর করিয়া উঠিয়াছে। কবি তাঁহার সমস্ত মনোজগতে এক ব্যাকুল কম্পন অনুভব করিয়াছেন; প্রকৃতির অঙ্গ ও নিজ মনের মাধুরী সঞ্চয় হইতে সৌন্দর্য-নির্যাস আহরণ করিয়া এই তিলোত্তমা-মূর্তি গড়িবার আয়োজনে ব্রতী হইয়াছেন। আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-বেদনা, নিশ্চিত আশ্বাস ও বারে বারে ফিরিয়া-আসা সংশয়-মোহের মধ্য দিয়া, কত ভাঙ্গা-গড়া, উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে কবির মানস অভিসার অগ্রসর হইয়াছে। কোন কোন সমালোচক কবি-মনের এইরূপ মুহুর্মুহু ভাবান্তরের অব্যবহিত কারণ জানিতে তাঁহার জীবনীর ও 'ছিন্নপত্র'-এর চাবিকাঠি খুঁজিয়াছেন। কবির জীবনকাহিনী ও পত্রের মধ্যে অভিব্যক্ত অন্তরপ্রবাহিণী ভাবধারা কখনও কখনও তাঁহার কাব্যরচনার উপর আশ্চর্য আলোকপাত করিয়াছে। একই প্রবল চেতনা পত্রাবলীর পাত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কাব্যরসধারার স্রোতোবৃদ্ধি করিয়াছে ও উহার উৎসের সন্ধান দিয়াছে। কবির যে মন চিন্তা করে ও যে কল্পনা কবিতা লেখে উভয়ের মধ্যে এই অদ্ভুত সমপ্রাণতা, রবীন্দ্র-কাব্যের উদ্ভব যে হঠাৎ-উত্তেজিত কল্পনার মধ্যে নয়, পরন্তু পুনঃপুনঃ

পরীক্ষিত, বহুধা-আবর্তিত জীবনপ্রত্যয়ের মধ্যে নিহিত—এই মূল্যবান সত্য প্রমাণিত করে।

কিন্তু ভ্রান্তি, অবসাদ ও নৈরাশ্যের এরূপ সমর্থক প্রমাণ মিলে না। যে কবি অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে প্রেয়সীরূপে অন্তরের মণিকোঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, অমূর্ত কল্পনাকে প্রণয়াবেশের আরতি-দীপে বরণ করিতে অভিলাষী, তাঁহাকে অনিবার্যভাবে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে সংশয়দোলায় দুলিতেই হইবে। প্রেমের অস্থিরতার সঙ্গে আদর্শের রূপবিভ্রান্তি ও পলাতক ক্ষণদীপ্তি যুক্ত হইয়া কবিচেতনাকে আরও দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধায় ঘুরাইবে। আত্মিকদ্যুতিবর্জিত মোহময় নারীসৌন্দর্যের যে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উর্বশী, তাহাই বিদ্যুৎশিখার ন্যায় স্থায়ী সম্পর্কবন্ধনে অনায়ত্ত। সুতরাং অনন্তের অন্তরলক্ষ্মী যে মানসসুন্দরী কবির কাব্যপ্রেরণা ও জীবনলীলার সহিত রহস্যময় অন্তরঙ্গতায় একাত্ম, তিনি যে কবির অনুভবকে বার বার বঞ্চনা করিবেন, মিলন-বিরহের মধ্যে মুহুর্মুহু আবর্তিত হইয়া তাঁহার চিত্তবিভ্রম জন্মাইবেন তাহা মনস্তত্ত্বসম্মত জীবন-সত্য।

'মানসী'-তে মানসসুন্দরীর জন্য যে বন্দনাগীতের আলাপ সুরু হইয়াছে, তাহাতে প্রেমের সুরই সহস্র ধারায় উছলিয়া উঠিয়াছে। ইহাই সে ঐকতান-সঙ্গীতের মুখ্য সুর। ছন্দের যে অফুরন্ত বৈচিত্র্য, যে নব নব শিল্পচাতুরী এই কাব্যের মধ্যে ঝর্ণার ন্যায় স্বতস্ফূর্ত লীলায়, কখনও নৃত্যচটুল, কখনও গম্ভীর-নাদী ভঙ্গীতে বহিয়া গিয়াছে, তাহা যেন অন্তরে সঞ্চিত দুর্বার আবেগের অনিবার্য নিষ্ক্রমণপথ রচনা করিয়াছে। কোন এক কাব্যগ্রন্থে এত সুপ্রচুর ছন্দ-উৎসারণ, এত অদ্ভুত গঠনশিল্পের কারুকার্য, বহুমুখী আবেগের এমন লীলাময় প্রকাশ এক সঙ্গে পুঞ্জীভূত হয় নাই। কবির মনোজগতে কি মর্মোৎসারিত ভাব-আলোড়ন চলিতেছিল তাহা এই কাব্যের শব্দপুঞ্জবিদারী ছন্দোস্রোতে অপূর্ব চিত্ররেখা রাখিয়া গিয়াছে।

'মানসীর' প্রেমকবিতাগুলি সবই যে মানসসুন্দরীর আদর্শরূপসন্ধানে ব্যাপৃত তাহা মনে করিলে theoryকে অনুচিত প্রাধান্য দেওয়া হইবে। শ্রেষ্ঠ কবি theoryকে সিন্ধবাদ নাবিকের ন্যায় পৃষ্ঠদেশে বহন করেন না, তাঁহার উৎসারিত কল্পনার স্রোতে উহাকে ভাসাইয়া লইয়া যান। এই সময় রবীন্দ্র-মানস মানসী-স্বপ্নে বিভোর ছিল বলিয়া কোন কোন প্রেম-কবিতায় এই আদর্শায়িতা জীবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর অপার্থিব রূপ ও অনন্তকল্পনারঞ্জিত ভাবাকৃতির প্রতিচ্ছবি

লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু মোটের উপর এই কবিতাগুচ্ছ মানসীকল্পনা-বহির্ভূত ও প্রাকৃত প্রেমের মনস্তাত্ত্বিক ও কাব্যিক লক্ষণে চিহ্নিত। ভাবিলে বিস্ময় লাগে যে এই মানসী কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার যত বিচিত্র পরিস্থিতি ও সূক্ষ্ম হৃদয়-সমস্যার যত কাব্যসৌন্দর্যময়, অথচ বাস্তবজীবনানুসারী ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রিত হইয়াছে তাহা অন্য কোন কাব্যে দুর্লভ। কবির সমস্ত অন্তর্দৃষ্টি যেন প্রেমরহস্য-উদ্ঘাটনে কেন্দ্রীভূত ও তাঁহার সমস্ত কাব্যকলা যেন এই অন্তর্লোকবিহারের রূপময় ছবি আঁকিতে নিয়োজিত। এই প্রেমকবিতার অনেকগুলিতে ব্রাউনিংএর মনস্তাত্ত্বিক চিত্তবিশ্লেষণের ও নাটকীয় অন্তর্বিক্ষোভের ছায়াপাত হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজ কবির অতিপ্রকট মনস্তত্ত্বসন্ধান ও নাট্যচমক রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সৌন্দর্যাস্তরণের নীচে আত্মগোপন করিয়াছে। প্রকৃতির কোমল, বিষণ্ণ ভাবাসঙ্গ প্রেমানুভূতির মদিরতার মধ্যে অনির্বচনীয়তার স্পর্শ আনিয়াছে।

'ভুলে', 'ভুলভাঙা', 'সংশয়ের আবেদন', 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'তবু', 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'নিভৃত আশ্রম', 'বিচ্ছেদ', 'আকাঙ্ক্ষা', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম'—প্রেমাভিসারের কি সুদীর্ঘ, ভাববিচিত্র শোভাযাত্রা! সব কয়টি আলোচনার সময় নাই। 'আকাঙ্ক্ষা', 'বিচ্ছেদ' ও 'মানসিক অভিসার'—এই তিনটি কবিতাতে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুস্মৃতি উহাদের প্রেমার্তির ও রূপানুরাগের মধ্যে একটি সুগভীর শূন্যতাবোধের অনুরণন জাগাইয়াছে। তরুণ কবির এই প্রেরণাদাত্রী দেবী তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁহার ভক্তহৃদয়ের পূর্ণ পরিচয় পান নাই, তাহার কৈশোর চাপল্য, লঘু হাস্যপরিহাসের স্মৃতি লইয়া তিনি মরণের অন্তরালে চিরতরে অদৃশ্য হইয়াছেন। এক মেঘাচ্ছন্ন, ঝঞ্ঝাতাড়িত প্রভাতে, বর্ষা-প্রতীক্ষায় আকুল প্রকৃতি-পরিবেশে কবির এই ক্ষোভ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে তিনি চপল কিশোর বলিয়া জানিয়া গিয়াছেন, যৌবনোদ্ভিন্ন তাহার হৃদয়ে কি অপার রহস্য, কি অসীম সম্ভাবনা অব্যক্ত ছিল তাহারই চেতনা আজ বিচ্ছেদ-বেদনাকে এক স্তব্ধ মহিমায় দিগন্তব্যাপ্ত করিয়াছে। কবিতাটি এই আলোকে পাঠ করিলে এক অপ্রত্যাশিত অর্থগভীরতায় ভরিয়া উঠে।

"কতকাল ছিল কাছে, বলিনি তো কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্য পরিহাস, বাক্য-হানাহানি,
তার মাঝে রয়ে গেছে হৃদয়ের বাণী।

এখন দেখা পাইলে কবি তাহাকে যে কথা শুনাইতেন তাহা—

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্যমর্মরসম মর্ম-ব্যাকুলতা।
ইহপরকালব্যাপী সুমহান্ প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্বের গান।

আবার

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছ চলে,
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা বলে।
কল্পনার সত্য রাজ্য দেখাইনি তারে,
বসাইনি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।*

কবিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই খেদপূর্ণ পূর্বস্মৃতিরোমন্থনের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

'বিচ্ছেদ' কবিতাটিতেও অনুরূপ নৈরাশ্যক্ষুব্ধ স্মৃতিদহনের জ্বালা উহার আপাতপ্রশান্ত কল্পনাভঙ্গীর মধ্যে অন্তর্গূঢ় হইয়া আছে। অপরাহ্নের স্বর্ণদীপ্তিতে ঘেরা একটি মোহিনী প্রতিমা প্রকৃতির ইন্দ্রজালে অপরূপ হইয়া স্মৃতিনেত্রে উদ্ভাসিত। এমন সময় হঠাৎ এক মুহূর্তে যে অন্তোত্তর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, তাহা এই প্রতিমাকে চিরকালের জন্য গ্রাস করিল। চিত্র বিলুপ্ত হইল কিন্তু চিত্রপট উহার শূন্য, নিষ্প্রাণ মহিমায়, যেন প্রেমিকের উৎসুক হৃদয়কে উপহাস করিতেই, দাঁড়াইয়া রহিল।

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল।
নয়নের দৃষ্টি গেল, রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ, আর ধরণী বিশাল।

এক কবির সুর যদি অন্য কবির কণ্ঠে প্রায় অবিকলভাবে ধ্বনিত হইতে পারে, তবে এই স্তবকে আমরা কি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এর Lucy কবিতার অন্তিম স্তবকের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই না?

No motion has she now, no force
She neither hears nor sees :
Rolled round in earth's diurnal course
With rocks and stones and trees.

'মানসিক অভিসার'এও যেন এই বিষাদ-করুণ পূর্বস্মৃতি একই প্রকারের কল্পনাবিভ্রম ও স্বপ্নমরীচিকার উদ্বোধন করিতেছে। কাদম্বরী দেবীর কালশোধিত স্মৃতি কবিচিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহার সাধারণ প্রেমচেতনা ও আদর্শ প্রেয়সীর কল্পনার মাঝে মধ্যে এক একটি গোপন ইঙ্গিত, এক একটি আত্মনিষ্ঠ অনুভূতির গূঢ়তর ব্যঞ্জনা রাখিয়া গিয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কতকগুলি প্রেমকবিতায় মানসসুন্দরীর সন্ধান-প্রয়াসের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। কবির অসীমাভিসারী মন যে বিশ্বব্যাপ্ত আকৃতিতে আপনাকে বিকীর্ণ করিয়াছে তাহারই যাত্রাপথে আহৃত সৌন্দর্যকণিকা-চয়ন ও দার্শনিক জিজ্ঞাসার গূঢ়সন্ধানী দৃষ্টি এই মানসী প্রতিমার অঙ্গসজ্জা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 'নিষ্ফল কামনা'য় (১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭) কবির ব্যর্থ রূপতৃষ্ণা তাঁহাকে আত্মার রহস্য-নির্ণয়ে প্ররোচিত ও অসীম ও অনন্তের পরিমণ্ডলে তাঁহার চিন্তাকে উর্ধ্বায়িত করিয়াছে। এই অন্বেষণস্পৃহা 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগ হইতে সম্প্রসারিত হইয়া আরও অন্তর্ভেদী হইয়াছে। 'নিভৃত আশ্রম' (১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৭) নামক সনেটে কবি বাহিরের খোঁজা হইতে বিরত হইয়া, বহির্বিষয়নিরপেক্ষ হইয়া, অন্তরের নিভৃতে এক 'জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মূরতি' প্রতিষ্ঠা করিয়া আপাত-নিশ্চয়তার প্রশান্তি অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এই অন্তর্দাহময় উৎকণ্ঠা এত সহজে নিবৃত্ত হইবার নহে। অনন্ত ও বাহিরের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিয়াই, অনন্তলোকব্যাপ্ত কুহেলিকাকে মানব হৃদয়ের রক্তিম প্রণয়লিপ্সার গাঢ় রং-এ রঞ্জিত করিয়াই এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইবে। 'পুরুষের উক্তি'-তে স্বপ্নটুটা, রূঢ়বাস্তববিড়ম্বিত সংসার-জীবনে আদর্শপ্রেমের কিরূপ বিবর্ণ অবসাদ ঘটে, "ত্রিভুবনজয়ী, অপাররহস্যময়ী আনন্দ-মূরতি" কেমন করিয়া ধূসর প্রাত্যহিকতায় বিলীন হয় তাহার কাহিনী সাধারণ প্রেমের অবসানের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। একটি অপেক্ষাকৃত মাঝারি উৎকর্ষের কবিতা 'মায়া'-তে প্রেমের চির অতৃপ্তি ও বঞ্চনার পিছনে মানসীর সন্ধানে কবির যে পাওয়া-হারানোর বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা তাহার ছায়াপাত হইয়াছে।

কত বার আসে, কত বার ভাসে
মিশে যায় কত বার,
পেলেও যেমন না পেলে তেমন
শুধু থাকে হাহাকার।

শেষ দুই পংক্তিতে চরম ব্যর্থতার যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সাধারণ মৃত্যুলাঞ্ছিত অনায়ত্ত প্রেম ও আদর্শায়িত প্রেম উভয়েরই ফাঁকি রেখা মিলাইয়াছে।

যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙিন
মেঘখানি ভালোবাসে,
এও চলে যায় সেও চলে যায়,
অদৃষ্ট বসে হাসে।

'আত্মসমর্পণ' কবিতায় (১২ই ভাদ্র, ১৮৮৯) মানবিক প্রেমের জবানীতে মানব অনুভূতির অতীতসত্তার আদর্শ প্রেমকল্পনার মানব ইচ্ছার ও একান্ত আত্ম-বিলোপের স্বরূপটি অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখানে মানস-সুন্দরীর স্তর অতিক্রম করিয়া অন্তর্যামী স্তরের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। কবি তাঁর মানস প্রেয়সীর অন্তরবাসিনী ও বিশ্বব্যাপিনী উভয় মূর্তিই উপলব্ধি করিয়াছেন ও একান্ত দীনভাবে প্রেমের সমস্ত ছলাকলা বিসর্জন দিয়া তাঁহার চরণে আপনার সমস্ত কর্তৃত্বাভিমান সঁপিয়া দিয়াছেন।

আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে।

সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছে তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

কবির অন্তিম আত্মনিবেদন—

—আশা-নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার।—

তাঁহার মানসী-অন্বেষণের জয়-পরাজয়মিশ্র দীর্ঘ বন্ধুর পথের ইতিহাস ও তাঁহার প্রতি অবিচল আনুগত্যের সঙ্কল্প যুগপৎ ব্যক্ত করিয়াছে।

'আত্মসমর্পণ'-এর কিছু পূর্বে লেখা তিনটি স্বল্প ব্যবধানে রচিত কবিতা—'ধ্যান' (২৬শে শ্রাবণ), 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম' (২রা ভাদ্র, ১৮৮৯) কবির সুদীর্ঘ সংশয়ক্ষুব্ধ, আশা-নৈরাশ্যবিড়ম্বিত আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে এক নিশ্চিত প্রত্যয়ের

প্রশান্ত আশ্বাসের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। কবির মনের কুয়াশা কাটিয়া গিয়া হঠাৎ নির্মল সূর্যালোক তাঁহার মানস দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত দীপ্ত করিয়াছে। অনন্ত ও প্রেমের ধারণা তাঁহার কল্পনায় এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই প্রেমরসে নিমজ্জিত, প্রেয়সীতে রূপান্তরিত অসীম-কল্পনা প্রকৃতির ও দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যবর্তিতা ছাড়াই এক স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির প্লাবনে কবিচিত্তকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছে। এই অনন্তসারভূতা কবি-প্রেয়সীর সঙ্গে কবির ব্যবধান সম্পূর্ণ দূরীভূত। তিনি উপলব্ধ সত্যের মত নিত্যস্মৃত, বিশ্বলোপকারী নির্জনতায় বৃত, কবির জীবন-মরণের উপর একচ্ছত্রা অধীশ্বরী। এ পর্যন্ত ভাষার মধ্যে আলঙ্কারিক অতিরঞ্জনের সংশয় জাগিতে পারে, কিন্তু পরের স্তবকের প্রারম্ভে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার অন্তর-নিংড়ানো সত্য।

তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।

নিজের প্রেয়সীকে অতুলনীয় বলিয়া না ভাবিলে নিজের প্রেমকে অতুলনীয় ভাবার স্পর্ধা কাহারও হয় না। এ ক্ষেত্রে মানসী প্রিয়ার অলোকসামান্যতা কবির প্রেমকেও অলৌকিকতায় উন্নীত করিয়াছে। কবির যে দৃষ্টি বিশ্বের অসংখ্য সৌন্দর্যের মধ্যে দিশাহারা হইয়াছিল, যাহা হৃদয়ের প্রতিটি অনুভূতি হইতে চূর্ণ রশ্মির মত ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল তাহা এখন এক লক্ষ্যে অনিমেষ, স্থির হইয়াছে। চিরস্থির আকাশ ও চিরচঞ্চল সমুদ্রের মধ্যে যেমন পূর্ণিমার চন্দ্র সমতা বিধান করে, তেমনি এক পরিপূর্ণ আনন্দ কবি ও কবিপ্রেয়সীর মধ্যে সমস্ত ব্যবধান বিলুপ্ত করিয়া উহাদিগকে একাত্ম করিয়াছে। অস্থির, নানা শাখাপথে বিভক্ত নদীতরঙ্গ এক পরম প্রাপ্তির মহাপারাবারে পৌছিয়া উহার অশান্ত যাত্রার অবসান ঘটাইয়াছে।

'পূর্বকালে' কবিতায় অনন্তের বিমূর্ত ধারণা সীমাহীন কালব্যাপ্তিতে ও যুগ-যুগান্তরের প্রেম-সাধনার লীলাভূমিরূপে কবির কাছে রূপোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মানসী শুধু তাঁহার একার নয়, অতীতের যত প্রেমিক-প্রেমিকা সকলেরই প্রেমের তিনি শাশ্বত উৎস। সৃষ্টিপ্রারম্ভ হইতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ কবির

অন্তরে তাঁহার উদয় হইয়াছে। যুগযুগান্তরের পথিকের মেলায় কবি একাকী নিজ পথ চলার পাথেয় সঞ্চয় করিতেছিলেন। আজ অনাদি বিরহের অসীম সুখের মধ্যে অবসান হইয়াছে, কিন্তু কবির অনুভূতিতে উভয়ের প্রকৃতি মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাই ত কবি এই নূতন প্রেমের স্বরূপ নিরূপণ করিতে গিয়া বলিতেছেন, 'এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে'। ব্রহ্মের ন্যায় এ প্রেমে বিপরীত বৃত্তির সামঞ্জস্য হইয়াছে।

'অনন্ত প্রেম' কবিতায় কবির পূর্বজন্মস্মৃতি আরও নিঃসংশয় হইয়াছে। পূর্ব কবিতায় তিনি আপনাকে পথিপার্শ্বে অপেক্ষমাণ নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে অনুভব করিয়াছেন; মানসীর কৃপা কবে তাঁহাকে ধন্য করিবে সেই শুভলগ্নের জন্য তিনি বসিয়া আছেন। কিন্তু বর্তমান কবিতায় তিনি আর দর্শকমাত্র নহেন। তিনি অনাদি অতীত হইতে, জন্মজন্মান্তরে মানসীর প্রেমলীলার সহযোগী ছিলেন এবং তাঁহার মুগ্ধ হৃদয়ের অর্ঘ্য চিরকাল তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া আসিতেছেন। অতীত প্রেমের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার বিস্মৃতির যবনিকা সরিয়া যায়, এবং তাঁহার স্মরণে চিরকালের প্রেয়সীর মূর্তি ধ্রুবতারকার ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। জাতিস্মর কবি এখন মনে করিতে পারেন যে কোটি প্রেমিকের প্রেম, নিখিলের বিরহ-মিলন-আবেগ, প্রাচীন কবির গীতধারা তাঁহাদের এই সদ্য-অনুভূত প্রেমে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

এই কবিতাত্রয়ী কবির অতীন্দ্রিয় প্রেমরহস্যের অনুভব-প্রত্যক্ষ ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে। এই নিঃসংশয় আশ্রয় হইতে তাঁহার কল্পনা আরও ঊর্ধ্বচারী হইয়া, উহার আরও নূতন নূতন লীলা, উহার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তগুলির স্বাদুতর রসনিবিড়তা, উহার গোপনসঞ্চারী শক্তির আরও আশ্চর্যতর প্রকাশ প্রকটিত করিবে। কবির অনন্তচেতনা ও প্রেমচেতনা এখানে এক মহাসঙ্গমে মিলিত হইয়া এক নবতীর্থমহিমা রচনা করিয়াছে। কবির বিশ্বের সহিত একাত্মতাবোধ, জন্মজন্মান্তরীণ অব্যক্ত জীবনস্পন্দনের নিগূঢ় সংস্কার ও প্রকৃতির সৌন্দর্য-ও-প্রাণলীলা ইহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাঁহার পরবর্তী কাব্যসম্ভারকে আরও বহুকোষযুক্ত, অনির্বচনীয় রূপরহস্যের আধাররূপে পরিচিত করিবে।

৫

'মানসী' কাব্যে প্রকৃতি ও মৃত্যু সম্বন্ধে কবির সংশয়িত মনোভাবের পরিচয় মিলে। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'শূন্য গৃহে' প্রভৃতি কবিতায় জীবনবিধানের কল্যাণময়তা, মৃত্যুর নিষ্ঠুর বঞ্চনা ও প্রিয়বিয়োগের করুণ স্মৃতি কবিকে নানা ব্যাকুল প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় প্রণোদিত করিয়াছে। কবিচিত্ত এখনও কোন আশ্বাসপ্রদ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই। 'মরণস্বপ্ন' কবিতায় প্রলয়কালীন বিশ্ববিলুপ্তি ও আত্মচেতনার মহাশূন্যগর্ভে ক্রমিক বিলয় একটি কল্পনাসমৃদ্ধ রূপকাভাসে সার্থক চিত্রকল্পসমন্বিত প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাতে পূর্বতন রচনার সহিত তুলনায় কবিদৃষ্টি বিমূর্তভাবরূপায়ণে কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা বোঝা যায়। কিন্তু সমস্ত রচনাটির মধ্যে একটা সাবলীলতার অভাব ও সচেষ্ট ভাবসংযোজনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যু কবির মনে কিরূপ ঘন বাষ্প-আবরণ বিস্তৃত করিয়াছে এই কবিতাগুলি তাহার প্রমাণ। এই কাব্যে প্রকৃতি সম্বন্ধে সংশয় কবিচিত্তে দেখা দিয়াছে। 'সিন্ধুতরঙ্গ'-এ আমরা মানব চিত্তের স্নেহপ্রেম প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয় ও জড়প্রকৃতির অন্ধ, নির্মম হিংস্রতার অমীমাংসিত বিরোধ দেখিয়াছি। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি'তেও সেই একই সংশয়ক্লিষ্ট মনোভাবের পুনরাবির্ভাব। 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায় প্রকৃতির দুর্বোধ্য, ভীতি-মিশ্র মায়াকর্ষণের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। মনে হয় প্রকৃতির অন্তর-রহস্যে, মানব মন ও ঐশী-চেতনার সহিত উহার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে কবি এই রহস্যময়ীর দ্বারদেশে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত লইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সঙ্গে কবি, বিভিন্ন দৃশ্যে প্রকৃতির যে বহুমুখী স্বরূপের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে আরও দিশাহারা হইয়াছেন ও শেষ পর্যন্ত উহার মধ্যে এক অন্তহীন প্রহেলিকার স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন।

প্রকৃতির এই মায়াময়, বিভ্রান্তিকর রূপ 'মানসী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় এক দ্বৈতরহস্যানুভূতির তীব্র সংশয়াবেগ জাগাইয়াছে। এই কবিতাটি কবিমনের এক অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত অভিব্যক্তিরূপে বিশেষভাবে আলোচনা-যোগ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে এখানে রবীন্দ্রনাথের মানসী-উপলব্ধির একটি ভাবসঙ্কট ও কবির ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার একটি পাপবিদ্ধ, অনুতাপদীর্ণ স্বীকারোক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। কবিসাধক সুরদাস তাঁহার আশ্রয়দাত্রী ও হিতৈষিণী রাণীর দেবীসুলভ রূপের প্রতি কামনা-কলুষিত, ইন্দ্রিয়মোহবিকৃত

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার এই অধঃপতনের কারণস্বরূপ তিনি প্রকৃতির মদিরলালসাময় প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে বিশ্বভুবন হইতে নিঃসৃত এক ভুবনমোহিনী মায়া অসংযত যৌবনাবেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়কামনাকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। কবির 'কড়ি ও কোমল'-এ যে জরতপ্ত রূপতৃষ্ণা তাঁহার কতকগুলি সনেটে উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে ও যে যৌবনস্বপ্ন তাঁহার অনুভূতির আকাশ ছাইয়া ফেলিয়া সুন্দরীর ললিত দেহস্পর্শ ও উর্বশীর কটাক্ষময় অক্ষির বিভ্রম জাগাইয়াছে, তাহা সুরদাসের এই সংযমহীন সৌন্দর্যমুগ্ধতারই অনুরূপ ; কিন্তু উহা যে প্রকৃতির মোহিনীমায়া-প্রসূত এরূপ কোন ইঙ্গিত পূর্ব কাব্যগ্রন্থে নাই। যে কামনাকুহক তরুণ কবির সর্বত্রসঞ্চারী রূপলালসারই নারীদেহাভিমুখী গতিপ্রবণতার ফল, তাহা যে অকস্মাৎ প্রকৃতি-সৌন্দর্যের চিত্তবিভ্রমকর মায়াকর্ষণের প্রতি আরোপিত হইল তাহার কারণনির্ণয়ের উপাদান আমাদের নাই। রবীন্দ্ররচনাবলী-সংস্করণে 'কড়ি ও কোমল'-এর ভূমিকায় কবি যে নিজের আত্মবিস্মৃত যৌবন-প্রমত্ততার কথা বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার কাব্যে রক্তমাংসে ক্ষণিক আসক্তি ও 'সুরদাসের প্রার্থনা'র ভোগলুব্ধতার মধ্যে একটি রক্তিম পিচ্ছিল রেখা আঁকিয়া গিয়াছে। কবি যেন মুহূর্তের যৌবন-বিভ্রান্তিতে আর্টের নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ ভুলিয়াছেন। কবির মনে এই যুগে প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়াছিল, এই দেহরূপমুগ্ধতা তাহারই একটি আকস্মিক বিদ্যুৎচমক বলিয়া মনে হয়। ইহার পরে আর কখনও প্রকৃতির উপর কবির কণামাত্র অবিশ্বাস দেখা যায় না। যে মোহিনী বারেকের জন্য কবির সম্মুখে বিভ্রমবিলাসের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিল, তাহাই তাঁহার সমস্ত পরবর্তী রচনায় অধ্যাত্মভাব-পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরানুভূতির দিব্য ব্যঞ্জনারূপে এক কল্যাণময়ী মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছে।

সুরদাসের অনুতাপজর্জর অপরাধ-স্বীকৃতিতে কবির ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ও তাহার রাণীর প্রতি লালসা ও উহার কঠোর প্রায়শ্চিত্তে কবির মানসী-অন্বেষণের কোন ভূগর্ভপ্রোথিত অধ্যায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে —এইরূপ ব্যাখ্যা কোন সাম্প্রতিক সমালোচকের গ্রন্থে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাতে দুইটি আলোচনাসূত্র উত্থাপিত হয়। সুরদাসের সঙ্গে রাণীর সম্পর্ক কি রবীন্দ্রনাথের মানসী-অনুসন্ধানের সমপর্যায়ভুক্ত ? রাণী পুণ্যজ্যোতিঃ সতী কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন আদর্শ রমণীয়তার দিগ্‌ভ্রান্তি, কোন অপ্রাপণীয়

সৌন্দর্যসত্তার রহস্যদ্যুতি আবিষ্কার করা যায় না। বিদ্যাপতির সহিত রাণী লছিমার যে কলঙ্কিত প্রণয়ের প্রবাদ প্রচলিত, সুরদাসের সঙ্গে রাণীর সম্পর্ক তাহারই পুনরাবৃত্তি। সুতরাং সুরদাসের সমাজনিন্দিত, আত্মধিক্কৃত প্রণয়মুগ্ধতা অতি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার—অনন্তাভিসারকে প্রেমাকৃতিতে পরিণত করার প্রক্রিয়ার সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। সুরদাসের কাহিনীতে কবির জীবন-প্রক্ষেপ অনুমানের বিষয়, উহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তবে প্রকৃতি-সৌন্দর্যের বঞ্চনাময়তা ও মানসী-উপলব্ধির বিষয়ে উহার বিভ্রান্তিসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের আরও কোন কোন কবিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। সুরদাসের প্রণয়পাত্রী মানসসুন্দরীর মত অনধিগম্যা ছিলেন না; প্রকৃতি-সৌন্দর্য তাঁহার স্বরূপকে আবৃতও করে নাই। প্রকৃতিমায়া সুরদাসকে মোহগ্রস্ত ও বিপথগামী করিয়াছে, রাণীর প্রতি তাঁহার ভক্তিমনোভাবকে কলুষিত আকাঙ্ক্ষায় ক্লিন্ন করিয়াছে, কিন্তু রাণীর চারিদিকে কোন দুর্ভেদ্যতার অন্তরাল রচনা করে নাই। সুতরাং সুরদাসের সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথের সমস্যা এক নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির প্রতি সাময়িক অবিশ্বাস সুরদাসে আরোপিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে কবির খানিকটা সাদৃশ্যবোধ জাগাইয়াছে। কবির মানসীমূর্তিকল্পনার কোন এক স্তরে প্রকৃতি-সত্তা তাঁহার মনকে আদর্শ-অনুস্যূতি হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। তাই তিনি বিশ্ব-বিহীন বিজনে, প্রকৃতি-সীমা অতিক্রম করিয়া মানসীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই তাঁহার 'আশঙ্কা' কবিতায় তিনি সংশয়াকুল হইয়াছেন যে মানসীর জন্য রূপরসগন্ধস্পর্শের জগৎকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া তিনি দুই কূলই হারাইলেন কি না। সেই একই প্রেরণায় ইন্দ্রিয়-প্রতারিত সুরদাস চক্ষু উৎপাটন করিয়া সমস্ত রূপজগতের উপর শূন্যতার মসী-লেপন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মর্মমূলে আঁকা ছবি, হৃদয়ের অণু-পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট অনুরাগস্মৃতি ইন্দ্রিয়ের উৎসাদনে বিলুপ্ত হইবার নহে। প্রলোভন দূর হইল কিন্তু যাহা প্রলুব্ধ করিয়াছিল সেই দিব্য দ্যুতি অন্ধতার অন্ধকারে, বিশ্ববিহীন বিজনে মানসী মূর্তির ন্যায়, চির-উজ্জ্বল থাকিবে। কল্পনার সুনিয়ন্ত্রিত, সুডৌল ব্যাপ্তিতে, আবেগের নিবিড়তায়, ছন্দ ও ভাষার আশ্চর্য প্রকাশিকা শক্তিতে, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মহৎ ভাবের অনায়াসসিদ্ধ রূপায়ণে রবীন্দ্রকাব্যপ্রতিভা এক নূতন উত্তুঙ্গ মহিমায় আরোহণ করিয়াছে। সুরদাস ঠিক কবির প্রতীক নয়। কিন্তু মানসীযুগের কবিমানসের সমস্যার কিয়দংশ তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে।

'মানসী' কাব্যের একেবারে শেষ দিকে রচিত দুইটি কবিতা—'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' রবীন্দ্রপ্রতিভার একটি বিস্ময়কর বিকাশরূপে আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তিলে তিলে সঞ্চিত কল্পনানুভব, স্তরে স্তরে উচ্চগামী আবেগমূর্ছনা, পর্যায়ে পর্যায়ে পরিণতি-প্রাপ্ত মননশীলতা এই কবিতাদ্বয়ে একত্র মিলিত হইয়া এক নিবিড় ভাব-ও-রূপসংহতি ও পরিপূর্ণতৃপ্তিবিধায়ক রসাবেদন লাভ করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে উভয়ত্রই একটি অতীত কাব্যকাহিনী ও পুরাণকথা কবির কল্পনাকে প্রাচীনের আবরণভেদী নূতন অর্থগূঢ়তা ও রসনির্ঝর আবিষ্কারে প্রণোদিত করিয়াছে। মেঘদূত বহু যুগের রসিক পাঠকগোষ্ঠীকে লৌকিক বিরহের, বঞ্চিত প্রেমের মধুর স্মৃতিরোমন্থনের, অতৃপ্ত সৌন্দর্যকামনার স্বর্গলোক-কল্পনার শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেই মেঘদূত-আস্বাদনের মধ্যে এক সার্বভৌম তাৎপর্য, এক নিগূঢ়তর রসব্যঞ্জনা, আধুনিক যুগের এক নূতন অন্তর্ভেদী বাসনাকৃতি, বিরহের আদর্শলোকের এক সূক্ষ্মতর, রমণীয়তর ভাবকল্পনা আরোপ করিয়া উহার ভোগস্মৃতিমন্থর বস্তুবিন্যাসের মধ্যে শাশ্বত মানবাত্মার ঊর্ধ্বগামী অভীপ্সা সঞ্চারিত করিয়াছেন। মেঘদূতের বিরহানুভূতির মধ্যে তিনি এক প্রতিনিধিত্বমূলক মহিমা অনুভব করিয়াছেন, বিশ্বের সর্বকালের বিরহীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্রুধারা, ব্যক্তির হৃদয়কন্দর হইতে নিঃশ্বসিত বাষ্পবেদনা যেন এই মহাকোষকাব্যে এক বিরাট, নিখিলমানস-পরিব্যাপ্ত বিষাদে সমন্বিত হইয়াছে। আর কালিদাসের কালের পর জাত প্রতি বিরহী নিজ নিজ মনোবেদনা, প্রতি বর্ষাঋতু উহার পরিবেশ-গাম্ভীর্য, রাজকররূপে এই বিরহব্যথার রাজকোষাগারে সঞ্চিত করিয়া উহাকে ক্রমপ্রসারশীল আবেদনে অধ্যাত্মব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলিয়াছে।

তাহার পর আধুনিক কবির কল্পনা দৌত্যকার্যে নিয়োজিত মেঘের সঙ্গে উধাও হইয়া প্রাচীন কবির জীবনযাত্রা ও প্রকৃতি-পরিবেশকে আশ্চর্য সাংকেতিকতায় নবব্যঞ্জনায় উদ্দীপ্ত করিয়াছে। কালিদাসের দীর্ঘ, ত্বরাহীন বর্ণনায় যাহা বর্ণময় চিত্রসৌন্দর্যরূপে মনকে রূপস্বপ্নাতুর করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত, অর্থগূঢ়, বিদ্যুৎচমকের ন্যায় সঙ্কেতভাস্বর খণ্ড-আভাসগুলি সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মনকে উচ্চকিত, উৎসুক ও ঈষদ্দৃষ্ট সৌন্দর্যসূত্রের অনুসরণে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকসমূহের ক্ষীণস্পন্দিত হ্রদবক্ষকে চিরিয়া যেন একদল পার্বত্য নির্ঝরিণী

নৃত্যচঞ্চল, উল্লাসমুখর কিঙ্কিণী বাজাইয়া আমাদিগকে নব দিগন্তের সন্ধান দিয়া ছুটিয়া গিয়াছে। সব কয়েকটির সুষ্ঠু উল্লেখ ও সার্থক ধ্বনিদ্যোতনা যেন আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এক অপূর্ব রূপলোকের চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

সর্বশেষে কাব্যের ফলনিষ্পত্তি বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কবির কাব্যে নূতন ভাষ্য যোজনা করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে সমাপ্তি আসিয়াছে অলকার অলৌকিক সৌন্দর্যপরিবেশে, বিরহিণী যক্ষপত্নীর ব্যথাতুর, প্রসাধনে উদাসীন অন্যমনস্কতার বর্ণনায়। যক্ষের উৎকণ্ঠা ও যক্ষপ্রিয়ার নীরব, প্রকাশকুণ্ঠ উদাস-উন্মনা দুঃখমগ্নতা যেন উভয় দিকের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া একটি পরিপূর্ণ বিরহচিত্রকে রং-এ, রেখায়, ভাবব্যঞ্জনায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আধুনিক কবি শুধু ভাবসামঞ্জস্যে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি চাহেন অসীমাভিমুখী ভাবপ্রসারণ। তাই কালিদাসের উপসংহার রবীন্দ্রনাথকে এক নব যাত্রার ইঙ্গিত দিয়াছে। যক্ষের যে বিরহ কর্তব্যচ্যুতির অপরাধের অভিশাপপ্রসূত, যাহা বাহির হইতে আরোপিত শাস্তি, তাহা রবীন্দ্রনাথে আদর্শকামী প্রেমিকের অন্তর্নিহিত অতৃপ্তি, চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে, কামনা ও তাহার সিদ্ধির মধ্যে প্রকৃতিসিদ্ধ মর্মান্তিক ব্যবধান। কালিদাসের কাব্যমন্ত্রে এই ব্যবধান মুহূর্তের জন্য লুপ্ত হইয়াছে, প্রেমিক তাহার বিরহের আদর্শলোকের দ্বার ক্ষণতরে উন্মুক্ত পাইয়াছে, কল্পজগৎবাসিনী চিরন্তর বিরহিণীর পলকের জন্য সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই মন্ত্রের প্রভাব চিরস্থায়ী হয় নাই। কবি আবার নিজ ব্যক্তিজগতে, নিজ ঘনবর্ষাক্ষুব্ধ বাস্তব পরিবেশে, নিজ ব্যর্থ প্রেমকল্পনার অপ্রশমিত বেদনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ও স্বীকার করিয়াছেন যে কোন মানব প্রেমিকের সেই বিরহকল্পলোক অলকায় পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবভারপীড়িত, অলভ্য আদর্শসন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত আধুনিক কবি তাঁহার পূর্ববর্তী কবির কাব্যের মর্মকথা এই নূতন আলোকেই অনুভব ও নূতন এক মহত্তর বেদনায় স্পন্দিত করিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠ কবিতায় কবিকল্পনা যেমন এক অননুভূতপূর্ব ভাবগাম্ভীর্যের উপযোগী বাহন হইয়াছে, তেমনি নূতন ভাবানুসন্ধানের কুশলতায়, অতীত যুগের অন্তর-লোকে অনুপ্রবেশশক্তিতে ও ফলনিষ্পত্তির ব্যাপকতর ও গভীরতর উপলব্ধিতে, প্রাচীন কালের এক সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ কাব্যের মূল সুর অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহাকে অনুষঙ্গী ভাবের সুষ্ঠু যোজনায় এক জটিলতর, সূক্ষ্মতর সুরসঙ্গতিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এক মহাকবির শিরা-উপশিরায় আর এক মহাকবির রক্তসঞ্চার ঘটিলে যে নূতন সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত'-এ সেই নব কাব্যসত্তার জন্ম হইয়াছে।

'অহল্যার প্রতি' কবিতার প্রেরণা আসিয়াছে কবির দৃঢ়সংস্কারগত বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্মবোধ হইতে। ইহা যে কবির কেবলমাত্র কল্পনাবিলাস বা জড়বিজ্ঞানের তত্ত্বস্বীকৃতি নয়, পরন্তু সহজসংস্কারলব্ধ মূলীভূত জীবনপ্রত্যয় তাহা তাঁহার 'ছিন্নপত্রে' বার বার উচ্চারিত অনুভববিবরণ হইতে সুস্পষ্ট হয়। কবি অপূর্ব নির্মাণক্ষমতার সাহায্যে তাঁহার এই সত্যোপলব্ধির আশ্রয় পাইয়াছেন অহল্যার সুপরিচিত পুরাণ-কাহিনীতে। পুরাণে অহল্যার যে কলঙ্ককালিমালিপ্ত জীবনেতিহাস, স্বামীর অভিশাপে তাহার পাষাণ-পরিণতির যে কাহিনী পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য কবিদৃষ্টির দ্বারা তাহার দিব্য রূপান্তর সাধন করিয়াছেন। এ অহল্যা কামাতুরা, রূপবিভ্রান্তা অসতী পত্নী নহে, পৃথিবীর বিচিত্র প্রাণপ্রবাহ, জীবধাত্রীর মাতৃস্নেহকম্পিত হৃৎস্পন্দনের সহিত একাত্মীভূতা, অতিমানব চেতনার সূক্ষ্ম অনুভূতিময়ী শক্তি। এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ধরিত্রীর অঙ্গীভূতা থাকিয়া সে নিখিলের জীবনরহস্য, মৃত্যুর ক্ষয়ক্ষতিপূরয়িত্রী বসুন্ধরার গোপন প্রাণভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছে। ধরণী যে স্নিগ্ধ স্পর্শে জীবনের তাপ-জ্বালা জুড়াইয়া দেয়, তাহাই অহল্যার পাপমোচন করিয়া তাহাকে নিষ্কলুষ কুমারীত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ইহার পর কবি তত্ত্ব ছাড়িয়া সৌন্দর্যকল্পনায় বিভোর হইয়াছেন। অহল্যার জড় ও মানব জীবন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে পরস্পর বিলীন হইতেছে তাহা তিনি অপরূপ সৌকুমার্যের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। পাষাণে পতিত শিশির-বিন্দু মানবীতে সদ্যোরূপান্তরিতা নারীর অলকে জ্বলিতেছে; প্রস্তরের আস্তরণ শ্যাম শৈবালপুঞ্জ রমণীর নগ্ন দেহে বসনের মত বিন্যস্ত হইয়াছে। পাষাণে যাহা উদাসীন প্রক্ষেপ ছিল, নারীতে তাহা অপরূপ রূপপ্রসাধনে শিল্পসৌষ্ঠবের কমনীয়তা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই রূপান্তর শুধু দেহে নয়, মনেও সংক্রামিত হইয়াছে। পরিচিত জগৎসংসার জড়বস্তু হইতে নবজাতা এই তরুণীর দিকে নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। প্রাণচেতনায় নব-প্রতিষ্ঠিতা এই মানবীরও বিস্মৃতি টুটিয়া গিয়া পূর্বস্মৃতি উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। অহল্যার চেতনায় শৈশব ও যৌবনের, কুঁড়ির ও সদ্যোপ্রস্ফুটিত ফুলের এক অপূর্ব মাখামাখি। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি এখানে এক সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে পুনরাবৃত্ত হইল; এই নবোন্মেষিত অনুভবমুগ্ধতা ব্যক্তি-জীবনের কৈশোর হইতে বিশ্বজীবনের এক অভাবনীয় পটপরিবর্তনে সন্নিবেশিত হইল। দ্বিবিধ রহস্য পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া চিরপরিচয়ের মধ্যে নব-

পরিচয়ের অরুণোদয় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। মহাকবির কল্পনার কি অপূর্ব বিকাশ ও পরিণতি!

অহল্যার সঙ্গে উর্বশীর ভাবসাদৃশ্যের মধ্যে ব্যঞ্জনার পার্থক্য লক্ষণীয়। উর্বশীর ন্যায় অহল্যাও সমুদ্রোত্থিতা, তবে এ সমুদ্র বিস্মৃতির রূপক-সমুদ্র। অহল্যাও উর্বশীর ন্যায় উষার মত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তবে এ উদয় ধীর, অনবগুণ্ঠিত নহে। এ উষা প্রথম উষা, ধরিত্রীগর্ভ হইতে মানবচেতনার প্রথম অভ্যুদয়। উর্বশীর উদয় প্রথম উষায় নহে, মানবজন্মের যে স্তরে তাহার মনে রূপমুগ্ধতার প্রথম উন্মেষ ঘটিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পরিণত যুগে। উর্বশীর এক হাতে অমৃতকলস, অপর হাতে বিষভাণ্ড; অহল্যার মন তাহার আবির্ভাবমুহূর্তে পাপ-পুণ্যবোধের সমুদয় জটিল রেখাজাল হইতে মুক্ত—শুভ্র, নির্মল, মানবঅভিজ্ঞতার সমস্ত সংস্পর্শহীন, অদৃষ্টলিপির ক্ষীণতম মসী-লেপনে অস্পৃষ্ট।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পরিণতিপর্ব—দ্বিতীয় স্তর

সোনার তরী ১৮৯৩-৯৪ (১৩০০)

চিত্রা ১৮৯৫-৯৬ (১৩০২)

১

'মানসী'র রচনাশেষ ও 'সোনার তরী'র রচনারম্ভের মধ্যে প্রায় দেড় বৎসরের ব্যবধান। এই অন্তর্বর্তী সময়ে কবি পিতার আদেশে শিলাইদহ জমিদারীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়া পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনের এক সমন্বিত রূপের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ১৮৯১ মে-তে তাঁহার ছোট গল্পের আরম্ভ। এই গল্পগুলির মধ্যে পদ্মার তটভূমির সবুজ সমারোহচিহ্নিত প্রকৃতি-পরিবেশে সাধারণ পল্লী-মানবের জীবনযাত্রাপ্রবাহ, উহার স্বল্প পরিধির মধ্যে হৃদয়াবেগের গভীর উৎসার ও জীবনরহস্যের অপরূপ উদ্‌ঘাটনে কবির মানবমুখীনতার প্রথম পরিচয় মিলে। একদিকে সৃষ্টির অবিরল ধারা, অন্যদিকে 'ছিন্নপত্র'-এ—তাঁহার অন্তর-প্রেরণার আশ্চর্য পরিচিতি, পদ্মার তট ও স্রোতোপ্রবাহের ন্যায়, পরস্পর সম্পৃক্ত-রূপে আত্মিক মিলনে যুক্ত। সুখদুঃখময় মানবজীবনের সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক-স্থাপনে আগ্রহ কবির রহস্যময়ী বিশ্বসৌন্দর্যসারাত্মিকা মানসী প্রতিমার প্রতি রূপমুগ্ধতার পরিপূরকরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। মানসীর রূপকল্পনায় প্রকৃতি-সৌন্দর্য ও কবিমনের অতৃপ্ত কামনা ও আদর্শসন্ধানের আকৃতিই মুখ্য, মানবিক সত্তা এখানে গৌণ ও মন্ময় অনুভূতিরই পরোক্ষ নির্মিতি। ছোট গল্পে মানবজীবন প্রকৃতিসৌন্দর্যের স্পর্শে ও আদর্শ ভাবকল্পনায় অনুরঞ্জিত হইলেও মুখ্যত: স্বাধীন সত্তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও তাঁহার মনে জীবনাগ্রহ ও কল্পলোকভ্রমণের মধ্যে একটি দ্বৈত সংঘাতের উল্লেখ করিয়াছেন, তথাপি নিরপেক্ষ আলোচনায় এই দ্বন্দ্ব মূলত: একই মানসপ্রবণতার দুই প্রকার মেজাজের ন্যায় প্রতিভাত হয়। প্রকৃতি ও মানবের, আদর্শ ও বাস্তবের মূলগত অভিন্নতায় বিশ্বাসী কবিচিত্ত সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে কখনও কল্পনাকে পরিহার করিয়া মানুষের দিকে ঝুঁকিয়াছে, আবার পর-মুহূর্তেই অন্তরগভীরশায়ী রূপস্বপ্নের ধ্যানে আত্মনিমগ্ন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের কবি নিশ্চয়ই,

কিন্তু দুই একটি কবিতায় ক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আবিষ্ট হওয়া ছাড়া, বা দুই একটি যান্ত্রিকজীবনভিত্তিক, রূপকধর্মী নাটক ছাড়া, অন্যত্র তিনি মানবজীবনসংগ্রামের রক্তস্রাবী কঠোরতা বা আধুনিক জীবনযন্ত্রণার দুরারোগ্যতার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না।

আমরা সাধারণতঃ যে সমস্ত কবিতাকে তাঁহার জীবনমুখীনতার নিদর্শনরূপে উপস্থাপিত করি, সেগুলি জীবনের করুণ-কোমল দিক, বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবনাদর্শ-স্বীকরণ ও উহার সহিত আবেগকল্পনাময় একাত্মতাবোধ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত মাত্র। এই সমস্ত রচনায় কবি মানুষের বাস্তব পরিচয়ে ততটা আগ্রহী নহেন, যতটা তাহার কবিত্বময় সম্ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট। এগুলিতে ঠিক জীবন নাই, আছে জীবনের নিগূঢ়সৌন্দর্যাভিষিক্ত কল্পনা। মাঝে মধ্যে কবির মনে তাঁহার কল্পলোকবিহারের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিয়াছে ও তিনি উচ্চকণ্ঠে মানবজীবনাশ্রয়ী কবি হইবার বাসনা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই জীবনে ফিরিয়া আসাও কিছু পরেই কল্পনানিষিক্ত হইয়া এক নূতন ভাবলোকের অভিমুখী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের একই কবি-অনুভূতি কখনও বাস্তবাশ্রয়ী হইতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু নিরুদ্দেশ-যাত্রার রহস্যদ্যুতি কোন না কোনরূপ বর্ণচ্ছটায় তাঁহার জীবনসংলগ্নতাকেও কল্পনাধর্মী করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের প্রতি ভালবাসা, মানবমহিমার উপলব্ধি, শোষণপীড়িত নিম্নস্তরের মানুষের দয়ার্দ্র, ন্যায়নীতিনিষ্ঠ পক্ষসমর্থন সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিরই একটি সহজ মানস প্রবণতা এবং রবীন্দ্রনাথেও তাহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ জীবননিষ্ঠ কবি বলিতে যাহা বুঝি রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে জীবননিষ্ঠ কবি নহেন।

তথাপি 'মানসী'র সহিত তুলনায় 'সোনার তরী' যে জীবন-কৌতূহল বিষয়ে অধিক অগ্রসর তাহা অনস্বীকার্য। অন্ততঃ কবি-মনে জীবনের তাত্ত্বিক স্বীকৃতি ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। উন্নতির একটা লক্ষণ—'মানসীর' যে ব্যঙ্গ-কবিতাগুচ্ছ কাব্যের বাতাবরণের মধ্যে একটা বিসদৃশ উপাদান সংযোজনা করিয়াছিল, 'সোনার-তরী'তে সেই ব্যঙ্গপ্রবণতা ও ব্যক্তিগত অভিমান একমাত্র 'হিংটিংছট্'-এ কিঞ্চিৎ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এই কবিতাটিতেও অপেক্ষাকৃত অধিক অন্তঃসঙ্গতি ও কাব্যের প্রারম্ভে স্থিত রূপককবিতাগুচ্ছের সহিত ভাবগত ঐক্য আছে। 'মানসীর' ব্যঙ্গকবিতাগুলিতে কবিচিত্ত যেমন স্পষ্টভাবে দ্বিধা-বিভক্ত, উহাদের মধ্যে গভীর ও লঘু মনোভাবের যেমন অস্বস্তিকর সহাবস্থান লক্ষিত হয়, 'হিংটিংছট'—তাহাদের তুলনায় ভাববৈপরীত্য ও

মানস লক্ষ্যহীনতা হইতে মুক্ত। নব্যহিন্দুধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপকব্যাখ্যা-প্রবণতা ও বাস্তববিমুখতাই ইহার আক্রমণের বিষয় কিন্তু রূপকথাধর্মী অবাস্তব আখ্যানের মধ্য দিয়া এই আক্রমণশীলতা মৃদু, কৌতুকময় ও সরস হইয়া উঠিয়াছে।

রূপকের ঘাটের সোপানে দাঁড়াইয়াই কবি, যে সোনার তরী তাঁহার দিব্য সম্পদের সঞ্চয়কে অজানা ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে ও তাঁহার ব্যক্তিসত্তাকে নিঃসঙ্গ তীরে অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় ফেলিয়া রাখিয়াছে, তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকারে ধন্য হইয়াছেন। এই তরী উহার হিরণ্য-দ্যুতিতে কবির কাব্যসার্থকতার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির ও উহার অবিরাম চলিষ্ণুতায় কবি-মনের দূরাভিসারের দ্যোতনায় নিগূঢ়-অর্থবহ। এই ছোট নাম-কবিতাটির মর্মোদ্‌ঘাটনে কবির সমালোচকগোষ্ঠী ও কবি স্বয়ং বিব্রত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় কবিকৃতি ও কবিসত্তার চিরস্মরণীয় হইবার দাবী যে এক পর্যায়ের নয় এই অর্ধসত্যকেই কবিতার মর্মবাণীরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহা যেন অনেকটা Keats-এর Nightingale কবিতায় পাখীর অমরত্ব ও মানুষের মরণশীলতার মধ্যে পার্থক্য-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসের ন্যায় অযৌক্তিক মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা জীবনদেবতা-পরিকল্পনার প্রথমআভাসযুক্ত বলিয়া কবির কাব্যজীবনে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। যিনি তরীর নাবিক তিনি মহাকালের ন্যায় নির্মম ও উদাসীন; কবির সঙ্গে তাঁহার ভাবমুগ্ধ প্রণয়সম্পর্কের কোন চিহ্নই এখানে নাই। কেবল এই নৌকাচালক গান করে ও কবির চেনা-চেনা মনে হয় বলিয়া উহাকে কবির কাব্যজীবনের নিয়ামকরূপে মর্যাদার আসন দেওয়া হইয়াছে। দেখা যাইতেছে তিনি যাহাই হউন না কেন, কবির কাব্যসম্বন্ধে আগ্রহশীল, কিন্তু কবি সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ। কবি যে মানসী প্রেয়সীকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া খুঁজিতেছেন এই কাব্যজীবননিয়ামকরূপে ভাবহীন ঔদাসীন্যে তাহার কোন ছায়াপাত হয় নাই। এই দুই অলৌকিক সত্তা কবির জীবনের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াও একাত্ম হইয়া যায় নাই। 'মানসসুন্দরী'তে প্রথম কাব্যলক্ষ্মী ও অন্তরলক্ষ্মীর একাত্ম মিলন ঘটিয়া কবি-মানসের দুইটি দিকের অভিন্নতা সম্পাদিত হইয়াছে। মহাকালের দৃষ্টিতে কবি ও তাঁহার কাব্য এখনও একই দিব্য প্রভাবের বন্ধনে একীভূত হয় নাই; সাধারণ সত্যহিসাবে নয়, কবির নিজস্ব জীবনবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া, যে আধারে কবিকল্পনার পরিপক্ব ফল স্থান পাইয়াছে, সেখানে কবির স্থূল, কামনা-বাসনা-

ক্ষুধা-মোহ জড়িত, ঘটনা-তরঙ্গে আবর্তিত জৈব সত্তার স্থান হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে তাঁহার গান ভগবানের চরণস্পর্শ করে, কিন্তু তিনি পারেন না, এখানে যেন তাহারই সদৃশ অবস্থাসঙ্কটের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সোনার তরী কেবল কবি-আত্মার ছন্দোময় প্রকাশ, উহার সূক্ষ্ম ভাববিগ্রহ ও রূপচ্ছটা বহন করিতে পারে, বস্তুউপাদানগঠিত স্থূল জীবনের ভার উহার পক্ষে অত্যধিক।

কবিতাটিতে রূপকবিন্যাসের নিপুণতা অসাধারণ পদ্মাতীরস্থ বর্ষাপ্লাবিত শস্যক্ষেত্রে ধান কাটা ও কর্তিত ধান্য নিরাপদে বহন করার জন্য চাষীর যে উৎকণ্ঠা, সেই নদীমাতৃক বাংলা দেশের সুপরিচিত দৃশ্যই ইহার ভাবপরিমণ্ডল-রচনায় নিয়োজিত হইয়াছে। এই সুপরিচিত বাস্তব দৃশ্যই কবির অপূর্ব রূপকদ্যোতনায় মায়ারহস্যনিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার আচ্ছন্নতা, থাকিয়া থাকিয়া মেঘগর্জন, নিঃসঙ্গতীরে নিরাশ চাষীর নৌকার জন্য প্রতীক্ষা, ভরা নদীর ক্ষুরধার স্পর্শে মুহূর্তেই নদীগর্ভে বিলীন হইবার আশঙ্কা, এক ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া বাঁকা জলের লোলুপ গ্রাসোন্মুখতা, পরপারে তরুচ্ছায়ায় ঘনীভূত মেঘান্ধকারে লুপ্তপ্রায় গ্রামের অস্পষ্ট ছবি—এই সমস্ত মিলিয়া চাষীর আবাল্য-পরিচিত জগতের উপর এক অজ্ঞাতসম্ভাবনাকণ্টকিত, অন্তর্লোক হইতে বিচ্ছুরিত যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। অকস্মাৎ এই যবনিকা ছিন্ন করিয়া একটি তরী নদী অতিক্রম করিতেছে দেখা গেল। উহার নাবিক পরিচয়-অপরিচয়ের সীমায় অবস্থিত থাকিয়া প্রাণে আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব জাগাইতেছে; তাহার মুখভাব নিয়তির ন্যায় নির্বিকার, সে কোন দিকে না তাকাইয়া দুর্বল মানুষের ন্যায় নিরুপায় ঢেউগুলিকে দলিত-মথিত করিয়া তাহার বিজয়াভিযানে অগ্রসর হইতেছে। কেবল তাহার গানই কবির সঙ্গে তাহার দূর আত্মীয়তার বার্তা ঘোষণা করিতেছে। সেই আশ্বাসেই কবি তাহাকে পরিচিত বলিয়া দাবী করিতেছেন। কবি তাহাকে সঙ্কুচিত আমন্ত্রণ জানাইতেছেন শুধু তাঁহার ক্লেশাহরিত শস্যসম্পদকে আশ্রয় দিতে; নিজের সম্বন্ধে তাঁহার কোন দাবী নাই। কিন্তু সোনার ধান যখন তরীতে সঞ্চিত হইল, কবির কাব্যকৃতি অমরতার অধিকারী হইল, তখন কবি তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া তাঁহার ব্যক্তিসত্তার জন্যই তরণীতে একটু স্থান চাহিলেন। নির্মম মহাকাল সে অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। কবি তাঁহার সারা জীবনের সম্পদ মহাকালের হাতে সমর্পণ করিয়া নিজে নিঃসঙ্গ নদীতীরে, ঘনায়মান

মেঘান্ধকার আকাশের নীচে, অপরিসীম রিক্ততার বেদনায় পরিত্যক্ত হইলেন। তাঁহার মর্মছেঁড়া ধন গেল, তিনি নিজ রক্তাক্ত হৃদয় লইয়া পড়িয়া রহিলেন। কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে এক মর্মান্তিক বিচ্ছেদ কবিহৃদয়কে এক গভীর বিষাদ ও অসীম শূন্যতাবোধে আচ্ছন্ন করিল। এখানে কবিজীবনের একটা সমস্যা রবীন্দ্রচিত্তকে সাময়িকভাবে অভিভূত করিয়াছে।

কবির আদর্শসন্ধানমগ্ন মন কয়েকটি রূপকচমকময় রূপকথাকাহিনীর ছদ্মাবরণে তাঁহার অনুসন্ধান-তীব্রতাকে এক অবাস্তব কল্পনাবিলাসের রূপ দিতে চাহিলেন। দীর্ঘ-অনুসরণ-ক্লান্ত চিত্ত নিজ গভীরতম অভীপ্সা সম্বন্ধে নিজেকে এই ভাবেই ভুলায়। মর্মের ক্রন্দন কৈশোর কল্পনার লঘুতায় আপন বেদনাকে প্রোথিত করে। কিন্তু এই বিস্মৃতি-ভস্মের আড়াল হইতে অনুভূতির আগুন আবার দ্বিগুণ দীপ্তি ও দাহের সহিত জ্বলিয়া উঠে।

এই রূপকাবরণের মধ্য দিয়া কবি 'পরশ পাথর', 'দুই পাখী', 'আকাশের চাঁদ', 'অনাদৃত', 'দেউল', 'কণ্টকের কথা' প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার জীবন-বিবিক্ত আদর্শ-কল্পনা সম্বন্ধে কিছু সংশয় ও বাস্তবানুস্মৃতির প্রতি আকর্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রূপকের তির্যক পথে যে বাস্তব জীবনকে খোঁজা যায়, তাহা কল্পনার সঙ্গে আপোস-মানা বাস্তব। ইহার আকর্ষণ দূর হইতে দেখা নদীর অপর পারে তরুচ্ছায়াঘেরা গ্রামের অস্পষ্ট ছবির ন্যায়—উহার অর্ধোপলব্ধ, অর্ধভাস্বর সাঙ্কেতিকতায় নিহিত। কোন কোন কবিতায় কবি-মন কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত; কবি উভয়কেই সমান আবেগের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহেন। সর্বত্রই কবির বাস্তবপ্রীতি দীর্ঘনিঃশ্বাসক্ষুব্ধ, মনের গোধুলিলগ্নের অস্পষ্টরেখাঙ্কিত ও ছায়ানিবিড়। রূপক আদর্শকল্পনারই প্রতীক, বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য উহারই মায়াস্পৃষ্ট প্রয়োগ। রূপকের বহু-বিসর্পিত বনবীথির ফাঁক দিয়া বাস্তবজীবনের যতটুকু দেখা যায়, তাহা ঠিক বস্তু নয়, অনুভূতির দ্বারা রূপান্তরিত বস্তুনির্যাস। 'পরশ-পাথর'-এ কবি আদর্শ সন্ধানকে ব্যঙ্গ করেন নাই, করিয়াছেন খ্যাপার দীর্ঘঅন্বেষণক্লান্ত, অসাড়, অভ্যাসান্ধ মনোভাবকে। আদর্শরত্নসন্ধানের সঙ্গে অন্যমনস্কতার বিসদৃশ সংযোগই তাঁহার অনুযোগের বিষয়। এই কবিতাগুলিতে বাস্তব জীবনের তত্ত্ব-উপলব্ধির দিকটাই কবিচিত্তে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; বস্তুরস-উপভোগের কোন আগ্রহ এখানে অনুপস্থিত।

'বিশ্বনৃত্য' (২৬শে ফাল্গুন, ১২৯৯) কবিতাটি কবির জীবনানুরাগের নব অনুভূতির প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই জীবন নিখিলবিশ্বের

প্রাণপ্রবাহের একটি অংশমাত্র। এই বিশ্বজীবনের ছন্দ নিরূপিত হইতেছে বিশ্বদেবতার করধৃত বীণার সুরঝংকারের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া। এখানে মানবজীবনের যে নব জাগরণ কল্পিত হইয়াছে তাহা কবির আদর্শ কল্পনা, সমগ্র নিখিল-প্রসারিত আনন্দ-চেতনার একটি গৌণ তরঙ্গরূপে। মানুষ এখানে গ্রহ-তারকার, ঋতুচক্রের, অরণ্য-সিন্ধু-নির্ঝরের উল্লাস-নৃত্যের অনুগামীমাত্র হইয়াছে। আর এই বিশ্বচেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া মানুষের যে পরিবর্তন হইবে তাহা অলৌকিক ও ঐন্দ্রজালিক, বাস্তব জীবনের বাধা, ইতিহাসের মন্থর বিবর্তন, অন্তরে ভাল-মন্দের সংগ্রাম প্রভৃতি মানবিক সঙ্কটের সহিত সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক। কবির এই কল্পনা তাঁহার নিজ মানস আবেগ, নিখিলবিশ্বের আনন্দময় গতিচ্ছন্দের সহিত তাঁহার আত্মিক যোগ হইতে সমগ্র মানবসমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। মানুষের সম্বন্ধে তাঁহার একমাত্র সন্দেহ এই বিশ্বব্যাপিনী রাগিণী এই অন্তর হইতে উৎসারিত সুর সকলের অনুভূতিগম্য হয় না। এই আনন্দসাগর হইতে বান আসিয়া মানুষের নিরানন্দ জড়তা, সঙ্কীর্ণ, অনুদার ভাবের মধ্যে বন্দিত্বকে ভাসাইয়া দিয়া এক মহাসঙ্গমের মিলনতীর্থে মানুষকে উপনীত করিবে। ইহা হইতে এইটুকুই প্রমাণ হয় যে কবি বিশ্বচেতনার অংশরূপে মানুষকে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন; মানুষও নভোবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও প্রাণোচ্ছল প্রকৃতির নানা দৃশ্যের সহিত কবির অন্তরের এক পাশে স্থান পাইয়াছে। ইহাকে কবির নবজাগ্রত মানব-সচেতনতার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যায় কি না তাহা সন্দেহ।

'বৈষ্ণব কবিতা' (১৮ই আষাঢ়, ১২৯৯), 'প্রতীক্ষা' (১৭ই কার্তিক, ১২৯৯), 'ঝুলন' (১৫ই চৈত্র, ১২৯৯), 'পুরস্কার' (১৩ই শ্রাবণ, ১৩০০)—এই কবিতা কয়টিতে কবির মানবাভিমুখিতার অগ্রগতি পরিস্ফুট হইয়াছে। অবশ্য এখানেও কবি মানবজীবনের তত্ত্বকথাটিই কখনও অপূর্ব আবেগকল্পনায়, কখনও কবিধর্মাশ্রিত মননক্রিয়ায় উপস্থাপিত করিয়াছেন। জীবনের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক এখানেও পরোক্ষ, তাঁহার অন্তরের ভাবাদর্শপ্রভাবিত। বৈষ্ণব কবিতা-য় রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহিত্যের বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম প্রেরণার পিছনে উহার জীবনাশ্রয়ী মানবিক আবেদনটি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও উহার রসাস্বাদনে এক সম্পর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তিত করিয়াছেন। যে অনুভূতিটি ভক্তিপ্রেরণার সর্বগ্রাসী প্রভাবে বৈষ্ণব কবির অবচেতন মনে আত্মগোপন করিয়াছিল, ক্ষীয়মাণ দেবাচ্ছন্নতার যুগে রবীন্দ্রনাথ সেই গোপন মূলটি আমাদের চেতনান্তরে উদ্ধার

করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিতার আদর্শ প্রেমের প্রয়োজন দেবতার থাক বা না থাক, অতৃপ্তপ্রেমপিপাসাক্লিষ্ট মানুষের তাহার ঢের বেশী প্রয়োজন আছে। কাজেই দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিত প্রেমার্ঘ্য মানুষ যদি দস্যুবৃত্তি করিয়া নিজের গৃহে লইয়া আসে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মার্জনীয়। মানবিক আবেগ দেবপূজার অঙ্গনে সঙ্কুচিত অনধিকার-প্রবেশ করিয়া এক সময়ে এক পরম অনুভূতির শিখায় জলিয়া উঠিয়াছে—'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'। এই স্মরণীয় উক্তিতে দেবতার মানবীকরণ ও মানবের দেবত্বে উন্নয়ন যুগপৎ সাধিত হইয়াছে। ইহাতে মানবের বাস্তব পরিচয় হয়ত বাড়িল না, কিন্তু মানুষের ললাটে দেবত্বের জ্যোতিস্তিলক ভাস্বর হইয়া অঙ্কিত হইল।

'প্রতীক্ষা'য় কবির বহুদিন হইতে মৃত্যু-আবিষ্ট চিত্ত এক নূতন, কবিজনোচিত কল্পনার আলোকে এই চিরন্তন প্রহেলিকাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। মৃত্যু-চিন্তা অতর্কিত মৃত্যুর নিদারুণ আঘাত তরুণ কবির চিত্তকে যে অনির্দেশ্য বিষাদবাষ্পরাশি ও প্রাকৃত মনের করুণ কাকলীতে পূর্ণ করিয়াছিল, তাহা প্রৌঢ়ের উপনীত কবির অনুভূতিতে এক দিব্য শিখায় প্রজ্বলিত হইল। তিনি মৃত্যুকে বর ও কবির জীবাত্মাকে বধূরূপে অনুভব করিয়া উভয়ের মধ্যে এক শঙ্কাভীতিজড়িত নিবিড় দাম্পত্য সম্পর্কের কল্পনা করিয়াছেন। মৃত্যু অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত কবির সুখদুঃখপূর্ণ বিচিত্রপ্রকৃতিসৌন্দর্যের আস্বাদনে মুগ্ধ বক্ষোপঞ্জরের মাঝে আসন গ্রহণ করিয়া বিবাহের লগ্নের প্রতীক্ষা করিতেছে। জীবন ও মৃত্যুর অনুভূতি-স্তরের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, জীবনের সদা-চঞ্চল ভোগস্পৃহার সহিত মৃত্যুর মৌন, নিশ্চল প্রেম-নিবেদন, মৃত্যুর বক্ষে আলিঙ্গনবদ্ধ অবস্থায় জীবনের মহাপ্রয়াণ, ও যে পর্যন্ত জীবনের পার্থিব সুখ-আস্বাদন সম্পূর্ণ না হয় সে পর্যন্ত মৃত্যুকে বিরত থাকার মিনতি—এ সবই শ্রেষ্ঠ কবির উদার-প্রসারিত কল্পনা, ভাষার অর্থ ও ধ্বনি-গাম্ভীর্য ও ছন্দের ভাবানুসারী নিপুণ বিন্যাসের সাহায্যে পাঠকের অন্তরে গাঢ়-মুদ্রিত হইয়াছে। মহাকবির স্বচ্ছন্দসঞ্চার পদক্ষেপ কবিতাটির ছত্রে-ছত্রে ও উহার অনুভবস্পন্দিত চিত্রকল্পে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে।

'ঝুলন' 'বিশ্বনৃত্যে'র সহিত তুলনায় জীবনের দুরন্ত আবেগে আরও গভীর-ভাবে আলোড়িত। 'প্রতীক্ষা'য় মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে আরোপিত বরবধূ-সম্পর্ক এখানে কবির বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর 'আমি'র মধ্যে সম্প্রসারিত। এখানে বিশ্বজীবন ও মানবজীবনের অতিপ্রসার সঙ্কুচিত হইয়া কবির

ব্যক্তিসত্তার দুই বিরুদ্ধ আকৃতির দ্বন্দ্বক্ষেত্রে সীমিত হইয়াছে। এই স্বল্প পরিসরে কবির আবেগমথিত অন্তর-আলোড়ন সমুদ্রঝটিকার দুর্নিবার বেগমত্ততায় যেন ফাটিয়া পড়িয়াছে। এখানে জীবনের তত্ত্ব আছে, কিন্তু তত্ত্বমন্থরতাকে ছাড়াইয়া জীবনসংবেগ কলরোল তুলিয়াছে। সমস্ত অলস কল্পনাবিলাস, সৌন্দর্য-স্বপ্নাবেশ, প্রাণচেতনার স্তিমিত আচ্ছন্নতা কাটাইয়া জীবনের প্রমত্ত গভীরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার বাসনা কবির মনে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। হ্রস্বদীর্ঘপংক্তি-গঠিত ছন্দে, মুহুর্মুহু ধ্বনিসঙ্গীতের পরিবর্তনে, আবেগের উদগ্র চাঞ্চল্যে, সমস্ত কবিতাটির মধ্য দিয়া যেন ঝটিকামথিত সমুদ্রের অশান্ত বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'মানসী'র 'সিন্ধুতরঙ্গে' কবিতায় কবি এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের বর্ণনা করিয়া উহাকে জড় ও চেতনার বিরুদ্ধআদর্শপ্রণোদিত সংগ্রামের পটভূমিকায় বিন্যস্ত করিয়াছেন। সেখানে মননসাহায্যে প্রকৃতি-তাণ্ডবের তাৎপর্য-অনুধাবন-প্রয়াস। বর্তমান কবিতায় এই তাণ্ডবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, অন্তরের মধ্যে উহার দুর্দম বেগকে গ্রহণ করিবার আকৃতি। সমুদ্র কবিমনকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করিয়াছে—কখনও জড়-চেতনের সংগ্রামক্ষেত্র, কখনও কবির জন্মান্তর-স্মৃতিরহস্যের, পৃথিবী ও কবিপ্রাণের মধ্যে নিগূঢ় ভাবসম্পর্কের বাহন; কখনও নিজ অন্তরদ্বন্দ্বের দুর্বার বেগচ্ছন্দের প্রতীকরূপে। কবির জীবনী হইতে জানা যায় যে এই কবিতা-রচনার কয়েকদিন পূর্বে তিনি পুরীতে দুর্যোগময় সমুদ্রদৃশ্য নিজের চোখে দেখিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতারই কাব্যরূপ 'ঝুলন' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায়। একটিতে সমুদ্রের চির-অশান্ত, অন্তঃপ্রেরণাময় আক্ষেপ, অন্যটিতে কবির বিশ্বাত্মবোধমূলক জীবনসংস্কারের প্রশান্ত প্রকাশ।

'পুরস্কার' কবিতাহিসাবে খুব উচ্চস্তরের নয়। বিশেষতঃ রামায়ণ-মহাভারতের সমগ্র কাহিনীর সারসংকলন কবিতার অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে উহার গঠনসুষমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তথাপি এ কবিতাটিতে 'মানসসুন্দরী'র অপার্থিব রহস্যময়, ব্যাকুল প্রশ্নপরম্পরায় দীর্ণ প্রেমের একটি বাস্তব গার্হস্থ্য প্রতিরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। 'মানসসুন্দরী'-তে কবি ও তাঁহার কাব্যপ্রেরণা এক নিবিড় প্রেমের একাত্মতায় মিলিত হইয়াছে; তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী ও দীর্ঘযুগ-অন্বিষ্টা মানস প্রেয়সীর অভিন্নত্ব বিপুল আবেগের বিস্ময়ে কবিচিত্তে প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু কল্পনার এই পরম উদ্বোধন সুচিরস্থায়ী হইতে পারে না। বাস্তব জগতের নিয়মে এই কল্পনাপ্রতিমার দিব্য সত্তাকে বিদীর্ণ করে ও উহার চারিদিকে সংশয়বাষ্প ঘনাইয়া তোলে। বিচিত্র রূপের সারাংশসঙ্কলিতা এই

মূর্তি আবার উহার বিভিন্ন উপাদানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং 'মানসসুন্দরী'র বাস্তবলোপী আবেগকে ভিন্নপাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয়। তাই 'মানসসুন্দরী'র আটমাস পরে লেখা 'পুরস্কার' কবিতায় কবি ও কবিজায়ার প্রশ্রয়-নির্ভরমধুর, কপট মান-অভিমানে রুচিকর দাম্পত্য প্রেম সাংসারিকতার বাস্তব পরিবেশে পুনরাবির্ভূত হইয়াছে। এখানে কবিজায়া কবির কাব্যপ্রেরণাদায়ী, কবিমনের সুকুমার স্ফুরণের সহিত একাঙ্গীভূতা, বিশ্ববিকীর্ণ কোন দিব্য শক্তি নহেন, তিনি নিতান্তই প্রেমময়ী, সংসারসুখভোগে উন্মুখী এক মানবী। তথাপি এই একান্ত সরল, আদর-সোহাগ-মান-ভৎর্সনাময় এই গার্হস্থ্য প্রেমও যে কবির নিবিড়তম উপলব্ধির মুহূর্তে কল্পলোকবাসিনী, দিব্যরূপিণী কাব্যলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হইতে পারে তাহার ইঙ্গিত এখানে দুর্লভ নয়। 'মানসসুন্দরী'র প্রিয়া-প্রশস্তি এখানে মাতৃরূপিণী বাণী-বন্দনায় প্রথাসিদ্ধ ভাবধারার অনুবর্তন করিয়াছে। রাজসভার বর্ণনা, বিভিন্ন অর্থী-প্রত্যর্থীর বাঞ্ছাপূরণের কাহিনী যেমন কবিত্ব-শক্তিতে উজ্জ্বল, তেমনি মার্জিত হাস্যকৌতুকে উপভোগ্য। বাণীবন্দনায়—

'ভাসিয়া চলিবে রবিশশিতারা
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদি কালের পান্থ যাহারা
তব সংগীতস্রোতে।'

এই স্তবকটি 'বিশ্বনৃত্য'-এর ভাবেরই পুনরাবৃত্তি। রামায়ণ-মহাভারতের বিরাট কাহিনী শেষ পর্যন্ত একটি মহারাগিণীতে মানবচিত্তে উহাদের চিরন্তন তাৎপর্যের ভাবানুরণন রাখিয়া গিয়াছে। এই কবিতাটিতে কবির কাব্যাভিপ্রায়ের মর্মকথা অতি অপূর্ব পরিমিতিবোধ ও বাস্তব চেতনার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানস সুন্দরীর ধাঁধালাগানো, উদ্‌ভ্রান্ত অন্বেষণ নহে, দিব্য চেতনার স্ফুরণ নহে, অমর্ত্য সৌন্দর্যকে ধরাতলে নামাইয়া আনা নহে, কবির লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে জীবননিষ্ঠ। প্রকৃতি-সৌন্দর্যের উপর কবিকল্পনাপ্রসূত একটি গাঢ়তর আভার আরোপ, সংসারের দুঃখবেদনাক্লিষ্ট জীবনে কিছু সৌন্দর্য-বিন্যাস, জীবনের কোমলতম বৃত্তিগুলির কিঞ্চিৎ মাধুর্যবৃদ্ধি—ইহাই কবির চরম উচ্চাভিলাষ। এই কবিতাটিতে কবি 'সোনার তরী'—'চিত্রার' যুগে তাঁহার সমস্ত নভঃসঞ্চরণ ও কল্পলোক-বিহারের মধ্যে মাটির পৃথিবীর দিকেই যে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এই সত্যটিই ঘোষণা করিয়াছেন।

'মানসী'র সহিত তুলনায় 'সোনার তরী'-তে প্রেম ও প্রকৃতি-কবিতা স্বল্পসংখ্যক। ইহার কারণ বোধ হয় একদিকে মনুষ্যজীবনগভীরে প্রবেশ-প্রয়াস, অন্যদিকে কবির অবচেতন মনে মানসী-প্রেমের সর্বব্যাপিত্ব। যে বাস্তব-প্রেমচেতনা মানুষকে আদর্শ প্রেমের জন্য প্রস্তুত করে, কবি-হৃদয়ে সেই প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত। প্রেম সম্বন্ধে কবির মনোভাব এখন একটি সাধারণীকৃত স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে। তাই বিচিত্র প্রেমলীলার চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনও কম, উহার উচ্ছ্বাসও প্রশান্ত। যে বিভিন্ন নদীগুলি অনন্তপ্রেমের মহাপারাবারে মিলিতে উদ্যত, তাহাদের গতিভঙ্গী ও কলকাকলী অনেকটা স্তব্ধ ও মন্থর।

'দুর্বোধ' (১১ই চৈত্র, ১২৯৯), 'হৃদয়-যমুনা' (১২ই আষাঢ়, ১৩০০), 'ব্যর্থ যৌবন' (১৬ই আষাঢ়, ১৩০০), 'ভরা ভাদরে' (২৭শে আষাঢ়, ১৩০০), 'প্রত্যাখ্যান' (২৭শে আষাঢ়, ১৩০০), 'লজ্জা' (২৮শে আষাঢ়, ১৩০০), ও 'অচল স্মৃতি' (১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩০০) এই কাব্যে প্রেমকবিতার পর্যায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে এক 'অচল স্মৃতি' ছাড়া আর কোনটিই আদর্শ-প্রেমকল্পনা-প্রভাবিত মনে হয় না। 'দুর্বোধ'-এ একটি স্তবক আদর্শস্মৃতিবাহী বলিয়া কোন সমালোচক মনে করিয়াছেন।

এ যে সখী সমস্ত হৃদয়
কোথা জল, কোথা কূল
দিক হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।
এ রাজ্যের আদি-অন্ত নাহি জান রানী,
এ তবু তোমার রাজধানী।

এই উক্তি মানসসুন্দরীর প্রতি নিবেদিত বলিয়া প্রতিভাত হয় না, পার্থিব প্রেমিকাই ইহার সম্বোধন-পাত্রী। ইহার মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্বের সুর আছে, উচ্চতর প্রজ্ঞাভূমি হইতে প্রেমরহস্যবিহ্বলা প্রেয়সীকে বুঝাইবার যে চেষ্টা লক্ষিত হয় তাহা মানসী সম্বন্ধে কবির মনোভাবের ঠিক বিপরীত। মানসী সম্বন্ধে মানসীই রহস্যময়ী, কবি বিস্ময়-বিমূঢ়। প্রেমের অগাধ রহস্যময়তা প্রাকৃত প্রেমের লক্ষণরূপে এখানে নির্দেশিত।

'হৃদয়-যমুনা' রূপক-ব্যঞ্জনার অপরূপ প্রয়োগে প্রেমের অতল-গভীর স্নিগ্ধতা, উহার সর্বলাজভয়হারী আবরণ ও মরণের সহিত উহার নিখিলবন্ধনচ্ছেদী সমধর্মিত্ব-বিষয়ক এক অনির্বচনীয় অনুভূতিকে রূপ দিয়াছে। যমুনা আদর্শ প্রেমলীলার ভাবাসঙ্গজড়িত বলিয়া কবি-প্রেয়সীর প্রণয়সাধনার পরিপূর্ণ আধার রচনা করিয়াছে। এই আশ্চর্য-সুন্দর কবিতাটিতে প্রেমিকার অন্তর ও বাহির, উহার প্রকৃতিসিদ্ধ ভাববিভোরতা ও নিগূঢ়তত্ত্বব্যঞ্জনা এক অন্তরঙ্গ মিলনে একীভূত হইয়াছে। ক্রীড়াশীল জলরাশির মধ্যে প্রণয়ী-হৃদয়ের ভাব-আলোড়ন, জলের জবানীতে প্রেমিকের সর্বত্যাগী, মরণস্পর্ধী প্রেমের আমন্ত্রণ যেন অপূর্ব সুসঙ্গতির সহিত ধ্বনিত হইয়াছে। প্রতিটি স্তবক নদীঘাটে অবতরণের সোপানশ্রেণীর ন্যায় এক ক্রমবর্ধমান প্রেমাবেশের স্তরবিন্যাস সূচিত করিয়াছে। প্রথম স্তবকে যমুনাজল নায়িকাকে চিনিয়াছে, দৃষ্টির মধ্য দিয়া নয়, উহার নূপুরনিক্কণের শ্রবণের মধ্য দিয়া, কেন-না আলুলায়িত কুন্তল যেমন নায়িকার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়াছে, তেমনি দিগন্তসন্নত মেঘভার নদীর দৃষ্টিবাধা জন্মাইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয় স্তবকে প্রেমসায়রে অবগাহনের পূর্বে নায়িকার যে মধুর মুগ্ধ ভাব-রোমন্থন তাহার বাস্তবচেতনাকে গ্রাস করে তাহারই অপরূপ বর্ণনা। সে যে কুম্ভ পূর্ণ করিয়া প্রেমের জল আনিতে গিয়াছে, সেই বস্তু-আধারই তাহার আত্মবিস্মৃতির সুযোগে কোন্ অতলগভীরে ভাসিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় স্তবকে আর কুম্ভ ভরার প্রশ্ন নাই, এখন প্রেমগভীরতায় সকল লাজ-বিসর্জনকারী অবগাহন-স্নান। তখন প্রেমিকের দিক হইতে সোহাগতরঙ্গোচ্ছ্বাস ও অস্ফুট কলভাষণ নায়িকাকে অভ্যর্থনা জানাইতেছে, কিন্তু নায়িকার দিক হইতে কোন সাড়া নাই। গাহনের সময় আর জল ভরিবার তাগিদ নাই, আছে প্রেমচেতনায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। শেষ স্তবকে প্রেমের অপার রহস্য ও অতলগভীরতা মৃত্যুর মত সমস্ত ব্যক্তিসত্তাকে অবলুপ্ত করিয়াছে। প্রেমের সময়-পরিমাপ, উহার কালচেতনা, উহার গীতিময় প্রকাশমাধুর্য সব এক আত্মাবলুপ্তির গভীর শূন্যতায় বিলীন হইয়াছে। প্রেমের চরম গৌরব মৃত্যুর সঙ্গে উহার অভেদ একাত্মতায়।

'ব্যর্থ যৌবন', 'প্রত্যাখ্যান' ও 'লজ্জা' সাধারণ প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা ও মানস সঙ্কটের পরিচয়বাহী। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। ইহাদের কাব্যমূল্য খুব উচ্চ নহে, তবে ইহারা প্রেম বিষয়ে কবির অন্তর্দৃষ্টিতে যে কত ব্যাপক ছিল তাহারই প্রমাণ দেয়। 'ভরা ভাদরে' কবিতাটি 'সোনার তরী'র

মত একইরূপ পদ্মাপরিবেশনির্ভর; পদ্মাতীরের শস্যক্ষেত্রের ভরা ধান, আকাশে লঘু মেঘখণ্ডের লক্ষ্যহীন বিচরণ ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে এক পূর্ণতাজাত শ্লথতা কবির চিত্তকে প্রেমবিবশ করিয়াছে ও তাঁহার প্রেয়সীর কালো আঁখির কথা মনে পড়াইয়া দিয়াছে। এখানে নাম-কবিতার মত রূপক-অনির্দেশ্যতা, অসমাহিত প্রশ্নের ভার কিছু নাই। 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতেও সরল, সমস্যাহীন, স্বল্পসন্তুষ্ট জীবনের প্রতীকরূপে এই পদ্মার কূলে ধান কাটা ও মাঝির গীতিপ্রিয়তার দৃশ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোট ছোট তরী পাল তুলে যায়,
মাঝি বসে গায় গান।

একই দৃশ্য কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুসারে নানাবিধ ভাবোদ্বোধনসমর্থ। ইহা কখনও বা প্রেমস্মৃতিউদ্দীপক, কখনও বা সরল, নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার চিত্রকল্প, কখনও বা এক অনির্দেশ্য উৎকণ্ঠায় বিহ্বল ও জটিল জীবন-জিজ্ঞাসায় প্রহেলিকাময়।

'অচল স্মৃতি' কবিতাটি মানসসুন্দরীর ধ্যানকল্পনায় উৎসর্গিত কবিচিত্তের একটি স্থির ঊর্ধ্বগামী প্রত্যয়ের অপূর্ব শব্দচিত্র। অচল, ঊর্ধ্বোত্থিত গিরিশৃঙ্গের মত এই অবিচল প্রত্যয় কবির মনোজগতে সর্বাতিশয়ী, সকল ক্ষুদ্রতর, কোমলতর অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দুরূপে চিরবিরাজিত। এই সমুন্নত, অনধিগম্য শিখর কবির বাসনাকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে, উহার চারিদিকে কবির শত কল্পনা রঙীন মেঘের মত আবর্তিত হয়, উহার নিশ্চল নীরবতাকে ঘেরিয়া কবিমনের সমস্ত গতিবেগ, উহার কল্পনার সমস্ত লীলাবৈচিত্র্য আনাগোনা করিতে থাকে।

শিখর গগনলীন
দুর্গম জনহীন,
বাসনা-বিহগ একেলা সেথায়
ধাইছে রাত্রিদিন।

কবির একটি চমকপ্রদ, অলৌকিক আদর্শ-সংস্কারের কি প্রশান্ত-গম্ভীর, গভীর-প্রত্যয়যুক্ত অভিব্যক্তি! মানসসুন্দরী কবিচিত্তের একটি ক্ষণিক অতিথি নহেন, উহার অন্তরনিয়ন্ত্রী স্থায়ী অধিবাসিনী।

'তোমরা ও আমরা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ভাবমুগ্ধতা হইতে স্বতন্ত্র, একক রচনা। পুরুষ ও নারী-জাতির গতিবিধি, মানস প্রকাশভঙ্গী ও

আবেগছন্দের পার্থক্য রেখার অতি সূক্ষ্ম, লঘু টানে অথচ অনুভূতির অভ্রান্ত অন্তর্ভেদিত্বে, দ্রুত-প্রবহমান ধ্বনি-সঙ্গীত-যোগে অপূর্বভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কবির গভীর প্রেমচেতনা পুরুষ-নারীর অন্তর-পরিচয় ও ভাবদ্যোতনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টিকে অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়াছে। Tennyson ও Browning-এর নারীপুরুষঘটিত প্রকৃতিপার্থক্য আলোচনা এই চকিতচমকময়, আভাসে-ইঙ্গিতে সত্যপ্রকাশক কবিতাটির মদির কটাক্ষের সহিত তুলনায় নীরস তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত ও স্থূল মননপ্রধান বলিয়া মনে হয়।

এইবার যে কয়েকটি কবিতায় কবির কবিত্বশক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটিয়াছে সেইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। এগুলি সংখ্যায় খুব বেশী নহে কিন্তু উৎকর্ষে পৃথিবীর কাব্যলোকে শীর্ষস্থানীয়। 'যেতে নাহি দিব' (১৪ই কার্তিক, ১২৯৯); 'মানস-সুন্দরী' (৮ঠা পৌষ, ১২৯৯), 'বসুন্ধরা' (২৬শে কার্তিক, ১৩০০) ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' (২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩০০) কবিকল্পনার তুঙ্গতম শিখর-মহিমায় বিরাজিত। প্রথমটিতে একটি ক্ষুদ্র সংসারজীবনের ব্যর্থ স্নেহ, অসহায় মানুষের একটি সাধারণ অনিবার্য হৃদয়বেদনা অপূর্ব কল্পনাশক্তির যাদুমন্ত্রে নিখিলবিশ্বের অন্তর্লীন মর্মব্যথায়, আদি মাতা ধরিত্রীর বেদনাপীড়িত সন্তান-মমতার এক সর্বব্যাপী বিষাদ-সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কবিতাটির প্রারম্ভে গার্হস্থ্য ব্যবস্থার ছোটখাট, প্রীতিমধুর, সেবাস্নিগ্ধ হাজার বস্তুসঞ্চয় যেন ধূলিমলিন মর্ত্যলোকের সর্বনিম্নস্তরে উহার ভূমিকা রচনা করিয়াছে। মধ্যভাগে একটি চার বৎসরের শিশু বালিকা অবোধ স্নেহের ব্যর্থদাবীভরা, নির্মম বিশ্ববিধানের দ্বারা উপহসিত, অথচ আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় এক অভিলাষ ঘোষণা করিয়াছে। সংসারের সমস্ত বাস্তব ক্ষণভঙ্গুরতার বিরুদ্ধে দুর্বল মানুষের প্রেম উহার চিরন্তন স্থায়িত্বের দৃপ্ত দাবী তুলিয়াছে। এই করুণ, সুনিশ্চিত পরাজয়চেতনার অঙ্কুর হইতে কবিপ্রতিভা এক বিরাট, বিশ্বব্যাপী ভাব-মহীরুহের উদ্‌গম ঘটিয়াছে। অবোধ, সংসারানভিজ্ঞ ছোট মেয়েটির শান্ত, নিঃসংশয় অধিকারবোধ সমস্ত নিখিলে বিকীর্ণ হইয়া বিরাট বিশ্বের হৃদ্‌পঞ্জর-বিদীর্ণকারী এক করুণ আবেদনে মুখরিত হইয়াছে। সমস্ত জগতের অণু-পরমাণুতে এই রোদনভরা মর্মনিঃসৃত কামনা প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। বিস্তীর্ণ হেমন্ত-শস্যক্ষেত্রে, বৃক্ষের আলো-ছায়ার হ্রস্ব-দীর্ঘতায়, নদীস্রোতের পরস্পর-অনুগামী তরঙ্গমালায়, চঞ্চল ঘটনাস্রোতের উপর নিক্ষিপ্ত এক অচঞ্চল মর্মকামনার স্থির আচ্ছাদনে—সর্বত্র এই বিষাদ-সঙ্গীত, আপাতব্যর্থ আশার অপ্রশমিত বেদনার সুর অনুরণিত হইয়াছে। সর্বশেষে

মাতা বসুন্ধরার শোকম্লান, অপ্রতিবিধেয় নিয়তির প্রতি অনিমেষ বদ্ধদৃষ্টি উদাস মূর্তিটিও অবিস্মরণীয় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই ক্ষুদ্র হইতে মহৎ, এই ভূমিতলনিবদ্ধতা হইতে ঊর্ধ্বগগনচারিতায় সংক্রমণ কিরূপ অনায়াসে, কত অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে—কোথাও সচেতনভাবে ভাবসমুন্নতিপ্রয়াস দেখা দেয় নাই। কল্পনার এই স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতা, ভাবের এইরূপ নিবিড়, নিটোল, অনবদ্য রূপসংহতি, মননের এইরূপ অবাধ নিখিলব্যাপী প্রসারণ শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভার রাজকীয় শীলমোহরে স্বাক্ষরিত।

৩

এই কাব্যের মধ্যমণি হইতেছে 'মানস-সুন্দরী', শুধু কাব্যোৎকর্ষের শ্রেষ্ঠতার দিক দিয়া নহে, কবির আকৈশোর-অনুসৃত, প্রকৃতি ও মানবমনের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যকণিকাসমবায়িত মানসী কল্পনার অপূর্ব-সুন্দর রূপপ্রতিমাগঠনের সার্থকতায়। কবির দীর্ঘ অরূপসুন্দরী-অন্বেষণের, উহার বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় চকিতচমকের ও দ্রুতবিলয়ের ছন্দাবর্তিত রূপাভাসের স্থির চিত্রকল্পগঠন-প্রয়াসের সার্থকতম পরিণাম ইহাতে সূচিত হইয়াছে। কবির চিরজীবনের শ্রান্তি, হতাশা, অবসাদ, অনির্দেশ্য আকূতি দীর্ঘসাধনার পর এই কবিতায় এক সব-ভাসান পুলকরসায়নের ভাবোচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়াছে। চিরকালের অনায়ত্ত মানসপ্রেয়সী এক শুভলগ্নে রূপবন্ধনে ধরা দিয়া কবির মর্মগৃহিণীর আসন অধিকার করিয়াছে। এই দীর্ঘাকাঙ্ক্ষিত মিলনে কবি-প্রেমিকের বীণায় কি অপরূপ রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়াছে! এই অসাধারণ সৌভাগ্যে প্রেমানুভূতির ঊর্ধ্বতমসীমাস্পর্শী ভাবব্যাকুলতা, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ধাবমান কূলপ্লাবী আনন্দোচ্ছ্বাস, আশাকল্পনা-ঔৎসুক্যসংশয়ের সমস্ত হৃদয়মন্থনকারী এক অপূর্ব আলোড়ন, বর্ষাবারিধারার ন্যায় বিচিত্র সৌন্দর্যের অনর্গল, অবিরত উৎসার—সব মিলিয়া কবিতাটিকে মানবমনের এক অলৌকিক রসোল্লাসের আদর্শ দৃষ্টান্তরূপে, এক অনির্বচনীয় ভাবোত্তরণের আধাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিমূর্ত, ভাবসার কাব্যপ্রেরণাকে অবলম্বন করিয়া এরূপ লৌকিক প্রণয়োন্মত্ততার উপযোগী আবেগ সঞ্চয় করা যে সম্ভব তাহা বৈষ্ণবপদাবলীর রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলা-বর্ণনায় কিছুটা আভাসিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীতে যে প্রেমকল্পনা-তত্ত্বের তটবন্ধনে সুনিয়ন্ত্রিত, রবীন্দ্রনাথে তাহা স্বাধীন অনুভূতির দুর্বার, নিরঙ্কুশ

স্রোতোবেগে সহস্র ধারায় ও বিচিত্র পথে উৎসারিত। শেলী অশরীরী ভাব-মূর্তির সহিত আবেগ-উষ্ণ অন্তরঙ্গতায় রবীন্দ্রনাথের কিয়ৎপরিমাণে সমধর্মী। কিন্তু তাঁহারও ভাব-পরিক্রমা সংকীর্ণতর গণ্ডীতে সীমায়িত ও তাঁহার মদিরতম উচ্ছ্বাসও রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় অলৌকিকতার হিমানীস্পর্শে ঈষৎ কুহেলিমাখা। অলৌকিক কল্পনাকে সৌন্দর্যমন্ত্রে বশ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে রূপজগতের ছন্দোবদ্ধ করার কৃতিত্বে রবীন্দ্রনাথ তুলনারহিত।

এই মানস-তিলোত্তমার সৌন্দর্যকণিকাগুলির তিলে তিলে আহরণ ও সঞ্চয়নের ইতিহাস অস্পষ্ট হইলেও দুর্নিরীক্ষ্য নহে। কবি বাল্যকালে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশে এক অর্ধপরিচিত সত্তার কৌতুকময় উপস্থিতি অনুভব করিয়াছিলেন। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এ এই অর্ধপরিচিতেরই নিঃশ্বাসবায়ু স্ফীত হইয়া এক অপরিণত, অপরিমিত ভাবকল্পনার কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়াছে। 'প্রভাতসংগীত'-এ তাঁহার পারিপার্শ্বিক মানবজীবনের সহিত প্রথম মিলনানুভূতির আনন্দউচ্ছ্বাস তরুণ কবির বিষণ্ণ আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে বহির্বিশ্বের স্বচ্ছন্দ-গমনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। 'ছবি ও গান'-এ এই বিশ্বজোড়া বিষাদ ও আনন্দ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সুমিত ছবিতে ও ক্ষীণ গীতাভাসে স্পষ্টতর রূপ লইয়াছে—বিষাদ-বাষ্প করুণ অশ্রুবিন্দুতে ঝরিয়া পড়িয়াছে, বিরাট বিশ্বমিলনের উত্তেজনা ছোট ছোট গানের সুরে ও রূপসৃষ্টির উৎসাহে কাব্যপরিমিতির রূপবন্ধনে ধরা দিয়াছে। 'কড়ি ও কোমল'-এ এক সর্বগ্রাসী রূপতৃষ্ণা ও উদ্বেল প্রেমচেতনা কবির মানস-জগতের ক্ষীণ-মন্থর স্বপ্নময়তাকে কামনা-চঞ্চল ও নিবিড়-বর্ণ-রঞ্জিত করিয়াছে। কৈশোরের স্বপ্নানুভবের সহিত নবযৌবনের বর্ণাঢ্য আবেশ যুক্ত হইয়া কবি-কল্পনার সমস্ত প্রকৃতির রং বদলাইয়া দিল। যে অর্ধপরিচিত সত্তা বিষাদের বাষ্প-অবগুণ্ঠিত ও মিলনানন্দের ক্ষণদীপ্তিতে মুহুর্মুহু আভাসিত হইতেছিল তাহা এখন কল্পনাদৃষ্টিতে গোচরীভূত, নিবিড় অনুভূতিতে সর্বব্যাপিনী প্রেয়সীর মূর্তিতে প্রতিভাত হইয়াছে। সমগ্র 'মানসী' কাব্য 'কড়ি ও কোমল'-এর যৌবন-স্বপ্নকে রূপনির্মিতি ও সুস্পষ্ট অনুভূতির বন্ধনে বাঁধিবার আকুল প্রয়াসের কাহিনী। কবির কাব্যোৎসাহের প্রেরণাদাত্রী, তাঁহার কাব্যসাধনাসঙ্গিনী কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় অকালমৃত্যু কবির মনোজগতে এক বিরাট আলোড়ন তুলিয়া, তাঁহার সুলভ কল্পনাবিলাসকে মর্মান্তিক জীবনসত্যে পরিণত করিয়া, একদিকে যেমন তাঁহার কাব্যে নিবিড়তার সুর জাগাইতে সহায়তা করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আদর্শ প্রেয়সীর রূপসন্ধানের প্রেরণা যোগাইতেছে। কাদম্বরী দেবী স্বয়ং

কবিমানসী কি না তাহা নির্ধারণের উপযুক্ত উপাদান আমাদের নাই ; কিন্তু এই মানসীর রূপদর্শনে তাঁহার ছায়াপ্রতিবিম্ব যে মাঝে মধ্যে পড়িয়াছে, উহার বিচ্ছিন্ন প্রাণকণিকাগুলিকে রূপসংহতি দিবার, অনির্দেশ্য বিশ্বানুভূতিকে হৃদয়ের গভীরতম প্রণয়াকৃতির সহিত মিলাইবার যে ব্যাকুল প্রয়াস কবির মধ্যে লক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোগ-সাধনের উপযোগী হৃদয়োত্তাপ মনে হয় কিয়ৎপরিমাণে কাদম্বরী দেবীর অকস্মাৎ-প্রজ্বলিত চিতানল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। মানসীর 'দুরন্ত আশা', 'অহল্যার প্রতি', 'সোনার তরী'র পরবর্তী রচনা 'বসুন্ধরা'য় বিশ্বজীবনের বিভিন্ন আধারে রস-আস্বাদনের জন্য কবির উদগ্র আগ্রহ, ব্যক্তিগত জীবনের এক নিদারুণ আঘাতে, 'মানসী'তে ঈষৎ উপলব্ধ কল্পপ্রতিমাও উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই উভয় ভাবধারাকে এক অপূর্ব সংশ্লেষাত্মক মিলনে যুক্ত করার বিপুল আবেগ এই অস্থিমজ্জাগত, অবদমিত শোকসংস্কারের উৎস হইতেই আসিতে পারে। এক হৃদয়বিদারী অথচ মর্মসংগুপ্ত বেদনার গভীর কালিমালিপ্ত পটভূমিকাতেই 'মানসসুন্দরী'র এই হেমোজ্জ্বল রূপচ্ছবি দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বাত্মবোধ ও মানস প্রেয়সীর জন্য আকৃতি এই উভয় প্রকার আবেগ এই কবিতাটির মধ্যে একটি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে প্রেমমহাতীর্থ রচনা করিয়াছে। কবি এখানে তাঁহার মানস প্রেয়সী ও কাব্যলক্ষ্মীর অভিন্নতা অনুভব করিয়া এক অসংবরণীয় আবেগে মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই আজন্মসাধনধন অলোকসুন্দরী যে কবিরই অন্তর্নিহিত কাব্যপ্রেরণা, তাঁহার কাব্যজীবনের পূর্ণতাবিধানকারিণী এই সত্যই কবি অকস্মাৎ আবিষ্কার করিলেন। ইনি কবিচিত্তকে অতুলনীয়, অলৌকিক প্রেমানন্দে অভিষিক্ত করেন, ইঁহার কোমল স্পর্শ ও অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য কবি-কল্পনাকে পরম সৌন্দর্যে বিকশিত করিয়া তোলে। প্রেমমিলনের অপূর্ব আনন্দ কবি ইঁহার মধ্য দিয়াই আস্বাদন করেন। তবে ইনি এখন পর্যন্ত কবিমনের নিয়ন্ত্রী পদে, কবির অন্তরলোকের সর্বময়ী কর্ত্রীত্বে উন্নীত হন নাই। মানসসুন্দরী এখনও অন্তর্যামিত্বের নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়া কবির কাব্যচর্চাকে নিজ অমোঘশক্তিবশে এক অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের প্রতি পরিচালন করিতে রত হন নাই। ইনি গৃহিণীর মত কবির অন্তর-অন্তঃপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার কল্পনাকুসুমকে নানা বিচিত্র-রসে ফুটাইয়া তুলিবার পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছেন, কবির অশান্ত হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার অপরূপ প্রেমসুধা দিয়া কবির চির-অতৃপ্ত চিত্তক্ষুধা মিটাইতে-

ছেন। সংসারজীবনের পরিপূর্ণ প্রেমসার্থকতার ছবি যেন কবি ও তাঁহার মানসীর মধ্যে—এক নিবিড়তন্ময়তাপূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। ইনি কবির মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লন না, তাঁহার উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রয়োগ করেন না, শুধু তাঁহার সত্তার স্পর্শে, তাঁহার নিকট উপস্থিতিতেই কবিপ্রতিভার স্বচ্ছন্দ বিকাশের অনুকূল আদর্শপরিবেশসৃষ্টিতে নিজ প্রভাব সীমাবদ্ধ রাখেন।

দীর্ঘ সাধনার পর কবির এই অকস্মাৎ সিদ্ধিলাভ তাঁহাকে 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসী'র বিফল অনুসন্ধানের বেদনার কাহিনী ভুলাইয়াছে। তিনি যে শুধু মানসীর স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নয়, অনুকূল প্রেয়সীরূপে তাহাকে নিজ নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে পাইয়াছেন। এই মিলনের আনন্দ, চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষার এই অপরূপ সার্থকতা তাঁহার চিত্তকে কানায় কানায় পূর্ণ করিয়াছে ও এই হর্ষোদ্বেলতা মিলনতৃপ্ত দম্পতির নিভৃত কূজনের বিচিত্র কলধ্বনিতে, ললিত লীলাকল্পনায় ও শেষ পর্যন্ত এক অনিবার্য মানস প্রতিক্রিয়াবশে, চরাচর-ব্যাপ্ত বিরহের মধ্যে একটিমাত্র মিলনের বাঁচিবার করুণ, শঙ্কিত আবেদনে শত ধারায় উৎসারিত হইয়াছে।

তাহার পর আসিয়াছে পূর্বস্মৃতি-উদ্বোধন। কবির শৈশবে এই মানসী তাঁহাকে গতানুগতিক কর্তব্য-পালনের পথ ভুলাইয়া তাঁহাকে এক স্বপ্নকল্পনায় আবিষ্ট রাখিত—দুই ক্রীড়াচঞ্চল বালক-বালিকার মতই তাঁহাদের চপল ভাব-বিনিময় ও সঙ্গরস-উপভোগ চলিত।

ইহার পর কৈশোরের বিরহবাষ্পাকুল, ঘনীভূত মিলনাকূতির অধ্যায় সম্বন্ধে কবি নীরব আছেন, কেবল প্রারম্ভ-স্তবকে 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসী'র স্তরের আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, কাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তির বাধা, উজ্জ্বল সম্ভাবনার বঞ্চনাময় পরিণতির অশ্রুজলসিক্ত কাহিনী আভাসে-ইঙ্গিতে অর্ধব্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী স্তরগুলি দ্রুত ছাড়াইয়া কবি বর্তমানের নিবিড় মিলনের অলৌকিক আনন্দ-সার্থকতার ঠিক মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কখন নিজের সংগীতে চমকিত হইয়া কবি আবিষ্কার করিয়াছেন যে শৈশবের লীলাসঙ্গিনী ও কৈশোরের প্রহেলিকাময়ী, ধরা-না-দেওয়া নারী কবির অন্তরলোকে মহিষীর মত পরিপূর্ণ গৌরবে ও অধিকারবোধে অধিষ্ঠিত হইয়াছে—এ যেন চিরপ্রণয়িনীর সঙ্গে শুভ-পরিণয়। এই বিবাহোৎসব-বর্ণনায় কবি-কল্পনা অপরূপ আবেগমুখর ও ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনাবধূ প্রবেশ করিয়াছে কবির সেই অন্তরগৃহে—

—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখ দুঃখ লয়ে।

ইহাতে প্রমাণ হয় যে নববধূ কেবল অন্তর্যামি-মন্দিরে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি এখনও মন্দির-দেবতার স্থান অধিকার করেন নাই। যদিও কবি তাঁহাকে 'জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি ইহা প্রেয়সীর প্রতি মর্যাদা-আরোপ, প্রেমিকার অতিরঞ্জিত আবেগের প্রকাশ, অন্তর্যামিত্বের সূক্ষ্ম তাৎপর্যদ্যোতক নহে। এখন তাঁহার বালচাপল্য অন্তর্হিত; তাঁহার সুর গম্ভীর ও গভীর-অর্থবহ। এখন কবি তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ কুরঙ্গসম, তাঁহার উৎস-অনুসন্ধানে ব্যগ্র। এখন তিনি কর্ণধারের ন্যায় কবিকে সৌন্দর্যসমুদ্রের গভীরের দিকে চালিত করিয়াছেন ও এই সীমাহীন সমুদ্রযাত্রার নানা অস্ফুট কলধ্বনিতে কবিকে পর্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন। যখন কবিপ্রেরণার দুরধিগম্যতা কবিকে অসহ্য বেদনায় বিহ্বল করিয়া তোলে তখন কাব্যচেতনার এই অন্তর্নিহিত শক্তিই কবিকে অভয় দিয়া তাঁহার মানসিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ও তাঁহার আত্মবিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখে। 'সোনার তরী' স্তরে উপনীত কবিজীবনের ইহা একটি আশ্চর্য সত্য পরিচয়। এই পরিপূর্ণ সাফল্যের মুহূর্তে কবি আরও দুর্গম পথে অভিযাত্রী হইবার কথা ভাবিতেছেন ও তাঁহার কাব্যতরণীকে অজানা অকূলে ভাসাইবার পূর্বে তাঁহার কাব্যপ্রেরণার সদা-প্রস্তুত সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া কোন দুঃসাধ্য সাধনকেই তাঁহার ক্ষমতাতীত বিবেচনা করিতেছেন না।

আনন্দের সর্বচেতনালোপী-তীব্রতায় কবি কবিতা রচনা পরিহার করিয়া কেবল ভাষাহীন আবেগ-প্রবাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই অপূর্ব সম্ভোগ-রমণীয় বর্তমানের পর কবি অনাদি-অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যতের কল্পনাজালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এই অন্তরপ্রেরণাকে তিনি পরজন্মে নারীরূপে কামনা করিয়াছেন। এখন তিনি প্রকৃতির নানা সৌন্দর্যের অন্তরাল হইতে, উহার নানা আবেগস্পর্শের মধ্যে লুকাইয়া, উহার বিচিত্র আলোছায়ার কম্পনে ও উদাস-করুণ গানের রেশে, চকিত আবির্ভাবে কবির মনে মায়াজাল বিস্তার করিতেছেন। কিন্তু কবির বিষণ্ণ অবসাদ ও জীবন-বিমুখতার মুহূর্তে, রজনীর স্তব্ধ অন্ধকারে তিনি নক্ষত্রঝিকিমিকি অসীম অকাশপ্রান্ত হইতে আসিয়া স্নেহময়ী মাতার ন্যায় কবিকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিয়া আবার অন্তর্হিত হইয়া যান। প্রেয়সীর এই কৌতুকময় লুকোচুরি-খেলার মধ্যে কখন মাতার চির-

নির্ভরযোগ্য, অচপল কল্যাণকামনা দেখা দেয়। সেই সর্বপ্রকৃতিব্যাপ্ত, অতর্কিত আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে দুরধিগম্য, পলাতক শক্তিকে কবি মানবীর স্থির অবয়ব-সৌন্দর্যে ও আবেগ-সৌকুমার্যে আয়ত্ত করিতে চাহেন। প্রকৃতির দ্রুত-অপসরণ-শীল, মুহূর্তে মুহূর্তে রূপান্তরিত ভাবমায়া মানবিক রূপে কি অপরূপ হইয়া দেখা দিবে তাহারই চিন্তা কবিকে বিভোর করিয়াছে।

বিশ্বাত্মবোধ ও জন্মজন্মান্তরীণ স্মৃতি এই প্রেমকে আশ্রয় করিয়া ইহাকে ব্যাপ্তি, গভীরতা ও অনির্বচনীয় রসব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করিয়াছে। বহু জন্মের ভাবাসঙ্গ ইহার চারিদিকে এক অতৃপ্ত, সুদূর অতীতের মায়ামাখান মাধুর্যচক্র রচনা করিয়াছে। বর্তমান মুহূর্তের প্রেয়সী চিরপরিচয়ভরা আশ্বাস বহন করিয়া, চিরজীবনের গভীরস্তরশায়ী অন্তরঙ্গতার উদ্বোধন ঘটাইয়া কবির অন্তরাত্মার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। এখানে কবি অনুভব করিয়াছেন যে এই মানসী তাঁহার নিজ একাগ্র আকৃতিরই সৃষ্টি। কবি যেমন মানসীর শতজন্মের প্রণয়ে শত পাকে জড়িত, মানসীও কি তেমনি কবির পূর্বস্মৃতি-বিভোরা হইয়া তাঁহার নিকট চিরকালের জন্য ধরা দিবেন? কাব্যলক্ষ্মীর প্রসন্ন হাস্যে, তাঁহার করুণ অশ্রুসিক্ত সমবেদনায় কবির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কি ধন্য হইবে? আবার কবিকল্পনা পরজন্মে প্রাপ্তির আশা হইতে পূর্বজন্মে নিশ্চিত উপস্থিতির স্মৃতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে—অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে অস্থির সংক্রমণে বিচিত্র রেখাচিত্র ও আবেগজাল উৎকীর্ণ করিয়াছে। মানসী যেন কবিজীবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী হইতে বিশ্বব্যাপিনী কাব্যপ্রেরণাতে বর্তমান জন্মে প্রসারিত হইয়াছে, আবার পরজন্মে ইহার বিপরীত প্রক্রিয়ায় পুনরায় নিবিড় বন্ধনে ধরা দিবার আশা জাগাইতেছে। এইরূপে আদর্শ প্রেয়সীমূর্তি ও ভাবকল্পনার মধ্যে যুগে যুগে আবর্তিত হইয়া কবির সহিত সৃষ্টি ও প্রলয়ের দ্বৈতক্রীড়ার মত তাঁহার মনে এক অবিরত লীলারসের রহস্য-ঘোর লাগাইতেছেন।

এই তীব্রতম, নানা প্রণালীতে প্রবাহিত মানস উত্তেজনার পর কবিমনের আবেশ কাটিয়া গিয়াছে ও তিনি প্রশান্ত বাস্তব-চেতনাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গভীর রজনীর স্তব্ধতা লোকালয়ের জীবনচাঞ্চল্য ও কোলাহলমুখরতাকে ঘন নৈঃশব্দ্য-যবনিকার অন্তরালে আবৃত ও কবির অনুভূতিকে বস্তুসংলগ্ন করিয়াছে। এই বিরাট, বিচিত্র কল্পনালীলার উত্তেজনা স্তিমিত হইবার পর, কবি নিজের প্রমত্ত আতিশয্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন ও কুণ্ঠিতভাবে তাঁহার সমস্ত স্বর্গমর্ত্যবিহারী, জন্মজন্মান্তরপ্রসারিত জল্পনা-প্রগল্‌ভতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহার

হৃদয়-পারাবারের অশান্ত ভাবোচ্ছ্বাসলহরী এক অন্তর-প্রবাহিত অশ্রুধারায় উহার সমস্ত বেগ সংহরণ করিয়াছে। কবির প্রিয়ার প্রতি শেষ সম্বোধন তাঁহার মনের উপর এক শান্ত, উচ্ছ্বাসহীন, মৃত্যুস্নিগ্ধ বিস্মৃতি-আবরণ টানিয়া দেওয়ার আবেদন। অন্তরবিদারী এত উন্মত্ত আলোড়নের, আবেগের এত উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত অসীম-অভিযানের শেষ ফল এক শান্ত বিস্মৃতিতে নিস্তরঙ্গ বিলয়।

বিমূর্ত ভাবের রসোচ্ছল প্রকাশ, ইন্দ্রিয়মুগ্ধতার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার অপূর্ব সমন্বয়, প্রাকৃত আবেগের উন্মত্ততার মধ্যে নিগূঢ় সংযম, নবনবসঞ্চারিণী ভাব-কল্পনার আশ্চর্য কেন্দ্রসংহতি, দেহলাবণ্যের মধ্যে আত্মার স্থির-জ্যোতিঃ-বিকিরণ, অনুভূতির প্রগাঢ়তার সঙ্গে শব্দযোজনা ও ছন্দপ্রবাহের অকল্পনীয় সহযোগিতা—এই সমস্ত গুণসমবায়ে 'মানসসুন্দরী'র অন্তর্লোকে ও বহির্লোকে উভয়পক্ষবিহার ইহাকে প্রেম ও ভাবরূপকপর্যায়ের কবিতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অন্ত্যমিলসংবৃত পয়ার ছন্দের এরূপ অসাধারণ ও ভাবপ্রতিবিম্বী প্রবহমানতা বাংলা ছন্দের ইতিহাসে আর কোথাও উদাহৃত হয় নাই।

'বসুন্ধরা' কবিতাটি কবির 'ছিন্নপত্র'-এর বিশ্বচেতনার সহিত একাত্মতার আকৃতির অপূর্ব কাব্যভাষ্য। কবির মনে যে অনুভূতি মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত তাহাই আশ্চর্য কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া, গভীর কবি-চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক দিব্য ভাবপ্রবাহে উৎসারিত হইয়াছে। দার্শনিক ভাব-সংস্কার কবি-কল্পনায় রূপান্তরিত হইয়া, কাব্যানুভূতিতে গভীর প্রাণস্পন্দন জাগাইয়া অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যাভিপ্রায় যে কত নিগূঢ় রূপ ধারণ করিতে পারে, কত বিচিত্ররূপে সৌন্দর্যসৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হইতে পারে, কিরূপ বেগবান প্রাণহিল্লোলে আপনার জীবনী-শক্তির পরিচয় দিতে পারে, এই কবিতায় তাহার এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে।

কবি বসুন্ধরার বিচিত্র জীবনধারার সহিত অব্যবহিত সংস্পর্শের আকৃতি জানাইয়া উহার সূক্ষ্মতর, নিগূঢ় জীবনরসসঞ্চারে আপনাকে বিলীন করিতে চাহিয়াছেন। প্রকৃতির অন্তর্জীবনের সহিত একাত্ম হইয়া উহার গূঢ় সঞ্চরণ-প্রক্রিয়া, উহার কোমল, স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দময় রূপরোমাঞ্চের ও চেতনাবিলোপী নিদ্রামগ্নতার সহিত কবি নিশ্চিহ্নভাবে মিশিবার কল্পনায় বিভোর হইয়াছেন।

তাহার পর কবি বিভিন্ন দেশের অসংখ্যবিধ চিত্রসৌন্দর্য ও জীবনছন্দের অন্তরে অনুপ্রবেশাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। মরুভূমি, পার্বত্যহ্রদবেষ্টিত মালভূমি, তুষারাবৃত মেরুপ্রদেশ, সমুদ্রতীরবর্তী ধীবরপল্লী, সবই একে একে

কবিদৃষ্টির সম্মুখে বর্ণবহুল শোভাযাত্রায় সঞ্চালিত হইয়াছে। বিশেষতঃ হিংস্র আদিম প্রাণশক্তিসম্পন্ন বর্বরজাতির বলিষ্ঠ, পূর্বাপরচিন্তাহীন জীবনযাত্রা কবিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। এমন কি হিংস্র শ্বাপদও উহার প্রাণোচ্ছ্বাস-মহিমায় কবির অনুচিকীর্ষা জাগাইয়াছে।

পৃথিবীর সহিত একাত্ম মিলনস্পৃহার পিছনে কবির যে যুগযুগান্তরের পূর্বস্মৃতি সক্রিয় আছে তাহা অকস্মাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। কবিচেতনায় পৃথিবীর গর্ভস্থ প্রাণরসপ্রবাহ, উহার উপরিভাগের বিচিত্র শ্যামসৌন্দর্যের আনন্দ-কম্পন, কবিচেতনার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া, উহাকে এক উল্লাসময় সমপ্রাণতায় উদ্রিক্ত করিয়াছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার বর্তমান মানব-জীবনের বিশ্ববিবিক্ত একাকীত্বের বিচ্ছেদ-বেদনা তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নির্বাসিতের কল্পনায় জীবনের অন্যান্য বিভাগের রূপময় প্রকাশের মধ্যে এক ম্লান উদাসীনতা, এক বিষন্ন স্পর্শ-অক্ষমতার বেদনা পরিস্ফুট। কবির পুনর্মিলনের আবেগ দৃশ্যতঃ জড়পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অপূর্ব প্রাণরোমাঞ্চ, এক অবিরত নৃত্যগীতছন্দ, এক জীবন-ঐশ্বর্যের অফুরন্ত প্রবাহ অনুভব করিয়া ধরিত্রীকে এক মাতৃকল্প মূর্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত কবি কখনও নিষ্ক্রিয় দানগ্রহীতারূপে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তিনি বহির্জগতের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করেন তাহার প্রতিদানস্বরূপ নিজস্ব অনুভূতির কিছুটা প্রত্যর্পণ করিতে চাহেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কবিজনোচিত মনোবৃত্তি লইয়াই প্রকৃতির এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যমেলায় নিজ কল্পনার অতিরিক্ত ভাবসম্পদ ও রূপের চমক সংযোজনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মানুষেরও আনন্দযজ্ঞে নিজের অনুভূতিরও কিছু আহুতি নিবেদন করিতে চাহেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে প্রকৃতির রূপ ও মানুষের আবেগ তাঁহার কবিমনের বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যবোধ ও অনুভূতি-গভীরতায় মধুরতর হইবে ও ভবিষ্যৎ যুগের নিকট গাঢ়তর আবেদন বহন করিবে। কবির জীবনপিপাসা এখনও অতৃপ্ত; পৃথিবীর সহিত আরও নিবিড়তর সম্পর্কে তিনি ঘনিষ্ঠ হইতে ব্যাকুল। তাই পৃথিবীর প্রাণশক্তির গোপন উৎস, তাহার লীলা—অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকারের অন্তিম আবেদনের সহিত তিনি কবিতা শেষ করিয়াছেন।

'মানসসুন্দরী'র সঙ্গে তুলনায় 'বসুন্ধরা' অনেকটা সরল ও একমুখীন, বিশেষতঃ সম্পূর্ণরূপে প্রণয়াবেশবর্জিত। ইহা 'মানসসুন্দরী'র ন্যায় জটিল-সংশ্লেষাত্মক নহে। ইহার আবেগ সমভাবেই প্রবল ও সর্বগ্রাসী; কবিমনের একটি

সহজ সংস্কার এই দীপ্ত আবেগ-শিখার উপাদান ও তাপমাত্রা যোগাইয়াছে। প্রেমের রূপমত্ততার সহায়তা ব্যতিরেকেও কবি অপূর্ব ভাবমুগ্ধতার আবহ সৃষ্টি করিতে পারেন কবিতাটিতে তাহারই প্রমাণ মিলে।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' 'মানসসুন্দরী'র সুনিশ্চিত মিলন-আনন্দের সংশয়ক্ষুব্ধ অস্বীকৃতি। যে মানসী পূর্ব কবিতায় কবির অন্তঃপুর-লক্ষ্মীর মত স্থায়ী দাম্পত্য বন্ধনে ধরা দিয়াছিলেন, যাঁহার হৃৎস্পন্দন কবিপ্রেরণার প্রাণাবেগের মূলগত শক্তিরূপে কবির অন্তরলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যাঁহার অভয়-আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল কবিচেতনাকে সমস্ত সংশয়মুক্ত করিয়াছিল, 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'য় সেই প্রেয়সী আবার রহস্যময়ীরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। সর্বপ্রথম, তিনি অমোঘ নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপে কবিকে চালনা করিতেছেন, কবির স্বাধীন ইচ্ছা তাঁহার নিয়ন্ত্রণের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সোনার তরীতে কবির স্থান হইয়াছে, কিন্তু এই তরী আর পরিচিত পদ্মা-তরঙ্গে আবদ্ধ না থাকিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, বায়ুগর্জনক্ষুব্ধ, দিকচিহ্নহীন অকূল সমুদ্রে ভাসিয়াছে। প্রেয়সী আবার 'বিদেশিনী'-রূপে সম্বোধিত হইয়াছেন; তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁহার প্রেমবিহ্বল কলভাষণের পরিবর্তে এক অস্বস্তিকর, কটাক্ষ-ইঙ্গিতে দুর্বোধ্য নীরবতা প্রেমিকযুগলের মাঝে এক মর্মান্তিক ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। কবির সংশয়োত্তেজিত, তীক্ষ্ণ প্রশ্নপরম্পরা, অপরিচিতার পরিচয়ের জন্য উদগ্র ব্যাকুলতা, প্রাকৃতিক পরিবেশের গোধূলি-অস্পষ্ট ইঙ্গিতময়তা, সমুদ্রের দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্তমান রূপচ্ছবি, মধ্যে ঘনায়মান সংশয় ও বিশ্বব্যাপী রোদনোচ্ছ্বাসের অস্থির আন্দোলন, সর্বোপরি রহস্যময়ীর বিভ্রান্তিকর স্মিতহাস্য-প্রহেলিকা—এ সমস্তই কবির সঙ্গে মানসসুন্দরীর এক অভিনব সম্পর্ক-অনিশ্চয়তার, কবির অন্তরজগতে এক নূতন আদর্শ-বিপ্লবের সঙ্কেতে শিহরিত। সোনার তরীর রূপকে এক অজ্ঞাত আবহ-ব্যঞ্জনা প্রবেশ করিয়াছে। কবি তাঁহার মানস পরিণতির এমন এক স্তরে উপনীত হইতেছেন যেখানে ক্ষণিক মিলনতৃপ্তি কাব্যানুভূতির নূতন আঘাতে বিদীর্ণ হইয়াছে, পুরাতন সংশয় নবরূপে দেখা দিয়াছে, এক অনির্ণীত লক্ষ্য কবিচেতনাকে চেনা পথের বাহিরে আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার আজন্ম-পরিচিত কাব্যানুভূতির রূপকের তটরক্ষিত পদ্মা, মানসসুন্দরীর সঙ্গে পরিপূর্ণ প্রেমের বিশ্বস্ততায় বাঁধা উষ্ণ দাম্পত্য নীড় কোন্ এক অজানা সাগরের তটহীন বিশালতায় মিশিয়াছে, এক নিরুদ্দেশ-যাত্রার শঙ্কিত অভিযানে স্বস্তির নিশ্চয়তা হারাইতে বসিয়াছে। 'মানসসুন্দরী'র

অন্তর্যামিত্বে রূপান্তরের মধ্যেই এই বিরাট, উদ্ভিন্ন পরিবর্তনের বীজ নিহিত। যে প্রেয়সীকে কবি নিজ কাব্যপ্রেরণার স্থিরত্ববিধায়ক প্রতিশ্রুতিরূপে বক্ষে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন সেই প্রেয়সীই অকস্মাৎ নিয়তিরূপে দেখা দিয়া কবির আত্মকর্তৃত্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে নিজকরধৃত বীণারূপে বাজাইতে চলিয়াছেন। এই অভাবনীয় পরিস্থিতি যে কবিমনকে বিচলিত করিবে তাহাতে আর সংশয় কি? 'বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস-সুন্দরী'-পংক্তিতে কবি মানসীকে যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, মানসী সে আহ্বান কবির অনভিপ্রেত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বীণা ফেলিয়া কবিকেই বীণাযন্ত্ররূপে আপনার অমোঘ শক্তির ক্রীড়নকের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। 'নিরুদ্দেশ যাত্রার' এই অপূর্বভাবে ব্যঞ্জিত নব পরিণতি-দ্যোতনার মধ্যে 'সোনার তরী'র উপর যবনিকাপাত হইয়াছে।

৪

'সোনার তরী'র সঙ্গে 'চিত্রা' কাব্যের রচনায় কমবেশী এক বৎসর ব্যবধান। এই কাব্যে যদিও 'সোনার তরী'র মূল সুর কিছু পরিবর্তনের সহ অনুসৃত হইয়াছে, তথাপি ইহাতে মানব-জীবনের প্রতি আকর্ষণ কবির বাড়িয়াছে ও তাঁহার কাব্যানুভূতির মধ্যে জীবন-ভাবনা আরও গভীরভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। এখানে মানুষের সাধারণ জীবন-যাত্রার অনুচিন্তন কবির প্রকৃতি-চেতনা ও অলৌকিক সৌন্দর্যসন্ধানের অন্তরঙ্গ ভাব-পটভূমিকারূপে দেখা দিয়াছে। 'মানসসুন্দরী'র বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মী, কবির অন্তর-লক্ষ্মী ও কাব্যলক্ষ্মীর সংশ্লেষমূলক রূপ আদর্শ হিসাবে কবিকল্পনার আশ্রয়ীভূত হইয়াছে; কিন্তু এই সংশ্লেষের অখণ্ডতা আর অক্ষুন্ন নাই। ইহারই বিচ্ছিন্ন, ক্ষণ-অনুভূত রশ্মিজাল 'চিত্রা'র প্রথম দিকের কবিতাগুলির মধ্যে কোন উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া চমক বিস্তার করিয়াছে। ইহা যেন 'মানসসুন্দরী'র স্থির ভাবশিখর হইতে নিম্নতর স্তরে অবতরণ; সংশয়জালে অবরুদ্ধ দৃষ্টির চকিত উন্মোচনের চমকময়। 'অন্তর্যামী' ও 'চিত্রা'র নামকবিতায় উহার নূতন স্বরূপের উপলব্ধি ও কবি-চেতনার সঙ্গে উহার সম্পর্কের নূতন তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা! প্রেয়সী-কল্পনার শেষ রশ্মি এখনও কবিচিত্তকে রঙীন ও ভাবাবিষ্ট করিতেছে; কিন্তু এই কল্পনা যে ম্লান হইয়াছে, নূতন তত্ত্বানুভূতিতে আবৃত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। দাম্পত্য প্রেমের সহজ আবেগ এখন এক নিগূঢ়তর আকর্ষণের রহস্যদ্যোতনায় অস্পষ্ট ও

অনির্দেশ্যতর ব্যাকুলতার বাহন হইয়াছে। রূপপ্রতিমা-নির্মাণের পূর্বেও যেমন, নির্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পরেও তেমনি উহার উপাদানগুলি পরস্পর-বিশ্লিষ্ট হইয়া আবার উদ্‌ভ্রান্তি জাগাইতেছে।

'সুখ' (১০ই চৈত্র, ১২৯৯), 'জ্যোৎস্নারাত্রে' (৫—৬ই মাঘ, ১৩০০), 'প্রেমের অভিষেক' (১৪ই মাঘ, ১৩০০), 'সন্ধ্যা' (৯ই ফাল্গুন, ১৩০০), 'পূর্ণিমা' (১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২)—এই কবিতাগুলি মানসসুন্দরীর স্মৃতি-অনুভাবিত, তাহারই বিদীর্ণ আদর্শকল্পনার ভগ্নখণ্ডাংশসঞ্চয়ের আকৃতিতে পূর্ণ। 'সুখ' কবিতাটি 'সোনার তরী'র যুগের উদ্‌বৃত্ত ভাবপ্রত্যয়। মানসসুন্দরীর অভয়-আশ্বাসভরা চক্ষে কবি আজ সুখকে খুব সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত অধিকাররূপে দেখিতেছেন। কিন্তু ইহার পটভূমিকা ও অনুভূতিসার গঠিত হইয়াছে পদ্মাতীরস্থ পল্লীজীবনের নিশ্চিন্ত আনন্দ ও উহার প্রকৃতির রূপকল্প দ্বারা। এই শান্তি বিশ্বানুভূতিতে আবিষ্ট কবিচিত্তে বিশ্ববীণার নীরব সঙ্গীতরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এবং এই শান্তিময়, আনন্দময়, বিশ্বচেতনার সহিত একাত্ম উপলব্ধিটি কবি বাক্যে গাঁথিয়া কেমন করিয়া তাঁহার প্রেয়সীর নিকট অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিবেন সেই চিন্তায় ঈষৎ বিব্রত। স্পষ্ট বোঝা যায় এই সুখ-শান্তির পিছনে কবির বিশ্বাত্ম-বোধ ও মানসী-প্রেম অন্তরালবর্তী হইয়াও নিগূঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল। 'জ্যোৎস্নারাত্রে' ও 'পূর্ণিমা'-য় একই আকৃতি চড়া ও নীচু সুরে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। প্রথম কবিতাটিতে মানসসুন্দরীর ভাবমুগ্ধতা, নিবিড় প্রণয়াবেশ ও প্রকৃতিসৌন্দর্যের মধ্যবর্তিতায় তাহার অনুভবপ্রয়াস অতি সুস্পষ্ট। নূতন সুরের মধ্যে ক্ষোভ ও অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মাননসুন্দরীর হারানো সান্নিধ্যের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কবিচিত্তের দুর্মর বাসনা প্রকাশ করিতেছে। 'মানসসুন্দরী' আবার অনন্ত তৃষার উদ্দীপিকা, কবির অন্তরের কামনা দিয়া বারবার গড়া ও ভাঙা, অজ্ঞাত দেবতার ছদ্মবেশ-ধারিণী হইয়াছেন। কবি মানুষের অপ্রাপণীয় দিব্য মূর্তি প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছেন। মানসীর নিবিড় আলিঙ্গন এখন আলিঙ্গনস্মৃতিতে পর্যবসিত হইয়াছে; চিরদিবসের, জন্মজন্মান্তরের প্রিয়া আজ এক রাত্রির আবির্ভাবরূপে আরাধিত হইয়াছেন। কবি প্রেম-অমরার বহির্দ্বারে নির্বাসিত হইয়া সুধাপানের ক্ষীণ আভাস-ইঙ্গিতে, দূর হইতে ভাসিয়া-আসা পারিজাতগন্ধে, যতটুকু তৃপ্ত তাহার অপেক্ষা বেশী উন্মনা হইতেছেন। জ্যোৎস্নারাত্রির এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী; কিন্তু কবি সেই নির্জন অন্তঃপুরে প্রেমিকের নিঃসঙ্কোচ অধিকারে আসেন নাই, আসিয়াছেন মাল্যকারের কুণ্ঠিত অনুগ্রহপ্রার্থী

হইয়া। এখানে 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এর বিপরীত সুর ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা ভোগস্বর্গ হইতে নহে, প্রেমস্বর্গ হইতে বিদায়; এবং কোন মানবী প্রেয়সীর প্রণয়মধুর আমন্ত্রণ এই বিদায়ের ক্লেশকে মন্দীভূত করে নাই।

প্রায় দুই বৎসর পরে লেখা 'পূর্ণিমা' কবিতায় উৎকণ্ঠা অপেক্ষা বিস্ময়ের পরিমাণই বেশী। এখানে সমালোচনাতত্ত্বের সাহায্যে সৌন্দর্য-উপলব্ধির ব্যর্থ প্রয়াস ও ক্ষুদ্র দীপশিখার অন্তরালে বিশ্বপ্লাবী জ্যোৎস্নাপ্রবাহের আত্মগোপন—উভয়ের মধ্যেই একটা বিপরীত-দ্যোতনামূলক ভাবসাম্য বর্তমান। এখানে সৌন্দর্যলক্ষ্মী কবির প্রতি একটি পরিহাসমধুর কটাক্ষ করিয়াছেন। পূর্ণিমাকে কবি 'অনন্তের অন্তরশায়িনী' আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাহার আকস্মিক আত্ম-উদ্ঘাটনে তাহার প্রতি প্রণয়নিবেদনে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন। এখানেও পূর্ণিমা 'বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী'রূপে কবির অন্তরে বিশ্বচেতনার উদ্বোধন করিয়াছে। কবি এই কৌতুকরসের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া উচ্ছ্বাসের আতিশয্য বর্জন করিয়াছেন। কিন্তু এই স্বল্প উল্লেখেও কবিচিত্তের অনন্তাভিমুখিতা ও মানসীস্মৃতি-প্রভাবিত প্রণয়াকৃতি পরিস্ফুট হইয়াছে।

'প্রেমের অভিষেক' বাহ্যতঃ মর্ত্যপ্রেমের জয়গান হইলেও ইহার অন্তরে 'মানসসুন্দরী'র দিব্য বিভা উদ্ভাসিত। ইহা যে কোন উঞ্ছবৃত্তি, আপনার সৌভাগ্যস্ফীত কেরানির ভাবোচ্ছ্বাস নহে, তাহা সমস্ত কবিতার দিব্যলাবণ্যময় অঙ্গদ্যুতিতে, উহার পৌরাণিক উল্লেখ-পরম্পরায় ও কাব্যসাহিত্যে বিশ্রুত, আদর্শ প্রণয়ীদম্পতির সহিত সাদৃশ্য-ঘোষণায় প্রমাণিত। মানসসুন্দরীর বিমূর্ত-কল্পনা নূতন ভাব-প্রতিবেশে এই কবিতাটির অন্তরপ্রেরণারূপে বিরাজিত। এই প্রেমিক যিনিই হন, তিনি অন্ততঃ হরিপদ কেরানির সগোত্রীয় নহেন। কোন অবদমিত কামনার করুণ ব্যঞ্জনা নয়, সমৃদ্ধিমান, ঐশ্বর্যময় প্রেমই এখানে মর্ত্যলোকে অমরাবতী সৃজন করিয়াছে। এই প্রেমের স্বর্গীয় অধিকারে ইহার প্রেমিকের সৌন্দর্যের নন্দন-ভূমিতে অবাধ সঞ্চরণ। রবিচন্দ্রতারা যে প্রেমরাজ্যের সভাসদ্ ও প্রশস্তি-সঙ্গীতকার, যে প্রেমের রোমাঞ্চ চন্দ্রের সুধার ন্যায়, সূর্যের মধ্যে হোমাগ্নিশিখার ন্যায়, নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে কমলার কণ্ঠহারদ্যুতির ন্যায় প্রেমিক-চিত্তে চিরসঞ্চিত তাহা যে সমস্ত মর্ত্যসীমার অতীত তাহা নিঃসন্দেহ, তাহা ভূলোকের হইলেও দ্যুলোকের। এখানে কবির প্রেম বিধিদত্ত অধিকারে স্বর্গরাজ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত।

'সন্ধ্যা' কবিতায় কবিমনে সন্ধ্যার শান্তি, নিঃসঙ্গতা ও অসীমচিন্তার উদ্বোধন

ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার পূর্বতন কাব্যগ্রন্থে সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় কবিতার তুলনায় ইহা অনেকটা স্থির ভাবনিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। কবির প্রণয়-অতৃপ্তির ক্ষোভ ও অনায়ত্ত আদর্শের বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধ্যার শান্তি বিশেষ অর্থবহ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমস্ত গভীর অনুভূতিই অনন্তপ্রয়াণের জন্য সদা-উন্মুখ। তাই এই পবিত্র ক্ষণে তিনি অনন্তের সঙ্গে সন্ধির জন্য তাঁহার অশান্ত চিত্তের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন ও অসীমের পদতলে জীবনের স্মৃতিনির্যাস দুই বিন্দু অশ্রুজলের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। এখানে কবির মানস অবসাদ তাঁহার অভীপ্সার নিম্নগামিতায় প্রতিফলিত—বাসনাসংঘাতক্ষুব্ধ কবি অনন্তের সঙ্গে সন্ধি চাহিয়াছেন, উহার সহিত সর্বাত্মক মিলন তাঁহার আশাতীত মনে হইয়াছে। গ্রামজীবনে স্বল্পরেখাঙ্কিত কয়েকটি খণ্ড ছবি এই শান্তির আধার রচনা করিয়া উহাকে একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নির্দিষ্ট রূপ দিয়াছে। প্রকৃতির আবেদন মানবজীবনের মাধ্যমে পরিশ্রুত হইয়া স্পষ্টতা ও অন্তর্গভীরতা উভয় গুণেই মণ্ডিত হইয়াছে।

এক বৃহত্তর পরা দৃষ্টি (cosmic vision) সন্ধ্যানুভূতিকে যুগযুগান্তরব্যাপ্ত, দূরতম অতীতের বিচিত্র পরিবর্তনের রেখাজালকীর্ণ পটভূমিকায় বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়া উহার অন্তর-ইতিহাসকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। দিনান্তের সমাপ্তিস্তব্ধ সন্ধ্যা গ্রামবধূর ন্যায় উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া অতীতস্মৃতিবিভোর হইয়াছে ও এই স্মৃতিরোমন্থনের মধ্যে পৃথিবীর বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের বহুবিধ অস্পষ্ট, তপ্ত ও স্নিগ্ধ জীবনচর্যা, উহার প্রাগৈতিহাসিক অতীতের জীবনমৃত্যুর নানারূপ দ্বন্দ্ব, অবক্ষয় ও অবলুপ্তির মধ্য দিয়া নবজীবনশক্তিসঞ্চয়—সমস্তই উহার মানস চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এক ক্ষণিক কালবিন্দুতে অতীত জীবন-মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালায় আবর্তিত এক বিরাট ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এক বিপুল ইতিহাসচেতনা ও জীববিজ্ঞান-পরিচয় কবির প্রকৃতিধ্যানকে গভীর অর্থগৌরবে ভরিয়া তুলিয়াছে। অনাদি অতীত, বসুন্ধরার মনে অনন্ত ভবিষ্যতের সীমাহীন যাত্রাপথের চিন্তা জাগাইয়াছে ও এক সমাধানহীন জিজ্ঞাসাচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছে।

'স্নেহস্মৃতি' (বর্ষশেষ, ১৩০০), 'নববর্ষে' (নববর্ষ, ১৩০১), 'দুঃসময়' (৫ই বৈশাখ, ১৩০১) ও 'মৃত্যুর পরে' (৫ই বৈশাখ, ১৩০১)—কবিতাচতুষ্টয় দশবৎসর পূর্বে মৃত্যুকবলিতা কাদম্বরী দেবীর শোকস্মৃতিতর্পণ। ইহাদের মধ্যে এই তরুণী বধূর আত্মহত্যা ঠাকুর পরিবারে ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যে তুমুল বিস্ময়—

নিন্দা-সমবেদনা-মিশ্রিত আলোড়ন তুলিয়াছিল, যে বিচার-বিতর্ক উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই একটি মৃদু প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই মৃত্যুস্মৃতি-রোমন্থনে কবিচিত্তের বিহ্বলতাও বেশী করিয়া চোখে পড়ে। কবি এই অপরাধিনীর কঠোর বিচার না করিবার জন্য, স্নেহময় বিস্মৃতির আবরণে তাহার সমস্ত দোষ ঢাকিবার জন্য, সমস্ত বিসদৃশ ব্যাপারটিকে ক্ষমাস্নিগ্ধ চোখে দেখিবার জন্য করুণ মিনতি জানাইয়াছেন। এখানে মৃত্যুর যে রূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দার্শনিক সান্ত্বনাবাক্যে বা আদর্শান্বিত কাব্যোচ্ছ্বাসে তাহার রূঢ় আঘাতকে কোমলস্পর্শ করা যায় না। এই গ্লানিপূর্ণ মরণের রমণীয় কাব্য-রূপান্তর বা ভাবোন্নয়ন সম্ভব নহে। কবির নিদারুণ আঘাতে অসাড়, আকস্মিক আক্রমণে মুহ্যমান মন এই জটিল প্রহেলিকার পাকে পাকে ঘুরিয়াছে, ক্লান্ত পুনরাবৃত্তিতে, দীর্ঘ অনুশোচনায়, বিস্মৃতির করুণ স্নিগ্ধতায়, নিন্দা ও কুৎসার মিনতিপূর্ণ প্রতিষেধে, নির্মম জগতের প্রসাদযাচ্ঞায় উহাকে সুদীর্ঘ বৃত্তে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। এই কবিতাগুলির আবেগ স্তিমিত, ছন্দ দীর্ঘ-শ্বাসের মত বিষণ্ণ-করুণ, আবহ কান্নায় ভারি ও নীরন্ধ্র। রবীন্দ্রকাব্যে এই মৃত্যু-কবিতাগুলি এক অসাধারণ ব্যতিক্রম। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ-উল্লেখ এই পর্বেই নিঃশেষিত। কিন্তু ইহার সূক্ষ্মতর প্রভাব কবির অবচেতন মনে নিগূঢ়শায়ী থাকিয়া তাঁহার পরবর্তী কবিতায় কোথাও কোথাও অতর্কিত-ভাবে ও আত্মগোপনকারী ইঙ্গিতে অস্তিত্বের স্পর্শ রাখিয়া গিয়াছে।

'চিত্রা'র একটি বৈশিষ্ট্য উহার বর্ধিত মানবপ্রীতির প্রচুরতর নিদর্শন। কবি নিজেই বলিয়াছেন যে নিরুদ্দেশ ও অমর্ত্য সৌন্দর্যসন্ধানের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তিনি সুখদুঃখময় সাধারণ মানবজীবনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহার পদ্মাজীবনের সমস্ত অনুভূতিই দ্বি-কোটিক। একদিকে উহার উচ্ছল স্রোতোবেগ, বিরাট বিস্তার ও উহার সুদূরপ্রসারিত নিঃসঙ্গ বালুচর অসীমানুভূতি ও রহস্যদ্যোতনার উৎস। অপরদিকে উহার তীরের ঘনপল্লবপ্রচ্ছন্ন, মানুষের হৃৎস্পন্দনে মৃদু-আন্দোলিত, শান্তিময় প্রাণ-গুলি কবির মানবিক সহানুভূতি উদ্রেক্ করিয়া তাঁহার মর্ত্যপ্রীতিকে ঘনীভূত করে। কবিহৃদয় এই দুই বিপরীতমুখী আকর্ষণে দ্বিধা-বিভক্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে এই দুইএর মধ্যে কোন সত্যকার বিরোধ নাই। মানবজীবন যখন আদর্শায়িত হইয়া কোন বৃহৎ ভাবের বাহন হয়, তখনই উহা কবিচিত্তে প্রবেশ লাভ করে। উহার মৃত্তিকাগন্ধী বৃত্তিসমূহ, উহার প্রতিদিনকার

ঘর্মাক্ত শ্রম, উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ-বিক্ষোভ সাধারণতঃ কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। যখন শান্তিমন্ত্রে বিশোধিত হইয়া, প্রকৃতির অন্তরঙ্গতায় এক বৃহত্তর সত্তার অঙ্গীভূত হইয়া ইহারা যখন এক নব তাৎপর্য লাভ করে, তখনই ইহারা কবির মানসস্বীকৃতিতে ধন্য হয়।

যেমন মানবজীবনবিচ্ছুরিত সূক্ষ্ম আভাস-ইঙ্গিতগুলিই তাঁহার নিরুদ্দেশ-যাত্রার পালে অনুকূল বায়ুর গরিবেগ সঞ্চার করে, সেইরূপ সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ জীবনযাত্রা কবির অনুভূতিতে আদর্শাভিমুখী হইলেই তাঁহার সৌন্দর্যলোকের অন্তর্ভূক্ত হয়। বৈষ্ণবদর্শনের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ন্যায় এখানেও দুই-এ এক, একেই দুই। বহুজনের রাজপথে ভ্রমণ করিতে কবি দৃঢ়সংকল্প হইলেও তাঁহার অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মী তাঁহাকে কি কুহকমন্ত্রে ভুলাইয়া ভাবলোকের সবুজতৃণাস্তীর্ণ, ছায়াস্নিগ্ধ বনবীথিতেই ফিরাইয়া আনে।

৫

২৩শে ফাল্গুন, ১৩০০-তারিখে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি কবির পথপরিবর্তনের নিদর্শনস্তম্ভরূপে সমালোচকগোষ্ঠী কর্তৃক এক গুরুত্ব-পূর্ণ তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। এখানে কবির মোড়ফেরার ঘোষণা অত্যন্ত দৃঢ় এবং উচ্চকণ্ঠ। তিনি নিজ কাব্যচর্চাকে কর্তব্যপলাতক বালকের ক্রীড়াসক্তির পর্যায়ে ফেলিয়াছেন ও সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রতিকারহীন, প্রতিবাদহীন, অদৃষ্টনির্ভর লাঞ্ছনা-বঞ্চনার এক হৃদয়-দ্রবকারী ছবি আঁকিয়াছেন। তাহাদের মূকমৌন বেদনার ভাষা যোগাইয়া, তাহাদের সুপ্ত মর্যাদাবোধ ও প্রতি-রোধশক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, তাহাদের জন্য বলিষ্ঠ আশা ও স্বাস্থ্যোজ্জল, দীর্ঘ পরমায়ু দাবী করিয়া তিনি তাঁহার মানবদরদী মনের অবিসংবাদিত পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটু পরেই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে তিনি কবিজনোচিত উপায়েই এই গণসংগ্রামের সহিত সহযোগিতা করিবেন। এই সংগ্রামে তাঁহার অবদান হইবে স্বর্গ হইতে আনা বিশ্বাসের ছবি—অর্থাৎ আদর্শ কল্পনার কাব্যময় প্রয়োগেই তিনি জনতার মনোবল বৃদ্ধি করিবেন।

পরবর্তী স্তবকে কবি গণমনের সহিত অপরিচয়ের জন্য নিজ কুণ্ঠিত লজ্জা প্রকাশ করিয়াছেন ও তাঁহার বাঁশি যে তাঁহাকে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতময় রণস্থল হইতে দূরে রাখিয়াছে তাহার জন্য আত্মধিক্কার দিয়াছেন। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত এই বাঁশির উপরেই তিনি ভবিষ্যতের সমস্ত আশা ন্যস্ত করিয়াছেন। এই বাঁশিই জীবনের গীতশূন্য অবসাদপুরকে, কর্মহীনতার নিশ্চলতাকে মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে সঞ্জীবিত করিবে, অন্তরের গভীর পিপাসার নিকট স্বর্গের অমৃত পরিবেশন করিবে ও জীবনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে মহাগীতে নির্বাণপ্রাপ্ত করাইবে। অর্থাৎ কবি বাঁশি বাজাইয়া জীবনযাত্রার মৌলিক পরিবর্তন আনিবেন; বাঁশির পরিবর্তে কোনদিন অসি ধরিবেন না। এই বাঁশির সুরেই জীবনের সমস্ত সংকীর্ণতা অতিক্রান্ত হইবে, বিশ্বজীবনের মহাতরঙ্গে উল্লাসময় আত্মনিমজ্জনের প্রেরণা জাগিবে, মৃত্যুভয়তুচ্ছকারী মানবের নির্বাধ সত্যাভিযান সুরু হইবে। সত্যদ্রষ্টা মহামানবের উদাত্ত আহ্বান মানবসাধারণের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উহাদিগকে আদর্শের জন্য সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে প্রণোদিত করিবে। মানবের সমস্ত জীবন-ইতিহাস এক বিরামহীন আদর্শ-অভিসারের শোভাযাত্রা-মহিমার রূপ ধারণ করিবে।

অবশেষে কবি যাহাকে জীবনসর্বস্বধন সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার মিলনের জন্য তিনি জনতার পুরোবর্তী হইয়া অভিসারে বাহির হইয়াছেন, তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হইয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা গেল যে এই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেরণাদাত্রী দেবতা সেই বহুপরিচিতা কবির মানসলক্ষ্মী—নিরুপমা সৌন্দর্যপ্রতিমা। তাহারই বিশ্ববিজয়িনী প্রেমমূর্তিখানি জনতার সমষ্টিগত মনে প্রতিবিম্বিত হউক বা না হউক, পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে আপন রূপচ্ছবি অঙ্কিত করিবে। সেই বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াই কবি জনসেবার পথে অগ্রসর হইবেন। প্রণয়াভিসার ও রণাভিযান কবির ক্ষেত্রে এক হইয়া গিয়াছে। যাত্রাশেষে কবির চরম পুরস্কার মিলিবে মহিমালক্ষ্মীর ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যদানে, সর্বপ্রেমতৃষার এক প্রেমের নিবৃত্তিতে। দীর্ঘপথ পর্যটনের পর, অশেষ ক্লেশবরণ ও রক্তপাতের পর, যুদ্ধক্ষেত্রের নানা বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া কবি তাঁহার চিরকালের সৌন্দর্যলক্ষ্মীরই দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়াছেন—সক্রিয়, সোচ্চার মানবপ্রীতি মানসসুন্দরীর আদর্শ সাধনায় বিলীন হইয়াছে। কবি 'অন্তর্যামী'তে যাহা বলিয়াছেন—

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে

তাহা যেন এই পুরাতন ভাবস্রোতে অনভিপ্রেত আত্মসমর্পণে আক্ষরিকভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিকে রবীন্দ্রকাব্যের বৈপ্লবিক দিকপরিবর্তনের সূচনারূপে গ্রহণ করা যে কতটা সমর্থনযোগ্য তাহা পূর্বোক্ত আলোচনায় অনেকটা পরিস্ফুট হইবে। এই কবিতাটির ভাষাও যেন কিছুটা অলঙ্কারস্ফীত ও ভাব নৈতিকতাধর্মী—ইহাদের মধ্যে কবিকল্পনার চারুতা ও অনুভূতির সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গতার যেন কিছুটা অভাব মনে হয়। ভাবনাপরিণতিও অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত ও আকস্মিকতার প্রভাবে শিথিল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মানবের প্রতি অনুরাগের আন্তরিকতা নিঃসংশয়; কিন্তু ইহা কঠোর বাস্তব জীবনসংগ্রামের প্রতি তাঁহার কবিধর্মের জন্যই অনেকটা উদাসীন। কবি নিজেই তাঁহার এই বস্তুনিষ্ঠ জীবনাকর্ষণকে এক সাময়িক খেয়াল মনে করিয়া তাঁহার পরবর্তী দুইটি কবিতায় 'শীতে ও বসন্তে' (১৮ই আষাঢ়, ১৩০২) ও 'নগরসংগীত'-এর (১৮৯৫, ১৪ই আগস্ট ?) উহার হাস্যাস্পদ ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াধর্মী প্রবল উৎসাহের ফুৎকারে কবির প্রবহমান কাব্যধারায় যে একটি বস্তুবুদ্‌বুদ্‌ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা কঠিন পিণ্ডাকারে জমাট বাঁধার পূর্বেই কৌতুকের বিপরীতমুখী বায়ুতরঙ্গে ফাটিয়া খান খান হইয়া গেল। বসন্তের সদ্যোজাত উতলা বাতাসে কবির সারবান সাহিত্যপ্রয়াস মুহূর্তে বিপর্যস্ত হইয়া গেল ও কবির প্রথম প্রেম —যৌবনগীতি ও প্রকৃতির মদির সৌন্দর্য—কবিচিত্তকে পুনরধিকার করিল। 'নগরসংগীত'-এ নগরীর কর্মসংঘাতে ফেনিল জীবনমদিরা উহার অন্তর্নিহিত বিপুল প্রাণশক্তিতে কবির ক্ষণিক বিস্ময় ও অনুসরণস্পৃহা জাগ্রত করিলেও, শেষ পর্যন্ত উহার বীভৎস আতিশয্য তাঁহার শ্লেষপ্রণবতাকেই উত্তেজিত করিয়াছে। যে পানপাত্রে তাঁহার প্রেয়সী মানসসুন্দরীর চুম্বন পড়ে নাই, তাহা উগ্রসুরাপরিপূর্ণ হইলেও কবির গ্রহণযোগ্য হয় নাই—কবি তাহাকে মুহূর্তের জন্য অভিনন্দন জানাইয়াই পরমুহূর্তে উপেক্ষা করিয়াছেন। মানুষের মর্মান্তিক জীবনসংগ্রামের প্রতি মমতা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সারবান সাহিত্যরচনার শুষ্ক মরুভূমিতে ও কর্মমুখর নগরজীবনের স্বর্ণমায়ামুগ্ধ উদ্‌ভ্রান্তিতে ও ত্বরাতাড়িত চিত্ত-উৎক্ষেপে উহার উদার প্রেরণাকে নিঃশেষিত করিয়াছে। যে পরিমাণে মানসসুন্দরীর প্রসন্নদৃষ্টি ও স্মিতহাস্য জীবনসংগ্রামের উপর বর্ষিত হইয়া উহাকে সৌন্দর্যরাজ্যের সীমাভুক্ত করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণেই উহা কবির কাব্যের বিষয়োপযোগিতার স্বীকৃতি পাইয়াছে। যে পথ শেষ পর্যন্ত মানসলক্ষ্মীর মিলনকুঞ্জে কবিকে

পৌছাইয়া দেন নাই, তাহার মানবিক মূল্য যত বেশীই হউক, সে পথে কবির পদচারণা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই।

৬

'চিত্রা'-কাব্যে গীতিকবিতা সংখ্যায় খুব অল্প ; যে কয়েকটি আছে তাহাদের অধিকাংশই চিত্রা-পরিকল্পনার কবরী-বন্ধনে আবদ্ধ পুষ্পমাল্যের ন্যায় ঐক্যসূত্র-বিধৃত। কেবল কয়েকটিরই স্বতন্ত্র প্রেরণা লক্ষিত হয়। এগুলি আবার পরবর্তী কব্যপরিণতির পূর্বসূচনা। 'দিনশেষে' (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২) খেয়ার অর্থগূঢ় সাংকেতিকতার প্রথম আভাস। কবি এক সন্ধ্যাগোধূলিতে এক নতমুখী তরুণীর কঙ্কণঝঙ্কারের মৌন ইঙ্গিতে আকৃষ্ট হইয়া, চারিদিকের নিথর নীরবতা, মন্দিরচূড়াত্রিশূলে ঝলকিত অস্তসূর্যরশ্মি, দূর রাজপ্রাসাদ হইতে ভাসিয়া-আসা পূরবীর উদাস সুরের বিচিত্র সমবায়ে এক মায়ারাজ্য গড়িয়া সেইখানেই তাঁহার দীর্ঘভ্রমণক্লান্ত, আদর্শ মরীচিকার অনুসরণে উদ্‌ভ্রান্ত পথিক-চিত্তের আবাসনীড় রচনা করিতে চাহেন। এই মায়াজগতের মধ্যমণি কঙ্কণঝঙ্কারবাহিত প্রেমের নিগূঢ় আহ্বান। তির্যক ব্যঞ্জনার সার্থক সন্নিবেশে এই অন্তঃসঙ্গতিময়, ক্লান্তি-দ্যোতনায় করুণ, যাত্রাসমাপ্তির আশ্বাসে রমণীয় ভাবপ্রতিবেশটি অপূর্ব অনুভূতি-নিবিড়তায় পরিপূর্ণ হইয়াছে।

'গৃহশত্রু' (১৫ই মাঘ, ১৩০২) সমস্ত গোপন চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া প্রেমিকার প্রণয়োল্লাস তাহার নিজ আভরণ, অঙ্গ ও অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে নিজ পরিচয় ঘোষণা করিয়াছে। এই গোপন ভাবপ্রকাশে তাহার নূপুরঝঙ্কার, তাহার অধীর হৃদয়, তাহার বক্ষে জ্বলা প্রেমের দ্যুতি ও তাহার অঙ্কশায়িনী বীণা সবই সহযোগিতা করিয়া তাহাকে অপ্রস্তুত করিয়াছে। প্রতিটি স্তবকে অবদমিত ভাবের নব নব প্রকাশ প্রণয়ের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিয়া সমস্ত কবিতার গীতসুর ও অন্তঃসঙ্গতির হেতু হইয়াছে। '১৪০০ সাল'-এ (২রা ফাল্গুন, ১৩০২) কবি 'সোনার তরী'-র 'পুরস্কার' কবিতায় জীবনকে মধুরতর করিবার যে সাধারণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারই একটি বিশেষ উপলক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার ভাবানুগামী, অসমদৈর্ঘ্যের পংক্তিগ্রথিত ছন্দোবিন্যাস পরবর্তী 'বলাকা'-কাব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আজিকার বসন্তদিনের সমস্ত শোভা, গন্ধ, মধুর ভাবোচ্ছ্বাস শতবর্ষ পরের আর এক ফাল্গুন

দিনে সংক্রামিত হইয়া উহার মাধুর্যকে কি নিবিড়তর করিবে না—কবি সসংকোচে আগামী যুগের পাঠককে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। হায় কবি, তুমি জানিতে না যে সেই সুদূর ভবিষ্যতে বসন্তই মানুষের দাহ-উপাদানপূর্ণ, সৌন্দর্যবিমূঢ় হৃদয়ের আঁচে ঝলসিয়া গিয়া আপনার সমস্ত সরস, নবীন পুষ্পপল্লবোদ্গম সংহরণ করিবে ও ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত কবির মন আকাশের চাঁদে ঝলসান রুটির সাদৃশ্য অনুভব করিবে।

'নীরব তন্ত্রী'-তে (৪ঠা ফাল্গুন, ১৩০২) কবি বলিতেছেন যে তিনি ভগবৎ-চরণে তাঁহার প্রেম উৎসর্গ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বীণাতন্ত্রীতে প্রেমের সুর নীরব হইয়াছে। ইহা তাঁহার সমকালীন কবিজীবনে সত্য না হইলেও তাঁহার অনাগত যুগের নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতি ভগবৎপ্রেমবিষয়ক কাব্যের ভবিষ্যদ্বাণী।

'প্রৌঢ়' (৭ই ফাল্গুন, ১৩০২) সনেটটি কবির কাব্যজীবনের যৌবনাবসান ও প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাগমের সংবাদ দিয়াছে। 'কড়ি ও কোমল' হইতে যে প্রমত্ত যৌবনাবেশ ও সর্বব্যাপ্ত প্রেমানুভূতি কবিচিত্তকে বিহ্বল করিয়াছিল, তাহা 'মানসী', 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র প্রথমাংশ পর্যন্ত নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া, 'চিত্রা'র সমাপ্তি-পর্যায়ে প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞাপরিণতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কবির বিশ্বব্যাপী যৌবনস্বপ্ন কবিকে দ্রুতগামী আবেগতরঙ্গে দোলাইয়া ও তাঁহার মনকে যৌবনানুকূল রূপমুগ্ধতার প্রতি নিবিষ্ট রাখিয়া তাঁহার সত্যদৃষ্টি ও জীবনবোধকে কিছুটা অপরিণত রাখিয়াছিল। এখন যৌবনলীলার অবসানে কবির স্বপ্ন টুটিয়াছে ও তিনি আত্মসমাহিত নিঃসঙ্গতার গবাক্ষপথে জীবন ও জগৎকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই শান্ত জীবনসমীক্ষায় মৃদু কল্লোল-ধ্বনি ও বিচিত্র গন্ধ তাঁহার আবেশমুক্ত চেতনায় উপলব্ধ হইতেছে ও অনন্ত লোকের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রণয়মোহনিরপেক্ষ স্বচ্ছতায় তাঁহার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে ধীর মহিমায় উদ্ঘাটিত হইতেছে। 'চিত্রা'র পরে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহারই ইহা যথার্থ স্বরূপনির্দেশ।

এইবার 'চিত্রা'র নাম-কবিতায় (১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২) কবি 'মানসসুন্দরী' সম্বন্ধে একটি নবলব্ধ প্রশান্ত তত্ত্ব-উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন। মানসসুন্দরীর অন্বেষণের প্রথম পর্ব হইতেই নানা রূপের মধ্যে তাহার চকিত আভাস, আদর্শ সৌন্দর্যসত্তাকে নির্দিষ্ট রূপবন্ধনে বাঁধিবার ব্যাকুল প্রয়াস কবিচিত্তকে এক অশ্রান্ত, অসমাপ্ত পরীক্ষার গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত করিতেছিল। 'সোনার তরী'র 'মানস-

সুন্দরী' কবিতায় বাহিরে চিরপলাতক, বিশ্বের অণু-পরমাণুতে বিকীর্ণ সৌন্দর্যলক্ষ্মী ও কবির অন্তর্নিহিত কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস অন্তরলক্ষ্মীর ক্ষণিক অভিন্নতাবোধে ও কবির সহিত এই যুগ্মসত্তার স্থায়ী পরিণয়বন্ধনে এই অন্বেষণ একটা সাময়িক প্রাপ্তির নিশ্চিত আনন্দে সমাপ্তি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই মিলনসুখ স্থায়ী হয় নাই। বক্ষোলগ্না প্রেয়সী কখনও মূর্তিমতী কখনও বিমূর্তা হইয়া, ভাব ও রূপের মধ্যে অস্থিরভাবে আন্দোলিত হইয়া, পূর্বজন্ম ও পরজন্মের নানা সংশয়িত কল্পনার ও আকৃতির বিষয়ীভূত হইয়া আবার নিবিড় আলিঙ্গনচ্যুত ও বহির্বিশ্বের সৌন্দর্যের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছে। অনন্তপ্রেমের জনয়িত্রী নিখিল-সৌন্দর্যমূর্তির সঙ্গে যখন কাব্যজীবননিয়ন্ত্রী, বিচিত্রভাবময়ী কবিতাধিষ্ঠাত্রী দেবীর সত্তা মিশিয়া গেল, তখন কবিকল্পনা যে নব নব তরঙ্গোচ্ছলতায় চূর্ণ-সূর্যকরদীপ্তির সঙ্কেতরেখা বিকীর্ণ করিবে তাহাই স্বাভাবিক। অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসার সঙ্গে অসিদ্ধ কাব্যাদর্শের সাধনাসংবেগ যুক্ত হইয়া কবিচিত্ত যে বিপুল, বহুমুখী লীলাচাঞ্চল্য জাগাইয়াছে তাহা নির্দিষ্ট রূপকের সীমা ছাড়াইয়া নানা রশ্মিবিচ্ছুরণে অনির্বচনীয়তা লাভ করিয়াছে। এই লীলাবিলাসের কতটুকু বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ, কতটুকুই বা কবিসত্তারহস্যে বিস্ময়, কোন্ অংশই বা জন্মজন্মান্তরব্যাপ্ত অস্তিত্বের মধ্য দিয়া নিগূঢ় অভিপ্রায়সাধক ঐশীশক্তির উপলব্ধি তাহা কে সঠিকভাবে নির্ণয় করিবে? সমালোচনার বিশ্লেষণীশক্তিতে উপাদানমিশ্রণের এই সূক্ষ্ম রাসায়নিক ক্রিয়া ধরা পড়ে না।

বিশেষতঃ কবি এই তত্ত্বের শুধু স্রষ্টা নয়, ব্যাখ্যাতারূপেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। কবির পরবর্তী ব্যাখ্যা যে সব সময় তাঁহার সৃষ্টিকালীন অভিপ্রায়ের মর্মভেদ করিতে পারে তাহাও সর্বতোভাবে গ্রাহ্য নহে। কবির তত্ত্বব্যাখ্যা তাঁহার অন্তর্নিহিত এই রহস্যময়ী শক্তির ক্রিয়াপরিধি ক্রমশঃ বর্ধিত করিয়াছে। ইহা তাঁহার অনন্তবোধ ও প্রেমানুভূতি হইতে তাঁহার কবিজীবনে, কবিজীবন হইতে তাঁহার ব্যক্তিসত্তায় ও ব্যক্তিসত্তা হইতে তাঁহার অনাদি-অতীত ও অনন্ত-ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ব্যাপ্ত অস্তিত্বভাবনায় সম্প্রসারিত হইয়া এক বিরাট, অনির্ণেয় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কবি তাঁহার বর্তমান জীবনসীমা অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যৎ জন্ম-পরম্পরাতেও এই অসীমচারিণীকে বধূরূপে লাভ করিবার অভিলাষী। পরজন্মে তিনি কবি হইয়াই জন্মগ্রহণ করিবেন কিনা তাহা অনিশ্চিত। সুতরাং তাঁহার কাঙ্ক্ষিত প্রেয়সীর মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীর যে রূপদীপ্তিটুকু ছিল তাহা হয়ত অন্তর্হিত হইতে পারে। তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে যে নিবিড়-অনুরাগময় দাম্পত্য সম্পর্ক

শোভন ও সঙ্গত, তাঁহার জীবননিয়ন্তা বিধাতা বা সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ের পূর্ণতাবিধায়ক বিশ্বদেবতার সহিত সেই প্রণয়মধুর, আবেগ-বৈচিত্র্যে উপভোগ্য ভাব ও ভাষা সুপ্রযুক্ত না হইতে পারে। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত বিশ্বদেবতাকল্পনা এই লীলারসচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ও সেবা-ভক্তি-আত্মসমর্পণের বিধি-অনুসরণেই কবির সহিত তাঁহার মিলনের পালা চলিয়াছে। প্রকৃতিসৌন্দর্যের সঙ্গে ঐশী আবির্ভাবের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু প্রেমের বিগলিত মাধুর্য ও কবিপ্রেরণার নানা রূপান্তরের মধ্যে আভাসিত অন্তর্যামী ও বিশ্বদেবতার সহিত তাঁহার ভাবাসঙ্গ শিথিল হইয়া আসিয়াছে। রূপকানুভবের অতিবিস্তার উহার অনির্দেশ্যতাকে ঘনীভূত করিয়া শেষ পর্যন্ত উহাকে একটা রূপাবয়বহীন ভাবকুহেলিকায় পর্যবসিত করিয়াছে।

'চিত্রা' কবিতার প্রায় দেড়বৎসর পূর্বে লেখা 'অন্তর্যামী' (ভাদ্র, ১৩০১) ও উহার স্বল্পকাল-পরবর্তী 'জীবনদেবতা' (২৯শে মাঘ, ১৩০২) ও 'চিত্রার' শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে' (২০শে ফাল্গুন, ১৩০২) কবিতাগুলির ভাবকল্পনা-অবলম্বনেই 'চিত্রা'র তত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'অন্তর্যামী' "মানসসুন্দরী'র ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পরিণতি। এখানে কবি তাঁহার কাব্য-ইতিহাসকেই এক কৌতুকময়ী অন্তরশক্তির লীলারহস্যের রূপকে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কবিতার আলোকে কবির মানসসুন্দরীর অন্বেষণ-প্রয়াস নূতন অর্থে প্রকটিত হইয়াছে। 'মানসী' ও 'সোনার তরী' পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতাই এই পরোক্ষ উল্লেখের অন্তর্ভুক্ত। এখানে কবির অসীমের প্রতি আকর্ষণের মূলে এই শক্তিরই অদৃশ্য প্রভাবের কাহিনী আমাদিগকে কবির অন্তর-রহস্যভেদের নূতন ইঙ্গিত দেয়। সাধারণ প্রেমের কাহিনী কাহার অলক্ষ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আদর্শরূপপিপাসার নিগূঢ় বেদনায় রূপান্তরিত হইল, প্রাকৃতনারী কেমন করিয়া অলৌকিক সত্তার ব্যঞ্জনায় দিব্যরূপধারিণী হইল, মানবিক উৎকণ্ঠা কাহার প্রেরণায় নিখিলের মর্মাকৃতিতে উদ্বর্তিত হইল তাহাই এই উদ্‌ঘাটনের মূল কথা।

বলিতেছিলাম বসি এক ধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত।

এবং

গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে।

একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
সে পথে বাহির হইনু খেলায়,
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।

রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতা এই বর্ণনার লক্ষ্য? মনে হয় এই পংক্তিগুলি কবিতায় আরোপিত সমকালীন ছোট গল্পের সারসংকলন। হয়ত কবির 'প্রভাত-সংগীত'-এ মানবের প্রতি তাঁহার অকস্মাৎ প্রীতি-অনুভব ও মানব-জীবনে সহজ, সমস্যাহীন আনন্দের আবিষ্কার ও 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসী'র বিশুদ্ধ মানবভিত্তিক প্রেম-কবিতা কবির এই ঘরোয়া কথা বলা ও প্রাকৃতপ্রেমের সুনির্দিষ্ট আবেগ প্রকাশ করার ইচ্ছাই ব্যক্ত করিতেছে। এই প্রাথমিক রচনা-পর্বে অনির্দ্দেশ্যতার কুহেলিকা-আবরণ, অস্পষ্ট ভাবাকৃতির প্রকাশ-বাধা সত্ত অপসারিত হইতেছে। তরুণ কবি জীবনের আনন্দমেলায় যোগ দিতে প্রস্তুত হইতেছেন। প্রকৃতিসৌন্দর্য ও মানবপ্রীতি জড়তার আচ্ছাদন ভেদ করিয়া স্বচ্ছ আলোকে কবির নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সহজ প্রেমের ইন্দ্রিয়ানুরাগ ও যৌবনাবেশ কবিচিত্তে প্রথম অনুভূতির দুর্দম মোহ সঞ্চার করিতেছে। অকস্মাৎ অন্তর্যামী মানস-সুন্দরীর রূপে আসিয়া কবির সমস্ত উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত করিয়া দিলেন। কুহেলিকা বাহির হইতে অপসারিত হইয়া কবির অন্তর-লোকে আলো-আঁধারি মায়া ঘনীভূত করিল, স্বচ্ছদৃষ্টি অজানা অনুভূতির বিহ্বলতায় ঘোরাল হইল, বাস্তব প্রতিবেশ অচেনা রাজ্যের কুহকে সুদূর-অনধিগম্য হইয়া উঠিল। রক্ত-মাংসের প্রেয়সী এক অপ্রাপণীয়া, পরিচয় ও অপরিচয়ের মধ্যে দোদুল্যমানা আদর্শপ্রতিমার রূপে দেখা দিয়া কবির সমস্ত অনুভূতি ও শিল্পচেতনাকে এক অকল্পনীয় শক্তির অধীন করিল।

কবিপ্রেরণার এই অভাবনীয় রূপান্তরের কাহিনী কবি রূপকপ্রয়োগে অথচ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা বেদনার আগুনে পুড়িয়া, অপ্রাবৃত

অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া যে মানসীমূর্তি গঠন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কবির কোন সচেতন কর্তৃত্ব ছিল না। তাঁহার সঙ্গীতপ্রবাহ, অন্ধ-আবেগ-তাড়িত ছন্দোলীলা, তাঁহার ব্যক্তিগত বেদনার মধ্যে বিশ্ব-বেদনার অনুরণন সবই এই মায়াশক্তির দান। তিনি যে বহুজনের রাজপথে না চলিয়া তাঁহার নিজস্ব নিঃসঙ্গ পথে চলিয়াছেন, তিনি যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া নিজ উদ্দেশ্যের অনুধাবন করিতে পারেন নাই, তিনি যে নানা সঙ্কটময়, দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছেন ও এই সমস্ত দারুণ দুঃখানুভূতির মধ্যে এক অজানা আনন্দে বিহ্বল হইয়াছেন তাহা এই অন্তরবাসিনীর নিগূঢ় অভিপ্রায়ে। কবি ইহার হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র।

কবি আরও বলিয়াছেন যে ইনিই কবির কাব্যানুভূতিকে অসীমের সঙ্গে যুক্ত ও তাঁহার প্রেমের মধ্যে অনাদিযুগের স্মৃতিজড়িত ভাবগভীরতার সঞ্চার করিয়াছেন। কবির সহিত তাঁহার অন্তর্যামিনীর সম্বন্ধ কতদিন স্থায়ী হইবে, কাব্য-প্রেরণা নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তর হইতে তিনি অন্তর্হিত হইবেন কি না এই সংশয় কবিচিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। তাঁহাকে দিয়া অন্তর্যামী বিশ্বদেবতার পূজা করাইয়া লইতেছেন কি না সে কৌতূহলও কবিমনে জাগ্রত হইয়াছে। কবির এত কৃচ্ছ্রসাধন, হোমানলে তাঁহার জীবন-আহুতি হয়ত পরিণামে এই অজ্ঞেয় প্রেরণাকে কবির অন্তরের গোপনতা হইতে মুক্তি দিয়া উহাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বহির্জগতের মূর্তিরূপে প্রত্যক্ষ করাইবে।

বর্তমান জীবনের শেষে দেবী কবিকে কি মূর্তিতে দেখা দিবেন তাহার কল্পনাতে কবি আবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। মোটামুটি এই বর্ণনা মানসসুন্দরীর প্রেমাবেশকল্পনারই পুনরাবৃত্তি। মানসসুন্দরীর ক্ষেত্রে তাহার দুরধিগম্যতার যে সংশয় কবির পরিপূর্ণ মিলনতৃপ্তিকে কণ্টকিত করিয়াছে, অন্তর্যামীর ক্ষেত্রেও সেই সংশয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছে। কবি অন্তর্যামীকে মূর্তিতে ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত বিরহমিলনমিশ্র, পাওয়া-ও-হারানোর অনিশ্চয়ে উদভ্রান্ত সম্পর্ককে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বর্তমান জীবনের মত ভুলভ্রান্তি দুরাশা-তাড়িত জীবনের ছন্দোপতন, তীব্রবেদনার অনুভব আবার কবির ভবিষ্যৎ জীবনেরও অভিজ্ঞতা হইবে এই ভিত্তিতেই কবি অন্তর্যামীর সহিত চিরন্তন সম্বন্ধ স্থাপন করিবার অভিলাষী।

এই সংক্ষিপ্তসার হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে 'অন্তর্যামী' কাব্যজীবনের রূপক-রহস্য। কবি এখানে তাঁহার কাব্যপ্রেরণার নিগূঢ় উৎসের কথাই নিজ অন্তর-উপলব্ধির চকিত আলোকে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। এই কবিতায়

প্রেয়সীর রূপ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; কৌতুকময়ী কাব্যশক্তিনিয়ন্ত্রীর মূর্তিই উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির মৃত্যু-সময়েই ইনি মধুরহাসিনীর প্রণয়িনীরূপে মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে দাঁড়াইবেন ও কবিকে নিবিড় আলিঙ্গনের আনন্দ অনুভব করাইবেন। অন্য সময়ে কিন্তু ইহার, পরস্পরবিরোধী নির্দেশে দুর্বোধ্য, অন্তর ও বাহিরের বৈপরীত্যে প্রহেলিকাময় প্রকাশ।

কবি নিজে ইহার যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে ইহার মধ্যে কোন দৈব শক্তি লা ঐশী লীলা অস্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ কবি-চেতনায় যে দ্বৈতসত্তার ক্রিয়া অনুভূত হয়, কবির সঙ্গে অন্তর্যামীর সম্পর্ক তাহারই প্রতীক। শুধু কবি কেন, সমস্ত মানুষের মধ্যেই এক আদর্শপ্রেরণা ও অপর উহার অসম্পূর্ণ, অতৃপ্তিকর বস্তুরূপায়ণ—এই দুই শক্তির অস্তিত্ব অনুভবগম্য হয়। সেই মানদণ্ডে বিচার করিলে, অন্তর্যামী কবির অনায়ত্ত, রূপাতীত কাব্যাদর্শকল্পনা; আর কবি নিজে সেই আদর্শের অপটু, অক্ষম কারিগর। সর্বপ্রকার শিল্পীর মত কবিশিল্পীও তাঁহার ভাবাদর্শ ও রূপসৃষ্টির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সম্বন্ধে সচেতন। ছিন্নপত্রে কবি এই দ্বৈতসত্তাকে বাইরের আমি' এবং 'আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা' এই দুই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু 'অন্তর্যামী' কবিতায় এই অন্তঃপুরবাসী আত্মার যে বিচিত্র পরিচয় উদঘাটিত হইয়াছে, কবির সঙ্গে তাঁহার যে অপূর্ব অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে কেবল উর্ধ্বতর কবিচেতনার প্রতীক্ বলিয়া মনে করা যায় না। ইনি কবির অন্তরলীন হইয়াও বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত ও কবির জন্মজন্মান্তরের ধ্রুবতারা। অন্তর্জগতে ও বহির্বিশ্বে উভয়ত্রই ইহার স্বচ্ছন্দ লীলাবিচরণ। কৃষ্ণানুরাগিণী রাধার অন্তর্লোক হইতে নিষ্কাশিত ও রূপসত্তায় প্রত্যক্ষীকৃত আদর্শপ্রেমসাধনার মত এই অন্তর্যামী কবির ব্যক্তিসীমা হইতে মুক্তি পাইয়া, বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য ও প্রেমের সমস্ত আবেগচঞ্চল লীলা-বৈচিত্র্য আপনার মধ্যে সংহত করিয়া, কবির বিচিত্রগামী কাব্যপ্রেরণার প্রত্যক্ষ-হেতুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈষ্ণব ভক্তকবির মত রবীন্দ্রনাথও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিয়াছেন—'আমার অন্তর হৈতে কে কৈল বাহির'। তবে 'চিত্রা'র অন্তর্যামী এখনও কাব্যজীবনেই নিজ নিগূঢ় ক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন।

জন্মান্তরের পরমলগ্নে উপস্থিত থাকিলেও ইনি সমগ্রজীবননিয়ন্তা জীবন-দেবতায় এখনও উদ্বর্তিত হন নাই। আর বিশ্বের প্রতি সৌন্দর্যকণায় মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া ও কবিচিত্তকে বিশ্বাভিমুখী করিতে সহায়তা করিয়াও ইনি

নিখিলবিশ্বের পরিচালক ও প্রাণকেন্দ্র বিশ্বদেবতারূপে ও ধর্মচেতনাসমর্থিত ঈশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিভাত হন নাই। অবশ্য কবি তাঁহার ভাবাকৃতির চরম-উন্নয়ন-মুহূর্তে (climax) যে ভাষায় অন্তর্যামীকে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাতে এই ত্রিবিধসত্তার বীজ-সম্ভাবনা তাঁহার মনে অঙ্কুরিত হইয়াছে এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে।

চিরদিবসের মর্মের ব্যথা,
শত জনমের চির সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী।

কবিতায় বিভিন্নস্থানে উল্লিখিত উক্তিগুলি শুধু সাধারণ উচ্ছ্বাস নয়, কবির কাব্যজীবনের বিভিন্নস্তরের ও মানস অভিজ্ঞতার ইঙ্গিতবাহী মনে হয়। যে সংগীত, লাবণ্য, ক্রন্দন কবির ব্যক্তিজীবনের অতীত, যে ছন্দ অন্ধবেগে আনন্দ বেদনার ভরাস্রোতে প্রবহমান, যে রূপকের অর্থ ও তত্ত্ব কবির অজ্ঞাত ও পাঠকের দুর্বোধ্য—এগুলি 'মানসী' হইতে কবির যে অভিনব কাব্যচেতনার উন্মেষ তাহার প্রতি নিশ্চিত অঙ্গুলি-সঙ্কেত। যে পথের দুর্গমতার কথা কবি বলিয়াছেন—

কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল।
কভু সংকট ছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম

তাহা কোন কোন সমালোচক কবির নবজাগ্রত মানবতাবোধ, সংগ্রাম-ক্ষুব্ধ মানবজীবনের প্রতি তাঁহার কাব্যাকর্ষণ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু কবির মানবতাবোধের যে আদর্শায়িত রূপের পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে এরূপ অনুমান সমর্থিত হয় না। কবির সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সমস্ত সংশয়-সংঘাত তাঁহার অন্তর্লোকসম্বন্ধীয়। বাহিরের ঝড়-ঝাপটা তাঁহার মনে আঘাত হানিলেও তাঁহার কবিচেতনা ইহাতে উল্লেখযোগ্যভাবে বিপর্যস্ত হয় নাই। ব্যক্তিমন হইতে কবিমনে সংক্রমিত হইবার পূর্বে ইহারা আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং এই উক্তির লক্ষ্য অন্যবিধ। মানবের সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্টপথে চলিতে অভ্যস্ত শক্তি ও অনুভব লইয়া অতিমানবিক, অসীমাভিমুখী, অতীন্দ্রিয় ভাবের অনুকরণ যেন ক্ষুরধার, অতিদুর্গম পথে পদক্ষেপ। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'

—ইতি কবয়ঃ বদন্তি—উপনিষদের এই সত্য এক কবির মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। এই অধ্যাত্মযাত্রার মধ্যে কবির যে বারে বারে পদস্খলন, লক্ষ্য-চ্যুতি ঘটিয়াছে, অরূপের উপলব্ধিতে রূপের স্থূলতা যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, উদ্দাম, উন্মত্ত কল্পনা যে সমগ্র কবি-সত্তার ভারসাম্যহানির আশঙ্কা জাগাইয়াছে, এই স্তবকে সেই অন্তর্জগতের কথাই রূপকাভাসিত হইয়াছে।

'জীবন-দেবতা' (২৯শে মাঘ, ১৩০২) 'অন্তর্যামীর' প্রায় দেড় বৎসর পরে লেখা। ইহাতে অন্তর্যামী-কল্পনার সমাপ্তিসূচক সুর ধ্বনিত হইয়াছে। আগের কবিতাটিতে কবির মন অতীতমুখী ; অন্তর্যামীর স্বরূপরহস্য-উন্মোচনে ও কবিচিত্তের উপর উহার নিগূঢ় প্রভাব-বর্ণনায় নিয়োজিত। 'জীবন-দেবতা'য় যেন এই লীলারহস্যের অন্তিম তাৎপর্যটুকু ছাঁকিয়া লইবার প্রয়াস। কবি তাঁহার অন্তর-দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কবিচিত্তে আবির্ভূত হইবার অভিপ্রায় তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে কি না। তিনি তাঁহার অন্তরমথিত অনুভবরাজি দিয়া, সৌন্দর্যসম্ভারের বিপুল আয়োজনে এই অন্তরদেবতার প্রীতিকাম হইয়া, তাঁহার নূতন নূতন মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন। এই গূঢ়চারী দেবতা কেন কবিচিত্তকে নিজ লীলাক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহার যৌবনকল্পনাবিকশিত কামনাপুষ্পগুলিকে নিজের খেয়াল-মত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার বিভিন্নভাবপ্রকাশক সঙ্গীতগুলির নীরব শ্রোতারূপে তাহাদের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন তাহা কবি জানেন না। কিন্তু তাঁহার অন্তরদেবতা কি এই অর্ঘ্যে তৃপ্ত হইয়াছেন ? কবি এই দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন, কবির অন্তর্লোকের রহস্যভেদী শক্তির নিকট নিজ ত্রুটি স্বীকার করিতেছেন —ইহার আদর্শভাবনা হইতে কবির কাব্যকৃতি যে গুরুতরভাবে স্খলিত হইয়াছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। অন্তর্যামীর উদ্যানে ফুল ফুটাইবার প্রস্তুতিরূপে কবি যে জলসেচনের ভার লইয়াছিলেন তাহা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন নাই—শিথিলপ্রযত্ন মালীর ন্যায় তিনি নিজ অসংস্কৃত ইচ্ছার তরুচ্ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই প্রণয়পর্ব এখন শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রেয়সীর সঙ্গে প্রণয়কলা-চর্চার মদির উন্মাদনা স্তিমিত হইয়াছে। এখন কবি পরজন্মে আবার নূতন উপাদান দিয়া, চিত্তের নূতন সরসতা, নবোন্মেষিত প্রেমের প্রথম মাদকতা দিয়া নবদাম্পত্যসম্পর্ক-স্থাপনের প্রতীক্ষায় আছেন। কবি বৈষ্ণবপদাবলীর

ইহজন্মবিড়ম্বিতা, পরজন্মপ্রত্যাশিনী নায়িকার মত অনাগত ভবিষ্যতের মিলন-স্বপ্নরোমাঞ্চিত আশামুগ্ধতার সুরে কবিতা শেষ করিয়াছেন।

'অন্তর্যামী'-তে কবির বিস্ময় 'জীবন-দেবতা'র প্রতি প্রশ্নহীন প্রগাঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। প্রথম কবিতাটিতে কবির কাব্যরচনায় আত্ম-কর্তৃত্বলোপ ও এক নিগূঢ়তর ইচ্ছার অনুবর্তন যেন প্রথম কবির নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাই এই প্রশ্নাকুল বিস্ময় কবির পরনিয়ন্ত্রিত-অবস্থার প্রথম উপলব্ধির সূচক। কিন্তু পরবর্তী কবিতায় কবি কেন আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন সে প্রশ্ন তুলিতেছেন না; তিনি কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে এই সুনিশ্চিত আত্মসমর্পণ একান্ত ও তাঁহার চালকশক্তির অভিপ্রায়ানুরূপ হইয়া উঠিয়াছে কি না। এ জন্মে যদি এই আদর্শ পূর্ণ না হইয়া থাকে, তবে আগামী জন্মেও তিনি এই জীবননিবেদনব্রতে দীক্ষিত হইতে প্রস্তুত। কাজেই অন্তর্যামীর জীবনদেবতায় পরিণতি। যে অজ্ঞাতশক্তি কবির অন্তর-অন্তঃপুরের গোপনতায় আপনাকে আবৃত রাখিয়া কবির দৃশ্যতঃ স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমে নিজ নিগূঢ় উদ্দেশ্যসাধন করিতেছিলেন, কবিসত্তার সহিত আপন সত্তা মিশাইয়া আত্ম-পরিচয় অপ্রত্যক্ষ রাখিতেছিলেন, তিনি 'জীবনদেবতা'য় তাঁহার লীলাসমাপ্তির পর কবিমনের অধীশ্বর এক স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারীরূপে কবির অনুভবে নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিভাত হইয়াছেন। 'অন্তর্যামী'-তে কবি আরাধ্য দেবতার সম্ভাব্য অংশ; 'জীবনদেবতা'য় কবি সম্পূর্ণভাবে দেবস্বভাববিশ্লিষ্ট আরাধনাকারী ভক্ত। অন্তর্যামীর তারাখচিত অন্ধকার হইতে জীবনদেবতার ভাস্বর সূর্যোদয় এবং হয়ত স্নিগ্ধবর্ণচ্ছটাময় রক্তিম সূর্যাস্তও।

'চিত্রা' কাব্যের শেষ কবিতা 'সিন্ধুপারে' (২০শে ফাল্গুন, ১৩০২) এই মানস-সুন্দরী—অন্তর্যামী-জীবনদেবতার মিলিত সত্তার লীলাভিনয়ের উপর অতি-নাটকীয়, অপ্রাকৃত-আতঙ্ক-কণ্টকিত অন্তিম যবনিকাপাত। এখানে কবি কবি-প্রকৃতিরহস্যকে অন্তরের নিঃসঙ্গতা হইতে বহিঃপ্রতিবেশের প্রেতভীতি-উদ্দীপক ভাবাসঙ্গের মধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রেয়সী-চরিত্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ও জীবনদেবতার অন্তিম স্তবকের নববিবাহের প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া কবি অপ্রাকৃত মায়াঘন পরিবেশে এক ভীতিবিহ্বল বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্তর্যামীর মূল কল্পনানুসারী প্রেয়সীর নিঃশব্দ অঙ্গুলি-সঙ্কেত ভয়ে ও অনিশ্চয়তায় অসাড় কবিকে মন্ত্রসম্মোহিতবৎ চালিত করিয়াছে ও অবগুণ্ঠনের

অন্তরালে প্রিয়ার পরিচয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। আবার জীবনদেবতার মরণোত্তর প্রভাব উদাহৃত করিবার জন্য কবি আপনাকে মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ করাইয়া নবজীবন-প্রভাতে সেই চিরপরিচিত জীবনদেবতার সহিত নূতন দাম্পত্য মিলনে সংযুক্ত করিয়াছেন। উল্লিখিত তিনটি কবিতার মূল সঙ্কেতগুলি এখানে কষ্টকল্পনার সাহায্যে সমন্বিত হইয়াছে। কিন্তু কবিমনের অন্তরতম প্রত্যয়ের এই প্রেত-বিভীষিকাময়, অপ্রাকৃতকল্পনাস্ফীত ভাবমণ্ডলে স্থানান্তরীকরণে একটি অপ্রিয় সত্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা এই ভোজবাজীর সহায়তা গ্রহণ করিয়া নিজ দুর্বলতাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। মানসসুন্দরী যাহাই হউন না কেন, তাঁহার এই অবাঞ্ছিত ভৌতিক পরিণতি দেখিতে, আরব্য-উপন্যাসের স্থূল ইন্দ্রজালময় ভাবাবহে তাঁহার বিসদৃশ আচরণের সম্মুখীন হইতে, আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। অবশ্য কবিকল্পনা ভাবাসঙ্গ-উদ্বোধনে অসাধ্য-সাধন করিয়াছে; কিন্তু আয়াস-নির্মিত বেদীর সহিত উহার উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিমার অসামঞ্জস্য কবির অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির দ্বারাও দূরীভূত হয় নাই।

এইবার 'চিত্রা'-কাব্যের নামকবিতায় কবি যে তাঁহার অন্তরবাসিনী ও বিচিত্ররূপিণী এই উভয় সত্তার মধ্যে একটি প্রশান্ত তত্ত্ব-সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। বাহিরে বহুকাব্য-স্তুতা, বহু বর্ণগন্ধসংগীতের অর্ঘ্যে পূজিতা বিচিত্রা, আর অন্তরে সমস্ত অন্তরলোককে ব্যাপ্ত করিয়া, উহার নানা আবেগ-কল্পনাকে একমুখীন করিয়া, বাহ্য চাঞ্চল্যের বিপরীতরূপে বিপুল ধ্যানশক্তি ও কর্মবিরতিবিধান করিয়া এক অচঞ্চল, দীপ্ত মূর্তি একেশ্বর মহিমায় বিরাজিত। কিন্তু এই দার্শনিক সমন্বয় কবির আবেগসংঘাতে বার বার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অন্তর ও বাহিরের বিরোধ বার বার দেখা দিয়াছে। অন্তরের মূর্তিকে বাহিরে দেখিবার উদগ্রকামনা, নানা রূপের মধ্যে এই অরূপ সত্তাকে ধরিবার ব্যাকুল প্রয়াস, অন্তরবাসিনীর সহিত কবির সম্পর্ক-নির্ণয়ে দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তাবোধ, মুহুর্মুহু আবির্ভাব—অন্তর্ধানে দুর্নিরীক্ষ্য এই সত্তার স্বরূপনিরূপণ প্রভৃতি নানা আবেগতরঙ্গ এই দার্শনিকমনননির্মিত সত্তাবিভাগকে পুনঃপুনঃ বিপর্যস্ত করিয়াছে। সুতরাই এই জাতীয় অধ্যাত্মপ্রত্যয়দৃঢ় কবিতাগুলিকে কবির মানস বিচারের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া মানসসুন্দরী-সম্পর্কিত আবেগমথিত কবিতাগুলির প্রতি ইহা কতদূর প্রযোজ্য তাহাই বিশেষভাবে আলোচ্য। সমুদ্রের যদি একটা স্থির, ঘাত-প্রতিঘাতের সামঞ্জস্য-সুষম রূপ কল্পনা করা যাইত, তাহা হইলে সেই কাল্পনিক রূপাদর্শের সহিত বাস্তব

সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত-চঞ্চল মূর্তির যতটুকু মিল, কবির পরিপাটি আদর্শবিন্যাসের সহিত তাঁহার কবিতায় তরঙ্গিত আবেগের অস্থির ছন্দের মিল তাহা অপেক্ষা বেশী হইবে না। কবি যে নিজ দর্শনসীমাকে বার বার উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার বিশেষ কিছু নাই। বরং তিনি যে অন্তরের অবিরত আলোড়নের মধ্যে একটা দার্শনিক ভারসাম্য অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন ইহা অধিকতর আশ্চর্যজনক।

মানসসুন্দরী-জীবনদেবতা-পর্যায় 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'তেই এক রস-প্লাবন সৃষ্টি করিয়া ও অপূর্ব মূর্তিনির্মাণদক্ষতার পরিচয় দিয়া কবির পরবর্তী কাব্যপর্বে কতকটা অপ্রধান ও স্মৃতিচারণার উপলক্ষ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। তাঁর প্রেমচেতনা অপেক্ষাকৃত সংযত হইয়াছে। প্রকৃতিচেতনা পূর্বাপেক্ষা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচিত্ররসভূয়িষ্ঠ হইলেও একটা বিশেষ কল্পনাছন্দের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়াছে। ইহা আর মানসীর অঙ্গলাবণ্যদ্যোতনায় নিয়োজিত নহে। ইহা স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কিংবা ঐশী-অনুভূতির বাহক। আর 'জীবন-দেবতা' কবির সহিত বিশেষ প্রেমমধুর সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বররূপে তাঁহার ভক্তি ও আত্মনিবেদনের রাজকরগ্রহীতা হইয়াছেন। যে অসাধারণ মানসক্রিয়া-সমাবেশে প্রেমকল্পনা ও কাব্যসৃষ্টির উত্তেজনা কবিচিত্তে এই ভাবময়ী প্রেরণাকে রূপময়ী, লীলাচঞ্চলা সত্রারূপে অনুভব করিয়াছিল তাহা কোন কবির জীবনেই স্থায়ী হয় না; রবীন্দ্রনাথেরও হয় নাই। প্রথমতঃ তাঁহার প্রণয়ানুভূতি যৌবন-স্বপ্নাচ্ছন্নতা ও সর্বগ্রাসী, বিশ্বব্যাপ্ত অনুপ্রবেশশক্তি হারাইয়া অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ ও বিশেষ-উপলক্ষ্যসীমিত হইয়াছে—ইহা কল্পলোকবাসিনী অপেক্ষা মানবিক আবেগচ্ছন্দিতা প্রিয়াকেই অধিক আশ্রয় করিয়াছে। সর্বোপরি কাব্যলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার প্রণয়িসুলভ সম্বন্ধ উহার প্রথম চমকিত বিস্ময়রোধ উত্তীর্ণ হইয়া সুনির্দিষ্ট রচনা-প্রক্রিয়ার নিয়মানুবর্তী হইয়াছে। তরুণ কবির প্রথম হৃদয়সমুদ্র-মন্থন হইতে যে অপরূপ কবিপ্রেয়সী শুভবুদ্ধি উর্বশীর ন্যায় উত্থিত হইয়া কবির নয়নে মোহবিভ্রম জাগাইয়াছে ও এক অলৌকিক শক্তির সহিত তাঁহার সহযোগিত্বের ধারণা জন্মাইয়াছে, তাঁহার পরবর্তী কাব্যস্তরে সে মোহ অনেকাংশে ক্ষীণ হইয়া তাঁহার আত্মকর্তৃত্ব ও শিল্পবোধ অধিকতর সজাগ হইয়াছে। কবির ভবিষ্যৎ রচনায় মানসসুন্দরী লীলাসঙ্গিনীর অপেক্ষাকৃত অপ্রধান অংশ অভিনয় করিয়াছে। অন্তর্যামী আর সচেতনভাবে কবিভাবনা ও কাব্যসৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন না। কবি তাঁহার উপস্থিতি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সচেতন হন, তবে

তাঁহার সক্রিয় প্রভাব এখন অতীতস্মৃতিচারিতায় ঈষৎ-প্রকাশিত। জীবনদেবতার কল্যাণময় অভিভাবকত্বে কবির আস্থা এখনও অক্ষুণ্ণ ও তাঁহার জন্মান্তরীণ স্মৃতি এখনও অম্লান। কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্লীন ও কবি-আত্মায় মাঝে মাঝে ছায়ানিক্ষেপী এই দেবতা পূর্বতন লীলাবিলাসে সহযোগিত্ব বর্জন করিয়া এখন কবির মননাশ্রয়ী, বিশ্ববিধানের মূর্ত প্রকাশরূপে গম্ভীরতর ভাবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইনি এখনও চকিত আবির্ভাবে কবিকে বিস্মিত করেন; কবি এখনও ইহাকে প্রিয়, দয়িত ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে পূর্ব সম্পর্কের স্মৃতি জাগরূক রাখেন। কিন্তু তথাপি কবির অনুরাগে আর পূর্ব মদিরতা নাই। তাঁহার জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা একেবারে ভোর না হইলেও যে নিশান্তের মোহভঙ্গস্পৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তী কাব্যে অভিসার-কল্পনা হয় রূপক-ধূসরতায় বর্ণহীন ও মননপ্রধান; না হয় সাংসারিকতার অভিভব হইতে বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল অনুভূতির উদ্বোধক। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের পরে মহত্তর ও গভীরতর জীবনবোধ-সমন্বিত কাব্যরচনা করিয়াছেন। কিন্তু গীতা-ব্যাখ্যাতা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে বৃন্দাবনের কৈশোরলীলার ন্যায় কবির মহত্তর সৃষ্টির পিছনে তাঁহার কৈশোর-কল্পনার অত্যুচ্ছ্বাসময় সৌকুমার্য চাপা পড়িয়াছে।

মানসসুন্দরী-অন্তর্যামী ভাবকে কেন্দ্র করিয়া 'চিত্রা'য় অনেকগুলি ক্ষুদ্র কবিতা রচিত হইয়াছে। 'সাধনা' (৪ঠা কার্তিক, ১৩০১), 'সান্ত্বনা' (২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২), 'শেষ উপহার' (১লা পৌষ, ১৩০২), 'মরীচিকা' (১৬ই মাঘ, ১৩০২) 'উৎসব' (২২শে মাঘ, ১৩০২) ও 'রাত্রে ও প্রভাতে' (১লা ফাল্গুন, ১৩০২)— এই কবিতা কয়েকটি, যে কেন্দ্রীয় ভাবগভীরতায় কবি-চিত্ত এই যুগে আবিষ্ট হইয়াছিল তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত কণাস্ফুলিঙ্গ। এগুলি কাব্যগুণে চমৎকার, ভাবদ্যোতনাগুণে এই চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'সান্ত্বনা' সংসারযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত প্রেমিকের প্রতি প্রণয়িনীর সান্ত্বনাবাক্যপ্রয়োগ। কিন্তু উহার ভাব ও ভাষার মধ্যে কাব্যাদর্শসংপৃক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে কাতর কবি-চিত্তের প্রতি মানসসুন্দরী-অন্তর্যামীর অপরূপ প্রেমবিগলিত শুশ্রূষার গভীরতর ব্যঞ্জনা সহজেই ধরা যায়। বাসর-কক্ষে দম্পতিমিলনের অন্তরঙ্গ নিভৃতি, দুই দেহের মধ্যে এক সমপ্রাণ আত্মার ললিতমধুর সঞ্চরণ, সান্ত্বনা-প্রলেপের আশ্চর্য স্নিগ্ধতা কবিতাটির ভাবাবহ ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়া অপরূপভাবে ফুটিয়াছে। এই গার্হস্থ্য চিত্রের বিরল রেখাঙ্কনের মধ্যে কিন্তু রাজোচিত ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য উল্লেখ আমাদিগকে ইহার অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতি সচেতন করিয়া তোলে। 'বাসরের রাণী', 'শয্যা-

রাজধানী', প্রেমিককে রাজা করার ও অমর বরমাল্যদানের সঙ্কল্প, নক্ষত্রসভার কৌতূহলী প্রতীক্ষা—সবই আমাদিগকে এক উচ্চতর রূপকতাৎপর্যের স্তরে পৌছাইয়া দেয়। 'সাধনা'য় কবির দীন স্বীকারোক্তি, যথাসাধ্য চেষ্টার পরেও ব্যর্থতার বেদনাপ্রকাশ, দেবীচরণে রিক্ত অর্ঘ্যডালা-নিবেদন—'অন্তর্যামী'-ভাবধারারই সুস্পষ্ট প্রকাশ। 'সাধনা'র এই কাতর অনুনয়ের উত্তরেই দেবীপক্ষ হইতে 'সান্ত্বনার' প্রত্যুত্তর। 'শেষ উপহার' পূর্ব অবদানের দাবীতে বর্তমান রিক্ততার মধ্যেও দেবীর প্রসাদ-ভিক্ষা, দেবীর হাতে নব বরমাল্যের প্রার্থনা ও তাঁহার অনন্ত পরাণে কবির পূর্বতন কাব্যকৃতির চিরন্তন অনুরণনের আশা-প্রকাশ। 'উৎসব' কবিতাটিতে কবিপ্রেমিকার দেহ-মনে বসন্তের লাবণ্যবিকাশের অনুভূতি 'মহুয়া'র পূর্বাভাস। কবি 'অন্তর্যামী'তে তাঁহার অন্তরদেবতাকে যে সংশয়িত প্রশ্ন করিয়াছিলেন এখানে তাহার আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় উত্তর। সেই মনোবনবাসী দেবতা কবির যৌবনবনে যে অনাবিল তৃপ্তির সহিত পদচারণা করিয়াছেন, কবির গানে যে শত অভিলাষ ভাষা পাইয়াছে তাহা যে তাঁহারই হৃদয়-নিঃসৃত, যৌবনলাবণ্যের যে শতধা-উৎসারিত ধারা কবিকে বিমনা করিয়াছে তাহা যে তাঁহারই আনন্দে স্থির আশ্রয় পাইয়াছে—এই সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে কবি নিঃসন্দেহ। 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবির সহিত অন্তরলক্ষ্মীর দুই প্রকার সম্পর্ক আভাসিত। জ্যোৎস্নানিশীথে প্রমত্ত যৌবনাবেশ, আর মোহমুক্ত প্রভাতে শুচিস্নাতা সুন্দরী হইতে সম্ভ্রমময় ব্যবধান এই দুই স্তরই অন্তর্যামীর সহিত কবির সম্পর্কে উদাহৃত। 'মরীচিকা'-সনেটটিও কবির এক অবিশ্বাস-মুহূর্তের মানসপ্রতিক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করা যায়। মানসসুন্দরী যে সত্যই মরীচিকা এ সন্দেহ যে কবিচিত্তে কখন কখন দেখা না দিয়াছিল তাহা নহে। অনন্ত সুখের আকর বলিয়া যাহার প্রতি কবির সমস্ত কামনা উৎকণ্ঠা আগ্রহে ধাবিত হইয়াছিল তাহা যে অনন্ত পিপাসা-পটে চিরতৃষ্ণার্তের স্বপ্ন এই সম্ভাব্য সত্য এক বিরল অবসাদক্ষণে কবিচিত্তে প্রতিভাত হইয়াছে। বৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ডের সহিত উহার কোমল শাখা-পল্লব যেমন একই প্রাণশক্তিতে ও রসপ্রবাহে সংযুক্ত, সেইরূপ কবির বৃহৎ পরিকল্পনা হইতে উৎসারিত ছোট ছোট আবেগতরঙ্গ এই ক্ষুদ্র গীতিকবিতা-গুলির মধ্যে লঘুতর প্রাণধারা সঞ্চারিত করিয়াছে।

বাকী থাকিল 'চিত্রা'-কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতা—'আবেদন' (২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২), 'উর্বশী' (২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২), 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২) ও 'বিজয়িনী' (১লা মাঘ, ১৩০২)। এগুলি সবই মনন, গীতিরস, পৌরাণিক কল্পনা ও ভাবসৌকুমার্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত সৌন্দর্যসারঘন, উদারবিস্তৃত রচনা। 'আবেদন'-এ নাটকের বহিরবয়বে গীতিকবিতায় রূপমুগ্ধতা প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। 'আবেদন' 'এবার ফিরাও মোরে'-র সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান—মানুষের ব্যথা—বেদনা—উপশমের দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে, কবি এখানে সমস্ত বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যসেবায় একনিষ্ঠভাবে সমর্পিত চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মানসসুন্দরীকে রাণীরূপে কল্পনা করিয়া আপনাকে অখ্যাত, অলস ভৃত্যের মত রাণীর প্রসাধন-কলার পরিচর্যায় নিয়োজিত করিতে চাহেন। কবিকল্পনা এক অপূর্ব লালিত্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিয়া রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্যবিলাসের নিপুণ—সজ্জিত আয়োজন, প্রাসাদসন্নিহিত উদ্যানের তৃণপুষ্পময়, ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর গন্ধস্পর্শ, রাণীর সান্ধ্য প্রসাধনের ও অবসর-বিনোদনের সমস্ত চারুকলা, সেবকের প্রেমের একাগ্রতাময় পরিচর্যাকামনার উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় নিজ গভীরতা ও সমৃদ্ধি প্রকাশ করিয়াছে। মানবসেবার আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার আর সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পরিচর্যার পুরস্কার আশ্চর্যরূপে অভিন্ন—রক্তিম চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া দেবীর প্রসাদ-অর্জন। শেষ লক্ষ্য যদি একই হয়, তাহা হইলে কবি যে নিজ মনোমত কাজই বাছিয়া লইবেন তাহা নিঃসন্দেহ। সেই জন্যই এক কবিতার জীবনকণ্টকপথের দুঃখবরণকারী যাত্রী অপর কবিতার রণসজ্জাত্যাগী, সৌন্দর্যাবেশমুগ্ধ মালঞ্চের মালাকারে পরিণত হইয়াছেন।

'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় কবির মর্ত্যপ্রীতি প্রমাণিত, কিন্তু এই পৃথিবী অশ্রুজলস্নিগ্ধ, প্রীতিমমতাকোমল স্বর্গখণ্ডগুলিরই সমবায়। হৃদয়হীন, নিষ্করুণ, ব্যথালেশহীন সুখমরুভূমি স্বর্গের পরিবর্তে কবি এই ভূস্বর্গকেই বরণ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের বিরোধ নয়, দুইপ্রকার স্বর্গের মধ্যে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। স্বর্গের অমৃতের সঙ্গে মর্ত্যের প্রেমসুধা মিশাইয়া, স্বর্গের তাপ-শৈত্যহীন আবহে অশ্রুমন্দাকিনীধারা বহাইয়া কবি এক উন্নততর, সুন্দরতর কল্পস্বর্গসুখ-আস্বাদনে অভিলাষী। যে স্বর্গীয় উপাদান মৃত্যুভয়বেষ্টিত মরজীবনের

অঙ্গীভূত হইয়া স্বাদুতর হইয়াছে তাহাই কবির উপভোগের বিষয়। কাজেই এই কবিতাকে ঠিক কবির মানবপ্রীতির নিদর্শনরূপে উপস্থাপিত করা যায় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। অবিচ্ছিন্ন, দুঃখস্পর্শহীন সুখ মানবরসনায় বিস্বাদ ঠেকে, বিচ্ছেদবিরহ-মৃত্যুর অপরদিকে যে নিবিড় শঙ্কিত ভালবাসা জীবনবৃত্তকে সম্পূর্ণ করিয়াছে তাহাই কালোর পটভূমিকায় আলোকের ভূমিকাকে স্নিগ্ধোজ্জ্বল করিয়া তোলে। কবি তাই কাল্পনিক স্বর্গসুখের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ-উপলব্ধ জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাশীল।

কিন্তু কবিতাটির তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি যাহাই হউক, ইহা অপূর্ব কল্পনার রঞ্জনশক্তিতে লাবণ্যোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। কবি স্বর্গ ও মর্ত্যজীবনের যে পরস্পর পরিপূরক দুইটি ছবি আঁকিয়াছেন তাহা বর্ণাঢ্যতায়, সার্থক চিত্রকল্পসমাবেশে, করুণ আবেগস্রোতনায় ও বর্ণনার উচ্ছ্বসিত, সর্বপ্রত্যাশাপূর্ণকারী, সমগ্রতা-বিধায়ক অনবদ্যতায় আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। বিশেষতঃ স্বর্গের চিত্রে তিনি পুরাণকল্পনার যে সুষ্ঠু প্রয়োগ করিয়াছেন, মর্ত্যবেদনার অভাবের জন্য উহার সৌন্দর্য কিরূপ স্থূলবস্তুপ্রধান ও সূক্ষ্ম-অনুভবহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহার যে ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা অতুলনীয় কবিত্বশক্তির নিদর্শন। পুরাণের তথ্যভারমন্থর কাহিনী যে আধুনিক কবির গূঢ়ানুপ্রবেশী কল্পনায় কিরূপ সঙ্কেতভাস্বর হইয়া উঠিতে পারে, উহার পুঞ্জীভূত ভোগোপকরণ সূক্ষ্ম অভাব ও অতৃপ্তির অন্তর্দীর্ণতায় কিরূপ শূন্যগর্ভ প্রতীয়মান হইতে পারে তাহা এই কবিতায় অপূর্ব দক্ষতায় উদাহৃত হইয়াছে। ইহার সহিত তুলনায় পার্থিব জীবনযাত্রার ছবি অনুভূতিসমৃদ্ধ হইলেও অতিপরিচিত ভাবাসঙ্গের সংস্পর্শে কিছুটা স্তিমিতদ্যুতি মনে হয়। 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-এ কবির স্বর্গকল্পনাই তাঁহার মর্ত্যকল্পনার উপর জয়ী হইয়াছে। বিদায়ক্ষণের অন্তর্ভেদী অনুভূতি সম্ভাবিত মিলনানন্দের পূর্বাভাসকে আপেক্ষিকভাবে ম্লান করিয়াছে।

'বিজয়িনী' কবিতায় দীর্ঘকাল ধরিয়া কবিচিত্তে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়-মোহ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়াছিল সেই খাদ-মেশানো সংমিশ্রণের তাত্ত্বিক অবসান ঘোষিত হইয়াছে। হয়ত কবির সৌন্দর্যকল্পনায় ও আবেগকম্পনে এই তত্ত্বের সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় না। হয়ত স্নানোত্থিতা সুন্দরীর ইন্দ্রিয়াতিসারী প্রশান্ত রূপোচ্ছলতার প্রতি সম্ভ্রমনত অনঙ্গদেবের প্রহরণত্যাগ অনিবার্যভাবে নয়, কবির স্বেচ্ছাচারিতাতেই সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিজয়িনী কি সত্যই বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সৌন্দর্যে ভূষিতা, তাহার দেহলাবণ্য কি আত্মিক জ্যোতির্মণ্ডলবেষ্টিত,

না কবি নিজ মানস পরিবর্তনের সাক্ষ্যরূপে ইহার ললাটে যদৃচ্ছাক্রমে জয়তিলক অঙ্কিত করিয়াছেন? এমন কি ভাবস্বরূপা, মনোলোকসঞ্চারিণী মানসসুন্দরীও সম্পূর্ণরূপ ইন্দ্রিয়রূপাকুলতা হইতে মুক্ত নহেন—তাঁহার দিব্যদ্যুতি দেহলাবণ্যের ও প্রাকৃতপ্রণয়প্রচেষ্টার ঘন আবরণে আচ্ছাদিত। অবশ্য ঘনপল্লবপ্রচ্ছায় বনবীথি ও অরণ্যবেষ্টিত শান্ত, নিস্তরঙ্গ হ্রদের পটভূমিকায় সৌন্দর্যের মাদকতা কিছুটা অন্তর্মুখী হইয়াছে। বসন্তের প্রথম নিঃশ্বাস, ছায়া-রৌদ্র, সুপ্তি ও মর্মরধ্বনির মিশ্রণে সমস্ত অরণ্যভূমিতে যে আভাস-ইঙ্গিতময় মৃদু প্রাণকম্পন হিল্লোলিত হইয়াছে তাহার প্রভাব রূপমুগ্ধতা ও আবেগমত্ততার প্রতিষেধক। সমস্ত মিলিয়া দেহসৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয়চেতনার উপর একটা স্নিগ্ধ, তাপপ্রশমনকারী বায়ুপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু সুন্দরীর রূপপরিকল্পনায় কোন নূতন, ইন্দ্রিয়-বিমুখ রীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গ লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির হইয়াছে; মধ্যাহ্নরৌদ্র দেহের শিখরে শিখরে ঝলসিয়া উঠিয়াছে; নিখিল বাতাস ও অনন্ত আকাশ সিক্ত দেহটি অঞ্চলে মুছিয়া লইয়াছে। এই বর্ণনায় রূপদীপ্তির উপর এক উদারতর জগতের পরিচর্যা একটি স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। এখানে সৌন্দর্যের স্থির সরোবরে প্রণয়াবেগ কোন তরঙ্গচাঞ্চল্য জাগায় নাই—এ যেন মায়াজগতের নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য স্তব্ধ, আত্ম-সমাহিত হইয়া আছে। প্রণয়ী-ব্যতিরেকে মদনের সমস্ত শরজাল কুণ্ঠিতাগ্র হইয়া ব্যর্থ হইয়াছে। অর্জুনের মধ্যবর্তিতায়ই চিত্রাঙ্গদার উপর মদনপ্রভাব কার্যকরী হইয়াছিল। নায়কবিহীনা, নিঃসঙ্গ নায়িকার উপর কামদেবের পরীক্ষায় তাহার মদনবিজয়ী চিত্তবল নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত হয় নাই। বিজয়িনীর নির্মল চিত্তপ্রশান্তির মূলে তাহার নিজস্ব চরিত্রদৃঢ়তা অপেক্ষা প্রতিবেশ-প্রভাব ও পরিস্থিতির আনুকূল্যই প্রধান হইয়াছে। কবির কবিত্বশক্তি তাঁহার তাত্ত্বিক দুর্বলতার দ্বারা কিছুমাত্র অভিভূত হয় নাই ইহাই তাঁহার পরম কৃতিত্ব।

সর্বশেষে শুধু 'চিত্রা'র নহে, রবীন্দ্রকাব্যের এবং হয়ত বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'উর্বশী'র আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে প্রেম ও সৌন্দর্যানুরাগ আদর্শকল্পনারঞ্জিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই মন্ময়তামুক্ত হইয়া স্বর্গের অপ্সরী উর্বশীর পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে এক সার্বভৌম রূপচেতনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রকল্পনার সমস্ত উপাদান—তাঁহার বিশ্বচেতনা, অসীমানুভব, রূপমুগ্ধতা ও প্রণয়াবেশ —সবই আছে। কিন্তু কবির মনোলোক হইতে দূরবর্তিনী, সত্তাবৈশিষ্ট্যসম্পন্না এক

স্বর্গনারীকে অবলম্বন করিয়া ইহারা এক অভিনব মূর্তিতে সংহত হইয়াছে। উর্বশীর জীবন-ইতিহাস ও উহার বন্ধনহীন সৌন্দর্যবিলাস বিভিন্ন পুরাণ ও কালিদাসের নাটক 'বিক্রমোর্বশী' হইতে আমাদের নিকট সুপরিচিত। সে সমস্ত কল্যাণবোধ ও নীতি-আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন, মোহময় রূপচমকের মূর্তবিগ্রহ। বিদ্যুৎশিখার ন্যায় সে ক্ষণিকের জন্য আমাদের চক্ষু ও মনকে মুগ্ধ করিয়া কোন্ অতল রহস্যে অন্তর্হিত হয়। তাহার সম্বন্ধে কোন নীতিপ্রয়োগ বা একনিষ্ঠতার অধিকার-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য। অর্জুন তাহাকে তাহার পূর্বপুরুষভোগ্যা বিবেচনা করিয়া তাহাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়াছিল ও তাহার উদ্যত আলিঙ্গনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। রূপমুগ্ধ পুরুরবা তাহাকে চিরস্থায়ী দাম্পত্যবন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়া ব্যর্থকামনার জ্বালায় উন্মাদ হইয়াছিল। ইহারা কেহই উর্বশীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইতিহাসেও ক্লিওপেট্রা-চরিত্র অনেকটা উর্বশীর অনুরূপ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এণ্টনির সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলিতে গিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার সহিত গভীর-রসাত্মক প্রণয়নিষ্ঠায় বাঁধা পড়িয়াছিল। ইহাই তাহার জীবনের ট্রাজেডি। সেক্সপিয়রের ফলস্টাফ ও এরিয়েল চরিত্রও, একজন সত্যিকার মানুষ হইয়াও ও অপরজন মানবের সম্পর্কে আসিয়া মানবিক আসক্তি, মানবমনের দৃঢ় সংসক্তির বশীভূত হয় নাই। মানবিক সত্তা ও এই সত্তাসংলগ্ন আত্মিক বোধ তাহাদের মধ্যে অবিকশিত ছিল। সেইজন্য ইহাদের ব্যক্তিপরিচয় অনেকটা নেতিবাচক—ইহারা কি অপেক্ষা ইহারা যে কি নয় তাহাই আমাদের অধিকতর সুপরিচিত। এক প্রকারের আশ্চর্য নিরাসক্তি ও উদাসীনতা ইহাদিগকে মানবসম্পর্ক হইতে বিবিক্ত রাখিয়াছে। মানুষের কামনাসাগরে সন্তরণ করিয়াও, মানবের কর্মবন্ধনে আকৃষ্ট হইয়াও ইহাদের প্রকৃতি হংসপক্ষের মতই আবেশসিক্ত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের উর্বশী-কল্পনা এই সর্ববন্ধনহীন, সর্বকামনামুক্ত, সমস্ত কর্তব্য-অসহিষ্ণু উদাসীন সৌন্দর্যের অপরূপ বিস্ময়রসপুষ্ট। তাঁহার উর্বশীর কোন লৌকিক কর্ম-অভ্যাস নাই, কোন নবোদ্ভিন্ন প্রণয়-সৌকুমার্য নাই, কোন অর্ধ-বিকশিত সৌন্দর্যের প্রত্যাশাচকিত, স্বপ্নমধুর সম্ভাবনা নাই। সাধারণতঃ রূপমুগ্ধ মানুষ সৌন্দর্যকে যে কর্তব্য ও অধিকারবোধে সুরক্ষিত, দান-প্রতিদানে পরস্পর-নির্ভর, গার্হস্থ্য আবেষ্টনে দেখিতে অভ্যস্ত, উর্বশী সম্পূর্ণরূপে সেই চিহ্নিত সীমার বহির্ভূত। এমন কি এই চিরযৌবনা রূপসীর নিজ জীবনও ক্রমবিকাশের ছন্দাতীত। তাহার বাল্য ও কৈশোর কবিকল্পনার কৌতূহল উদ্রেক করিতে

পারে, কিন্তু কোন তথ্যবন্ধনে ধরা দেয় না। এই উর্বশী মানবদৃষ্টিতে রূপের একটি চির-প্রজ্বলন্ত বহ্নি-প্রহেলিকা।

কিন্তু এই অলোকসম্ভবা রূপশিখা কবির দিব্যদৃষ্টির নিকট আত্মপরিচয়ের দীপ্ত রেখাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। উর্বশীর স্বরূপ ব্যঞ্জিত হইয়াছে নিখিলের রূপতরঙ্গের ছন্দোময় প্রবাহে, স্খলিত তারকার ক্ষণদীপ্ত আত্মঘাতী চিত্তবিভ্রমে, মানবের অসংবরণীয় যৌবনচাঞ্চল্যে ও সংযমশাসনছিন্ন রূপমোহে ও তাহার গভীরতর অনুভূতিতে এক চির-অতৃপ্ত, মর্মমূলজড়িত বেদনাবোধে। সে নিজে অপরিচয়ের অন্ধকারে আবৃত, কিন্তু চরাচরের অনির্বাণ কামনাবহ্নি তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে আমাদের বোধগম্য করিয়াছে। এই উর্বশী মানবের হৃদয়সমুদ্র-মন্থনজাত রূপলক্ষ্মী, তাহার এক হাতে তৃপ্তির অমৃত, অপর হাতে অতৃপ্তির বিষ। তাহার উদ্ভবমুহূর্তে চির-অশান্ত সমুদ্র তাহার নিকট মাথা নত করিয়া মানুষকেও তাহার নতিস্বীকারের শিক্ষা দিয়াছে। তাহার শৈশবক্রীড়া ও কৈশোরস্বপ্ন কেবল অপার্থিব সৌন্দর্যে লীলামগ্ন ও বিশ্বজগতের সহিত নিঃসম্পর্ক।

কিন্তু বিশ্বজগতে জাগরণের পর এই সুন্দরীর পরিচয় মোহিনীরূপে। তাহার কটাক্ষ, তাহার অঙ্গগন্ধ, তাহার নূপুরঝংকৃত গতি, সুরসভায় তাহার নৃত্যকলার চারুশিল্প এবং সময় সময় তাহার স্খলিত মেখলা, অসংবৃত রূপের চকিত আভাস সমগ্র বিশ্বে এক আত্মহারা, আবেগমত্ত আলোড়ন জাগাইয়াছে। বিশ্বের বিগলিত অশ্রুধারায় তাহার চরণ ধৌত, নিখিলের হৃদয়রক্তে উহার অলক্তক-রঞ্জন ও সমগ্র জগতের মিলিত হৃদয়বৃন্ত হইতে যে একটি সার্বভৌম বাসনার পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহাই এই দেবীর চরণকমলের লঘু আশ্রয় রচনা করিয়াছে।

জগতের আদিম যুগে উর্বশীকে লইয়া যে বাসনা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল, মোহভঙ্গে বিস্বাদ এই আধুনিক যুগে তাহা একটি বিষণ্ণ, নৈরাশ্যক্ষীণ, স্তিমিত প্রত্যয়ে অবসিত হইয়াছে। তিক্ত অভিজ্ঞতায় মানব উর্বশীর অপ্রাপণীয়তা সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিতই হইয়াছে। কোন ভবিষ্যৎ অর্জুন আর উর্বশীকে প্রলুব্ধ করিবে না, কোন ভবিষ্যৎ পুরুরবা আর তাহার বরমাল্য-প্রসাদে ধন্য হইবে না —এই বিশ্বাস মানুষের অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের রূপ ধারণ করিয়াছে। উর্বশী-স্বপ্নবিভোর সে গৌরবযুগ আজ চির-অস্তমিত। কেবল আছে উদাস স্মৃতি, আনন্দের সহিত অবিচ্ছেদ্য অব্যক্ত বেদনা, আর অতিক্ষীণ, সুদূর আশার খদ্যোত-দীপ্তি।

মানসসুন্দরীর যৌগিক সত্তার একটি অংশ উর্বশীতে মূর্ত হইয়াছে। আদর্শ

প্রেয়সীর কল্যাণস্পর্শবর্জিত, প্রগাঢ়প্রণয়াবেশহীন অলভ্যতা ও উহার বিশ্বব্যাপ্ত, চকিত আবির্ভাবই এই দুই নারীকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র। কে জানে হয়ত মানসীর বঞ্চনা-প্রবণতা, তাহার মরীচিকাবিভ্রান্তিই কবিকে উর্বশী-কল্পনায় অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে। মানসীকে যদি শেষ পর্যন্ত পাওয়াই না গেল, জীবনদেবতার প্রতি নিবেদিত সমস্ত প্রেমাকূতি যদি কবির শূন্যহৃদয়ে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়াই আসিল, যদি সৌন্দর্যের আকর্ষণ বিশ্বের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া কবির ধরা-ছোঁয়ার অতীতই থাকিল, তবে এই মায়াবিনীকে বিশ্বসৌন্দর্যের মায়াময়ী, বিভ্রান্তকারিণী অন্তঃপ্রেরণারূপে অনুভব করিলেই বা সত্যচ্যুতি কোথায়? 'চিত্রা'য় কবিচেতনার এক স্তরে 'মানসী' উর্বশীরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকিবে। কবি অপূর্ব শক্তিতে এই রূপলক্ষ্মীকে তাঁহার এতদিনের অভ্যস্ত ভাবাসঙ্গ হইতে অপসারিত করিয়া তাহাকে নিখিলের মর্মশতদলের একটি নূতন পাপড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সৌন্দর্য কল্যাণময় অথবা কল্যাণবর্জিত হউক, সমগ্র বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে উহার প্রতিচ্ছবি, মানবকামনার প্রতি অণু-পরমাণুতে উহার অনুপ্রবেশ, বিশ্বছন্দের সহিত উহার সর্বাঙ্গীণ একাত্মতা। সৌন্দর্যের স্থান শুভাশুভের ঊর্ধ্বে, উহা প্রকৃতির মতই মানবনিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী, মানবকল্যাণের সঙ্কীর্ণ মানদণ্ডে উহা বিচার্য নহে এই তত্ত্বই অপরূপ রসপরিণামে, আশ্চর্য রূপসৃষ্টিতে, অবয়বগঠনের অনবদ্য শিল্পে ও ভাবব্যঞ্জনার অপূর্ব সঙ্গতিতে কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রসাদ অর্জন করিয়াছে।

'কড়ি ও কোমল' হইতে 'চিত্রা'—যৌবনস্বপ্নবৃন্তে রূপরক্তিম অপরূপ পুষ্পবিকাশ। এই দশ বৎসরে প্রগল্‌ভ যৌবনপ্রমত্ততা নিজ গভীরতর অন্তরসত্যের উপলব্ধিতে, কবিসত্তার নানা উৎকণ্ঠার আবর্তনে, কল্পনার অসীমাভিসারের নব নব পর্যায়-উত্তরণে, বিশেষতঃ সর্বসমন্বয়কারী সৌন্দর্যসৃষ্টির লীলামুগ্ধতায় এক দিব্য চেতনায় উদ্বর্তিত হইয়াছে। রূপের আবেশ ধ্যানমগ্নতার মধ্যবর্তিতায় কবিকে অরূপ-প্রত্যয়ের সীমান্তপ্রদেশে উপনীত করিয়াছে। জীবনযবনিকার অন্তরালে, সৃষ্টির গোপন অন্তঃপুরে যে সার্বভৌম প্রাণবেগ ও রূপরহস্য বিরাজিত কবি তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। সৌন্দর্যের এই উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া কবি এখন ইন্দ্রিয়সীমা অতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পরিশীলিত মনন ও স্থির অতীন্দ্রিয় প্রত্যয় লইয়া তিনি প্রৌঢ় জীবনের দৃষ্টিগভীরতা ও মানসপ্রশান্তি প্রয়োগের উপলক্ষ্য খুঁজিতেছেন। এই নব-অনুভূতির সন্ধিক্ষণে উপনীত কবি-কল্পনাকে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি-উত্তীর্ণা ও প্রথমপ্রণয়বিমুগ্ধা রাধিকার সহিত তুলনা

করা যাইতে পারে। তরুণী-রাধিকা ইহার পর নানা ভাবগভীরতার স্তর অতিক্রম করিবেন। মিলনের রসোদগার, ক্ষণিক বিচ্ছেদের অবকাশে স্মৃতিরোমন্থন, পরিণত প্রেমের নানা সঙ্কট-সমস্যা ও চিরবিরহের অতল শোকনিমজ্জন নায়িকার ভবিষ্যৎ জীবনকে এক দিব্য অনুভূতির শিখরদেশে লইয়া যাইবে। জানি না, প্রথমপ্রেমের মাদকতায় এই সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিণতির, বিশেষতঃ নায়কের দুর্বোধ্য, নির্মম ভাবান্তরের কোন পূর্বাভাস নায়িকার মনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল কি না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলক্ষ্মীর ধ্যানকল্পনায় যে তাঁহার আগামী যুগের নূতন অভিসার-যাত্রার রূপচ্ছবি উঁকি দিয়া যাইতেছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। 'চিত্রা'র সমাপ্তিক্ষণে 'চৈতালি', 'কল্পনা' এমন কি সুদূরতর 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি'র সুর. কবি-বীণায় কবির অঙ্গুলিস্পর্শের প্রতীক্ষায় নীরব অনুরণন তুলিতেছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পরিণতিপর্ব—তৃতীয় স্তর

চৈতালি ১৩০৩ (কাব্যগ্রন্থাবলী)[১]

১

পূর্বগামী কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রা'র সহিত 'চৈতালি'র কালগত ব্যবধান অতি সামান্য, নাই বলিলেই চলে। 'চিত্রা'র সমাপ্তি-কবিতা 'সিন্ধুপারে'-র রচনা-দিন, ২০শে ফাল্গুন, ১৩০২; আর চৈতালি'-র প্রথম কবিতা 'প্রভাত'-এর রচনার দিন ১১ই চৈত্র, ১৩০২। এই কাব্যের কবিতাবলী সমস্ত চৈত্রমাস ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। ২রা বৈশাখের পর ২০শে আষাঢ় পর্যন্ত একটা নাতিদীর্ঘ বিরতির পর ১৫ই শ্রাবণে ইহা সমাপ্তি-সীমায় পৌছিয়াছে। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা'র (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬) সহিত ইহার প্রায় তিন বৎসরের ব্যবধান।

কিন্তু কালের দিক্ দিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্ন হইলেও কবির মানসপ্রেরণা ও রচনাভঙ্গীর দিক্ দিয়া 'চৈতালি' 'চিত্রা' হইতে যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের অধিবাসী। 'চিত্রা'য় যে কবি-কল্পনা আবেগে অধীর, নিগূঢ়, সর্বব্যাপী বিশ্বানুভূতির আবেশ-মন্ময়তায় আত্মহারা, ছন্দের লীলাবৈচিত্র্যে ও উচ্ছ্বসিত গতিবেগে উদ্দাম, তাহা অকস্মাৎ এক মাসের মধ্যেই কবি-মনের কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় সংযত-গম্ভীর, নিরুচ্ছ্বাস ও প্রজ্ঞা-প্রশান্ত হইয়া উঠিয়াছে। গীতিকবিতার উন্মাদনা মননশীলতার যুক্তিশৃঙ্খলাগ্রথিত, বাহুল্যবর্জিত মিতভাষণে পরিণতি লাভ করিয়াছে। জীবন-দেবতা-কল্পনার সর্বগ্রাসী আবিষ্টতা, রহস্যময় কাব্য-প্রেরণার ব্যাকুলস্বরূপ-অনুসন্ধান, জীবনমৃত্যুর সীমাতিসারী এক অনির্ণেয় সত্তাশক্তির সহিত কবির প্রেমবন্ধনজাত একাত্মতা—অনুভূতির এই অপূর্ব-নিবিড় কল্পলোকরমণীয়তা যেন চোখের পলক পড়িতে না পড়িতেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। 'চৈতালি'র উৎসর্গ-কবিতায় কবি সমস্ত ভাববিহ্বলতা পরিহার করিয়া নিতান্ত সহজভাবে ইহাকে নিজ 'সার্থকসাধন' এই মানসপ্রক্রিয়াসূচক, নিরাবেগ অভিধানে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। এক মুহূর্তে রূপ আবার ভাবের নৈর্ব্যক্তিকতায়, হৃদয়ের গভীরতম রঙে অনুরঞ্জিত কল্পনা আবার তথ্যবিবৃতির

১ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১১-১২ (১৩১৮)

ঔদাসীন্যে বিলীন হইয়াছে। দ্বিতীয় কবিতা 'গীতহীন'-এ কবি ক্ষুব্ধ অনুযোগের সহিত নিজ অজস্র, অফুরন্ত গীতি-প্রেরণার অকস্মাৎ অন্তর্ধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত 'চৈতালি'-কাব্যে, দুই একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, এই গীতধারারিক্ততার অনুযোগের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে। কবি যেন, কিছুটা পরিণত মননশক্তি, জীবন-প্রজ্ঞা ও বিষয়-কৌতূহলের প্রশস্ততর পরিধি লইয়া, পিছু হটিয়া 'কড়ি ও কোমল'-এর যুগে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 'চৈতালি'-র অধিকাংশ কবিতাই 'কড়ি ও কোমল'-এর ন্যায় চতুর্দশপংক্তির পয়ার-সমষ্টি। যে সামান্য কয়েকটি গীতি-কবিতা আছে তাহারাও আয়তনে সংক্ষিপ্ত, ভাবচক্রে সঙ্কীর্ণবৃত্ত এবং কল্পনা ও আবেগের দিক দিয়া নিতান্ত সীমিত।

রবীন্দ্রনাথ 'চৈতালি'-র রচনাবলী-সংস্করণের ভূমিকায় এই রীতি-পরিবর্তনের ব্যাখ্যারূপে আকস্মিক বাধার উল্লেখ করিয়াছেন। ভাঙ্গা ডাল-পালা আটকাইয়া যেমন নদীর স্রোত মন্দীভূত হয় ও এই স্রোতোহীনতার সুযোগ লইয়া সেখানে যেমন পলিমাটি জমে ও ইহারই সহিত নানা অবান্তর বস্তু ও শৈবালপুঞ্জ যুক্ত হইয়া একটি অভাবিত ক্ষীণকায় দ্বীপ-মরীচিকা আপাতদৃষ্টিতে ঘন হইয়া উঠে, 'চেতালি'-তে কবির মানসজগতে তদনুরূপ একটা প্রক্রিয়া ঘটিয়াছিল—ইহাই কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কবির সমকালীন জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই সময় কবি তাঁহার স্বভাববিরোধী কতকগুলি বৈষয়িক জটিলতার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথম, কুষ্টিয়ায় ঠাকুর-কোম্পানির কারবার পরিদর্শনের অভাবে ও কর্মচারীদের দুর্নীতির জন্য দেউলিয়া হইতে চলিয়াছিল ও ইহারই পরোক্ষ ফলরূপে ঠাকুর-পরিবারে জ্ঞাতিবিরোধ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইহারই জন্য বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে জমিদারি-বিভাগও অপরিহার্য হইয়াছিল। জমিদারি কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ থাকার জন্য রবীন্দ্রনাথের উপরেই জমিদারি-বণ্টনের এই অপ্রীতিকর ভার পড়িয়াছিল। 'চৈতালি'-র শেষের দিকের কয়েকটি কবিতাতে স্বজনবিরোধের এই মর্মদাহ, তুচ্ছ স্বার্থ লইয়া বাদবিসংবাদের এই তিক্ততা ও গ্লানি পরোক্ষ-উল্লেখে উহার ক্ষতচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত এই অবাঞ্ছনীয় কবিধর্মবিরোধী অভিজ্ঞতাকেই আকস্মিক বাধারূপে অভিহিত করিয়াছেন।

কিন্তু তথ্যভিত্তিক এইটুকু মন্তব্যকে মানিয়া লইলেও 'চৈতালি'-সম্বন্ধে কবির যে মূল্যায়ন তাহা স্বীকার করা যায় না। কবিপ্রেরণায় পক্ষে স্রোত ও স্রোতো-হীনতা উভয় অবস্থারই স্বতন্ত্র মূল্য আছে। স্রোতোহীনতায় কবির মনোভূমিতে

যে পলিমাটি পড়ে তাহাতে হয়ত শ্যামাকোকিলমুখরিত গীতিকুঞ্জ উদ্ভূত হয় না, কিন্তু উর্বর, পুষ্টিকরফলপ্রদ শস্যক্ষেত্র জন্মে। ইহা যে কেবল শৈবালপুঞ্জকে আকর্ষণ করে, স্বল্পজলসঞ্চারী মৎস্যকুল ও শিকারপ্রতীক্ষাস্তব্ধ, কপটতপস্বী বকের প্রচ্ছন্ন সংগ্রামভূমিতে পরিণত হয় তাহা অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে যথার্থ হইয়া উঠে নাই। প্রকৃত বিচারে 'চৈতালি' রবীন্দ্রকাব্যে আকস্মিক ছেদ নয়; ইহা নূতন সৃষ্টির প্রস্তুতিসম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষণিক বিরতি মাত্র। ইহা পূর্বতন কাব্যশস্যকে ঘরে তোলার অবসরে নববীজবপনের সুযোগ-প্রতীক্ষা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বিবর্তনে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—কবি আমাদের যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন ইহা কোনমতেই সেরূপ অবান্তর প্রক্ষেপ নয়। সমুদ্রের ঢেউ যখন তাহার অবিরাম গতিতে মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়া নানা খণ্ডে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন ঠিক তাহার পশ্চাৎবর্তী তরঙ্গরেখাটি রজতফেনশীর্ষ হইয়া উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত হইবার জন্য বেগ সঞ্চয় করিতেছে।

২

এইবার 'চৈতালি' হইতে রবীন্দ্রনাথের যে সুরবদল হইয়াছে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। 'চিত্রা'-র 'প্রৌঢ়' সনেটটিতে এই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা লক্ষ্য করা যায়। কবি অনুভব করিতেছেন যে তাঁহার যৌবনের উন্মত্ত, বাসনাকেন্দ্রিক আবেগ প্রশমিত হইয়া ধীর ও বস্তুনিষ্ঠ জীবনসমীক্ষার অভ্যুদয় হইতেছে। 'চিত্রা'তে কবির প্রথম যৌবনের মদির বিহ্বলতা, কল্পনাকেন্দ্র হইতে অজস্র ধারায় উৎসারিত, প্রেমানুভূতি-অনুরঞ্জিত জীবনবোধের বর্ণাঢ্য অধ্যায় শেষ হইয়াছে। 'চৈতালি' হইতে কবির প্রৌঢ়জীবনের আরম্ভ। 'উৎসর্গ' কবিতাটিতে একটা প্রশান্ত পরিপূর্ণতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি যে দলিত দ্রাক্ষার বক্ষোরস নিষ্ঠুর পীড়নে নিঙাড়িয়া জীবনদেবতার পানপাত্র ভরিয়া দিয়াছিলেন তাহাই এখন স্বভাবের সহজ অনুবর্তনে দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে রসস্ফীত ফলরূপে পুঞ্জে পুঞ্জে ধরিয়া আছে। এই ফলের রস নিটোল পরিপক্কতায় স্বতঃপূর্ণ, আত্মনিপীড়নপ্রক্রিয়ায় কোন অজ্ঞাত দেবতার ভোগবিধানের জন্য উহার অন্তর-নির্যাসটুকু বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হয় নাই। এখানে কৃচ্ছ্রসাধনের পরিবর্তে আছে স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি। কবি এখানে ব্যাকুল পূজারীরূপে নহে, সৌন্দর্যমুগ্ধ, কতকটা আত্মতৃপ্ত দ্রষ্টারূপে আবির্ভূত। তিনি নিজ সর্বস্বসঞ্চয়

উদার প্রশান্তির সহিত যাঁহার নিকট সমর্পণ করিতেছেন, তিনি 'সোনার তরী'র নাবিকের বা 'অন্তর্যামী' ও 'জীবনদেবতা'র মত কোন রহস্যময়, বিভ্রান্তিকর, জানা-অজানার, গ্রহণ-প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দোলায়িত সত্তা নহেন। তিনি 'সার্থকসাধন' এই স্বার্থলেশহীন নামে অভিহিত, তিনি ভাব ও রূপের মধ্যে অবিরাম যাতায়াতে দুর্নিরীক্ষ্য নহেন, তিনি অবিভক্ত ভাবলোকে স্থির-অধিষ্ঠিত। বসন্তলক্ষ্মী যেমন স্বভাব-অধিকারে বনের উপহার গ্রহণ করেন, এই নবামন্ত্রিত দেবতাও তেমনি কবির কাব্যসাধনার চিরন্তন স্বত্বে ফলভোগী। ইনি শুক্তিরক্ত নখরে ফলগুলি ছিন্ন করিয়া অলস অন্যমনস্কতায় অবলীলায় দর্শন-দংশনে উহাদের রস উপভোগ করেন। যে কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সম্বন্ধে 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' পর্যন্ত কবির বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তার অন্ত ছিল না, যাঁহার সহিত অনির্ণীত সম্পর্ক-রহস্য তাঁহাকে নিরন্তর অস্থির করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে এখানে কি নির্বিকার, কৌতূহললেশহীন প্রশান্তি প্রকাশিত হইয়াছে! কবি নিজ চিত্তকে ভ্রমর-চঞ্চল, মর্মর-স্পন্দিত, উদাসবায়ুবীজিত উপবনের সহিত তুলনা করিয়াছেন—কাব্যপ্রেরণার উৎস সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় তাঁহার আপাততঃ অবসান হইয়াছে মনে হয়।

এই পরিবর্তনের ধারা নানা প্রণালী বাহিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার একটা নিদর্শন গীতিকবিতার সংখ্যাল্পতা ও গীতিপ্রেরণার আপেক্ষিক উচ্ছ্বাস-হীনতা। 'গীতহীন', 'স্বপ্ন', 'আশার সীমা', 'পল্লীগ্রামে', 'কর্ম', 'প্রার্থনা' কবিতাগুলির ছন্দ যেমন মন্থরগামী ও মাদকতাহীন, কল্পনা ও আবেগও তেমনি সঙ্কীর্ণকক্ষচারী। 'গান' কবিতাটি ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম, তবে এখানেও পূর্বযুগের সহিত তুলনায় ভাবোচ্ছ্বাস স্তিমিত ও নিস্তরঙ্গ। মনে হয় কবি সাময়িকভাবে গীতিকবিতার নভোচারী কল্পনা ও উদ্বেল আবেগ-তরঙ্গ হারাইয়াছেন। তাঁহার অনুভূতি পয়ারসমবায়গঠিত চতুর্দশপদী কবিতার অপ্রশস্ত পরিধিতে, ক্ষুদ্র তড়াগের তটবন্ধনে শান্তভাবে বিধৃত। তিনি যেটুকু জীবনসত্য ব্যক্ত করিতে চাহেন তাহা আবেগোচ্ছল ও ছন্দদোলায় দ্রুত-আবর্তিত নয়, প্রজ্ঞাঘনরূপে কঠিন-সংহত।

চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছের মধ্যে একশ্রেণী ধর্মবিষয়ক ও তত্ত্বপ্রধান। 'দেবতার বিদায়', 'পুণ্যের হিসাব', 'বৈরাগ্য', 'সতী', 'তত্ত্ব ও সৌন্দর্য' প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই তত্ত্বচেতনা ও ধর্মরহস্যবোধ পর্যাপ্ত গাম্ভীর্য ও অর্থঘন মিতভাষিতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। এগুলিতে কবি অপেক্ষা তত্ত্ববিদ্ ও গঠনশিল্পীরই

পরিচয় বেশী ফুটিয়াছে। এখানে কবি নেপথ্যান্তরালে আত্মগোপন করিয়া নিজ কবিধর্মকে তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার সহায়করূপে নিয়োজিত করিয়াছেন। শুধু ধর্ম নয়, রাজনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বপ্রিয়তা প্রসারিত হইয়াছে। 'পরবেশ', 'বঙ্গমাতা' প্রভৃতি কবিতা ইহার উদাহরণ। শেষোক্ত কবিতায় শেষ দুইটি চরণ তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকাশভঙ্গীতে স্মরণীয়তা লাভ করিয়াছে।

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননি
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।

আর এক কবিতাগুচ্ছে 'কড়ি ও কোমল'-এর মানবপ্রীতি, সাধারণ মানুষের তুচ্ছ জীবনকথাতে আগ্রহ গভীরতর সুরে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। 'কড়ি ও কোমল'-এ কবি নিজ কল্পনা-ঐশ্বর্য ও অ-মর্ত্য সৌন্দর্যপিপাসার কোন পরিচয় দেন নাই; হয়ত নিজের অন্তরলোকেও উহাদের অস্তিত্বের সন্ধান পান নাই। 'কড়ি ও কোমল'-এর জীবনকৌতূহল অবাস্তব কল্পনা-কুহেলিকার প্রতিক্রিয়া, ধূম্রলোক হইতে বস্তুজগতের নির্দিষ্টতায় পদক্ষেপ। কাজেই ইহার মধ্যে আত্মসংবৃত শক্তির বিশেষ কোন নিদর্শন নাই। কিন্তু 'চৈতালি'-তে সাধারণ লোকের জীবনকথা প্রচ্ছন্নতাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে কবি 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'য় জীবনের অতল সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছেন, যিনি আবেগ ও অনুভূতির সীমাহীন বৈচিত্র্য ও তুঙ্গতম শৃঙ্গ স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহার সর্বত্রবিহারিণী কল্পনা যদি আত্মসঙ্কোচন করিয়া তুচ্ছতম বিষয়ে আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখে, তাহা হইলে এই স্বেচ্ছাবৃত সংযমের পিছনে এক প্রচ্ছন্ন শক্তির আভাস আমাদের সূক্ষ্মতর চেতনাকে আন্দোলিত করিতে থাকে। নভোবিহারী পাখী কোনও কারণে মৃত্তিকাচারী হইলেও নীল আকাশের স্মৃতি তাহার আপাত-স্তব্ধ পক্ষপুটে জড়িত থাকে।

'সামান্য লোক', 'দুর্লভ জন্ম', 'খেয়া', 'দিদি', 'পরিচয়', 'পুঁটু', 'হৃদয়ধর্ম', 'মিলনদৃশ্য', 'দুই বন্ধু', 'সঙ্গী', 'স্নেহদৃশ্য', 'করুণা' প্রভৃতি চতুর্দশপদীতে কবির এই মর্ত্যপ্রীতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা, স্থানে স্থানে গূঢ়তর ব্যঞ্জনা ও দার্শনিক উপলব্ধির আভাস সহ অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমরা সহজেই অনুভব করি যে এই তুচ্ছের প্রতি আকর্ষণের পিছনে কবির অসাধারণ কল্পনা ও নিগূঢ় ভাবদৃষ্টি অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল, তথ্যবিবৃতিমূলক আখ্যানের পিছনে এক চিন্ময় জীবনবোধের প্রেরণা উপস্থিত। বিশেষতঃ মানুষে-পশুতে স্নেহবন্ধন কবির পূর্ব-পরীক্ষিত বিশ্বাত্মবোধেরই নিদর্শনরূপে তাঁহার গভীরতর চেতনার সহিত সংপৃক্ত।

'অনন্ত পথে', 'ক্ষণ মিলন', 'প্রেম' প্রভৃতি কবিতায় তুচ্ছের পিছনে অনন্ত মহিমার অধ্যাত্ম প্রত্যয়টি অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়াছে, স্বতঃসিদ্ধতা হইতে প্রমাণের বিষয়রূপে দেখা দিয়াছে। 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় যে জ্যোতিষ্কানুভূতির দিগন্তব্যাপ্ত আলোকপ্লাবন, এই নিরুচ্ছ্বাস কবিতাগুলিতে তাহারই ম্লান অপরাহ্ণ-ঝিকিমিকি।

'সমাপ্তি', 'মৌন', 'অসময়', 'শেষ', 'অনাবৃষ্টি', 'অজ্ঞাত বিশ্ব', 'ভয়ের দুরাশা', 'ভক্তের প্রতি', 'মৃত্যুমাধুরী', 'স্মৃতি', 'বিলয়', 'যাত্রী' প্রভৃতি কবিতায় চতুর্দশপদীর দৃঢ় বেষ্টনীরেখার মধ্যে নানা ভাববৈচিত্র্য শান্ত মাধুরীতে, সান্ধ্যগগনে শুকতারার ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথম চারিটি কবিতায় কবি গীতিপ্রেরণার অভাবের জন্য নিজেকে প্রবোধ দিতেছেন। যে গীতধারা স্বাভাবিক কারণে শুকাইয়াছে তাহার শুষ্ক খাতে কৃত্রিম নির্ঝরবেগ প্রবাহিত করার দুশ্চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। শান্ত প্রতীক্ষাই উহার পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রকৃষ্ট প্রস্তুতি। যে কাব্যলক্ষ্মী নেপথ্যচারিণী হইয়াছেন তিনি অনুকূল প্রতিবেশে আবার মঞ্চ-পুরোভাগে অধিষ্ঠিত হইবেন—তাঁহাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় সাজঘর হইতে টানিয়া আনার প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্র। এই কবিতাগুচ্ছে কাব্যোৎকর্ষ ছাড়াও কবির স্বরূপ উপলব্ধির পরিচয় মিলে।

'অজ্ঞাত বিশ্ব', 'ভয়ের দুরাশা' ও 'অনাবৃষ্টি' প্রকৃতির রুদ্ররূপ ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দুর্বল মানবের আকিঞ্চন-ব্যর্থতার কথা বলা হইয়াছে। কবি যে দার্শনিক নহেন, তাঁহার মন যে ক্ষণ-প্রতীতির আবর্তে ঘূর্ণ্যমান, উহাতে যে দার্শনিক প্রত্যয়ের অনড়, স্থাণু-স্থিরতা নাই কবিতাগুলিতে তাহারই প্রমাণ। 'অনাবৃষ্টি'-তে বৃষ্টির জন্য কৃষককন্যকার ব্যাকুল, ঊর্ধ্বমুখী প্রার্থনা দেবতার বধির কর্ণে প্রবেশ-লাভ করে না—যৌবনের আবেদন এখন মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কবির ঈষৎ শ্লেষাত্মক পরিসমাপ্তি-মন্তব্য কবিতার ভাবকেন্দ্রটিকে বিচলিত করিয়াছে মনে হয়। প্রথম দুইটি কবিতায় 'মানসী'র 'সিন্ধুতরঙ্গ' কবিতাটিতে প্রকৃতির নির্মমতা ও স্নেহ-শীলতার মধ্যে যে আপাত-বৈপরীত্য, তাহাই উহার নিষ্করুণতা-প্রতীতির একক প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনে হয় যে 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'-য় সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকৃতির সহিত একাত্মতা-প্রত্যয়ের কোন চিহ্ন এখানে দেখা যায় না। 'মৃত্যু-মাধুরী', 'স্মৃতি' ও 'বিলয়' বর্ষাসিক্ত, রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতি-পরিবেশে মরণের সহজ মাধুর্য, মানবাত্মার জন্য মৃত্যুর নিখিলসৌন্দর্যাস্তীর্ণ প্রেম-বাসর-রচনার আমন্ত্রণ কোন অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের সমর্থন ব্যতিরেকেই কবির অনুভূতিকে আবিষ্ট করিয়াছে।

মৃত্যুই ক্ষুদ্র মানবজীবনকে সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্যলোকে প্রবেশাধিকার দিয়া উহাকে সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে মুক্তি দিয়াছে। অকালমৃত্যুকবলিতা প্রণয়িনীর অঙ্গলাবণ্য প্রকৃতিসৌন্দর্যের মধ্যে নবরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া কবিপ্রাণকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। এগুলি যেন 'স্মরণে' ও 'বলাকা'-র 'ছবি' কবিতার পূর্বাভাস। তথাপি অনুযোগের মৃদু কণ্ঠ, শান্ত প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয় নাই। এই কবিতাগুলিতে তত্ত্বকাঠিন্য কাব্যসৌন্দর্যে অভিষিক্ত হইয়া একেবারে তরল না হইলেও কোমল ও দ্রবীভূত হইয়াছে।

কতকগুলি কবিতায়—যথা, 'অভিমান', 'তৃণ', 'ঐশ্বর্য', 'স্বার্থ', 'শান্তিমন্ত্র' প্রভৃতিতে—কবি-জীবনে বৈষয়িক বিরোধ ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের এক স্বার্থ-কলুষিত, পরিবাদজর্জর অধ্যায়ের কালিমা-কাহিনী ইঙ্গিতে আভাসিত হইয়াছে। সাধারণতঃ রবীন্দ্রকাব্য কবির বৈষয়িক-জীবননিরপেক্ষ; কতকগুলি বিশেষ ভাবঘন মুহূর্ত ছাড়া তাঁহার ব্যক্তিজীবনের সঙ্গেও উহার বিশেষ তথ্যভিত্তিক সম্পর্ক দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু এই প্রৌঢ়জীবনের প্রারম্ভে প্রীতিভাজন আত্মীয়দের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাত তাঁহার কাব্যজীবনের ভাবলোকবিহারের মধ্যে এক বেদনাময় অভিজ্ঞতার বিষণ্ণ সুর অনুরণিত করিয়াছে। হয় কবির সুখদুঃখের অতীত জীবনদর্শন এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, নতুবা আঘাতের তীব্রতা ও আকস্মিকতা তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে ভারসাম্যচ্যুত করিয়াছিল। তথাপি এই কবিতাগুলিতে কবির উদার আদর্শবাদ প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—কুৎসা-গ্লানির প্রত্যুত্তরে তিনি জানাইয়াছেন শান্ত অনুযোগ ও তাঁহার অনুসৃত আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে অবিচল আস্থা। বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র তৃণের বা কবির তুচ্ছতম গানের যে ছন্দনিরূপিত, শাশ্বত স্থান আছে, তাঁহার নিন্দুকদের ঐশ্বর্যবিলাসের সে স্থান নাই। স্বার্থ উদার সার্বভৌম বিশ্বসত্যকে বিকৃত করে; কিন্তু কবি-হৃদয়ে প্রেমের অবিনশ্বরতার প্রতি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত তিনি ইছামতী নদী ও তাঁহার অন্তর্যামিনী কাব্যলক্ষ্মী দেবীর প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছেন যাহাতে সাংসারিক কূটচক্রান্ত ও বিষদিগ্ধ অপবাদ-রটনার মধ্যে তাঁহার চিত্তশান্তি ও পার্থিব লাভক্ষতির প্রতি নিঃস্পৃহতা চিরদিন অব্যাহত থাকে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, যে-জীবনদেবতা তাঁহাকে নিখিলের মর্মানুপ্রবেশের প্রেরণা দিয়াছিলেন, তাঁহাকে একটি তুচ্ছ জ্ঞাতিকলহের বিষজ্বালার প্রতিষেধক শক্তিরূপে কবিকে আবাহন করিতে হইয়াছে।

৩

'চৈতালি'-র প্রেমকবিতাগুলিও প্রায়ই আবেগ-উত্তাপহীন ও মননপ্রধান। মনে হয় অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিনটি কাব্যে যে উচ্ছ্বসিত ভাব ও সৌন্দর্যপ্লাবন কবির মনোভূমিকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, 'চৈতালি'-তে তাহারই পরিত্যক্ত পলিমাটির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্বর ভূমিখণ্ডে গূঢ়ার্থক দার্শনিক চিন্তার বীজবপন-প্রয়াস। প্রণয়লীলার সৌন্দর্যমহিমাময় বেদগানের পরে এখানে কবি তাহার সূত্রসংক্ষেপসংকলন করিয়াছেন। 'মানসী', 'নারী', 'প্রিয়া', 'ধ্যান' এই চতুর্দশপদী-চতুষ্টয়ে প্রণয়ের তত্ত্বরূপসমীক্ষার পরিচয় পাই, বিশ্বরহস্যে উহার তাৎপর্য-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। 'মানসী'-তে কবি বলিয়াছেন নারী বিধাতা ও পুরুষের যুগ্ম সৃষ্টি—বিধাতার নিরাবেগ শিল্প-নির্মিতির উপর পুরুষের ব্যাকুল বাসনাসঞ্জাত প্রসাধন-সংগ্রহ, সত্যের উপর কল্পনার অনুরঞ্জন, স্বভাব-চারুতার শুভ্র আলোকের উপর আবেশ-মুগ্ধতার বর্ণালী-বিকিরণ। 'নারী'-কবিতায় নারীর এই মানস উদ্ভবের ভিত্তিতে কবি একদিকে তাহার সহিত পুরুষের জন্মান্তরীণ সম্পর্কের প্রত্যয়, অন্যদিকে নিখিলের সৌন্দর্যের সঙ্গে তাহার সহজ মিলনপ্রবণতা অনুমান করিয়াছেন। নারী-সত্তা মনের সুষমায় নির্মিত বলিয়া বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্যরাজির সহিত তাহার এমন অনায়াস একাত্মতা। পুরুষ-মনের অনন্ত তৃষ্ণাই এই মিলনের প্রেরণা ও এই মানস প্রতিমার চরণে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় লোকের শ্রেষ্ঠ সাধনাই নিবেদিত হয়। এই কবিতাটিতে নারীর স্বভাবমহিমা কিঞ্চিৎ খর্ব করা হইয়াছে, কেন না ইহার মূলে আছে পুরুষের আবেশমত্ততা।

'প্রিয়া' ও 'ধ্যান' কবিতাদ্বয়ে নারীর এই পুরুষচিত্তনির্ভরতাকে উদাত্ত কণ্ঠে অস্বীকার করা হইয়াছে ও তাহার নিজস্ব আত্মিক জ্যোতিঃ-ই যে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্যের মূল উৎস তাহা কবি ঘোষণা করিয়াছেন। নারীর এই অন্তরদীপ্তি পুরুষের মনের মাধ্যমে বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত সৌন্দর্যচেতনার উদ্বোধন করে। নারীই দীপ জ্বালিয়া সমস্ত বিশ্বকে পুরুষের অন্তরে আবাহন করিয়াছে। সুতরাং এই কবিতায় বিশ্বের সৌন্দর্যসম্ভার-বিষয়ে পুরুষের অনুভূতির মধ্যে যোগসূত্র-রচনার গৌরব নারীরই প্রাপ্য। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও তাঁহার Prelude-এ বলিয়াছেন যে মাতা যখন শিশুর জন্য আকাশের চাঁদকে আহ্বান করেন, তখন শিশুর মনে চাঁদের সৌন্দর্যবোধ মাতৃস্নেহের মাধ্যমেই জাগ্রত হয়, অনাত্মীয় ও সুদূরবর্তী চাঁদের আকর্ষণ মাতৃস্নেহের সহিত নিবিড় সম্পর্কের জন্যই তাহার নিকট

এত মোহময় মনে হয়। মনে প্রবল আগ্রহ সঞ্চারিত না হইলে জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবচিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারে না—এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যই কবিতাটির ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে। 'ধ্যান' কবিতাটিতে কবি অনুভূতির আরও উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিয়াছেন। প্রেমকে বড় করিয়া দেখাই সত্য-দৃষ্টি, প্রেমের স্বরূপ-উপলব্ধির যথার্থ উপায়। প্রেমকে ছোট করিয়া দেখিলে উহার প্রকৃতি সম্বন্ধেই অজ্ঞ থাকিতে হয়। এই মুখবন্ধের পর কবি যুক্তির ক্ষেত্র হইতে তাঁহার নিজস্ব অবস্থানভূমি ধ্যানকল্পনার রাজ্যে উড্ডীন হইয়াছেন। প্রলয়ের সর্ববিলোপী মহাসমুদ্রের মধ্যে একমাত্র প্রেমের পদ্ম বিকশিত থাকে, এবং প্রেমস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা এই প্রেমপদ্মের মধ্যেই নিজ শাশ্বত আত্ম-প্রতিচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছেন—প্রেমের সৌন্দর্যই স্রষ্টার একমাত্র ধ্যানের বিষয় ও প্রলয়ান্তিক সৃষ্টির একমাত্র প্রেরণা। শেষ পর্যন্ত কবি-ঋষি প্রেমরহস্যকে পুরুষের মানস আকৃতি ও বিশ্বসৌন্দর্যের সহিত একাত্মতা হইতে উন্নীত করিয়া ভগবানের মনোগহনে বিকশিত একক পদ্মরূপে, সৃষ্টির আদিম প্রেরণারূপে অনুভব করিয়া কাব্যসৌন্দর্য ও ধ্যানচেতনার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

'প্রথম চুম্বন' ও 'শেষ চুম্বন' কবিতাদ্বয় Browning-এর 'Meeting at Night' ও 'Parting at Morning' এই দুইটি কবিতার খানিকটা অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ও ভাবশীর্ষ (climax) উভয়ই Browning হইতে স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার ঘনীভূত স্তব্ধতার মধ্যে 'প্রথম চুম্বন' দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনির মত অনন্তলোকের বার্তাবহ। 'শেষ চুম্বন'-এ দ্রুত-বিলীয়মান নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া সদ্যোজাগ্রত জীবনের কোলাহল ইহার পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। ইহার চিত্রকল্পগুলিতে একটি ক্ষীণ অবসাদের ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা সাধারণতঃ প্রভাতের সহিত সংশ্লিষ্ট নবজীবনের উৎসাহের সম্পূর্ণ বিপরীত। কবি প্রেমের নিবিড় স্বপ্ন টুটার, উহার অনুকূল ঘন-আবেশময় নৈঃশব্দ্য-যবনিকার অপসারণের বেদনায় বিধুর। প্রভাতসূর্যকে প্রত্যুদ্গমন জানাইবার, কর্মরথের মোহবন্ধনমুক্ত গতিবেগের সহিত প্রাণমনের সাধর্ম্য অনুভব করার মনোভাব তাঁহার নাই। এমন কি বাতায়নের অবকাশ-পথে বালারুণের অনুপ্রবেশ তাঁহার মনে পরিতাপের জ্বালারূপে অনুভূত হইয়াছে। কবির মেজাজের সঙ্গে পরিবেশের রং কেমন করিয়া পালটায়, কবিতা দুইটি তাহার সুন্দর উদাহরণ। 'গান' কবিতাটিতে প্রেমের মৃদু উচ্ছ্বাস ও ছন্দের ভীরু ক্রীড়াশীলতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

'চৈতালির'-র নিসর্গ কবিতাগুলিও—'মধ্যাহ্ন', 'প্রভাত', 'পদ্মা', 'বর্ষশেষ', 'নদীযাত্রা', 'ইছামতী নদী', 'শুশ্রূষা', 'আশিষ-গ্রহণ', 'বিদায়'—সবই এই কাব্য-পরিব্যাপ্ত সুর-সূত্রে গ্রথিত। সব কয়টিতেই একটি শান্ত, নির্মল, কল্যাণবোধপূত অনুভূতি নিরুচ্ছ্বাস মহিমায় সঞ্চরমান। কবির দার্শনিক প্রত্যয়, প্রকৃতির সহিত একাত্মতাবোধ এখানে কোন উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ বা কল্পনার কোন উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত উত্তেজনা জাগায় নাই, একটা সহজ প্রশান্তিময় স্বীকৃতির মধ্যে আত্মসংহরণ করিয়াছে। প্রভাত বা মধ্যাহ্নের চিত্র একটি মিতভাষী আনন্দরসে আপ্লুত। ক্লাসিকাল সংযমের সুস্পষ্ট রেখাবিন্যাসের মধ্যে রোমান্টিক ভাবপ্রগাঢ়তার স্থির সন্নিবেশ। প্রভাত একটি আশীর্বাদের মত, মধ্যাহ্ন একটি সমীকরণকারী ধ্যানাবেশের মত, সন্ধ্যা একটি ক্লান্তিহরা স্নেহহস্তের মত কবির অন্তরাত্মার উপর একটি মৃদু শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া যাইতেছে। 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় কবির যে বিশ্বচেতনা তাঁহার পূর্বতন কাব্যগুলিতে এক উত্তাল ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা একটি নিস্তরঙ্গ বক্ষঃস্পন্দনসংরুদ্ধ আনন্দানুভবে ঘনীভূত হইয়াছে। পদ্মা ও ইছামতী—নদীরূপে উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য! একের দুরন্ত স্রোতোবেগ, অপরের স্তিমিত-মন্থর জলধারা! কিন্তু কবির অন্তরের বন্ধনে উভয়েই বাঁধা পড়িয়া তাঁহার অন্তর্জগতের মানচিত্রে প্রীতি-প্রবাহিণীর ন্যায় পাশাপাশি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পদ্মা তাঁহার নিকট জন্মান্তরীণ অচ্ছেদ্য সম্পর্কের স্মৃতিবাহিনী, লাজনম্রা বধূর ন্যায় আত্মসমর্পণকারিণী ও পরজন্মে মিলনপ্রত্যাশিনী। ইছামতী পল্লীকল্লোলিনী ক্ষুদ্র তটিনী সংসারযুদ্ধে প্রবিশ্যমান কবির কর্ণে শান্তিমন্ত্রগুঞ্জরিণী ও অভয়ের আশ্বাসরূপিণী। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে পদ্মার উন্মত্ত সংহারমূর্তি ও ভৈরব জলোচ্ছ্বাস কবির কল্পনায় ধরা পড়ে নাই, উহার কল্যাণী বধূরূপই তাঁহার মানস সমর্থন লাভ করিয়াছে। কবি দ্বিতীয় জহ্নুমুনির ন্যায় এই উদ্দাম, খরবেগা পর্বতনন্দিনীকে নিজ কল্পনাগণ্ডূষে পান করিয়া তাহাকে আপন নিখিলব্যাপ্ত ভাবচেতনার অঙ্গীভূত করিয়াছেন।

'চৈতালি'র 'বর্ষশেষ' কবিতার সহিত কল্পনার অভিন্ননামা কবিতার কি অপরিসীম ভাবব্যবধান! 'কল্পনা'য় বর্ষশেষ আসিয়াছে ঝড়ের দুর্দান্ত পক্ষ-ঝাপটে, মেঘমন্দ্রে ও বিদ্যুৎ-ঝলকে, ধারাবর্ষণের ক্ষণিক উন্মত্ততায়, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সৃষ্টিমন্থনকারী মহাবিপর্যয়ে ও শেষ পর্যন্ত উভয়ত্রই এক নবজগতের

কল্যাণময় আবির্ভাবের আশ্বাসদ্যোতনায়। চৈতালির 'বর্ষশেষ' ইহার সহিত তুলনায় একেবারেই শান্ত, কেবল বিহগকূজনমুখরিত। বর্ষশেষ সমস্ত প্রাণিজগতে কোন সমাপ্তি-ব্যঞ্জনা-বহন, জীবনশেষের কোন অশুভ ইঙ্গিতের ছায়াপাত করে না। এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দপ্রবাহ বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভকে চির-সংযুক্ত রাখিয়া উভয়ের স্বাতন্ত্র্যকল্পনার প্রতিবাদই জানায়। পক্ষীর মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ বক ও মৃত্যু-চিন্তায় বিমর্ষ মানবই এই কাল্পনিক বিভীষিকার নিকট নিজ সুস্থ জীবনানন্দকে বিসর্জন দেয়। 'চৈতালি'র সহজ-আনন্দময় আবহাওয়া ও জটিল দার্শনিক চিন্তামুক্ত সরল জীবনোপভোগই কবিকে বর্ষশেষের এই প্রাকৃতচিত্তসুলভ ভাষ্যরচনার প্রেরণা দিয়াছে।

৫

এ পর্যন্ত 'চৈতালি'র যে কবিতাসমূহের আলোচনা করা হইল তাহাতে উহার অতীতরোমন্থনের প্রবণতাই সুস্পষ্ট হইয়াছে, কোন নব পরিণতির সূচনা দেখা যায় নাই। মনে হয় যেন কবি তাঁহার কাব্যজীবনের এক সমৃদ্ধ, যৌবনলীলা-রসের আস্বাদন-মধুর পর্যায় শেষ করিয়া এক পূর্ণতা-বোধের তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন। যাহা আহরণে রোমাঞ্চময় ও প্রথম আস্বাদের আনন্দাতিশয্যে উদ্‌ভ্রান্তিকর ছিল তাহা অধিকারের পর যেন অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতার শান্তছন্দবিধৃত হইল। বিশ্বজীবনের সহিত ব্যক্তিজীবনের মিলন-রহস্য, নিজ কাব্যপ্রেরণার স্বরূপ-নির্ণয়ের মায়াচক্রভ্রমণ, সোনার তরীর দুর্বোধ্য খেয়ালিপনা ও নিরুদ্দেশ যাত্রার বঞ্চনাকুটিল বিভ্রম—সব যেন কবির নিকট হয় মরীচিকার ন্যায় দিগন্ত-বিলীন, না হয় নিঃশ্বাস-বায়ুর মত সহজ হইয়া আসিয়াছে। হৃদয়ের আশা-নৈরাশ্যের মধ্যে উত্থান-পতন, প্রণয়ের আনন্দ-বেদনার চিরন্তন দ্বন্দ্ব, আদর্শের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মধ্যে অশ্রান্ত অগ্র-ও-পশ্চাৎগতি—এক কথায় জীবনের সমস্ত সংঘাতময় ও বিপরীত সীমার মধ্যে আন্দোলিত গতিসংবেগ—সব যেন 'চৈতালি'-তে আসিয়া মৃদু ও নিয়মিত নাড়ী-স্পন্দনের মত একটা চিরপ্রত্যয়ের পরিণতফল মানস সংস্কারের রূপ লইয়াছে। অতীত কীর্তির যবনিকাপাত অনাগতের উন্মেষদ্বারকেও যেন রুদ্ধ করিয়াছে।

কিন্তু এই চিত্র সর্বাংশে সত্য নয়—যবনিকার একটি রন্ধ্রপথে অন্ততঃ আগামী প্রবণতার একটি সূত্র দর্শন করি। এই সূত্র হইল প্রাচীন ভারতের, বিশেষতঃ

উহার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি কালিদাসের সহিত রবীন্দ্রনাথের আত্মিক যোগ-স্থাপন। 'বনে ও রাজ্যে', 'সভ্যতার প্রতি', 'বন', 'তপোবন', 'প্রাচীন ভারত', 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান', 'মানসলোক' ও 'কাব্য'—এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের এই প্রাচীন আদর্শের রাজ্যে পদক্ষেপচিহ্ন বহন করে। রামের সীতার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও অনির্বাণ বিরহবেদনা এই মন্দির-প্রবেশের প্রথম সোপান। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের সমস্ত ঘটনাসংঘাত ও নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগ, পঞ্চবটীর সানন্দ বনযাত্রা ও সীতাহীন অযোধ্যার নিরানন্দ রাজ্যভোগের মর্মান্তিক পার্থক্য এই চতুর্দশপদীর পংক্তিগুলির মধ্যে সংহত রূপ লইয়াছে। সমাপ্তি-পয়ারে এই বৈপরীত্যবোধ বিরোধাভাস অলঙ্কারের চমকপ্রদ অভিব্যক্তিতে স্মরণীয়তা লাভ করিয়াছে।

নিত্যসুখ দীনবেশে বনে গেল ফিরে,
স্বর্ণময়ী চিরব্যথা রাজার মন্দিরে।

'সভ্যতার প্রতি', 'বন' ও 'তপোবন' এই কবিতাত্রয়ে ভারতের আরণ্য-সভ্যতার মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথমটিতে বর্তমান ভোগসর্বস্ব সভ্যতার সহিত পার্থক্য কবির তীব্র অভাববোধ ও হৃদয়াবেগকে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয়টিতে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনা বনের উপর কালিদাস-প্রভাবিত পথে এক নূতন গরিমা অর্পণ করিয়াছে—হয়ত তপোমগ্ন বনবাসী ঋষিদের এই কবিদৃষ্টি ছিল না। 'তপোবন' কবিতাটি সম্পূর্ণ কালিদাসস্মৃতি-আশ্রয়ী এবং কিছুটা পূর্বপ্রথানুসারী। 'প্রাচীন ভারত' ক্ষত্রিয়-গরিমা ও ব্রাহ্মণ-মহিমার পার্থক্য দেখাইবার সচেতন প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্যপরতন্ত্র ও কাব্যানু-ভূতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভূমিকার পর রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে কালিদাসের 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত' ও 'কুমারসম্ভব গান' এই তিনটি কবিতায় তাঁহার তিনটি কাব্যের রসাবেদন-বৈচিত্র্য অপূর্ব অন্তর্দৃষ্টি ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জনার সহিত প্রকটিত করিয়াছেন। 'ঋতুসংহার'-এ ভোগসমৃদ্ধ প্রেমের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ; 'মেঘদূত'-এ এই প্রেমের রাজ্যচ্যুতি ও মরীচিকা-বিলয় ও এই বিরাট শূন্যতার মধ্যে অশ্রুসিক্ত, নিঃসঙ্গ বিরহের অভিষেক ও কৃত্রিমবিলাসমুক্ত উদার প্রকৃতি ও সরল গ্রাম্যজীবনের সুদূর দিগন্তলগ্ন আভাসরেখা ; 'কুমারসম্ভব গান'-এ কুমারসম্ভবরচনার পশ্চাৎপট-কল্পনা, পার্বতীর প্রেমসাধনার কাহিনী-শ্রবণে দেবীর ভাব-বিপর্যয় ও কাব্যের

শেষ সর্গে দেবদম্পতির ভোগাতিশয্যবর্ণনায় দেবীর ব্রীড়া-প্রকাশ ও উহারই নীরব অনুযোগে কবির অকালবিরতি।

'কালিদাসের প্রতি', 'মানসলোক' ও 'কাব্য'—এই তিনটি কবিতা কবি-জীবনের স্বরূপ ও প্রেরণারহস্য নিরূপণের কৌতূহলাবিষ্ট। মহাকবির কাব্য-রচনার পটভূমি রবীন্দ্রনাথ কল্পনা-সহানুভূতির সাহায্যে পুনর্গঠন করিয়াছেন। ধ্যানভঙ্গের পর মহাদেবের ভূমানন্দপ্রসূত নৃত্য, মেঘ ও বিদ্যুতের সঙ্গত-সহযোগিতা ও উমার প্রসন্নহাস্য-সংবলিত স্নেহ-উপহার এই দিব্য সঙ্গীতের শিল্প-আবেদনকে পূর্ণ ও মানবিক প্রীতিসংযোগে জীবন্ত করিয়া তুলিত। 'মানসলোক' কালিদাসের কবিজীবনের বিক্রমাদিত্য-নিরপেক্ষ শাশ্বত তাৎপর্যটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কালিদাস রাজসভার কবি নহেন, শিবসংসদের কবি। তাঁহার আসন নবরত্নমালায় নহে, মানসকৈলাসের শঙ্করধামের উদাত্তগৌরবময় প্রকৃতি-পরিবেশের মধ্যে। তাই বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার রাজসভা বিস্মৃত, কিন্তু কালিদাস-মহিমা চিরোজ্জ্বল। 'কাব্য' কবিতাটিতে আধুনিক সমালোচনার চির-উদ্যত প্রশ্নটি উচ্চারিত হইয়াছে—কালিদাসের সুখদুঃখমিশ্র, আঘাত-সংঘাত-জর্জর ব্যক্তিজীবন তাঁহার সৌন্দর্যসারময়, কল্যাণবুদ্ধিপ্রণোদিত কাব্যে কেন ছায়াপাত করে নাই? রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কবি জীবনে বিষপান করিয়া থাকিলেও কাব্যে বিশুদ্ধ অমৃতরসই পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহার কাব্য তাঁহার জীবনাতীত।

প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শ ও মহাকবি কালিদাসের কাব্যসাধনার যুগ্ম স্বর্ণসূত্র অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যজীবনের অদূরবর্তী নব পর্যায়ে পদক্ষেপ করিয়াছেন। 'চৈতালি'র ইঙ্গিত অনুসরণেই 'কল্পনা'র আবির্ভাব ও কবির কাব্যমানচিত্রে নূতন দৃশ্যপটের উন্মোচন।

৬

কণিকা ১৯০০-০১ (১৩০৭)

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা' তাঁহার কবিপ্রেরণার স্বভাবধর্মের আরও আশ্চর্য ও অভাবনীয় ব্যতিক্রম। স্বল্পায়তন ভাবগাঢ়তা ও প্রকাশ-সংহতি তাঁহার কবিধর্মের স্বভাব-প্রসারশীলতার বিপরীতমুখী এক প্রকার সংযম-সাধনার দুরূহ অভ্যাসের মতই আমাদের মনে হয়। কাজেই যখনই

তাঁহার একটি বিশেষ ভাব-পরিবর্তন সূচিত হয়, তখনই এই অভিনব ভাব-প্রেরণা পূর্ণ গতিবেগ আহরণের পূর্বে কবির কাব্যে একটি মিতভাবিতার প্রয়াস দেখা যায়। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাত-সংগীত' ও 'ছবি ও গান' কবির এক অপরিস্ফুট ভাববাষ্পনিঃসরণের অতিকায় স্ফীতির যুগ। এখানে ভাবের তটবন্ধনহীন প্লাবন প্রায়ই গঠনসুষমাকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। 'কড়ি ও কোমল'-এ কবির বাষ্পকল্পনা প্রথম নির্দিষ্ট ও সুষম রূপাবয়বের অভিমুখী হইয়াছে, অতিস্ফীত ভাবমনন গঠনসীমা স্বীকার করিয়া বিন্যাস-পারিপাট্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে। মনে হয় যে ইন্দ্রিয়ানুভবের রূপতৃষ্ণা, দেহসৌন্দর্যের প্রতি রোমন্থন-লোলুপ ভোগাকর্ষণ কাব্যের গঠন-সুষমার সহায়ক হইয়াছে। সৌন্দর্যের প্রতি অতিনিবিষ্টতার একটা কেন্দ্রানুগ আবর্তনশক্তি আছে। কবি যাহাকে বেশী করিয়া উপভোগ করিতে চাহেন তাহাকে যেমন নিজে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে চাহেন তেমনি কাব্যে তাহার রূপবর্ণনাতেও সুনির্দিষ্ট চিত্রকল্প বা ভাবমুগ্ধতা পাঠকের অনুভূতির জন্যও ফুটাইতে চাহেন। বৈষ্ণবকবিতার নায়ক-নায়িকা-মূর্তিতে তাই যুগপৎ লৌকিক রূপনিবিড়তা ও অলৌকিক রূপকব্যঞ্জনা সমন্বিত হইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল'-এ আমরা কবির অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বিলাস বা ভোগলালসাদুষ্ট রুচিবিকারের যতই নিন্দা করি না কেন এই সৌন্দর্যমত্ততাই তাঁহার মধ্যে প্রথম শিল্পসংযমের বীজ বপন করে। সৌরমণ্ডলের উদ্দাম আকর্ষণে দিশাহারা আমাদের এই পৃথিবীর আদিম জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড যেদিন নিজ ছন্দোনিয়মিত কক্ষপথের সন্ধান পাইল, সেইদিনই তাহার ঘূর্ণ্যমান অর্ধজড় চেতনায় তাহার শ্যামশ্রীমণ্ডিতা, পুষ্পাভরণা, সরিৎ-সমুদ্র-মেখলা যৌবন-কান্তির ভ্রূণস্বপ্ন এই গতিসুষমার সহিত মিশিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অর্ধপ্রবুদ্ধ যৌবন-চেতনায়, কবিমনের রূপমোহ ও প্রকাশসংযমের মৈত্রী-দ্বন্দ্বের প্রাণোত্তাপময় পটভূমিতেই, তাঁহার মহৎ কাব্যকল্পনা অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

সুতরাং 'কড়ি ও কোমল'-এর চতুর্দশপদী কবিতাবলী একটি সঙ্কীর্ণ সংযোজক প্রণালীর ন্যায় কবির প্রথম জীবনের দার্শনিক মনন ও কল্পনাবিলাস ও পরবর্তী স্তরের গীতিকবিতার অজস্র উৎসারের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়াছে। ইহাদের ভাবসংক্ষেপ ও অবয়ব-সঙ্কোচ একটা আসন্ন প্লাবনের উৎসমুখকে কিছুক্ষণের জন্য রোধ ও সেই ভাবমুক্তির পিছনকার বেগসঞ্চয়ের সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু 'কণিকা'তে আমরা এই অতিসঙ্কোচনের যে নিদর্শন দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইহা কবির কাব্যজীবনের একটা ক্ষণিক খেয়াল,

কোন ভবিষ্যৎ পরিণতির অগ্রদূত নহে। ইহাতে কবি নিজ ভাবায়তনের পরিমাণ কমাইতে কমাইতে একেবারে ন্যূনতম স্বচ্যগ্র মননবিন্দুতে পৌঁছিয়াছেন। আরও আশ্চর্যের কথা যে ইহাদের বস্তু-অংশ আহৃত হইয়াছে কোন কল্পনা-সমুন্নত আদর্শবাদ হইতে নহে, খাঁটি বাস্তবউপলব্ধি-প্রসূত জীবন-অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হইতে। ইহার কাব্য-প্রেরণা আশ্চর্য উপযোগী দৃষ্টান্ত-নির্বাচনে, উহাদের অন্তর্নিহিত জীবনসত্যব্যঞ্জনায় ও অনেক কবিতায় সিদ্ধান্তের চমকপ্রদ তীক্ষ্ণতায় নিঃশেষিত। কবি নিজ কল্পনা ও ভাবোচ্ছ্বাসকে, চিরাভ্যস্ত মণ্ডনকলাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাদিগকে নিজ সীমিত উদ্দেশ্যের অধীন রাখিয়াছেন। কোথাও কোথাও গভীর জীবনসত্যের ইঙ্গিত বা দার্শনিক সূত্রাকারে নিবদ্ধ অধ্যাত্মতত্ত্বের দ্যোতনাও দেখা যায়। মোটের উপর এই সংক্ষিপ্ততম কবিতা-সংকলনে কবি নিজ কাব্যদৃষ্টিকে আবৃত রাখিয়া নীতিবিদ জীবনসমীক্ষকরূপেই আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই কণা-আহরণে তিনি যে শক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কোন পরবর্তী কাব্যরচনায় তাহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই। কবির বাস্তবচেতনা, পরিহাসরসিকতা, জীবনের অসঙ্গতির উপর তির্যক কটাক্ষপাত—এ সমস্তই তাঁহার পরের রচনায় ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে বিশিষ্ট মানস প্রক্রিয়ার ফলে বক্তব্যের এরূপ ঘনত্ববিধান (condensation), চিন্তা ও ভাবের এরূপ তীক্ষ্ণাগ্র নির্যাসবিন্দুতে তনিমা সম্ভব তাহার অনুশীলনের কোন নিদর্শন কবির ভবিষ্যৎ কাব্যে দুর্লভ। সমস্ত কবিতার মধ্যে জীবনের মেকী-উদ্‌ঘাটনে বুদ্ধির যে ক্ষিপ্রতা ও ঔজ্জ্বল্য উদাহৃত তাহা কৌতুকরসে অভিষিক্ত হইয়া রূঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্বাভিমান হারাইয়াছে। কবির স্নিগ্ধ হাসি মানুষের ভ্রান্তি ও মনোবিকারের গ্লানিকে শুধু সহনীয়ই করে নাই, আস্বাদ্যও করিয়াছে। কৌতুকচ্ছটায় ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা চাপা পড়িয়াছে।

৭

পদ-ও-বংশগৌরবের জন্য অযোগ্যের লোলুপতা সংসারে অনেক কৌতুককর অসঙ্গতির উৎস। মঞ্চারূঢ় কুষ্মাণ্ডের আকাশপ্রীতি ও ভূমিবিরূপতা, যে বোঁটা তাহাকে মাটির সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়াছে তাহার প্রতি অবজ্ঞা এইরূপ একটি হাস্যকর অভিমানের উদাহরণ। বোঁটা কাটা গেলেই আকাশ-পিয়াসী কুষ্মাণ্ডের

ভূতল-পতনে এই ভ্রান্তির নিরসন। বড়র সহিত আত্মীয়তার দুরাকাঙ্ক্ষা আর ছোটর সহিত সম্পর্কের প্রবল অবজ্ঞাপূর্ণ অস্বীকৃতির সহাবস্থান, অনেকের চরিত্রের স্ববিরোধটি হাস্যকরভাবে প্রকটিত করিয়াছে। কেরোসিন শিখা, মাটির প্রদীপ ও চাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটি এই মানস প্রবণতার দৃষ্টান্ত। 'পর ও আত্মীয়' কবিতায় ছাই ও ধোঁয়া আলোকশিখার সঙ্গে জন্ম-আত্মীয়তা দাবী করে; কিন্তু জোনাকি রক্তসম্পর্কহীন হইয়াও আলোকের স্বভাবধর্মের অধিকারী। তেমনি ভিক্ষার ঝুলি ও টাকার থলির মধ্যে উপাদানগত সাম্য আভ্যন্তরীণ পূর্ণতা ও শূন্যতার ভেদের জন্য অস্বীকৃত, একবংশোদ্ভব ধনী ও দরিদ্রের সাম্যের দাবীর ন্যায়। আবার 'আত্মশত্রুতা' কবিতায় খোঁপা ও এলো চুলের দ্বন্দ্ব একই বস্তুর দুই ভিন্নরূপের মধ্যে অকারণ বিবাদ বলিয়া হাস্যোদ্দীপক। শেষে কবির মধ্যস্থতায় ইহার মীমাংসা হইয়াছে।

আত্মশক্তির সীমা সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা ও নিজ অবস্থা সম্বন্ধে অহেতুক অসন্তোষ যেমন মানবজগতে তেমনি প্রাণি-ও-জড়জগতেও নানা কৌতুককর বিভ্রান্তি ও সঙ্কটের হেতু হয়। কাঁসার ঘটি নিজ ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া কূপের অপ্রশস্ততার জন্য অনুযোগ জানাইয়াছে। কূপ সমুদ্র হইলে আর যাহাই হউক ঘটির যে ইচ্ছামত ওঠা-নামার সুবিধা হইত না এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধে সে অভিমানে অন্ধ। তেমনি চকোরী নিজ ক্ষণজীবিত্ব ভুলিয়া চাঁদের পরমায়ুর স্বল্পতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। 'মোহের আশঙ্কা'তেও বসুন্ধরার সৌন্দর্যমুগ্ধ সদ্যোপ্রস্ফুটিত পুষ্প পৃথিবীকে অন্ততঃ তাহার জীবনকালের জন্য বাঁচিয়া থাকিবার অনুরোধ জানাইয়াছে। 'অযোগ্যের উপহাস'-এ দীপ নক্ষত্রপতনের জন্য সমবেদনা জানাইতে গিয়া নিজ তৈলনির্ভর স্বল্পায়ুর কথা ভুলিয়াছে। 'স্পর্ধা'-য় হাউই ঊর্ধ্বগগনে উঠিয়া তারকাকে ভস্মলিপ্ত করিয়া আসে বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছে। কবি কিন্তু তাহাকে স্মরণ করাইয়াছেন যে সেই ছাই নির্বাপিত হাউই-এর পিছন পিছন ফিরিয়া তাহারই অঙ্গকে কলঙ্কিত করে।

নিজের অনাদরে অসন্তুষ্ট মহিষ ঘোড়ার ন্যায় দলন-মলন দাবী করিয়া সহ্যাতিরিক্ত সেবা লাভ করিয়াছে ও কাঁদিয়া-কাটিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিতে চাহিয়াছে। লাঙ্গল ফালের সংযোগকে উহার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কারণ মনে করিয়া উহার সংসর্গ-ত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। কিন্তু ফালহীন লাঙ্গল যখন অকেজো কাঠহিসাবে অগ্নি-সমর্পিত হইতে চলিয়াছে তখন সে

আপনার ভ্রম বুঝিয়াছে। আগুনে পোড়া অপেক্ষা মাটিচষা ভাল এই জ্ঞান তাহার জন্মিয়াছে। 'পরের কর্মবিচার'-এ নাক ও কান পরস্পরের বিরুদ্ধে অকর্মণ্যতার অভিযোগ আনিয়া আপনাদেরই বিচার-সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছে।

অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকগুলি কবিতায় হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে। 'হার-জিত'-এ ভিমরুল-মৌমাছি, 'ভার'-এ টুনটুনি-ময়ূর, 'যথাকর্তব্য'-এ 'ছাতা ও মাথা', 'অধিকার'-এ বকুল-পলাশ-গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পদল একদিকে, অপর দিকে মূলজ উদ্ভিদ্ কচু, প্রজাপতি ভ্রমর ('গুণজ্ঞ'), বোলতা-মধুকর ('হাতে-কলমে'), আগা ও গোড়া ('মূল'), টিকি ও হাত-পা ('কৃতীর প্রমাদ'), কানা কড়ি ও টাকা, ('সমালোচক'), শর ও গদা ('গদ্য ও পদ্য'), কুয়াশা ও মেঘ ('কুয়াশার আক্ষেপ') প্রভৃতি কবিতা এই পর্যায়ভুক্ত। প্রাণি-ও-বস্তুজগতের এই অধিবাসীগুলি আপেক্ষিকমর্যাদাসম্পন্ন ভাবসত্যের প্রতীক-রূপেই এই প্রতিযোগিতা-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই পর্যায়ের কবিতা-গুলিতে ভাবের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথ অনেকটা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ ও ঈশপের আখ্যানের অনুবর্তী হইয়াছেন। কিন্তু প্রকাশের শিল্পকৌশলে ও সংক্ষেপতীক্ষ্ণতায় প্রায় প্রতিটি কবিতাই হীরকখণ্ডের ন্যায় মৌলিকদ্যুতি-সমুজ্জ্বল। এই ক্ষুদ্রকায় কবিতাসমূহে কল্পনা-প্রসারের অবসর নাই, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকটি রন্ধ্র, প্রতিটি সূক্ষ্ম আবর্তনের খাঁজ কাব্যসুরভি-অনুবাসিত। ইহাদের মধ্যে ভিমরুল-মৌমাছি বা বোলতা-মধুকর, অথবা প্রজাপতি-ভ্রমরের দ্বন্দ্ব বিশেষ মৌলিকতাহীন, প্রাচীন বিতণ্ডাধারার অনুসারী। কিন্তু কতকগুলি কবির মৌলিকচিন্তাদীপ্ত, অপ্রত্যাশিত ভাবসংঘাতের স্ফুলিঙ্গ-চমকিত। টুনটুনি ময়ূরের অসম পুচ্ছ বিস্তারের জন্য তাহার প্রতি বিদ্রূপশীল; ময়ূর তাহার গৌরবের অনুষঙ্গীরূপে এই ভারবহনের সমর্থন জানাইয়াছে। বকুল-পলাশ-গোলাপ কেহ গন্ধে, কেহ বর্ণে, কেহ বা গন্ধ-বর্ণের যুগপৎ-সম্মিলনে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাইয়াছে। কিন্তু কচু, আধুনিক বস্তুবাদী কবির ন্যায়, ভূমিদখলের সত্ত্বে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বর্তমান-কালগ্রাহ্য প্রমাণে তাহারই জয় সুনিশ্চিত। ছাতা ও মাথার দ্বন্দ্বে মাথার মর্যাদা-স্বীকৃতির ভিত্তিতেই মাথার জয় হইয়াছে, কিন্তু ছাতা এই সত্য মানিয়া লইবে কি না সন্দেহ। 'আগা ও গোড়া'র বিতণ্ডায় গোড়া যে আগার উচ্চতার মূলে এই সত্য ব্যক্ত করিয়াই বিতর্কের অবসান ঘটাইয়াছে। 'কানা কড়ি ও টাকা'র

তথা 'টিকি ও হাত-পা'র কলহে সমালোচকের অক্ষম দূষণবৃত্তিই পরোক্ষে খোঁচা খাইয়াছে। যাহা মূল্যহীন ও নিষ্কর্মা তাহাই যে আপন স্বল্পমূল্যের কার্যনিরত বৃত্তিগুলির ত্রুটি দেখাইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তাহাই এখানে সমালোচনার বিষয়। এই কবিতাগুচ্ছের বিষয় ও ভাব-প্রকাশপদ্ধতির উপর আধুনিকতার ছাপটি সুস্পষ্ট।

৮

শুধু যে সাংসারিক অভিজ্ঞতা-লব্ধ ও কিয়ৎপরিমাণে কুটিল ও মলিন নীতি-জ্ঞানই কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে তাহা নয়, উদারতর ও উচ্চতর জীবন-সত্যও তাঁহার অনুভূতি-গোচর হইয়াছে। অবশ্য এই স্থূল দৃষ্টির অগম্য সত্য বিষয়ে অজ্ঞতাই সাধারণ ব্যক্তির অভিমতে প্রতিফলিত হইয়া সংশোধনের প্রতীক্ষা করে। এই পর্যায়ের কবিতাগুলি সাধারণ অদূরদর্শিতার প্রতিষেধক-রূপেই কল্পিত। হিসাবী-বুদ্ধি যাহাকে ঋণাত্মক মনে করে প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে তাহারই ধনাত্মক দিকটি উদ্‌ঘাটিত হইয়া ভ্রান্ত মতের অপনোদন করে ও কিঞ্চিৎ বিস্ময়চমক জাগায়। 'দানরিক্ত'-এ মেঘের বৃষ্টিসঞ্চয়হীন রিক্ততা বর্ষণপূর্ণ সরোবরের উপহাসের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু সে বোঝে না যে যে-দাতার অকৃপণ দানে সে পুষ্ট হইয়াছে তাহার দারিদ্র্যকেই সে অবজ্ঞা করিতেছে। 'স্পষ্টভাষী'-তে কাক কোকিলের চাটুকারিতার সহিত তুলনায় নিজ স্পষ্টবাদিত্বের বড়াই করিতেছে, কিন্তু স্পষ্টভাষণ আর সত্যভাষণ যে এক নয় এই সত্য তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। 'প্রতাপের তাপ'-এ ভাবের চমৎকারিত্ব ও মৌলিকতা কবিতার উপভোগ্যতা বাড়াইয়াছে। ভিজা কাঠ জলন্ত অঙ্গারের দীপ্তির প্রতি ঈর্ধ্যান্বিত, কিন্তু যে দহন-জ্বালা এই দীপ্তির কারণ তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। সে আগুনে না পুড়িয়া ঘুণে ধীরে ধীরে শতচ্ছিদ্র হওয়াও বাঞ্ছনীয় মনে করে। 'নম্রতায়' যাহা একদিক দিয়া দোষ তাহাই অপর দিক দিয়া গুণের নিদর্শন হইয়াছে। কঞ্চি ঝড়ে মাথা নোয়ায় না, কিন্তু বাঁশ নতি স্বীকার করিয়াও নিজ অঙ্গচ্ছেদে রাজী হয় না। 'ভিক্ষা ও উপার্জন'-এ শ্রমবিমুখ মানুষ বসুমতীর কার্পণ্যের নিন্দা করে। কিন্তু বসুমতী বলেন যে বিনা শ্রমে শস্য দান করিলে তাঁহার গৌরব যতটুকু বাড়িবে তাহার তুলনায় মানুষের গৌরব অনেক কমিবে। 'উচ্চের প্রয়োজন' ও 'অনাবশ্যকের আবশ্যকতা'

—উপেক্ষিত সত্যের উদ্‌ঘাটন করে বলিয়াই চমকপ্রদ। পর্বত ও সমুদ্র, আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হইলেও নদীপ্রবাহকে সমতল ভূমির ক্রোড়ে আকর্ষণ করে। 'অচেতন মাহাত্ম্য' ও 'শক্তের ক্ষমা'-য় মেঘ ও ধরণীর উদার মহানুভবতা সিদ্ধান্তের চমৎকারিত্বে উন বলিয়া মনে হয়—উহাদের মধ্যে কাব্য আছে, তীক্ষ্ণধার ভাবপ্রতিষ্ঠা নাই। 'প্রকারভেদ'-এ আমশাখা ও বাবলা-শাখা, কেহ বাঁচিয়া, কেহ আত্মাহুতি দিয়া নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী সফলতা অর্জন করিতেছে। উপায়ের পার্থক্যের দ্বারা উদ্দেশ্যের সমতা আড়াল পড়িতেছে। শেফালি ও তারার ('এক পরিণাম') মধ্যেও সেই একই পরিণাম-বন্ধন কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতাকে সংযোগসূত্রে গ্রথিত করিতেছে।

'ভক্তি-ভাজন', 'অস্ফুট ও পরিস্ফুট', 'আদিরহস্য', 'অদৃশ্য কারণ', 'মোহ', 'স্বাধীনতা', 'সত্যের সংযম', 'সৌন্দর্যের সংযম' প্রভৃতি কবিতায় ভ্রান্ত ধারণার অন্তরালে নিগূঢ়তর অধ্যাত্ম সত্য বা সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বরূপ গভীর ব্যঞ্জনাময় ভাষায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। 'ভক্তিভাজন'-এ রথযাত্রায় পথ, রথ এবং রথ-বাহিত মূর্তি প্রত্যেকেই দেবত্বের অধিকারীরূপে জনসংঘের ভক্তি-অর্ঘ্য দাবী করিতেছে। আসল দেবতা কিন্তু এই তিনটিকেই ছাড়াইয়া লোক-বুদ্ধির অতীতরূপে আত্মগোপন করিয়া আছেন। কত নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্য কত অল্প পরিসরে ব্যক্ত হইয়াছে! 'আদি রহস্য'-এও তেমনি বাঁশি ও ফুৎকার বাদকের অস্তিত্ব ও সুররহস্যের কারণ ভুলিয়া পরস্পরের উপর গৌরব আরোপ করিতে চাহিয়াছে। 'ফুল ও ফল'-এ আবির্ভাবের কাল-ব্যবধান দূরত্বের ভ্রান্তি আনিয়া পরস্পরের একদেহলীনত্বের সত্যটি আবৃত করে। 'অদৃশ্য কারণ'-এ কাব্যচিন্তা তত্ত্বপ্রহেলিকারূপে প্রকাশ পাইয়াছে; কবি ছাড়া আর কাহারও দৃষ্টিতে এই দুর্লক্ষ্য অসঙ্গতি ধরা পড়িত না। রাত্রির অদৃশ্য হস্ত ফুলের কুঁড়িগুলি ফুটাইয়া নিজে সরিয়া যায় ও সেগুলিকে পূর্ণপ্রস্ফুটিত ফুলরূপে প্রভাতের অর্ঘ্যথালায় উপহার সাজাইয়া দেয়। আশ্চর্যের বিষয়, প্রভাত-আলোকপায়ী ফুল ও পুষ্প-সৌন্দর্যে ঝল্‌মল্ প্রভাত উভয়েই এই অন্তরালবর্তিনী ধাত্রীর কথা ভুলিয়া প্রভাতের স্বামিত্বই মানিয়া লয়। 'অস্ফুট ও পরিস্ফুট'-এ ঘটিজলের স্বচ্ছতা ও সমুদ্রজলের গাঢ়নীল অস্বচ্ছতা ব্যবহারিক সত্যের সুস্পষ্টতা ও মূল সত্যের দুর্বোধ্যতার প্রতীকরূপে কল্পিত হইয়াছে। ইহারই বিপরীত সত্য 'অল্প জানা ও বেশী জানা'য় উদাহৃত। অল্পবুদ্ধিলোক জলের উপরিভাগের কালোটাই দেখে, এই কালো যে অনাবিল স্বচ্ছতার বহিরাবরণ

মাত্র তাহা সে বোঝে না। তেমনি জামের ('জ্ঞানের দৃষ্টি ও প্রেমের সম্ভোগ') কালো রং উহার স্বাদুতারই ত্বকাচ্ছাদন ; এই পার্থক্য জ্ঞানের ও প্রেমের দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যেরই রূপক। 'মোহ'-কবিতাটি আয়ত্তের প্রতি অবহেলা ও অনায়ত্তের প্রতি আকৃতি নদীর উভয়তীরের ক্ষোভেই পরিস্ফুট। 'স্বাধীনতায়' ধনুক ও শরের পারস্পরিক সম্পর্কে স্বাধীনতার স্বরূপের গভীরতত্ত্ব ও উহার, মধ্যে পরস্পর-বিরোধী শক্তির গূঢ় সহযোগিতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্থিতিশীল ধনুক শরের গতিবেগের আসল প্রেরণা ও উহার আপাতদৃষ্টিতে নিরঙ্কুশ দ্রুতধাবনের শক্তির আধার। 'সত্যের সংযম' ও 'সৌন্দর্যের সংযম' কবিতা দুইটি নীতি ও নন্দনতত্ত্বের নিগূঢ় নিয়মাধীনতার রহস্য ব্যক্ত করিতেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার সত্য ও সৌন্দর্য উভয়েরই .পরম পরিপন্থী। দুই চারি পংক্তিতে, বৈপরীত্যের গ্রন্থিমোচন করিয়া এরূপ প্রকৃতিগহন সত্যের ব্যঞ্জনা কবির একদিকে মনীষা অন্যদিকে গূঢ় প্রকাশরীতির অপূর্ব সার্থকতার পরিচয় বহন করে।

৯

আরও কতকগুলি কবিতায় কবি আমাদের সুপরিচিত কয়েকটি গুণের যে নূতন লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা উহাদের ব্যবহারজীর্ণ সত্তার উপর এক নবঅর্থবহনের চাকচিক্য আরোপ করিয়াছে। 'ভক্তি ও অতিভক্তি', 'অসম্ভব ভালো', 'ক্ষুদ্রের দম্ভ', 'সন্দেহের কারণ', অকৃতজ্ঞ', 'প্রভেদ', মাঝারির সতর্কতা', 'শক্রতাগৌরব', তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে', কর্তব্য-গ্রহণ', 'মহতের দুঃখ', 'অপরিহরণীয়', 'সুখদুঃখ', 'ছলনা', 'অনুরাগ ও বৈরাগ্য' প্রভৃতি এই পর্যায়ের কবিতা। এই সমস্ত গুণের আভিধানিক অর্থের উপর প্রয়োগ-তাৎপর্য ও অসদভিপ্রায়গত অপব্যবহার যুক্ত হইয়া ইহাদের উদ্দেশ্যকে অনেকটা পাল্টাইয়া দিয়াছে। কাজেই সাঁচ্চার সঙ্গে মেকি-ফাঁকির নূতন করিয়া তুলনা করিয়া ইহাদের বিশুদ্ধ প্রকৃতিটি আবার নিরূপণ করিতে হয়। অনেক গুণই তাহাদের নিকট প্রতিবেশী দোষ-গুণের সংসর্গে, বিশেষতঃ ঠকের পাল্লায় পড়িয়া স্বধর্মচ্যুত হইয়া পড়ে এবং কবি তাঁহার ক্ষুদ্র শব্দচিত্রের মাধ্যমে ইহাদের এই রূপবিকারের প্রতি সঙ্কেত করিয়াছেন। ভক্তির হাত খালি, কিন্তু অন্তর পূর্ণ ; অতিভক্তির প্রতি নিবেদিত অর্ঘ্য কিন্তু বস্তুভারাক্রান্ত ও অতিপ্রকট। অসম্ভব ভালো

যথাসাধ্য ভালোরই প্রতিস্পর্ধী ও যশঃ-অপহারক। কিন্তু উহা কোন মহত্তর আদর্শের ফল নয়, অক্ষমের ঈর্ষ্যাপ্রসূত একটি কাল্পনিক সত্তা। কৃতজ্ঞতার আসল পরিচয় উচ্ছ্বসিত স্তুতিতে নয়, অশ্রুপূর্ণ আঁখির নীরব ভাবপ্রকাশে। ক্ষুদ্রের দানের পরিমাণ যতই অকিঞ্চিৎকর, দম্ভ ও আত্মাভিমান ততই আকাশ-চুম্বী। নকল হীরা আকারের বৃহৎ আয়তনে উহার মেকিত্ব ঢাকা দিতে গিয়া সন্দেহেরই উদ্রেক করে। অকৃতজ্ঞতার নূতন লক্ষণ হইল উপকারীর ব্যঙ্গ করা; যেমন প্রতিধ্বনি ধ্বনির নিকট উহার ঋণ ঢাকিবার জন্য উহার বিকৃত ব্যঙ্গাতিরঞ্জনে প্রয়াসী হয়। 'একই পথ'-এ কবির 'অচলায়তন' নাটকের ভাব-সত্য একটি পয়ারের মধ্যে ঘনীভূতরূপে সংকলিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজ সব দ্বার রুদ্ধ করিয়া যেমন ভ্রমের, তেমনি নূতন সত্যেরও প্রবেশপথ বন্ধ করিয়াছে। নীচতা তাহার নিম্নাবস্থানের জন্যই নিরাপদ, তাহার কর্দমনিক্ষেপ অন্ততঃ তাহাকে স্পর্শ করে না। মধ্যস্তরের ব্যক্তি তাঁহার আভিজাত্য-গৌরব সম্বন্ধে অতি-সতর্ক, সেইজন্য সে অধম সংসর্গ পরিহার করিতে সর্বতোভাবে প্রয়াসী। পক্ষান্তরে উত্তম ও অধমের মধ্যে এরূপ শ্রেণীসচেতন ব্যবধান নাই। এই প্রবণতার আর এক দৃষ্টান্ত নামহীন ক্ষুদ্র বনফুলের প্রতি অন্যান্য উচ্চবর্ণ আরণ্য ফুলের ধিক্কার, আর মহান সবিতার তাহার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ। পেঁচা সূর্যের সহিত তাহার চিরশত্রুতা-ঘোষণাতেই গৌরবান্বিত—মহত্ত্বের বৈরিতাই কোন কোন বিকৃতমনা ব্যক্তির নিকট আভিজাত্যের সনন্দ। সূর্যের অবর্তমানে ক্ষুদ্র দীপ যে পৃথিবীকে আলোকিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে ইহাতে কর্তব্যনিষ্ঠার এক শক্তিনিরপেক্ষ নূতন আদর্শই উপস্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই ছোট কবিতাকণাসমূহের কষ্টিপাথরে আমরা নৈতিক গুণের আদর্শের সহিত তুলনায় তাহার সমাজ-প্রচলিত রূপে যে কতটা খাদ মিশিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি।

আরও কয়েকটি কবিতায় গভীরতম অধ্যাত্মপ্রভাবিত জীবন-সত্যের বিতর্কহীন সহজ প্রকাশ ঘটিয়াছে। 'বিরাম', 'জীবন', 'সুখদুঃখ', 'চালক', 'সত্যের আবিষ্কার', স্পষ্ট সত্য', 'আরম্ভ ও শেষ', 'বস্ত্রহরণ', 'চিরনবীনতা', 'মৃত্যু', 'শক্তির শক্তি', 'ধ্রুবসত্য' প্রভৃতি কবিতায় এই প্রজ্ঞাঘন জীবনরহস্য-বোধ স্মরণীয়ভাবে বিধৃত হইয়াছে। এগুলি একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যদিকে মনে হয় বৃহত্তর দার্শনিক মননপ্রধান কবিতা হইতে উৎকলিত অংশ। কাজের সহিত বিরাম ও জন্মের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ পরস্পর-বিরোধী নয়, একই

অখণ্ড ছন্দের যতি-বিশ্লিষ্ট দুইটি অংশ। রবীন্দ্রকাব্যে এই জাতীয় ভাবধারা আমাদের নিকট সুপরিচিত; যাহা বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ তাহা হইতেছে এই জাতীয় গভীর ভাবের ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে অর্থগূঢ় সংক্ষেপীকরণ। সুখদুঃখের শুভময় ফল অভিন্ন, তবে এই শুভের আনন্দ-বেদনারূপী দ্বৈত অভিব্যক্তি। শ্রাবণের ঘনবর্ষণ সমস্ত সৃষ্টির পক্ষে কল্যাণময় ও আনন্দসঞ্চারী; যূথীর মত ক্ষীণপ্রাণ ফুলের পক্ষে ইহা মৃত্যুবেদনারূপ সুদুঃসহ। 'চালক' কবিতায় অদৃষ্টরহস্য যে বস্তুতঃ প্রাক্তন কর্মের অমোঘ ফল মাত্র তাহা রূপকাবরণে চমৎকার-ভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'সত্যের আবিষ্কার', 'শক্তির শক্তি' ও 'ধ্রুবসত্য' একই তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ। পরিদৃশ্যমান বিশ্বের পিছনে যে অদৃশ্য শক্তি গোপনভাবে ক্রিয়াশীল, কোন বিশেষ কালে তাহার যবনিকা অপসারিত হইয়া তাহার রূপটি অনুভূতিসীমা স্পর্শ করে। রাত্রিতে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতির্ময় আবিষ্কার, অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তির আলোকনির্ভরতা ও আলোকবিন্দুর সৃষ্টি-ব্যাপ্তির অন্তরালে অনাদি অন্ধকারের নীরব প্রতীক্ষা—সবই একই সত্যের তিনটি দিক। 'বস্ত্রহরণ', 'চিরনবীনতা' ও 'মৃত্যু'—মরণের বিভিন্নমুখী স্বরূপদ্যোতনা। মৃত্যুর দ্বারা জীবনের মর্যাদাহানিপ্রয়াসের ব্যর্থতা, মাতৃরূপে জীবনশিশুকে ঘুম পাড়াইয়া নবজীবনজাগৃতির জন্য উহার প্রস্তুতিবিধান, মৃত্যুর ক্রোড়ে অফুরন্ত জীবনের চিরনির্ভর স্নেহাশ্রয়—প্রভৃতির মধ্যে জীবননাটকে মৃত্যুর বিচিত্র ভূমিকা চকিত আলোকপাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য মৃত্যুকে জীবনদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-পালার নায়ক দুঃশাসনরূপে অভিহিত করার মধ্যে খানিকটা কষ্টকল্পনা অলক্ষিত থাকে না। 'ছলনা' ও 'স্পষ্ট সত্য'-এ সংসারের উপর একদিকে প্রবঞ্চনা অন্যদিকে স্পষ্টভাষিত্ব এই উভয়বিধ বিপরীত গুণই আরোপিত হইয়াছে। অবশ্য দ্বিতীয় উক্তিটিই বেশী যথার্থ বলিয়া মনে হয়। সংসার চিরবিশ্বস্ততার অঙ্গীকার কখনই দেয় না, সংসারমায়ামুগ্ধ মানুষই উহার সত্যজ্ঞানের সতর্ক-বাণী সত্ত্বেও এইরূপ চিরন্তন সম্পর্কের অলীক কল্পনায় আত্মপ্রবঞ্চিত হয়। 'আরম্ভ ও শেষ' কবিতায় শেষের মধ্যেই যে নূতন আরম্ভের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে এই দার্শনিক সত্যের সুন্দর আভাস দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বের অবিরাম গতির অবিচ্ছিন্ন কার্যকারণশৃঙ্খলার আঘাতে মানুষের কৃত্রিম পরিপাটি শ্রেণী-বিন্যাস বিপর্যস্ত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে 'বলাকা'র পূর্বসূচনা-আবিষ্কার দুরূহ নয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার বেদীতে মুহূর্তে মুহূর্তে নব-নবায়মান ভাবমননের সমিধ-সংযোগে যে চিরসৃষ্টির বহ্ন্যুৎসব সদা প্রজ্বলিত ছিল তাহারই কয়েকটি

বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ 'কণিকা'-কাব্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। এই স্ফুলিঙ্গগুলি রবীন্দ্রনাথের কেন্দ্রীয় যজ্ঞানলেরই অংশ—তাঁহার বৃহত্তর কাব্যের সহিত ইহাদের অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুতরাং ইহাদের বিস্ময় ভাবপ্রেরণার অভিনবত্বে নয়, আশ্চর্য আঙ্গিকসুষমায়। এই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্ফুলিঙ্গসমষ্টির মধ্যে শুধু যে সামগ্রিক কবি-কল্পনার দিব্য দীপ্তি অক্ষুণ্ণ আছে তাহা নয়, সমশীর্ষ, স্থির প্রেরণায় রেখাবন্ধনবলয়িত অগ্নিশিখার গঠনসৌষ্ঠবও এই ক্ষুদ্রতম বিন্দুগুলির মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রতিবিম্বিত।

১০

কথা ও কাহিনী ১৮৯৯-১৯০০ (১৩০৬)

১৯০০-১৯০১ রবীন্দ্র-কাব্যে একটি বিস্ময়করভাবে দ্রুত বিবর্তনের যুগ। 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা'—সবই ১৯০০ খৃঃ অঃ, এবং একবৎসর ব্যবধানের পর 'নৈবেদ্য' (আগস্ট, ১৯০১) পর পর প্রকাশিত হয়। 'কণিকা'-র ঘনসংবদ্ধ মুক্তার ন্যায় ক্ষুদ্র ও সেইরূপেই উজ্জ্বল ভাববিন্দুসমষ্টি হইতে 'কথা'র ইতিহাসসংঘাতময়, নাটকীয়-আবেগচঞ্চল প্রশস্ত পটভূমিকায় কবি-প্রতিভার উত্তরণ একটি অভাবনীয় রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। কবি-কল্পনা প্রাচীনযুগের ধর্মকাহিনী, লোককিংবদন্তী ও ইতিহাসের দ্রুতধাবমান ঘটনাবলীকে এক অনায়াস বিন্যাসকৌশলে কাব্যসৌন্দর্য ও নাট্যচমৎকৃতির রসপরিণতি দান করিয়াছে। ঘটনার বিবৃতি ও সহজ গতি কবির যথাযথ মানস আবেগ ও স্বতঃউৎসারিত সৌন্দর্যচেতনার সহিত মিলিয়া, পরিমিত বর্ণনা ও সুসঙ্গত ভাবোদ্দীপনের সহিত একপ্রকার রাসায়নিক সংযোগে একটি মনোরম রসমূর্তির অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে। ইহার সর্বজনগ্রাহ্য মহান আদর্শের মধুর আবেদনটি শেষ ফলশ্রুতিরূপে অন্তরমধ্যে চির-অনুরণিত থাকে। বিষয়ও ভাবোপযোগী বিচিত্র ছন্দবিন্যাসও কোন অনুচিত প্রাধান্য লাভ না করিয়াও এই সর্বাত্মক আবেদনে একটি আবশ্যিক অংশ গ্রহণ করিয়াছে। বেগবতী নদী যেমন সহস্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে সূর্যকিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিতে করিতে নিজ গতিবেগকে মন্দীভূত না করিয়াই অগ্রসর হয়, রবীন্দ্রপ্রতিভাও এখানে চলমান ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই উহার চলার ছন্দে ছন্দেই কবির সৌন্দর্যাবেশ, জীবনসমীক্ষা ও

নীতিবোধ, এবং নাট্যকারের আন্তর সংঘর্ষ ও দ্রুত-উৎক্ষিপ্ত পরিণতির চমককে বিন্যস্ত করিয়াছে। ঐহিক জীবনের বিচিত্রবর্ণ শোভাযাত্রাসমারোহের ও উহার অন্তর্লোকের নানাবিধ সরল, কিন্তু পরিণামে ঊর্ধ্বাভিমুখী বৃত্তিগুলির সহিত রবীন্দ্রমানসলোকের এমন গভীর ও স্বতঃস্ফূর্ত সামঞ্জস্য আমরা তাঁহার অন্য কোন কাব্যে খুঁজিয়া পাই না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের যে সহজ অবস্থানভূমিতে একদিকে রাজ্যলিপ্সা, ধর্মবিদ্বেষ, হত্যা, ব্যভিচার, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রাকৃত পাপের ও অপরদিকে ক্ষমা, ত্যাগ আদর্শনিষ্ঠা, ধর্মসাধনা, দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য অকুতোভয় আত্মবিসর্জনশীলতা প্রভৃতি মহৎগুণের যুগপৎ অনুশীলন চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই পাপপুণ্যের যুগ্ম প্রতিষ্ঠাপীঠে দাঁড়াইয়া এই দ্বৈত জীবনলীলার সহিত একটি গভীর একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। চিত্রকল্প-বর্ণনায়, গতিচ্ছন্দস্পন্দিত বিবৃতিতে ও নাটকীয় আবেগ ও উত্তেজনা-সঞ্চারে কবি ইহার একটি অবিস্মরণীয় আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। ভারতের সাধারণীকৃত আত্মা রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুভূতিতে আর কোথায়ও এরূপ সুস্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধভাবে ধ্বনিত হয় নাই। ভারতের সনাতন কথাকারদের, গ্রামবৃদ্ধ উদয়ন-কথাকোবিদদের গল্প বলার বিশেষ কি রীতি ছিল তাহা আমরা জানি না। 'কাদম্বরী'-রচয়িতার অতি মন্থরগতি, শব্দৈশ্বর্যভারাক্রান্ত, সূক্ষ্ম বর্ণালিম্পনশিল্পসমৃদ্ধ আখ্যানরীতি রাজসভার অলঙ্কৃত পরিবেশে চলিতে পারে, সাধারণ গ্রাম্য শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে তাহা নিশ্চয়ই অচল ছিল। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাধারণ গাল্পিকদের মধ্যে যে দুর্লভ ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। তথাপি মনে হয় যে চারণ কবিগোষ্ঠী বা গাথা-রচয়িতার সহিত রবীন্দ্রনাথের শুধু যে রীতিগত মিল ছিল তাহা নহে, ভাবোদ্দীপনার উদ্দেশ্যসাম্যও তাঁহাদিগকে নিকট-আত্মীয়ের ন্যায় সংযুক্ত করিয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' প্রাচীন ভারতের কথাসরিৎসাগরের প্রতিভাকিরণদীপ্ত উজ্জ্বলতম তরঙ্গ।

'কাহিনী' 'কথা'র মতই আখ্যানধর্মী রচনা। তবে ইহা ইতিহাসের শৌর্য-বীর্যদৃপ্ত, নাট্যসংঘাতের ইঙ্গিতবহ, অসাধারণ ঘটনার উচ্চ মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া সাধারণ জীবনের মন্থরগতি, কিন্তু ভাবঘন ও মহিমাদীপ্ত সংঘটনগুলির আশ্রয় লইয়াছে। এখানে 'গানভঙ্গ' ও 'দীন দান'-এ যে রাজাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা ইতিহাসের গৌরবমুকুটপরিহিত নহেন, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম-সাধনার সঙ্কীর্ণতর পরিবেশে, অন্তর্লোকের আত্মসমাহিত ভাবপরিক্রমায়

সঞ্চরণশীল। প্রথম কবিতাটিতে রাজা প্রতাপ রায় ও গীতশিল্পী বরজলাল গানের সূত্রে আবদ্ধ দুই সমানুভবশীল বন্ধু, গীতিরসবিভোরতার স্বপ্নলোকবিহারে দুই সহযাত্রী। এখানে এক অন্তরের ভাবমুগ্ধতা ও করুণ স্মৃতিরোমন্থন ছাড়া রাজমর্যাদার আর কোন পরিচয় নাই। 'দীন দান'-এর রাজা অভ্রভেদী, স্বর্ণখচিত মন্দির-প্রতিষ্ঠার গৌরবে অহংকারমত্ত, দেবতা যেন স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা তাঁহার চিরবাধ্য একজন প্রজা। সূক্ষ্মতর ধর্মানুভূতি যদি দম্ভস্ফীত মন্দিরে দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার না করে তবে রাজা তাঁহার ঐশ্বর্যাড়ম্বরের প্রতি উপেক্ষাকে নাস্তিকতার প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন না ও ভক্তবৎসল ও ভক্তের প্রতি একই নির্বাসনদণ্ডাজ্ঞা অসঙ্কোচে প্রয়োগ করেন। সুতরাং 'কাহিনী'র রাজা 'কথা'র রাজা বা রাজপুরুষদের সহিত এক শ্রেণীর নহেন। অন্যান্য কবিতাগুলিতে জীবনের এক একটি শান্ত-গভীর অনুভূতি, ঘটনা-রোমাঞ্চ ও নাটকীয় গতিবেগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া, অন্তরের একটি মৃদু, অথচ মন্থনকারী আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। 'কাহিনী'তে আখ্যায়িকা-প্রাধান্যের রীতি কিছুটা অনুসৃত হইলেও ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের চমক ও বহির্ঘটনার সুলভ উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া নিজ অন্তরাশ্রয়ী নিগূঢ় ভাবকেন্দ্রে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। 'কথা' যেন উচ্চকণ্ঠে ইতিহাস ও উদাত্ত ধর্মানুশাসনের উদ্দীপনাময় ভেরীনাদ; 'কাহিনী'র সুরটি যেন ঘরোয়া জীবনের অশ্রুভাবমন্থর গভীরভাবগ্রাবী, মৃদু গীতগুঞ্জরণ। একের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সুদূরের আহ্বানবহ, যুগযুগান্তরের ইতিহাস-মুখরতার নৈঃশব্দ্যবিধায়ী অতীত; অপরের হইল, বিস্মৃতির অতলে অবগাহিনী, ছিন্নভিন্ন চেতনাসূত্রের পুনঃসংযোজিকা ব্যক্তি-জীবনস্মৃতি।

১১

'কথার' কবিতাগুলির রচনাকাল কার্তিক ১৩০৪ হইতে অগ্রহায়ণ ১৩০৬ এই দুই বৎসরে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দুইটি কবিতা 'গুরু গোবিন্দ' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) ও 'ব্রাহ্মণ' (ফাল্গুন, ১৩০১) এই কালসীমাবহির্ভূত। প্রথমটি 'কড়ি ও কোমল' (১২৯৩, ১৮৮৬) ও 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যের (১২৯৫, ১৮৮৮) সমকালীন ও অতিবিস্তারে ও রচনার আপেক্ষিক অপরিপক্কতায়, ভাবের বিস্রস্ত শিথিলতায় ও প্রকাশ-অসংযমে 'মানসী'র 'দুরন্ত আশা' এমন কি পরিণত 'চিত্রা'র 'নগর-

সংগীত'-এর সমধর্মী বলিয়া মনে হয়। 'গুরু গোবিন্দ'-এ শিখগুরুর জাতি-সংগঠনের অস্পষ্ট ভাবকল্পনা রবীন্দ্রনাথের নিজের রাজনৈতিক চেতনা-সম্মোহের সহিত যুক্ত হইয়া যে উচ্ছ্বাসঘন কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়াছিল ভাবে ও ভাষায় তাহারই প্রকাশ। গুরু নিজের মন বুঝিতে ও অবসরের অনুকূলতা সম্বন্ধে ঠিক ধারণা করিতে না পারিয়া উৎসাহ ও অবসাদের যে বিরুদ্ধ দোলায় আন্দোলিত হইয়াছেন কবিতাটির মধ্যে যেন সেই অনিশ্চিত গতিদ্বন্দ্বই সংক্রামিত হইয়াছে। 'কাহিনী'র 'নিষ্ফল উপহার'ও (২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) 'গুরু গোবিন্দ'-এর সমকালীন ও 'মানসী'-যুগের লক্ষণান্বিত। 'কাহিনী'র 'গানভঙ্গ' (২৪শে আষাঢ়, ১৩০০) সময়ের দিক দিয়া 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সোনার তরী'র মধ্যবর্তী। ইহার আবেদন আখ্যানরসের নয়, সঙ্গীতের নিগূঢ় আকর্ষণ-সম্বন্ধীয়, সুতরাং তত্ত্বপ্রধান। শ্রেষ্ঠ গানের উৎস সুরলহরীর উপর অবাধ অধিকার ও কণ্ঠের সাবলীল ও সু-উচ্চ স্বরসঞ্চারণে নয়, অনুভূতির গভীরতার দ্বারা ভাবের উদ্বোধনে ও স্বল্পসংখ্যক রসিকচিত্তে স্মৃতিচারণাপুষ্ট, ভাবাসঙ্গলালিত আনন্দতন্ময়তার বিস্তারে। তত্ত্বের দিক ছাড়াও ব্যক্তিসম্পর্কের দিকটা প্রতাপ ও বরজলালের সহৃদয় অন্তরঙ্গতায় উদাহৃত হইয়াছে। 'সুরদাসের প্রার্থনা'র সহিত এই মনস্তত্ত্বজটিলতাহীন কবিতাটির অন্তরধর্মের কিছুটা মিল আছে। ইহার আখ্যানাংশ সামান্য, যেটুকু আছে তাহা তত্ত্বালোচনা ও স্মৃতিরোমন্থনের উপলক্ষ্য মাত্র।

'ব্রাহ্মণ' (৭ ফাল্গুন, ১৩০১) ও 'পুরাতন ভৃত্য' (১২ই ফাল্গুন, ১৩০১) কয়েকদিনের ব্যবধানে রচিত ও 'চিত্রা'-র (ফাল্গুন, ১৩০২) কিছু কিছু কবিতার সমকালীন। 'ব্রাহ্মণ' 'কথা'-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহার রচনাকালের তিন চারিবৎসর পূর্ববর্তী। যে আখ্যানস্রোত ইহার মধ্যে অবিরল ধারায় প্রবাহিত 'ব্রাহ্মণ' সেই ধারার সহিত ঠিক একাত্ম নয়। 'কথা'র বিষয়বস্তুর সহিত ইহার প্রকৃত সংযোগ গতিবেগে নয়, প্রাচীন ভারতের তপোবন-মহিমার ভাবসূত্রে। 'চৈতালি'-তে আশ্রম-পরিবেশের যে সাধারণ নির্বিশেষ বর্ণনা পাই, তাহা এখানে ব্যক্তিসম্পর্ক-সরস ও বিশিষ্টলক্ষণচিহ্নিত হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রমের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, ব্রহ্মবিদ্যার্থী ঋষিবালকদের অভ্যস্ত কর্মসাধনা, তাহাদের সমস্ত সংযম-শাসনের অন্তরালবর্তী প্রগল্ভ কৌতুকপ্রিয়তার ইঙ্গিত—এ সবই তপোবনকে আমাদের নিকট অত্যন্ত জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ বর্ণনার মহিমাময় গাম্ভীর্য ও জীবনাদর্শের প্রশান্ত একনিষ্ঠতা নিপুণ শব্দনির্বাচনে ও ছন্দোধ্বনির গৌরবমন্দ্রিত, বিলম্বিত পদসঞ্চারে অপূর্ব দ্যোতনায়

ফুটিয়া উঠিয়াছে। তপোবন-পরিবেশের ভাবপরিধি নভোলোক পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া কুতুহলী নক্ষত্রমণ্ডলীকে গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ শিষ্যশ্রেণীর সহিত একাসনে বসাইয়াছে ও উহার মহিমাকে ভূলোক-দ্যুলোকব্যাপ্ত করিয়াছে। শেষের দিকে একটু নাটকীয় বিস্ময় উপসংহারকে একেবারে ভাবসমুন্নতির শীর্ষে উন্নীত ও অভাবনীয়তায় চমকিত করিয়া তপোবন-গাম্ভীর্যের মধ্যে প্রাণস্পন্দনের চঞ্চলতা জাগাইয়াছে।

ইহার সহিত তুলনায় 'পুরাতন ভৃত্য' একটি ঘরোয়া কথার তুচ্ছতার ফাঁকে ফাঁকে করুণরস সঞ্চারিত করিয়া, পারিবারিক জীবনকাহিনীতে প্রভুভক্তির পরম আদর্শ আরোপ করিয়া ও স্থূল নির্বুদ্ধিতার সহিত সহজ জীবন-মহিমার সামঞ্জস্য ঘটাইয়া বাঙালীর দৃশ্যতঃ রিক্ত জীবনভূমিতে রসের যে ফল্গুধারা চির-প্রবহমান তাহাকে অবারিত করিয়া কাব্যের সৌরকরসম্পাতে ঝলসিত করিয়া তুলিয়াছে। এখানে যেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বিষয়বস্তুকে কাব্যজগতে স্থানান্তরিত করিয়া উহার কবিধর্মোপযোগী রূপান্তর সাধিত হইয়াছে। বাঙালীর নিস্তরঙ্গ জীবননদীতে যেন অকস্মাৎ একটি বর্ণোচ্ছ্বাসময় ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ জাগিয়া উঠিয়াছে। অথচ ইহাতে ভাবে বা ভাষায় কোন অতিরঞ্জন-প্রয়াস নাই।

১২

'দুই বিঘা জমি' ইহার ঠিক একবৎসর পরের রচনা (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২)। এই কবিতাটিতে গল্পরস ও ভাবরস প্রায় সমপরিমাণেই মিশ্রিত আছে। ইহাতে একদিকে ক্রূর জমিদার কর্তৃক উৎপীড়িত দরিদ্র প্রজার বাস্তুচ্যুত হইবার করুণ কাহিনী বিবৃত ও অপর দিকে দীর্ঘ প্রবাসযাপনের পর বাঙালীর গৃহ-প্রত্যাবর্তনের আকৃতি ও তাহার স্মৃতিপটে পুনঃপুনঃ রোমন্থনে উজ্জ্বল-হইয়া-ওঠা জন্মভূমির ঘনমমতানির্যাসরূপী শ্যামশ্রী কাব্যানুভূতির নিকষে সোনার রেখার ন্যায় ফুটিয়াছে। মনে হয় যেন এই কবিতায় সমকালীন জীবনের রাজনৈতিক ভাবোচ্ছ্বাস কাব্যের স্ফটিকপাত্রে সঞ্চিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে বাঙালী-জীবনসুলভ ভাবাকুলতাকে ঘনীভূত কাব্যরূপদানের একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহাতে কোন কৃত্রিমতা নাই, কাব্যকটাহে মৃদু জ্বালে আবর্তিত জীবনরস ক্ষীরস্বাদুতা লাভ করিয়াছে। উপসংহারে সাধু ও চোরের প্রকৃত তাৎপর্যের মধ্যে বিরোধাভাস আমাদের মনকে একটু ধাক্কা দেয়, কিন্তু সমস্ত

কাহিনীটির ভাবধারার সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' প্রথম মুদ্রণকালে 'চিত্রা'কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'কথা'-র 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' (৫ই কার্তিক, ১৩০৪), 'প্রতিনিধি' (৬ই কার্তিক, ১৩০৪), 'কাহিনী'-র 'দেবতার গ্রাস' (১৩ই কার্তিক, ১৩০৪), 'কথা'র 'মস্তক-বিক্রয়' (২১শে কার্তিক, ১৩০৪) ও প্রায় দুই বৎসর ব্যবধানে রচিত 'পূজারিণী' (১৮ই আশ্বিন, ১৩০৬), 'অভিসার' (১৯শে আশ্বিন, ১৩০৬), 'পরিশোধ' (২৩শে আশ্বিন, ১৩০৬), 'সামান্য-ক্ষতি' (২৫শে আশ্বিন, ১৩০৬), 'মূল্যপ্রাপ্তি' (২৬শে আশ্বিন, ১৩০৬), 'নগরলক্ষ্মী' (২৭শে আশ্বিন, ১৩০৬), 'অপমান-বর' (২৮শে আশ্বিন, ১৩০৬), 'স্বামীলাভ' (২৯শে আশ্বিন, ১৩০৬), 'স্পর্শমণি' (২৯শে আশ্বিন, ১৩০৬), মালী' (১লা কার্তিক, ১৩০৬), 'শেষ শিক্ষা' (৬ই কার্তিক, ১৩০৬), 'নকল গড়' (৭ই কার্তিক, ১৩০৬), 'হোরিখেলা' (৯ই কার্তিক, ১৩০৬), 'বিবাহ' (১১ই কার্তিক, ১৩০৬), 'বিচারক' (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬), 'পণরক্ষা' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৬), ও 'কাহিনী'র 'বিসর্জন' (২৪শে আশ্বিন, ১৩০৬) ও 'দীন দান' (১৩০৭) – এই দুইটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতাসমূহের রচনা-তারিখ তুলনা করিয়া দেখিলে বোঝ যায় যে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণায় বর্তমান গার্হস্থ্য ধারা ও অতীত-ইতিহাস-ধারা দুইটিই এক সঙ্গে প্রবাহিত হইতেছিল। ইহাদের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ হইতেছে কবির গল্প বলার আগ্রহ ও এই গল্পের কাঠামোর মধ্যে কোথাও বা শান্ত, মৃদুস্পন্দিত গার্হস্থ্য রস, কোথাও বা ধর্মপ্রেরণাসঞ্জাত নিঃশব্দ হৃদয়-আলোড়ন ও দুঃসাধ্য ব্রতসাধন, আর কোথাও বা ইতিহাসদ্বন্দ্বসম্ভূত জীবনগতিবেগ ও নাটকীয় চমক-পরিণতির সংঘটন। এই উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী ভাষা ও ছন্দেরও প্রয়োগতারতম্য ঘটিয়াছে। কোথাও শান্তির গভীরতা, সংকল্পের নীরব দৃঢ়তা কোথাও বা উত্তেজনার দ্রুত ছন্দে নৃত্যশীল ঘটনারোমাঞ্চ ও অন্তর-বিস্ফোরণ এই কবিতাগুলির ফলশ্রুতি-রূপে অনুভূত হইয়াছে। সবগুলিতে কবি নিজ মানস লোকের মন্ময় আবিষ্টতা হইতে বাহিরে আসিয়া বহির্ঘটনাসমূহের বিচিত্র ভাবপ্রেরণার সহিত নিকট সম্পর্কে যুক্ত হইয়াছেন। পাত্র-পাত্রী সকলেই স্বতন্ত্রব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও বিশেষ-সমস্যাভিভূত, কেহই রবীন্দ্রনাথের মানস প্রতিচ্ছবি, রবীন্দ্র-কল্পনার মূর্ত প্রকাশ মাত্র নহে। হয়ত কোন কোন আখ্যানের ভাবসিদ্ধান্তে রবীন্দ্রজীবনদর্শনের ছায়াপাত ঘটিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ আখ্যায়িকা ও আখ্যায়িকা-বর্ণিত চরিত্রই কবিভাবনামুক্ত এক একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্যের অভিমুখী। এই কাব্যে প্রাচীন ও

আধুনিক জীবনযাত্রা, ইতিহাস, ধর্মসাধনা ও সাধারণ পারিবারিক জীবন-সমস্যা একদিকে বিচিত্র ঘটনা-পরিবেশ ও অপরদিকে অভিন্ন আদর্শ-মহীয়ান সমাধান লইয়া কবির মনোলোককে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে।

কবির উদ্দেশ্য ও বিষয়-নির্বাচনের এই ত্রিপথগামী বিভিন্নতার ভিত্তিতেই কবিতাগুলির আলোচনা বিধেয়, কেননা এইরূপ আলোচনা-সূত্রেই তাহাদের শিল্পরূপের পার্থক্য পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'-তে এই গার্হস্থ্য আবেদনটি কেমন সুকৌশলে ও স্বল্পতম ভাব ও শিল্পোপকরণে উদ্বোধিত হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। 'দেবতার গ্রাস' এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইহাতে অপত্যস্নেহের নিরুচ্ছ্বাস, এমন কি আপাত নির্মম, অথচ সুনিবিড় আকর্ষণের সহিত অন্ধ ভক্তিসংস্কারের দ্বন্দ্বে উভয়েরই স্বরূপের কি মর্মান্তিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে! জলযাত্রার বিপদ, স্থলের আশ্রয়চ্যুত মানুষের সর্বগ্রাসী, বিশ্বাসভঙ্গকারী অতল জলরাশি সম্বন্ধে এক অজ্ঞাত সংশয় ও বিভীষিকা, সমুদ্র-সন্নিহিত নদীতে জোয়ার-ভাটার অতর্কিত উচ্ছ্বাস. মোক্ষদা ও মৈত্রের মধ্যে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু নিদারুণ অর্থবহ ইচ্ছা-ও-শক্তির নাটকীয় সংঘাত নিমজ্জিতপ্রায় বালকের অগ্নিজ্বালাময় আর্ত চীৎকার ও আত্মরক্ষার অন্তিম প্রয়াস ও একেবারে শেষ মুহূর্তে এক অপ্রতিরোধ্য প্রেরণায় অস্তাচল-অন্তহিত সূর্যের সহিত এক দুর্লক্ষ্য-ঐক্যসূত্রবদ্ধ ব্রাহ্মণের জলমগ্ন বালকের উদ্ধার-চেষ্টায় আত্মবিসর্জন—সবই বর্ণনার ওজোগুণে, পয়ারের তরঙ্গস্পর্ধী প্রবহমানতায়, আখ্যানের কোথাও স্তিমিত, কোথাও খরবেগ, কিন্তু সর্বত্র অভ্রান্ত শিল্পবোধসাধিত গতি-নিয়ন্ত্রণে, পাঠকের অনুভূতিতে আগ্নেয় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া যায়। গ্রাম্য জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ, তীর্থযাত্রার সহজ আগ্রহ, একটি বিশেষ পরিবারের স্নেহমমতা-আধারের বৈশিষ্ট্য ও একটি বালকের দুরন্ত, প্রশ্রয়পুষ্ট আবদার-প্রবণতার মধ্য দিয়া যে গল্পের আরম্ভ, তাহার পরিসমাপ্তি কি অপ্রত্যাশিত, অথচ সূক্ষ্মভাবে ব্যঞ্জিত করুণ পরিণতিতে! হেমন্তপ্রভাতে চূর্নীনদীতীরস্থ যে ক্ষুদ্র গ্রামটি যাত্রার সময় কুয়াশার ছদ্ম অশ্রুজলে ছলছল-আঁখি হইয়া উহার স্নেহপাত্রগুলিকে বিদায় দিয়াছিল, ঘটনার তীব্র ব্যঙ্গে তাহার সেই অভিনয়ের চোখের জল কি মর্মান্তিকভাবে শোক-লবণাক্ত হইয়া পুনরাবৃত্ত হইয়াছে!

'কাহিনী'র 'বিসর্জন' কবিতাটি (২৪শে আশ্বিন, ১৩০৬) 'দেবতার গ্রাস'-এর ন্যায় অন্ধভক্তি-সংস্কার-জাত পারিবারিক করুণ কাহিনী। কিন্তু ইহার মধ্যে পূর্ব কবিতার তীব্র নাটকীয় আবেদন ও উচ্ছ্বসিত কাব্যাবেগের অভাব। মৃতবৎসা

বিধবা মল্লিকার সমস্ত জীবনচর্যা অজ্ঞাতবিভীষিকাময় দৈব শক্তির প্রসাদভিক্ষার কৃচ্ছ্রসাধন-নিয়োজিত। ঐকান্তিক নিষ্ঠার পৌরাণিক দৃষ্টান্ত তাহার মনে নির্বিচার আত্মসমর্পণের প্রেরণা জাগাইয়া তাহাকে আরও নির্দয়ভাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। সে রুগ্ন ছেলেকে জোয়ারস্ফীত গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া আশা করিয়াছে যে মকরবাহিনী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহার রোগমুক্ত পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে ফিরাইয়া দিবেন। এই অবাস্তব কল্পনা তাহাকে আরও বিভ্রান্ত করিয়া মরীচিকার ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে। ইহার কবিতায় আখ্যায়িকার সমতল বিবৃতি আছে, কোন আবেগ-তরঙ্গিত, কাব্যোচ্ছ্বাসময় প্রকাশ নাই। ইহাতে কারুকৃতের স্থমিত প্রয়োগশিল্প আছে, প্রতিভার দীপ্ত অগ্নিস্পর্শ অলক্ষ্য। 'দীন দান'-এ (.৩০৭) এ আখ্যান নাই, আছে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত ভক্তি-তত্ত্বের সহিত কাব্যরসের সুষ্ঠু সমন্বয়।

১৩

এইবার 'কথা'র কবিতাগুলির মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কবিতাগুলির পৃথকভাবে আলোচনা করা যাইবে। 'কথা'তে গার্হস্থ্য জীবনরসের কবিতা একমাত্র 'পরিশোধ', কিন্তু এখানে ব্যক্তিহৃদয়ের দুর্বার প্রেমের উপর বহিরঙ্গগত এত বিচিত্র উত্তেজনাময় প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, যে ইহার গার্হস্থ্য আবেদন রাজনৈতিক চক্রান্ত-জালে ও অসাধারণ ঘটনা-বিপর্যয়ে জড়িত হইয়া একটি জটিল, বিমিশ্র রূপ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং ইহার আলোচনা একেবারে শেষের জন্য রাখিয়া দিলে ভাল হয়। 'কথা'র মধ্যে ধর্মের দৃপ্ত অনুশাসন ও ইতিহাসের দুর্দম ঘটনাসঙ্কট এই দুই জাতীয় প্রেরণায় মানবমনের বিচিত্র ও বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মসম্পর্কিত কাহিনীর মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'মূল্যপ্রাপ্তি' ও 'নগরলক্ষ্মী' এই পাঁচটি কবিতা গণনীয়। ইহাদের মধ্যে উত্তেজনার মাত্রা ও ঘটনা-চমকের তারতম্য বিষয়ানুসারী ও ছন্দোবিন্যাস-প্রতিফলিত। 'নগরলক্ষ্মী'তে একটি কুণ্ঠিত গতিমন্থরতা ছন্দঃস্পন্দের ধীরগতিতে আভাসিত। ইহার ঘটনা-পরিণতিতেও বিশেষ কোন চমৎকারিত্ব দেখা যায় না। দুর্ভিক্ষপীড়িত শ্রাবস্তীপুরীকে অন্নদানের ভার ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া যে স্বীকার করিয়াছে তাহার ভাবতাৎপর্য সমবায়নীতিতে আস্থা। বুদ্ধের ধনী শিষ্যেরা এই গুরুদায়িত্বস্বীকারে অক্ষম, কেন-না তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদের ব্যক্তিগত

ঐশ্বর্য-সামর্থ্যকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছে ; হয়ত মর্যাদার প্রশ্নই এই অসামর্থ্য-বোধের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। সুপ্রিয়ার মৌলিক আবিষ্কার হইল ব্যক্তিগত অকিঞ্চিৎকরতার অন্তরালে বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত সংঘশক্তিসম্বন্ধে অকুণ্ঠিত প্রত্যয়। কবিতাটি উহার ভাবসংযম, ভাষাপরিমিতি, আখ্যানরিক্ততা ও ছন্দ-মন্থরতার মধ্য দিয়া বৌদ্ধধর্মের একটি শান্ত বিকাশের দিকটিই ফুটাইয়া তুলিয়াছে। 'মূল্যপ্রাপ্তি'তেও প্রথাগত ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ কবিতার বস্তুবিন্যাসের সরলতাই দ্যোতিত করিয়াছে। ইহার আখ্যানভাগ একটি ভক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিলেও শীঘ্রই বেগ হারাইয়া একান্ত শরণাগতির অবিচল স্থিরতায় বিলীন হইয়াছে। 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'-য় প্রত্যাশা এবং চমক-পরিণতির সুর অপেক্ষাকৃত উচ্চগ্রামে বাঁধা। প্রভাত-আলস্যসুপ্তির আবেশজড়িত শ্রাবস্তীপুরীর জনহীন রাজপথ দিয়া ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডদের চরম আত্মোৎসর্গের দাবী ধ্বনিত করিতে করিতে অধ্যাত্মভাব-বিভোর স্বপ্নসঞ্চরণ. সুপ্তোত্থিত নাগরিকবৃন্দের এই উদাত্ত আহ্বানের তাৎপর্য-গ্রহণে বিমূঢ়তা, ভ্রান্ত ধারণায় উৎসর্গিত নানা মূল্যবান উপহারের নিঃশব্দ প্রত্যাখ্যান, বিভিন্ন বয়সের নর-নারীর মনে সংসার-বৈরাগ্যের আকস্মিক উদ্দীপন ও শেষ পর্যন্ত এই অসম্ভব যাচ্ঞার অপ্রত্যাশিত পূরণ—এই সব মিলিয়া পাঠকের মনে যে একটি মিশ্র প্রত্যাশা জাগে ছন্দে এবং কবিত্বে তাহারই নিবৃত্তি ঘটিয়াছে।

'পূজারিণী' ও 'অভিসার' কবিতা দুইটিতে ধর্মপরিবেশে ঘটনার দ্রুতগতি, নাটকীয় পরিণতি ও আবেগের বর্ণময়তা সঞ্চারিত হইয়া আখ্যানকবিতার আদর্শ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সৌন্দর্যের সমস্ত উপাদানই আখ্যায়িকার ঋজু লক্ষ্যাভিমুখিতা ও কাব্যপ্রয়োজনানুকূল সত্বরতার সহিত অপূর্ব সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়াছে। প্রথম কবিতাটির প্রথম চারিটি স্তবকে বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর মধ্যে যে ধর্মাদর্শ-বৈপরীত্য সমস্ত রাজ্যে একটা রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের দুঃস্বপ্ন বিস্তার করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্যঞ্জনাতীক্ষ্ণ বর্ণনার সাহায্যে আখ্যানটির ঐতিহাসিক পটভূমিকা-নির্মিতি। তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীমতীর দুঃসাহসিক সংকল্প আরতির আয়োজনরূপে আমাদের নিকট গুমোটধরা আকাশে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় হঠাৎ ঘোষিত হইয়াছে। ইহার পর মহিষী, রাজবধূ ও রাজকন্যার ও অন্যান্য পৌর-পরিজনের নিকট এই নিষিদ্ধ পূজাতে যোগ দিবার নীরব আমন্ত্রণ বহন করিয়া শ্রীমতী দ্বার হইতে দ্বারান্তরে ফিরিয়াছে। অতি অল্পকথায় মহিষী, রাজবধূ ও রাজকন্যার বিভিন্ন

চরিত্র তাহাদের মানস প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মহিষী রাজাদেশের কথা শোনাইয়াছে, প্রসাধনরতা রাজবধূ কম্পিত হস্তে তাহার মানস উৎকণ্ঠার পরিচয় দিয়াছে ও বধূসুলভ আত্মনিরোধপ্রবণতার সহিত পাছে এই সাংঘাতিক কথা কেহ শোনে এই আশঙ্কার কথা বলিয়াছে। কিন্তু রাজকন্যা শ্রীমতীর প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী সহানুভূতি দেখাইয়াছে। তাহার পর পরবর্তী দুইটি স্তবকে শ্রীমতী যখন আরতির প্রস্তুতিতে নেপথ্য-অন্তরালে অদৃশ্য, তখন কবি সেই ক্ষণবিরতিমুহূর্তে সন্ধ্যার প্রদোষ তিমিরে শারদ আকাশে, রাজধানীতে ও রাজপুরীতে যে পরিবর্তন-যবনিকা প্রসারিত হইয়াছে তাহারই অর্থপূর্ণ বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন। ইহা যেন পরবর্তী নাটকীয় ক্রান্তিলগ্নের দৃশ্যসজ্জাবিধান। সর্বশেষ স্তবকদ্বয়ে এই দীর্ঘ ভূমিকার অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু একান্ত সার্থক বস্তুবিন্যাস। ইহার প্রথমটিতে দুই বিরোধী শক্তির প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ ও বার্তাবিনিময়। দ্বিতীয়টিতে আশ্চর্য সংযত দ্যোতনার মাধ্যমে চরমফল-নির্দেশ—নিষ্ঠুর হত্যার সমস্ত বীভৎসতাকে অন্তরালে রাখিয়া উহার এক সূক্ষ্মতম উদ্বর্তিত রূপে প্রকাশ, উহার মানবিক প্রত্যক্ষতা হইতে মহাকালসংশোধিত ইতিবৃত্তে উন্নয়ন। মহাকালের চিত্রপটে যাহা অক্ষয় বর্ণে আঁকা রহিল তাহা হইল শুভ্র অহিংসার প্রতীক বৌদ্ধস্তূপে প্রথম রক্তপাতের কলুষ-রেখা আর শেষ আরতিদীপ-নির্বাপণের যুগে যুগে ঘনীভূত চিরতমিস্রা।

'অভিসার' বোধ হয় এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইহার গঠনশিল্প ঘটনাবিন্যাসে, প্রকৃতি-প্রতিবেশ-রচনায় ও আবেগোচ্ছ্বাসের পরিমিত স্পর্শে অনবদ্য। ইহার ইতিহাসভূমিকা নাই, ঘটনা-প্রত্যক্ষতাতেই ইহার আরম্ভ। একটি বিরোধী পরিস্থিতির মধ্যে সূক্ষ্ম ঐক্যদ্যোতনায় ইহার নাটকীয়তা নিহিত। উপরে ঘনমেঘাচ্ছন্ন, বিলুপ্ততারকা শ্রাবণ আকাশ, নীচে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নির্বাপিতদীপ নগরী, মধ্যে চকিত-উদ্ভাসিত ক্ষণিক বিদ্যুৎশিখা ও মেঘগর্জনের ব্যঙ্গপরিহাস—এই প্রতিবেশের মধ্যে নগরনটীর রূপ-উৎফুল্ল-হৃদয়ে কৌমার্য-ব্রতধারী তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতি অভাবনীয় মোহসঞ্চার ও সন্ন্যাসীর বিনীত প্রত্যাখ্যানে নাটকের প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি। কয়েক মাস পরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে বসন্তোৎসবের মদির বিহ্বলতা ও বসন্ত প্রকৃতির উচ্ছল পুষ্পসৌন্দর্যের মধ্যে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ। এবার প্রণয়বিমুখ সন্ন্যাসীই অভিসারে অগ্রণী; আর যে নটীর প্রমত্ত কামনা শ্রাবণ রজনীর দুর্যোগের বাধা না

মানিয়া অভিসারযাত্রী হইয়াছিল সে আজ কৌমুদীফুল্ল চৈত্রপূর্ণিমায় রোগে অবসন্ন ও অচেতন ও নাগরিক মণ্ডলীর দ্বারা পরিত্যক্ত। শ্রাবণ নিশায় যে প্রেমের আহ্বান ব্যর্থ হইয়াছিল বসন্তের পুষ্পোচ্ছ্বাসের মধ্যে তাহা সেবার কর্তব্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া অর্ধসম্পূর্ণ অভিসারকে এক অকল্পনীয় সার্থকতায় মণ্ডিত করিল। সর্বাঙ্গভূষিতা নটীর মতই সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতাটি চলা না থামাইয়া প্রতিবেশ-সৌন্দর্যের চকিত কিরণ গায়ে মাখিয়াছে ও এক আপাত-অসম্ভব প্রতিশ্রুতিকে নাটকীয়ভাবে রক্ষা করিয়াছে। এই চলমান কবিতা-সুন্দরীর পায়ে ছন্দনূপুর উহার মনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছে ও উহার অঙ্গবিচ্ছুরিত দেহ-লাবণ্য আত্মার সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যদ্যোতনায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রতিস্পর্ধী হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির বহির্ভূত অন্যান্য ধর্মসাধনা হইতেও কবি উদাত্ত প্রেরণা আহরণ করিয়াছেন। 'প্রতিনিধি' কবিতায় শিবাজির গুরু রামদাসের ভিক্ষা-ব্রত সম্বন্ধে সংশয়-নিরসন গুরুর প্রতি রাজ্যসমর্পণ ও গুরুর প্রতিনিধিরূপে নিষ্কাম ভাবে রাজ্যভার-পরিচালনার দুরূহ আদর্শস্বীকৃতি দীর্ঘ ত্রিপদীর মন্থরগামী ছন্দোবিন্যাসে সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়াছে। এখানে যাহা কিছু বিপ্লব তাহা অন্তর্লোকের নীরবতায় সংঘটিত, বাহ্য উত্তেজনায় বিস্ফোরিত নহে। সেইজন্য শিবাজীর মৃদু সংশয় ও রামদাসের ভগবদ্‌ভক্তির শান্ত উচ্ছ্বাস কবিতার মধ্যে সামান্য একটু ভাবকম্পনের হেতু হইয়াছে। 'অপমান বর'-এ কবীরের ঈশ্বর-সাধনায় সম্মানবিমুখতা ও অহেতুক নিন্দাবরণ রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনদর্শনের অনুরূপ হিসাবে তাঁহার কাব্যসমর্থন লাভ করিয়াছে।

'স্বামীলাভ' ও 'স্পর্শমণি' কবিতাদ্বয়ে আখ্যানের যৎসামান্য আশ্রয়ে অধ্যাত্ম তত্ত্বেরই উপস্থাপনা। প্রথম কবিতাটিতে সহমরণে প্রস্তুত সদ্যোবিধবা নারীর তুলসীদাসের মন্ত্রদীক্ষায় সেই সংকল্পত্যাগ ও নিজ অন্তরে স্বামীর চির-উপস্থিতির অনুভব বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে বৃন্দাবনে যমুনাতীরে নাম-জপনিরত সনাতনের স্পর্শমণির প্রতি উপেক্ষা ও তাহার প্রসাদভিক্ষু দরিদ্র ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয়ে ধনাকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি। দ্বিতীয়টির বিষয়-ঘটনার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিস্ময়-বৈচিত্র্য আছে এবং এই বিস্ময়োচ্ছ্বাসের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া কাব্যশক্তির ব্যঞ্জনাময় অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। প্রবল মানুষ দ্বন্দ্বে বিমূঢ় ব্রাহ্মণের কানে যমুনাকল্লোল কত বিচিত্র ভাব-ভাবনার ইঙ্গিত দিয়া চলিয়াছে। দিনান্তের ক্লান্ত রবি বহু বিরোধী-চিন্তায় অবসন্ন মানবচিত্তের এক বিলম্বিত

সিদ্ধান্তে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার সুন্দর প্রতীকরূপে আমাদের অনুভূতিতে রক্তিমোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্বের ধূসর সন্ধ্যাকাশে কাব্যের শুকতারা শান্ত দীপ্তি বিকিরণ করিয়াছে।

১৪

'পরিশোধ' কবিতাটি গার্হস্থ্যজীবন ও রাজপ্রশাসনের একটি আকস্মিক সংযোগস্থলে বিন্যস্ত। বারাঙ্গনা শ্যামার বিলাসব্যসনাসক্ত, নীতি-সংযমহীন ভোগ-জীবনে রাজদণ্ডে বলিপ্রদত্ত বজ্রসেনের কান্তিচ্ছটা ও দুরবস্থার গ্লানি এক সমবেদনা-লালসামিশ্র বাসনার দুর্দম স্রোতোবেগ বহাইয়া দিয়াছে। দয়ার রন্ধ্র-পথে অনুপ্রবিষ্ট এক প্রমত্ত, দুকূলপ্লাবী আবেগধারা তাহার অন্তরলোককে প্লাবিত করিয়া তাহাকে এক অপ্রতিরোধনীয় মোহের অসহায় ক্রীড়নক করিয়াছে। সে ধর্মাধর্ম ভুলিয়া এক কিশোর প্রণয়ীর প্রাণের বিনিময়ে বজ্র-সেনকে কারামুক্ত করিয়া তাহার সহিত নিঃসঙ্গ প্রমোদযাত্রায় বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই প্রণয়াভিযানে এক দুঃস্বপ্নময় আতঙ্ক মধ্যবর্তীর ন্যায় প্রণয়ীযুগলের মধ্যে নিঃশব্দ ব্যবধান রচনা করিয়াছে। শেষে শ্যামা যখন ঘৃণ্যতম উপায়ে তাহার প্রণয়ীর প্রাণরক্ষার গোপন তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, তখন বজ্রসেনের বিস্ফোরক মানস প্রতিক্রিয়া এই দুঃস্বপ্ন-অগ্নিদাহের জলন্ত শিখাবিস্তারের ন্যায় তাহাদের সমস্ত দির্ন-রাত্রি ও প্রেমমুগ্ধ প্রতিবেশীকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়াছে। আখ্যানের মধ্য দিয়া, কাব্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির অপূর্ব সংমিশ্রণে এই দুঃস্বপ্ন আমাদের নিকট মূর্ত হইয়াছে, এই লেলিহান অগ্নিবলয়ের দিগন্তব্যাপ্তি ও অসহনীয় উত্তাপ-জ্বালা আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠিয়াছে। Keats একদা কবিতার যে আদর্শ নির্দেশ করিয়াছেন —load every rift with ore—তাই রবীন্দ্রনাথের এই আখ্যানকবিতায় পরিপূর্ণ সার্থকতার সহিত অনুসৃত হইয়াছে। অলঙ্কার-প্রসাধিতা, প্রাণবেগ-চঞ্চলা সুন্দরী যেমন স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে আভরণ যে তাহার ভার নহে তাহাই প্রমাণ করে, তেমনি এই রূপসী আখ্যায়িকা ঘটনাগতির সহিত অন্তর্দ্বন্দ্বের গূঢ় ও দ্রুতসঞ্চারী সম্বন্ধরহস্য ও দিন-রাত্রিতে আবর্তিত কালপ্রবাহের সহিত মানব আবেগের সমছন্দধৃত ভাবতরঙ্গ মিশাইয়া এক গভীর তাৎপর্যময় লীলা-সৌন্দর্য প্রকটিত করিয়াছে। বহির্জগতের একটি উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া

অন্তর্লোকের ঘাত-প্রতিঘাতময়, অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্বদোলায়িত এক অপূর্ব জীবনট্র্যাজেডি উহার সমস্ত করুণ-রক্তিম দল মেলিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

কাহিনীর বস্তু সামান্য ও অচিরেই নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু উহার কুক্ষি হইতে যে ধূমকেতুধর্মী আবেগবাষ্প নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে তাহা দুইটি জীবনে দারুণ বিপর্যয় ঘটাইয়াছে ও উহার দিগন্ত পর্যন্ত বহ্নিজ্বালা বিস্তার করিয়াছে। ইহারই মধ্যে অনুরাগের জোয়ার সরিয়া গিয়া সেখানে সংশয়ের ভাটা আসিয়াছে ও প্রবল আত্মধিক্কার-জাত বিরাগের চড়া দেখা দিয়াছে। তাহার উদ্ধারের নিদারুণ সত্য ব্যক্ত হইলে বজ্রসেনের মানস বিমুখতার নিদর্শনরূপ আলিঙ্গন-শিথিলতা ও কঠোর স্তব্ধতা; অন্ধকার নিশীথে আরণ্য জটিলতার দুর্ভেদ্যতর অন্ধকারে নায়কের আত্মগোপনচেষ্টা ও নায়িকার সেখান পর্যন্ত অনুসরণে তাহার তীব্র রোষোচ্ছ্বাস; নায়িকার সর্বাঙ্গলেহনকারী ব্যাকুল আত্মসমর্পণ ও সেই চরম মুহূর্তে নায়ক কর্তৃক নায়িকার শ্বাসরোধী কণ্ঠনিষ্পেষণে অরণ্য-অন্ধকারের ও লক্ষ লক্ষ ভূগর্ভস্থ তরুমূলের মধ্যে এক অজ্ঞাত বিভীষিকার শিহরণ—এই সমস্ত বর্ণনা মানবের মানস রহস্যের সহিত অচেতন প্রকৃতিরহস্যের নিবিড়সহযোগিতাজাত এক তীব্রতম বিকারের জ্বলন্ত অনুভূতি জাগাইয়াছে।

তাহার পরদিন বজ্রসেন সমস্ত দিন ধরিয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে প্রখর রৌদ্রে ছুটা-ছুটি করিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্বে এক অতর্কিত মানস প্রতিক্রিয়ায় তাহার লুপ্ত প্রেম আবার উচ্ছ্বসিত হইয়াছে ও যে প্রিয়াকে সে গলা টিপিয়া মারিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুল আহ্বান জানাইয়াছে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়া শ্যামা তাহার প্রেতমূর্তির মত যেন মৃত্যুর অতল গহ্বর হইতে পুনরাবির্ভূত হইয়াছে। তাহার দর্শনমাত্র বজ্রসেনের মুহূর্ত-পূর্বের প্রেম আবার কঠিন ঘৃণায় পরিণত হইয়াছে ও এইবার সে তাহাকে শেষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। শ্যামা বজ্রসেনের জীবন হইতে মধুর-বঞ্চনাময় স্বপ্নের ন্যায় চিরতরে মিলাইয়াছে। প্রেমিকযুগলের এই মানস অস্থিরতা, অনুরাগ-বিরাগের বিপরীতমুখী স্রোতের প্রবল অভিঘাত ও সর্বোপরি প্রভাত-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাভেদে বনে ও নদীতীরে প্রকৃতির রূপান্তরের মধ্যে মানবের দুর্দম আবেগোচ্ছ্বাসের সহিত প্রকৃতির এক রহস্যময় হৃৎস্পন্দনসমতা কবির আখ্যান-নির্মিতি-কৌশল ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের অপূর্ব কাব্যময় পরিচয় বহন করে।

ইতিহাসকাহিনীতে মনোনিবেশের পূর্বে ২০শে ফাল্গুন, ১৩০৬-এ প্রকাশিত

'কাহিনী' নামে নাট্যকাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত 'পতিতা' (৯ই কার্তিক, ১৩০৪) ও 'ভাষা ও ছন্দ' নামে দুইটি স্বতন্ত্র রীতির কবিতার আলোচনার ইহাই প্রকৃষ্ট স্থান। 'পতিতা' কবিতাটি 'মানসী-সোনার তরী'র যুগের 'সুরদাসের প্রার্থনা' জাতীয় কবিতার সমপর্যায়ভুক্ত। এখানে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে যে মানস উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা জাগিয়াছে তাহারই গীতিময় উচ্চারণ হইয়াছে। নিষ্পাপ, সরল ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকুমারকে ভুলাইয়া অযোধ্যার রাজসভায় আনিতে রূপযৌবনসম্পন্না, যে লাস্যময়ী বারবনিতার দল প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে একতমা ঋষিকুমারের বিস্ময়সারল্যে ও পবিত্র ভাবমুগ্ধতায় নিজ অন্তর্নিহিত মহিমা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এই গীতধারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।. সুতরাং এখানে গীতপ্রবাহ একটি নাট্যবেগসম্পন্ন ভাববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে। ইহার মূলে একটি নাটকীয় অনুভূতিমূলক ভাবান্তরের প্রেরণা বিদ্যমান—ইহাই নাটকের সঙ্গে ইহার স্বল্পতম সম্পর্ক। কবিতাটির অন্তর্নিহিত মনোভাব রাজমন্ত্রীর কুটিল নীতি, ঋষ্যশৃঙ্গের অপার্থিব সারল্য, বারবনিতার প্রবল আত্মধিক্কার ও নবোন্মেষিত আত্মোপলব্ধির দিব্য মহিমা—এই কয়েকটি ভাবধারার অবলম্বনে কক্ষাবর্তন করিয়াছে। গীতিকবিতার স্বচ্ছ, নির্মল প্রবাহের মধ্যে এই নাটকীয় সংবেগটি অনতিলক্ষ্য থাকিয়া উহাকে নিশ্চিত ও বেগবান ভাবাশ্রয় দিয়াছে। একটি সুনির্দিষ্ট মানস পরিস্থিতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া এই কবিতাটি শুধু গীতিকবিতার ভাবমুক্তি ও সার্বভৌমত্বে উত্তরণই অর্জন করে নাই, একটি যথাযথ মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যে অন্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি মূলতঃ তত্ত্বকবিতা, কিন্তু উচ্চাঙ্গের কবিপ্রতিভার স্পর্শে তত্ত্বের কেমন করিয়া কাব্যরূপান্তর সাধন হইতে পারে তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। ছন্দের ধ্বনিগম্ভীর, দীর্ঘায়িত প্রসারে, কবিকল্পনার উদাত্ত আভিজাত্যে, বিষয়গৌরবোপযোগী চিত্রকল্পের অকৃপণ সন্নিবেশে, ভাষা ও ভাবের উচ্ছ্বসিত উৎসারে ও পরস্পরস্পর্ধী সহযোগিতায় ও উহাদের সহিত অর্থব্যঞ্জনার সুদূর-প্রসারী ইঙ্গিত ও ঘনবদ্ধতায় কবিতাটি রবীন্দ্রকাব্যের অনন্ত রত্নভাণ্ডারের মধ্যেও একটি বিশিষ্টদ্যুতিময় সত্তার অধিকারী। নবছন্দ-আবিষ্কার ও উহার অনন্তসম্ভাবনাসচেতনতায় বাল্মীকির উদ্‌ভ্রান্তপ্রায় উত্তেজনা, সূর্যাস্তকালে নব-সূর্যোদয়দীপ্তিবাহী নারদের আবির্ভাব, ছন্দের বিষয়বস্তু ও প্রয়োগসম্বন্ধে উভয়ের তত্ত্বগম্ভীর ও মনীষাদীপ্ত বিতর্ক, প্রকৃতির সহিত তুলনায় প্রকাশদীন মানবের পক্ষে ছন্দের আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক শক্তি-বিষয়ে বাল্মীকির প্রকাশতত্ত্বের সূক্ষ্মতম

উপলব্ধি, রাম-চরিত্রের আদর্শ উপস্থাপনা ও কবি-মানসের ক্রান্তদর্শী সত্যানুভূতির ঐতিহাসিক তথ্যের অপূর্ণতা-নিরসক শক্তির আশ্বাসদান—এই সব মিলিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বের চারিদিকে এক কাব্যালোকবিকীর্ণ জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করিয়াছে। দুর্ভেদ্য মননের অন্তরে কেমন করিয়া কাব্যসৌন্দর্য অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহার কঠোরতাকে রসনির্ঝরে দ্রবীভূত করিতে পারে, ক্লাসিক বিষয়গৌরবের সহিত বিচিত্র আলোকক্ষেপী রোমান্টিক কবিচেতনার কিরূপ আশ্চর্য সমন্বয় সম্ভব এই কবিতাটিতে কাব্যতত্ত্বের সেই দুরূহতম সমস্যাটি অপূর্ব সার্থক সমাধান লাভ করিয়াছে।

১৫

ইতিহাসের উত্তুঙ্গ গিরিসঙ্কট হইতে বেগে অবতীর্ণ প্রাণস্রোত ও দুরূহ জীবন-সমস্যা 'কথা'র অবশিষ্ট কবিতাগুলির উচ্ছল আধারে নাটকীয় পরিণতি-নির্দেশের সহিত বিধৃত হইয়াছে। 'মস্তক-বিক্রয়' (২১শে কার্তিক, ১৩০৪), 'সামান্য ক্ষতি' (২৫শে আশ্বিন, ১৩০৬), 'মানী' (১লা কার্তিক, ১৩০৬), 'প্রার্থনাতীত দান' (২রা কার্তিক, ১৩০৬), 'রাজবিচার' (৪ঠা কার্তিক, ১৩০৬), 'শেষ শিক্ষা' (৬ কার্তিক, ১৩০৬), 'নকল গড়' (৭ই কার্তিক, ১৩০৬), 'হোরিখেলা' (৯ই কার্তিক, ১৩০৬), 'বিবাহ' (১১ই কার্তিক, ১৩০৬), 'বন্দী বীর' (৩০শে কার্তিক, ১৩০৬), 'বিচারক' (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩০৬) ও 'পণরক্ষা' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৬)—কবিতাগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে বিষয়-গৌরব, দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও পরিণতির চমকপ্রদ অভাবনীয়তা অনুসারে বর্ণনার দ্রুত বা মন্থর গতি ও ছন্দের উদাত্ত বা লঘু বিন্যাসরীতি অভ্রান্ত কলাকৌশলের সহিত নিরূপিত হইয়াছে। 'মস্তকবিক্রয়'-এ কাশী ও কোশলরাজের বিরোধ অনেকটা কীর্তি-প্রতিযোগিতার ছেলেমানুষী অভিমানজাত, ইহার মধ্যে কোন বদ্ধমূল বৈরিতার বীজ নাই। তাই কোশলরাজের অমানুষিক আত্মবিসর্জনে ইহা উন্মূলিত হইয়াছে। এ যেন একটা মহত্ত্বের বাজী-খেলা—সেইজন্য কাশীরাজ এই উদারতার দ্বন্দ্বে হার না মানিতে বদ্ধপরিকর। ছন্দোবিন্যাসও কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব-বস্তুর সহিত মিল রাখিয়া করুণ রসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও লঘু ও স্মিতকৌতুকময়। 'সামান্য ক্ষতি'-তে রাণীর নিষ্ঠুর খেয়ালে রাজার রোষোচ্ছ্বাস ও ন্যায়বিচারের অনমনীয় সংকল্প ছন্দঃস্পন্দের ওজোগুণপ্রাধান্যে, নদী ও নারীমনের তরঙ্গিত

উচ্ছলতার ও বহ্নিশিখার সর্বগ্রাসী উদ্দাম বিস্তারের, অপূর্ব দ্যোতনাময় বর্ণনায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। উদাত্ত বীর্যবত্তা ও অতুলনীয় আদর্শনিষ্ঠ মনোবলের প্রকাশে, শিখ-মোগলের মৃত্যুপণ সংগ্রামের মহাকাব্যোচিত উদ্বর্তনে গীতিকবিতা নিজ স্বধর্ম না হারাইয়া উহার সহিত এক অভাবনীয় সঞ্চরণশক্তি ও লৌহকঠিন, ঐশ্বর্যময়ছন্দধ্বনি মিশাইয়াছে। 'বিচারক'-এর যুক্তধ্বনিময় ছন্দ যুদ্ধের ভৈরব আয়োজন ও ন্যায়দণ্ডের নৈতিক অমোঘতাকে দুই সমান নিক্তিতে ওজন করিয়া উভয়কেই সম গুরুত্ব দিয়াছে। 'পণরক্ষা' কবিতায় বীরত্বপ্রতিশ্রুতিপূর্ণ প্রতিরোধ-প্রস্তুতি অকস্মাৎ এক আত্মঘাতী নীতির বশে অর্ধপথে ছিন্নভিন্ন হইয়া নীরব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সঙ্কল্পচ্যুতির করুণ অনুশোচনার সুরকে প্রাধান্য দিয়াছে। তাই কবিতার কয়েকটি পংক্তিতে বৈরাগ্যধূসরতার ছায়া জমাট বাঁধিয়াছে।

> বেলা বয়ে যায়, ধূ ধূ করে মাঠ
> দূরে দূরে চরে ধেনু।
> তরুতলছায়ে সকরুণ রবে
> বাজে রাখালের বেণু।

পংক্তি কয়টি যে সর্বপ্রয়াসের বিরতিসূচক শান্ত নির্বেদভাবের উদ্দীপন করে, গেরুয়াবসনা সন্ধ্যার পশ্চিমমাঠ পারে অবতরণে তাহারই স্থায়ী রসে পরিণতি ও দুমরাজের কর্তব্যদ্বন্দ্বমথিত আত্মহননে তাহারই পূর্ণাহুতি।

'শেষ শিক্ষা' 'কথা ও কাহিনী'র অন্যান্য কবিতার সহিত তুলনায় একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। ইহার আখ্যানের মধ্যে গীতি-উচ্ছ্বাস বা ছন্দদোলন নাই, আছে বিবৃতিধর্মী, মন্থরগামী পয়ার-পদাতিকতা। ইহার প্রায় সবটাই আখ্যানের ত্বরাহীন অথচ অবিচ্ছিন্ন গতি-প্রয়োজনে নিয়োজিত। কবিত্ব এখানে সংযত, উপমা-বর্ণনার বিরল উপস্থিতিতে সীমিত। সন্তানহীন শিখগুরুর অন্তরে পাঠান বালকের অপত্যস্নেহে স্থানলাভ 'বাজে-পোড়া বটের কোটরে' ভিন্নজাতীয় বীজের দৈবলব্ধ অনুপ্রবেশ ও শাখা-প্রশাখা-বিস্তারের সহিত উপমিত হইয়াছে। আরও এক স্থানে গুরু যেখানে মামুদকে প্রতিশোধ-গ্রহণে উত্তেজিত করিতেছেন সেই নাটকীয় মুহূর্তের পটভূমিকায় দীর্ঘচ্ছায়াক্ষেপী অস্তসূর্যরশ্মিমালা বাদুড়ের পাখার সহিত তুলনায় এক অশুভশংসী ইঙ্গিতময় হইয়া উঠিয়াছে। এই কবিতায় ঘটনা-বিবৃতির মধ্যে গীতিসুরের পরিবর্তে নাটকীয় আভাস বেশী পরিমাণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য এখানে যে উহার চিরাভ্যস্ত সংস্কারকে অবদমিত করিয়া এক নতুন সাধনায় দীক্ষিত হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়।

ঐতিহাসিক আখ্যানমালার দ্বিতীয় স্তরে উদাত্ত, আবেগময় সুরভঙ্গী ও ছন্দ-উদ্দীপনার পরিবর্তে একটি লঘু শ্লেষাত্মক মেজাজ, তির্যক সংলাপের গূঢ় অর্থবহতা ও গাথাকবিতার (ballad) হেঁয়ালিস্পৃষ্ট পুনরুক্তি ও ধুয়ার প্রয়োগ-প্রাচুর্য বিশেষ লক্ষণরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। ইতিহাসের সমস্তটাই বীরত্বগৌরবময় নহে; উহার মধ্যেও grim humour বা সাংঘাতিক ছদ্মবেশী রঙ্গরসিকতার, আমোদ-প্রমোদের মুখোশপরা ট্র্যাজেডির অতর্কিত আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। 'মানী' কবিতায় বীরত্ব-মহিমা ও উহার যথাযোগ্য সংবর্ধনা আছে, কিন্তু ছন্দে ও ভাষায় সুর-ছড়ানো আবেগের চিহ্ন নাই। এই আটপৌরে দর্পণে বীরত্ব ও উদারতার ঘরোয়া রূপটিই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'প্রার্থনাতীত দান' ও 'রাজবিচার'-এ ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে উন্নত নীতি-আদর্শ অতিসংক্ষেপে ও কাব্যকলার বিশেষ অনুরঞ্জন ব্যতীতই, খানিকটা দ্রুতভাষণের চকমকি-ঠোকা বিস্ময়ের সাহায্যেই ব্যক্ত হইয়াছে।

'নকলগড়', 'হোরিখেলা', 'বিবাহ' এই তিনটি কবিতায় লঘু সুরে গুরু বিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম কবিতাটিতে একটা তুচ্ছ ব্যাপার অবলম্বনে দেশপ্রীতির কিরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সহজ, নিরলঙ্কার বিবরণ পাই। এই সহজ বিবৃতির আড়ালেই গভীর ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। 'হোরিখেলা'-য় উৎসব-আমন্ত্রণের অন্তরালে দেশশত্রুর প্রতি কিরূপ বদ্ধমূল প্রতিশোধসংকল্প লুকান আছে, ঘাগরার নীচে কিরূপ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র গুপ্ত আছে, ফাগ ও আবীরের লালের সঙ্গে অস্ত্রাহত দেহের রক্তের ব্যবধান কত স্বল্প তাহারই একটি ছদ্মকৌতুকময় কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এখানে ব্যালাডের বর্ণনাভঙ্গি ও বাচন-বৈশিষ্ট্য চমৎকার কলা-কৌশলের সহিত অনুসৃত হইয়াছে। কাহিনীতে কোন সচেতন কবিত্বপ্রয়াস নাই, তবে বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কাব্য-পরাগসুরভি গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। 'বিবাহ'-এ আনন্দমিলনের করুণ পরিণতি, বাসরশয্যার সহমরণে পর্যবসান ঘরোয়া কথায় কিন্তু গভীর—সংযত আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। রাজপুত জীবনের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, উহার লৌহকঠিন রীতি-নীতি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপরিচয় ঘটনাবিন্যাসকে স্বাভাবিক বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়াছে।

'কথা ও কাহিনী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে মন্তব্য করিয়াছেন :—"এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরি হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস নেমেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়।" এই মন্তব্যে কাব্যটির কবিমানসবিবর্তনে বিশিষ্ট কল্পনারীতির সার্থক পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে ইতিপূর্বে কোথায়ও মানবজীবনমহিমার এইরূপ আত্মমানসপ্রভাবহীন, যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। অবশ্য আখ্যানগুলি প্রায়ই অতীতযুগের ইতিহাসাশ্রয়ী, বর্তমান জীবন হইতে সুদূর ব্যবধানে সন্নিবিষ্ট, ও উদার ও মহান ভাবের বাহন। তথাপি উহারা যে কবিকল্পনা দ্বারা বিকৃত নয়, পরন্তু যুগের সত্য প্রতিচ্ছবি সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কবি উহাদের মধ্যে নিজ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শ আরোপ করেন নাই, উহাদের অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটিই নিজ কবিত্বশক্তির জ্যোতিঃসম্পাতে উজ্জ্বল ও ছন্দবাহিত উদ্দীপনায় প্রাণোচ্ছল করিয়া তুলিয়াছেন। এখানে কবির ভাবমন্ময়তার কোন নিদর্শন নাই ; কবি অন্তর্লোকের কল্পনা ও আদর্শরোমন্থনের প্রভাব কাটাইয়া, বহির্ঘটনার তুর্ণগতি ও ভিন্নধর্মী-লোকের দ্বন্দ্ব-আলোড়িত, বিচিত্র জীবনকাহিনীর নাটকীয় আকর্ষণের প্রতি নিজ অবিভক্ত লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্য-ইতিহাসে ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন স্তরের বিকাশ।

এই কবিতাগুলিতে রেখায় বদ্ধ ও রং-এ গাঢ় ছবির প্রাচুর্য আছে, কিন্তু কবি সচেতনভাবে ও ঘটনার অগ্রগতি থামাইয়া চিত্রাঙ্কন-উদ্দেশ্য অনুসরণ করেন নাই। নদী যেমন চলিতে চলিতে কোথাও সূর্যকিরণে ঝলমল করিয়া উঠে, কোথাও বা আবর্ত-নৃত্যে পাক খায়, কোথাও বা জলের গাঢ়তর বর্ণে দহের ইঙ্গিত দেয়, 'কথা ও কাহিনী'র কবিতাগুলিও সেইরূপ ঘটনা-অঙ্কুশ-তাড়িত হইয়া দ্রুতধাবন করিতে করিতে নিজ গতিবেগেই ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, অশ্বারোহী সৈন্যের বর্ষাফলকবিদ্ধ আলোকরশ্মির মত। কাহিনীর রস সর্বত্রই ফুটিয়াছে এবং ইহারই অবারিত উৎসারে রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব-প্রত্যাশিত গভীরতর রসগুলিও যেন অনেকটা চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু এই কাব্যের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ইহার নাটকীয়তায়। বস্তুতঃ আখ্যান ও নাটক যেন ইহাতে হাত ধরাধরি করিয়া, এক সমমর্যাদাসম্পূর্ণ সহযোগিতায় ঘনিষ্ঠ হইয়া চলিয়াছে। গল্পের নদীস্রোত ক্ষণে ক্ষণে নাটকীয়তার বায়ুপ্রবাহ-

সংযোগে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে—"আজি উতরোল উত্তর বায়ে উতলা হয়েছে তটিনী"। ইহাতে ঘটনার প্রতি বাঁকে গল্পের আকর্ষণের সহিত নাট্যরসের নিগূঢ়তর, অধিকতর বেগবান ও রোমাঞ্চকর আকর্ষণ মিশিয়াছে—কাহিনীর রশির সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের শিরাস্নায়ু-রক্তনালীর রশিতে টান পড়িয়াছে। কবি এখনও অন্তর্যামী-জীবনদেবতার ধ্যানাবিষ্ট, গীতিকবিতার লীলারসবিভোর। কিন্তু ঠিক এই সময় তাঁহার কাব্যে একটি প্রবল নাটকীয় প্রেরণার অনুপ্রবিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। কবি আত্মভাবনার সূক্ষ্ম সূত্রের সহিত মিশাইয়া জগন্নাথের রথরজ্জুতে হাত দিবার সূচনা দেখাইয়াছেন। কাব্য-নাটকের এই যুগ্ম প্রভাব কোথাও সম্পূর্ণ সমন্বিত হয় নাই—কখনও একের, কখনও অপরের প্রাধান্য অনুযায়ী যাহা রচিত হইয়াছে তাহাকে নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য এই ভিন্ন মিশ্র নামে অভিহিত করা যায়। কয়েক মাসের মধ্যে (ফাল্গুন, ১৩০৬) 'কাহিনী' কাব্যে কবির মনে নাট্যপ্রবণতার আপেক্ষিক প্রাধান্য নাটকের বহিরঙ্গ-অনুসৃতিতে প্রকটিত হইয়াছে। কাব্যের অন্তরধর্মের সহিত নাটকের রূপকল্প ও কিছুটা নাট্যগুণের সংমিশ্রণ রবীন্দ্রকাব্যে এক অভিনব মানস প্রেরণা ও আঙ্গিকরীতির প্রবর্তন করিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পরিণতিপর্ব—চতুর্থ স্তর

কল্পনা ১৯০০ (১৩০৭)

ক্ষণিকা ১৯০০ (১৩০৭)

১

'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থ একই বৎসরে অতি অল্প ব্যবধানে প্রকাশিত, তবে উহাদের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির রচনাকালের মধ্যে প্রায় দুই বৎসরের একটা দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। উভয় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবি-মেজাজের সাম্য কিছুটা আছে, কিন্তু বৈষম্যই প্রবলতর। কতকগুলি কবিতার সুরের ঐক্য উহাদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করিলেও, মোটের উপর 'কল্পনা' হইতে 'ক্ষণিকা'য় যাত্রা একটি সুগভীর ও দূরপ্রসারী পরিবর্তনের চিহ্ন বহন করে। 'চৈতালি' হইতে প্রাচীন হিন্দুসাধনা ও সংস্কৃত কবিতার বিশিষ্ট ভাবলোকে অনুপ্রবেশের জন্য কবির যে আগ্রহ দেখা যায় তাহা 'কল্পনা'য় পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'চৈতালি'তে যাহা মর্মানুধাবনের প্রয়াস ছিল তাহা 'কল্পনা'য় নবসৃষ্টিতে বিকশিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সরস পথ বাহিয়া কবি মৌলিক কাব্যপ্রেরণার রসলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 'চৈতালি'র সনেটের দৃঢ় কায়ব্যূহে আবদ্ধ ভাবগাম্ভীর্য ও বোধযাথার্থ্য পরবর্তী কাব্যে প্রাচীন ভাবমৃণালে বিকশিত, নব প্রাণরসে সঞ্জীবিত, অপরূপ কল্পনালীলার রক্তপদ্মের রূপ ধারণ করিয়াছে। ধ্যানসমাহিত স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করিয়া প্রেমের স্নিগ্ধ, লাবণ্যময় সৌরভ আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কুমারসম্ভবের দেবমহিমামণ্ডিত শান্ত অধ্যাত্মসাধনামূলক প্রেম হইতে ভাবোচ্ছ্বাসস্ফীত, কৌতুককল্পনায় উচ্চকিত লৌকিক প্রণয়লীলার রসলোকে প্রবেশ করিয়াছেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্বতন কাব্যপর্বের 'মানসী'তে 'মেঘদূত'-এর অন্তঃপ্রেরণা ও কিয়ৎ পরিমাণে উহার বহিরঙ্গ প্রতিবেশের বর্ণনাভঙ্গী আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনি কালিদাস-কাব্যের অন্তর্নিহিত বিরহবেদনার সার্বভৌম তাৎপর্যটির দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। প্রাচীন যুগের বিশেষ-পরিবেশ-সীমিত প্রেম ও বিরহের মধ্যে যে সর্বকালীন ভাবব্যঞ্জনা ও আদর্শ-

বাস্তব-সংঘাত মাঝে মধ্যে নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে কবি তাহাকেই গভীরতর অনুপ্রবেশ ও কল্পনা-অনুভূতির সাহায্যে কালসীমাতিসারী শাশ্বত আবেদনে মানবচিত্তে পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন। কালিদাসের সহিত যেখানে নিখিল কবিমনের মিল, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়াছেন। কিন্তু 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'-য় কালিদাস-যুগের উজ্জয়িনীর সাধারণ জীবনযাত্রার ও প্রণয়লীলার ছন্দ, উহার দেবলোকের সহিত মর্ত্যলোকের বিশ্বাস-সংস্কার-গঠিত সহজ অন্তরঙ্গতা, কবি-কল্পনার কৌতুকরস, বিচিত্র চিত্ররেখায় ও রংএর প্রাচুর্যে উৎসারিত অনায়াস-নৈপুণ্য এক আশ্চর্য সাবলীলতায় রবীন্দ্রকাব্যে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। পূর্বে কালিদাস-যুগের তপোবন, উহার পারমার্থিক চিন্তারত, লৌকিক বিকারের অতীত ঋষিব্রজ, উহার শান্তি ও সন্তোষমণ্ডিত জীবনাদর্শ রবীন্দ্রকাব্যে স্থান পাইয়াছিল। এখন উহার প্রণয়পীড়িতা তরুণীবৃন্দ ও ক্রীড়াশীল আশ্রমমৃগও উহাদের লঘুচপল ভঙ্গী, সরস বাক্‌চাতুর্য ও সরল প্রাণোল্লাস লইয়া যুগজীবনের সম্পূর্ণ ছবিটি ফুটাইয়া তুলিল। অথচ ইহা কেবল revivalism বা প্রাণহীন অতীতের পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়। রবীন্দ্রযুগের আরও নিগূঢ়চারী, গভীরপ্রবেশী প্রাণশক্তি, উহার পরিণততর পরিহাসরসিকতা, উহার দক্ষতর তির্যককটাক্ষক্ষেপ ও কল্পনার স্বচ্ছন্দতর সঞ্চরণ কালিদাস-কালের জীবনযাত্রার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া অতীতকে এক অভিনব লীলামাধুর্যে অভিষিক্ত করিয়াছে ও উহার হৃৎস্পন্দনের গোপন উৎসটিকে আমাদের নিকট অবারিত করিয়াছে।

এই দুই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নিসর্গকবিতাগুলিও প্রাচীন যুগের ভাবাসঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়া ও সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও মাত্রাবৃত্তরীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে এক নূতন সুরঝঙ্কারে অনুরণিত হইয়াছে। এই বহিরঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত এক নিগূঢ়তর ভাবব্যঞ্জনার সমন্বয় কবির প্রকৃতিসম্বন্ধীয় এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়াছে ও নিসর্গচেতনার রূপান্তরসাধক কবি-অনুভূতির সার্থক দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছে। তাঁহার পূর্বতন নিসর্গকবিতায় বর্ণনার সহিত কবিচিত্তের তৎকালিক এক প্রবল অনুভব মিশিয়াছে। এই মিশ্রণের ফলে কবিতাগুলি নিছক বহিরঙ্গবর্ণনার স্তর ছাড়াইয়া একটি ভাব-ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও নিসর্গকবিতা অবান্তর দৃশ্যপ্রাচুর্য হইতে মুক্তি পাইয়া আপনাতে আপনি সংহত ও একটি বিশেষ ভাবের স্বচ্ছ দর্পণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে প্রকৃতির অন্তরাত্মার কোন রূপান্তর সাধিত হয় নাই। এই পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থে

ভাবব্যঞ্জনার সার্বিক প্রবলতার জন্য ঋতুসমূহের অবয়বগত রূপটি এক গভীর আত্মিক বা সাঙ্কেতিক দ্যোতনার দ্বারা অনেকটা অভিভূত হইয়াছে। ইহাদের গ্রীষ্ম ও বর্ষা শুধু ঋতুচক্রের অঙ্গ নয়, নিগূঢ় কল্পনানুভূতি হইতে উৎক্ষিপ্ত আলোকে ইহারা কবিচিত্ত ও প্রকৃতি উভয় শক্তির সমবায়ে গঠিত এক নূতন ভাবসত্তার অধিকারী হইয়াছে।

লঘু সুরের ব্যঙ্গকবিতা 'মানসী'-পর্ব হইতেই কবি-মেজাজের একটি বিশেষ লক্ষণরূপে বারে বারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই ব্যঙ্গপ্রবণতা কবির গভীর-রসাত্মক কবিতাবলীর মধ্যে এক বিসদৃশ ব্যতিক্রমরূপেই প্রতিভাত হইয়াছে। কেবল 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় এক পক্ষের ভাববিহ্বল প্রেম-নিবেদনের সহিত অপর পক্ষের রুচির স্থূলতা ও অভিলাষের তুচ্ছতার অপ্রত্যাশিত সংযোগ একদিকে যেমন বাস্তবানুগামী, অপরদিকে তেমনি সুরসঙ্গতিপূর্ণও হইয়াছে। লঘু সুরের আকস্মিক উৎক্ষেপ যেমন প্রবল বৈপরীত্যবোধের মাধ্যমে হাস্যরসের উদ্রেক করে, তেমনি গভীরতর রূপক-ব্যঞ্জনাও এই আপাত-অসঙ্গতির মধ্যে অর্থগৌরবের চকিত উপলব্ধি সঞ্চার করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু তথাপি মোটের উপর 'মানসী'-'সোনার তরী'-'চিত্রা' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের লঘু কল্পনা তাঁহার গভীর রসসৃষ্টির সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্কে মিশিয়া যায় নাই—কবি-মনের একটি দ্বৈতভাব, একটি দ্বিধাবিভক্ত ভাবপ্রেরণা এই বিসদৃশ সহাবস্থানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'কণিকা'-য় লঘু সুরেরই প্রাধান্য, তবে কবিতাগুলির অতি-সংক্ষিপ্ততা কল্পনার স্বচ্ছন্দ-বিকাশকে স্বল্পবাক্ মননের মধ্যে সংহরণ করিয়াছে।

'কল্পনা'য় 'জুতা-আবিষ্কার' 'উন্নতি-লক্ষণ' এই দুইটি কবিতা পূর্বতন প্রবণতা যে এখনও কবিকে ত্যাগ করে নাই তাহার নিদর্শন। তাহার মধ্যে প্রথমটি শ্লেষাঘাতহীন প্রসন্ন কৌতুককল্পনা ; দ্বিতীয়টি পূর্বেকার আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তির অনুসরণ। 'হতভাগ্যের গান' কবিতাটি কিন্তু অতীতানুবৃত্তিবর্জিত, ও 'ক্ষণিকা'র সমধর্মী মানস প্রবণতার পরিচয়বাহী। ইহাতে কবির খেয়াল বেপরোয়া হইয়া ও বিরোধাভাস অলঙ্কারের দ্বারা ভাবিত হইয়া বহুস্তুত জীবনাদর্শকে অবহেলায় অস্বীকার করিয়াছে। নিন্দিত আদর্শের উপস্থাপনায়, ছন্দ, ভাব ও প্রকাশের অনবদ্য সঙ্গতিতে ও কবিমনের সাবলীল স্ফূর্তিতে এমন একটি দুঃসাহসিক, আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল মেজাজ ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন কাব্যে বিরল ও 'ক্ষণিকা'তেই যাহার আকস্মিক পূর্ণতা। এই কবিতাটির রচনায়

তারিখ ৭ই আশ্বিন, ১৩০৪ ও পরিবর্ধনের তারিখ ৭ই আষাঢ়, ১৩০৫। যে লঘু খেয়াল রবীন্দ্রকাব্যে অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মত বার বার বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা কুয়াশারূপে তাঁহার কাব্যদিগন্তে লীন থাকিয়া আমাদের দৃষ্টিকে মাঝে মধ্যে ঝাপ্‌সা করিয়াছে, তাহাই 'ক্ষণিকা'য় ও উহার পূর্বাভাসরূপে 'কল্পনা'র একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যাকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া এক স্ববিরোধহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবাবহ-বিস্তারের হেতু হইয়াছে। বাধা ও ব্যতিক্রম নিয়মিত প্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়া কবিমনের এক নব ভাববিগ্রহ নির্মাণ করিয়াছে।

'কল্পনা'য় দীর্ঘদিন পরে আবার কবিমনে গানের জোয়ার আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সের অনেক সুবিখ্যাত গান 'কল্পনা'র অন্তর্ভুক্ত। গানগুলি অধিকাংশই প্রণয়নিবেদনমূলক। তবে এই প্রেমাকুলতার মধ্যে রচনাচাতুর্য, ভাবসংযম ও প্রেমের অপেক্ষাকৃত স্থিতধী অবস্থা সুপরিস্ফুট। প্রণয়ের প্রথম উন্মত্ত উচ্ছ্বাস এখন কবিচিত্তে অনেকটা শান্ত ও পরিণত মননের তটবন্ধনে দৃঢ়বিধৃত। অনেকগুলি গান ও গীতিকবিতার সার্থক সমন্বয়ে রচিত। তাহারা সুরের সাবলীলতা ও সুপ্রযুক্ততায় গান; আর মনন-কল্পনার পরিমিত প্রয়োগে গীতিকবিতাবধর্মী। 'লীলা' গানটিতে নায়িকার স্নানছলে সুদীর্ঘ জলক্রীড়া ও বোধ হয় নায়কের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য লীলাভরে কঙ্কণঝঙ্কার নায়কের মনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল কি না তাহা জানা যায় না। বরং সে তাহাকে ঘরে ফিরিতেই অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু নায়িকার এই লীলালাস্য নদীর ঢেউ ও নদীপারের মেঘমালার মনে তাহার ছলনা সম্বন্ধে স্মিতকৌতুক জাগাইয়াছে। প্রেমিকের নির্বিকারত্ব ও অচেতন পদার্থের প্রেমের খেলায় তির্যক সহযোগিতা প্রেমের একটি নূতন পটভূমি রচনা করিয়াছে, যাহা গান অপেক্ষা কবিতারই অধিক উপযোগী। 'লজ্জিতা' গানটিতে হৃদয়ানুভূতি অপেক্ষা কাব্যপ্রসাধনের অংশই বেশী। এই গানটির তথাকথিত রুচিহীনতা দ্বিজেন্দ্রলালের কঠোর আক্রমণের বিষয় হইয়াছিল। রুচির কথা বাদ দিয়া ভাবের দিক দিয়া গানটি অভিসারের আধুনিক গার্হস্থ্য সংস্করণ; ইহাতে অভিসারিকার লজ্জা-সংকোচ সমস্ত প্রতিবেশে সঞ্চারিত হইয়া একটি কাব্য-রমণীয়তাই প্রধানরূপে প্রতিভাত। 'কাল্পনিক' ও 'মানসপ্রতিমা' একই আদর্শ সাধনার দুইটি বিপরীত দিক্। প্রথমটিতে কল্পনাবিলাসের হতাশাময় শূন্যতা ও দ্বিতীয়টিতে, কবিচিত্তের আবেগের আকর্ষণে ও রমণীয়তার রঞ্জনে সুদূরচারী

আদর্শও কেমন করিয়া কবির মনোলোকে চিরন্তন স্থান লাভ করিয়া তাঁহার জীবন-মরণের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হইতে পারে তাহার প্রতিপাদন। এই দুইটি গানেই সুরনির্ভরতা ও কাব্যমর্যাদা প্রায় সমঅংশেই মিশ্রিত। 'প্রার্থী', 'সকরুণা', 'বিবাহমঙ্গল' ও 'ভারতলক্ষ্মী' সুর-সংযোজনায় গান, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিতে ও ভাবগৌরবে গীতিকবিতা। এই পর্যায়ের মধ্যে শুধু 'নব বিরহ' ও 'সঙ্কোচ' এই দুইটিই ভঙ্গীর লঘুতা ও আবেগের প্রত্যক্ষ সরলতার জন্য অবিমিশ্র গান হইয়া উঠিয়াছে। 'জন্মদিনের গান', 'পূর্ণকাম' ও 'পরিণাম' আধ্যাত্মিক সুরগভীরতায় 'গীতাঞ্জলি'-পর্যায়ের ভগবৎ-ভক্তিপ্রধান গানগুচ্ছের পূর্বসূচনা।

২

রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা'-য় কখনও গভীর, একনিষ্ঠ আকৃতিতে, কখনও লঘু-চটুল কল্পনা-লীলায় কালিদাসস্মৃতিসুরভিত প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের প্রণয়াবেশের স্মৃতি-উদ্বোধনে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। 'চৌরপঞ্চাশিকা' (২৩শে বৈশাখ, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০), 'স্বপ্ন' (৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪), 'মদনভস্মের পূর্বে' (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪), 'মদনভস্মের পরে' (১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪), 'সেকাল' ও 'জন্মান্তর' ('ক্ষণিকা') কবিতাগুলিতে এই স্মৃতিচারণার স্বপ্নময় লীলামাধুর্য পরিস্ফুট। 'চৌরপঞ্চাশিকা' বিদ্যাসুন্দর-প্রেমকাহিনীর এককালের উদ্দাম, বাসনা-বিহ্বল উচ্ছ্বাস এযুগে কেমন একটি করুণ, নিরুত্তাপ সুর-ঝঙ্কারের মূঢ় পুনরাবৃত্তিতে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে তাহারই অপরূপ মর্মোদ্‌ঘাটন। বিদ্যাসুন্দর কবির একসন্ধ্যার প্রমোদ-পুষ্পমাল্যের অবলম্বন-ডোর মাত্র, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই এক ক্ষণিক প্রেমস্বপ্ন আপনার রক্তিম দলগুলি বিকশিত করিয়াছিল। আজ সেই উন্মত্ত প্রণয়-লালসা সমস্ত উত্তপ্ত বস্তুসত্তা হারাইয়া রাজান্তঃপুরলালিত শুক-সারীর বারে বারে পুনরাবৃত্ত এক অর্থহীন কলকাকলীতে পর্যবসিত হইয়াছে। প্রেমিক-প্রেমিকা আজ চিরনিদ্রায় অচৈতন্য, আবেগদীর্ণ হৃদয়ের বেদনা আজ স্তিমিত, প্রেম-কাব্য আজ অভ্যস্ত, অবোধ সুরের চক্রাবর্তন, ছন্দকারুকার্য আজ স্বর্ণপিঞ্জররূপে একদা্‌ প্রাণোচ্ছল প্রণয়বিহঙ্গকে চিরতরে বন্দী করিয়াছে। জীবন হৃদয়াবেগের শিল্পরূপের অচলতায় জমাট-বাঁধার করুণ তাৎপর্যটি আশ্চর্যভাবে সঙ্কেতিত করিয়াছেন।

'স্বপ্ন' কবিতায় প্রতিবেশ-চিত্রণে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্যতা ও হৃদয়ানুভূতিবর্ণনায়

ম্লান, ধূসর অস্পষ্টতা স্বপ্নের এই উভয়বিধ বিপরীত লক্ষণ আশ্চর্যভাবে সমন্বিত হইয়াছে। উজ্জয়িনীর গৃহ, দেবমন্দির, গৃহের বাহিরের অলঙ্করণ ও ভিতরের স্নেহলালিত পক্ষীসমাজের বিশ্রব্ধ আশ্রয়নীড়···সমস্তই অত্যন্ত উজ্জলবর্ণে চিত্রিত। কিন্তু প্রেমের বর্ণনায় প্রশান্ত, বিষণ্ণ, কালব্যবধানে মন্দীভূত, স্মৃতির পুনরুদ্ধার-চেষ্টায় ক্ষীণ ও অস্পষ্ট একটি সুর সমস্ত কবিতাটিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। স্বপ্নে যেমন বাক্‌স্ফূর্তি হয় না, তেমনি এখানে এই স্বপ্নমন্থর প্রেম, খানিকটা স্মৃতির ভারে, খানিকটা ভাষা-বিস্মৃতির শূন্য বিমূঢ়তায়, রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছে। এই অতীতস্মৃতিচারণায় বিভোর প্রেম সমস্ত স্থান-কালের চেতনা হারাইয়া এক অতলস্পর্শ শূন্যতা-সমুদ্রে আত্মনিমজ্জন করিয়াছে।

গ্রীসে সাইকি ও কিউপিডের মত ভারতীয় সাহিত্যে মদনদেবতার একটি ভাববিগ্রহ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ও প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে আমরা মদনমহোৎসবের বর্ণনা পাই। কালিদাস নিজ কাব্যে মদনভস্ম ও রতিবিলাপ বর্ণনা করিয়া উহাদের একটি অবিস্মরণীয় কাব্যপ্রতিমা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আর মদনের অদৃশ্য প্রভাব ও গোপন লীলার জয়গানে ত সংস্কৃত সাহিত্য চিরমুখর। কিন্তু তথাপি এই কামচারী, সর্বব্যাপী দেবতা হিন্দু পৌরাণিক দেবমণ্ডলীর মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট স্থান পায় নাই। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে তাহার কোন সর্বসম্মত মূর্তিপরিকল্প বা পূজাবিধিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহার হাতে কেবল ফুলধনু ও চূতমুকুলের তীর অর্পিত হইয়া তাহার স্বরূপব্যঞ্জনার উপায়রূপে নিয়োজিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অদ্ভুত কল্পনাশক্তির প্রয়োগে এই অনঙ্গদেবের রূপকল্প, উহার গতিবিধি ও মানব-মনের উপর প্রভাববিস্তারের রহস্যটি চিত্ররেখায় ও সার্থক ভাবদ্যোতনায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তরুণ চিত্তের গহন উৎস ও মদির উত্তেজনা হইতে যাহার উদ্ভব সেই মানসিক দেবই মূর্তি ধরিয়া সকলের আনুগত্যের অঞ্জলি আকর্ষণ করিতেন। কুমারীর আরতি, কিশোর কবির মধুর কল্পনা, বয়ঃসন্ধিতে উপনীতা তরুণীর সশঙ্ক কৌতূহল, নূপুররণিতা নববধূর মদন-উদ্দীপনের লজ্জিত চাতুরী-প্রয়াস, বিরহব্যথাতুরা যুবতীর মুগ্ধ আত্মবিস্মৃতি—এ সবই এই দেবতার বিচিত্র পূজা-উপচার। বর্তমানে এই দেবতা ভক্তের আকূতি সত্ত্বেও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছেন—কবি তাঁহাকে আবার মানবসমাজে আবির্ভূত হইয়া মানবচিত্তকে হর্ষবিহ্বল ও দেবস্পর্শরোমাঞ্চিত করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। ছন্দের

দোলায়, শব্দগ্রন্থনের নৈপুণ্যে, অন্তঃস্পন্দের ধ্বনিময়তায়, সর্বোপরি চিত্ররচনা ও চয়নের অনবদ্যতায় কবিতাটি রবীন্দ্রকবিপ্রতিভার, ভাবের রূপে উত্তরণদক্ষতার এক আশ্চর্য নিদর্শন। কীট্‌সের Ode to Psyche-কে ইহার সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ততার তুলনায় খানিকটা সচেষ্ট, তথ্যভারাক্রান্ত ও সৌন্দর্যমন্থর পুনর্গঠন বলিয়া মনে হয়। তবে কীট্‌সের শেষ দুই পংক্তির বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দূরোদ্‌ঘাটনকারী সাঙ্কেতিকতার সহিত তুলনীয় সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নাই :—

A bright torch, and a casement ope at night
To let the warm Love in!

ইহার কারণ কীট্‌সে দেবী নিজেই প্রণয়মুগ্ধা, রবীন্দ্রনাথের দেবতা মানবমনে বিকার জাগাইয়াও নিজে নির্লিপ্ত।

'মদনভস্মের পরে' কবিতাটিতে রতিবিলাপের বিপরীত দিকটি উদ্‌ঘাটিত। প্রেমের ন্যায় মানবের সনাতন হৃদয়বৃত্তিকে উৎসাদন করা যায় না। প্রণয়-দেবতাকে ভস্মসাৎ করিলে উহার সম্মোহনশক্তি আরও দুর্লক্ষ্যভাবে দূরবিকীর্ণ ও অপ্রতিরোধ্য হয়। যাহা মূর্তিতে সংহত ছিল তাহা নানা ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া, নানা সাঙ্কেতিকতার সূত্র-অবলম্বনে, বিচিত্র সাদৃশ্য-ব্যঞ্জনায় বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অতীত মূর্তিপূজার সহিত তুলনায় আধুনিক অমূর্ত ভাবেরই জয় ঘোষিত হইয়াছে। প্রথম কবিতাটিতে কল্পনার যেরূপ উদ্ভাবনী ও আত্মবিস্তারমূলক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টিতে তাহার তুলনায় পরিচিত ভাবেরই প্রাধান্য।

'ক্ষণিকা'-র 'সেকালে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের লঘু কল্পনা নৃত্যচপল ছন্দে ও অত্যন্ত অনায়াস ভঙ্গীতে কালিদাসের কালের জীবনের ত্বরাহীন তৃপ্তি, রাজসভার পরিবেশ, কাব্যরচনার প্রেরণা, প্রণয়লীলার হাব-ভাব ও ছলা-কলা ও শেষে যুগপরিবর্তনে মানবপ্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্ব অতি নিপুণভাবে উপস্থাপিত করিয়া সমস্ত যুগের মর্মবাণী ও জীবনচর্যাটির একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়াছে। সব যুগের গভীর চিন্তা-কল্পনা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে একটা রূপসাম্য অনুভব করা কঠিন নহে। কালিদাসের মেঘদূত ও রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত ভাবের উচ্চাকাশে পরস্পরের অতি-সন্নিহিত ও প্রায় একই রকম জীবনসত্যের দ্যোতক। কিন্তু যুগের মধ্যে আসল পার্থক্য উহাদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটিতে বিলাসকলা ও রুচি-পারিপাট্যের বিভিন্নতায়। এই ছোটখাট ব্যাপারেই একটা অপরিচয়ের ব্যবধান মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি

প্রাত্যহিক জীবনের এই ছন্দবৈষম্য অতিক্রম করিয়া অতীতের একটি জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল রূপ আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছে। কবিতার মধ্যে কোথায়ও সুর কাটে নাই, জীবনরসের স্বচ্ছন্দ উপভোগ তত্ত্বকথা বা আবেগের আতিশয্যে কোথায়ও খণ্ডিত হয় নাই। 'জন্মান্তর' কবিতায় বৃন্দাবন-লীলার রাখালদের আদর্শায়িত, আনন্দময় জীবন কবির মনে মোহাবেশ সৃষ্টি করিয়া উহাকে বর্তমানবিমুখ ও অতীতচারী করিয়াছে। কিন্তু এই আকৃতি বৈষ্ণব সাধনার একটি সুপরিচিত ও বহুচর্চিত অঙ্গ বলিয়া ইহার মধ্যে রসানুভূতি যেন কিছুটা অনুকরণাত্মক বোধ হয়।

এবার নিসর্গকবিতার নূতন সুরটি পরীক্ষা ও আস্বাদন করিয়া দেখা যাইতে পারে। 'কল্পনা'-র 'বর্ষশেষ' (৩০শে চৈত্র, ১৩০৫), 'বৈশাখ' (১৩০৬), 'বর্ষামঙ্গল' (১৭ই বৈশাখ, ১৩০৪), 'আষাঢ়' (২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭), 'মেঘমুক্ত' (২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭), 'শরৎ', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'রাত্রি' (১৩০৬) প্রভৃতি কবিতায় কবির এই নব কল্পনাসৃষ্টি উদাহৃত হইয়াছে। 'বর্ষশেষ' ও 'বৈশাখ'-এ কবি প্রকৃতির বহিঃরূপের মধ্যে একটি নিগূঢ় রূপকতাৎপর্য সঞ্চারিত করিয়া উহার মধ্যে বিশ্ববিধানের একটি অভিপ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কাজেই প্রকৃতি এখন একটি নূতন অর্থগৌরবে ও ভাবমহিমায় উদ্দীপ্ত ও উহার প্রাণধর্মের পিছনে এক বৃহত্তর আত্মিক শক্তি আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম আবিষ্কারের এক বিপুল আনন্দ ও উত্তেজনা, মননানুভূতির এক সুদূরপ্রসারী ভাববিবর্তন এই নিসর্গকবিতার উদাত্ত ছন্দগৌরব ও কল্পনা-সমুন্নতি-ও-বিস্তারের অনিবার্য প্রেরণা দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কবির নিজস্ব অনুভব ও পাশ্চাত্ত্য-প্রভাব উভয়েই একযোগে কার্যকরী হইয়াছে। তবে মনে হয় কবিতাগুলির ভাবপারম্পর্য ও ক্রান্তিবিন্দু-আরোহণ (climax) কোন কোন স্থানে যথাযথ হয় নাই ও কবি যেন ভাবের আবর্তনে কতকটা বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

'বর্ষশেষে'-এ কবি-কল্পনার বিপুল প্রাণোচ্ছলতা ও বিরাট ব্যাপ্তি ও বিস্তার, ছন্দসঙ্গীত ও শব্দৈশ্বর্যের উপর অসাধারণ অধিকার পাঠকের মনের গভীরে সংক্রামিত হইয়া তাহার বিচারবুদ্ধিকে কিছুটা অভিভূত করে। প্রথম স্তবকেই কবি যে 'পুরাতন ক্লান্ত বরষের সর্বশেষ গান গাহিবার' ইচ্ছা জানাইয়াছেন

তাহা কিন্তু পরবর্তী স্তবকগুলির দ্বারা সমর্থিত হয় না, ক্লান্তির কোন চিহ্নই উহাদের মধ্যে দেখা যায় না। দ্বিতীয় স্তবকে ঝড়ের আসন্ন আবির্ভাবের উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক অপূর্ব শক্তির সহিত দ্যোতিত হইয়াছে। তৃতীয় স্তবকে ঝড়ের উদ্দাম বেগের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া কাব্যের সুর ও হৃদয়ের আবেগকেও অনুরূপ উচ্চগ্রামে তুলিবার সঙ্কল্প ঘোষিত হইয়াছে ও উহার শেষ দিকে ও চতুর্থ স্তবকে ঝটিকার মাধ্যমে পুরাতনের জীর্ণ সঞ্চয়কে নিশ্চিহ্নভাবে উড়াইয়া দিবার উপযোগী আত্মিক শক্তির উদ্বোধনের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চরম পরিণতি যে নবজীবনের পবিত্র, নির্মল উপলব্ধি তাহা একটু আকস্মিকতার সহিতই ব্যক্ত হইয়াছে। এই পরিণতির পরে কিন্তু আবার মেঘ ও ঝড়ের আকাশব্যাপ্তির বর্ণনা ও উহাদের নিগূঢ় মানস কার্যকারিতার ইঙ্গিত পাই। এই ইঙ্গিত যে ঠিক কি তাহা প্রকৃতিও জানে না, কবিও ঠিক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পূর্ববর্তী স্তবকদ্বয়ের সুনিশ্চিত আশ্বাসের সহিত কবিতার পরবর্তী অংশের অনিশ্চিত অনুমানের ঠিক সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরবর্তী স্তবকগুলিতে নববর্ষের আহ্বানে কবিচিত্তে চিরাভ্যস্ত জীবনযাত্রা ত্যাগ করিয়া জীবনের অখণ্ড অনুভূতির দিকে দৃপ্ত অগ্রগতি ও মৃত্যুরহস্য-ভেদের জন্য জীবনবিসর্জনের সংকল্প বলাকার পূর্বাভাস ও কাব্যব্যঞ্জনায় অতুলনীয়। কিন্তু পূর্বের শান্তি ও সরলতাপূর্ণ শুভ্র মুক্ত জীবনাদর্শের সহিত ইহাদের ভাবসঙ্গতি অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া মনে হয় না। যে মেঘ ও ঝটিকাগর্জন বেদগাথা সামমন্ত্রের ন্যায় এক উদাত্ত গৌরবময়, আত্মিক শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবাণীর উদ্‌গাতা, তাহাকে শেষে এক দুর্গম অজ্ঞাত পথের দিশারী বলিয়া বর্ণনা করায় হয়ত কিছুটা অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। শেষ স্তবকে এক শান্ত নির্বেদের আদর্শকেই কবিতার ফলশ্রুতি-রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

কবিতার ভাববিন্যাসের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করিলে ধারণা জন্মে যে কবি কালবৈশাখীর তাণ্ডব শক্তি সমস্ত কল্পনা দিয়া গ্রহণ ও প্রকাশ করিয়াছেন ও উহার মানস প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার কোন সুদৃঢ় প্রত্যয় জাগে নাই। তিনি ঝটিকা ও বৃষ্টিকে মনের মধ্য দিয়া জড়জগতের সহিত সমান উদ্দাম শক্তিতে প্রবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু এই তুমুল বিপর্যয়ের শেষ পরিণতিটি তাঁহার অন্তরে সুনিশ্চিতভাবে প্রতিভাত হয় নাই। চিরাভ্যস্ত পুরাতনের বিলুপ্তি ও নব জীবন-বোধের আবাহন ইহাই সাধারণভাবে তাঁহার কাম্য। অন্তরে এই নবীনের প্রতিষ্ঠার

সঙ্গে কখনও জীবনের স্ববিরোধমুক্ত নির্মল তাৎপর্যবোধ, কখনও নিগূঢ় আত্মানুসন্ধান, কখনও দুঃসাহসিক পথ-পরিক্রমার আহ্বান, কখনও মৃত্যুর অব্যবহিত নৈকট্যের চোখধাঁধানো আলোকে জীবনের রহস্যভেদ ও পরিণতিতে এক শান্ত সমাপ্তির পরিতৃপ্ত পূর্ণতা—এইরূপ নানা ভাব দ্রুত আবর্তনে ও স্বতঃউদ্ভিন্ন, লক্ষ্যহীন আবেগসংঘাতে কবিচিত্তকে মথিত করিয়াছে। কবি এই ভাবপরম্পরার ক্রমপর্যায়কে কোন কেন্দ্র-পরিণতির দিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই, প্রত্যেকটির অভিঘাত স্বতন্ত্রভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা ঝটিকার প্রচণ্ড ও বহুমুখী বেগকে ঠিক ধারণ করিতে পারে নাই, বেগের প্রতিঘাতে অন্তরের অনুভূতিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। শেলীর Ode to the West Wind-এর সহিত তুলনায় এইখানেই রবীন্দ্রনাথের গঠন-শিথিলতা। ইহার কারণও দুর্লক্ষ্য নয়। শেলীর জীবনসাধনা দীর্ঘ অনুশীলনের পর এই ঝটিকা-বিপ্লবের মধ্যে মুক্তি পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এযাবৎকাল পর্যন্ত জীবনসাধনা বিচিত্রগামী, শেলীর মত একাগ্র হয় নাই। তিনি তাঁহার বহুমুখী অনুভূতিকে এই ঝড়ের আকাশে উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিবিড় সংযোগ সম্বন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ পরীক্ষা এখানে একটি মোড় ফিরিয়াছে, সাধনা-লব্ধ একক জীবনপ্রত্যয়ের অবিচল স্থিরতায় সংহত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ লীলাবাদী, ভগবানের রূপবৈচিত্র্য-আস্বাদনে তিনি বিচিত্র রস উপভোগ করেন। শেলী অদৃষ্টের শুভ পরিণতিতে আস্থাশীল আশাবাদী, ঝড়ের প্রমত্ত গর্জনে তিনি সেই দূরাগত আশার সুর শোনেন। একের পিছনে উপনিষদের বিচিত্র-গতি কিন্তু একের মহাসাগরে বিলীন আনন্দনির্ঝর, অপরের অভিজ্ঞতায় ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত, অর্ধসমাপ্ত মুক্তি-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি। কাজেই উভয়ের চিন্তাধারা ও কল্পনালীলার মধ্যে অনুরূপ পার্থক্য স্বাভাবিক।

'বৈশাখ' কবিতাটির মধ্যে ও 'বর্ষশেষ'-এর ন্যায় রূপকারোপ বা জীবনকল্পনা লক্ষিত হয়। ইহাতে গ্রীষ্মের অগ্নিক্ষরা তাপ কৃচ্ছ্রসাধনরত সন্ন্যাসীর তপশ্চর্যার মধ্যে মানবিক রূপ লইয়াছে। গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে দিগন্তে দৃষ্টিরোধী ঘূর্ণী রুদ্রের ছায়ামূর্তি প্রেতানুচরের কল্পনা-সাদৃশ্যকে উদ্রিক্ত করিয়াছে। এখানেও যেন কবির চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ ঠিক সুবিন্যস্ত হয় নাই। গ্রীষ্মের শান্তিমন্ত্রপাঠ ও করুণ ব্যঞ্জনা যেন যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হওয়ায় ভাবের ক্রমারোহণছন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। কেননা শান্তিমন্ত্র-পাঠের পরে আবার সুখ-দুঃখ-আশা নৈরাশ্যের চূর্ণীকরণ ও উহাদের সম্বন্ধে উদাসীনতার উদ্ভব যেন পৌর্বাপর্যের

ক্রম লঙ্ঘন করিয়াছে। বৈরাগ্যের পরেই শান্তি, পূর্বে নয়। কাজেই শান্তি ও চিত্তের করুণ দ্রবতার পর বৈরাগ্যের উল্লেখ ক্রমভঙ্গদোষে দুষ্ট। আর শেষ স্তবকে শান্তি ও বৈরাগ্য উভয়ের সহিত তুলনায় একটি নিম্নস্তরের ভাব—নির্বাক্ বিস্ময়-স্তব্ধতা—শেষ ফলশ্রুতিরূপে আমাদের প্রত্যাশাকে কিছুটা ব্যাহত করে। শান্তি ও করুণ রসের উদ্বোধনে যদি কবিতাটি শেষ হইত তবে প্রারম্ভের রৌদ্র রসের যে রূপান্তর কবির অনুভূতির দ্বারা সাধিত হইয়াছে তাহা কলাপরিণতির দিক দিয়া অধিকতর তৃপ্তিকর হইত।

ইহার পর 'বর্ষামঙ্গল', 'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা' এই তিনটি বর্ষাঋতুসম্বন্ধীয় কবিতা তুলনায় আলোচ্য। 'বর্ষামঙ্গল'-এ কবিকল্পনা বর্ষার রাজকীয় মর্যাদা, ভাবানুষঙ্গের নিবিড় আবেগময়তা ও প্রসাধনকলার প্রণয়াকৃতিস্পন্দিত ঐশ্বর্য অপূর্ব তন্ময়তার সহিত আমাদের অনুভবগম্য করিয়াছে। প্রথমত বর্ষার আবির্ভাব-সমারোহ অপরূপ ছন্দধ্বনি ও শব্দগাম্ভীর্যে নন্দিত হইয়াছে। এই বর্ষা কিন্তু বাংলার বর্ষা নয়; ইহার পটভূমিকায় কালিদাসযুগের অধীর প্রণয়ৌৎসুক্য, প্রেমোদ্দীপক অঙ্গরাগ ও অসংবৃত উল্লাসের ছন্দানুসারী চারুকলাচর্চার বর্ণময় উচ্ছ্বাস বিরাজিত। এই আভিজাত্যগৌরবমণ্ডিত ঋতু যেন প্রিয়মিলনাকাঙ্ক্ষিণী রমণীর হৃদয়ের সমস্ত সুকুমার অনুভূতি, সমস্ত সৌন্দর্যপ্রসাধনস্পৃহা, সমস্ত নৃত্যগীতপ্রেরণাকে এক ইন্দ্রজালশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া আপনাকে এক বর্ণাঢ্য রোমান্সজগতের রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। সব শেষে বর্ষার্দ্র পবনে আন্দোলিত বনবীথিকার শাখাপল্লবমর্মর যেন শত যুগের অসংখ্য কবির সম্মিলিত গীতধ্বনির ন্যায় চিত্তকে এক কল্পলোকের অনুভূতিতে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া তোলে। 'বর্ষামঙ্গল'-এ প্রেমের অমরাবতীবিহারিণী নারীর আসঙ্গলিপ্সার স্বপ্ন যেন একটি বস্তুময় চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে—বর্ষার আবির্ভাবে স্বর্গের দ্বার তাহার নিকট উন্মুক্ত হইয়া নন্দনকাননের পারিজাত-সুরভি যেন তাহার দেহমনকে আবিষ্ট করিয়াছে। কবিতাটিতে এই মোহাবেশেরই চঞ্চল রূপটি আশ্চর্য কুহকশক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'আষাঢ়'-এ কিন্তু বর্ষার একটি বিপরীতভাবাসঙ্গময় চিত্র পরিস্ফুট। ইহাতে বাঙলার কৃষকগৃহিণীর উদ্বেগ ও সতর্কবাণীই মুখরিত। সাংসারিক দায়িত্ববোধের অসংখ্য নির্দেশের সঙ্গে রূপমুগ্ধ মনের একটি চাপা আনন্দ ও উত্তেজনা সুর মিলাইয়াছে। বর্ষার আগমনে বাঙলার চাষীর কাজের চাপ আর সৌন্দর্যের হাতছানি এই দুই-এ মেশামেশি একটি যথার্থ মানস ছবি ত্রস্ত উৎকণ্ঠার ছন্দে

দ্রুত বর্ণসম্পাত ও রেখাবিন্যাসে উজ্জ্বল হইয়াছে। কৃষকগৃহকর্ত্রীর শুধু কবিত্ব করিবার সময় বা মানসিকতা নাই—গোরুকে ঘরে আনা, রাখালবালকের খোঁজ, কৃষিকার্যরত পুরুষদের মাঠ হইতে ফেরা, খেয়া-নৌকায় পারাপার বন্ধ হওয়া, ঘাটের পথ পিছল হওয়া প্রভৃতি সংসারের নানা ছোট-খাট-প্রয়োজনে তাহার মনোযোগ সীমিত ও বিভক্ত। কিন্তু এই সমস্ত খুঁটিনাটির মধ্য দিয়া অবিশ্রান্ত বর্ষণধারার মত এক সদা-সক্রিয় আগ্রহ ও মানস মুক্তির ধারা এই কবিতাটির মধ্যে প্রবাহিত।

'নববর্ষা' 'বর্ষামঙ্গল'-এর বাঙালী জীবনের ভাবপ্রতিবেশ-অনুযায়ী নব সংস্করণ। এখানে সংসার-জীবনের তুচ্ছ যবনিকা উত্তোলিত হইয়া এক বর্ণাঢ্য, ভাবসমারোহময় নাটকের অভিনয় হইয়াছে। বর্ষার উদ্বেল নদ-নদী-সরোবরের ন্যায় হৃদয়ের নদীও উদ্বেল হইয়াছে। আনন্দ ময়ূরের মত বিচিত্রবর্ণময় ভাবকলাপ বিস্তার করিয়াছে। যেখানে পূর্ব-কবিতাটির সহিত বস্তুসাদৃশ্য আছে, সেখানেও ব্যঞ্জনার পার্থক্যটি লক্ষণীয়।

'আষাঢ়'-এর বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউসের ক্ষেত জলে ভর ভর
'নববর্ষা'য় ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা

এই নূতন রূপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। প্রথমটির বস্তুবিবৃতি দ্বিতীয়টিতে এক দুরন্ত আবেগ-কম্পনের ছন্দে আন্দোলিত। বাদলধারার অবিচ্ছিন্ন পাত এখানে একটি আনন্দ-চঞ্চল গতিবেগে রূপান্তরিত; আউসের ক্ষেতের জলপূর্ণতার মধ্যে যে শস্যসম্ভাবনার ইঙ্গিত তাহা পরিবর্তিত হইয়া একটি চঞ্চল শিশুর অকারণ উল্লাসনৃত্যের ছবিতে পরিণত। ভাবাবহের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্কেতিকতারও নব রূপায়ণ।

এই কবিতাটিতে প্রাচীন যুগের অভিসার, বিরহিণীর অন্তর-উৎকণ্ঠার কাব্যময়, সমৃদ্ধিমান প্রকাশ অনুপস্থিত। তাহার পরিবর্তে পাই শাশ্বত হর্ষোদ্বেলতা ও কল্পনানুভূতির ছন্দোময় অভিব্যক্তি। বিকশিত কদম্ববনে প্রাণোচ্ছলতার বিস্তার, প্রাসাদশিখরে এলায়িতকেশা, নীলবসনা, বিদ্যুৎ-চঞ্চলা সুন্দরীর লীলাবিহার, নদীকূলে ভাবতন্ময়া তরুণীর আত্মবিস্মৃতি, বাদল হওয়ায় আন্দোলিত বকুলশাখা-পল্লবের রন্ধ্রপথে দোদুল্যমানা নারীমূর্তির আভাস, বিকচকেতকী তটভূমিতে নৌকা বাঁধিয়া শৈবালদলে কেলিমগ্না, সঙ্গীতমুগ্ধা রমণীর কল্পনা—এই চিত্তগুলি

ভাবোদ্বোধকরূপে বর্ষাঋতুকে প্রাণময় ও সঙ্কেতময়রূপে উপস্থাপিত করিয়াছে। ঝুলনচিত্রে দুইটি কবিতার পার্থক্য লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমটিতে উদ্দাম প্রণয়মত্ততা, মিলনাকৃতির উদগ্র প্রেরণা ; দ্বিতীয়টিতে শুধু বেগবান্ গতিচ্ছন্দের প্রেমনিরপেক্ষ আবেশ। প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতাটির মধ্যে অন্তিম ভাবপরিণতিতেও অনুরূপ পার্থক্য। প্রথমটিতে ঘাটের পথের পিচ্ছিলতা ও বেণুবনের সঘন আন্দোলন বর্ষা-ঋতুর দুর্গমতার নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। অপরটিতে উল্লাসের পূর্ণোচ্ছ্বাস বর্ষার মানস পবিক্রমার সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছে।

ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে
তীর ছাপি নদীকলকল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।

প্রথমটিতে দুর্যোগ-তাড়িত মানুষের নিরাপত্তার সন্ধান ; দ্বিতীয়টিতে যুক্তবর্ণের প্রাচুর্য ও পুনরাবৃত্তিতে নদীর তীর-ছাপানোর মত উল্লাসের সীমা-উত্তরণ।

'মেঘমুক্ত' কবিতাটিতে গার্হস্থ্য বিশ্রব্ধতায় সুরের পুনরাগমন। ইহাতে বর্ষার আনন্দের নিবিড়তা নাই, আছে দুর্যোগের পীড়াদায়ক বন্দিত্ব হইতে মুক্তির সহজ চলা-ফেরার পুনঃপ্রাপ্তির, মুখরতর স্বস্তিবোধ। বর্ষার অভিভব নাই, অথচ তাহার পূর্ণতার তৃপ্তি আছে। গতির উন্মত্ত বেগ, অশ্রান্ত আলোড়ন শেষ হইয়া তাহার স্থানে এক স্বপ্নময় বিরতি, এক নিশ্চল স্তব্ধতা বিরাজিত। 'যাস্ না ঘরের বাহিরে'-র বিপরীত সুর এখানে ধ্বনিত—নিষেধের পর আমন্ত্রণ। বর্ষণসিক্ত প্রকৃতি রৌদ্রতপ্ত হইয়া যে প্রশান্ত ভাবলোকের সৃষ্টি করিয়াছে, কবিতাটিতে তাহারই মর্ম উদ্‌ঘাটিত। পুরাতন কথাকে নূতন ভাবে বলিবার, পুরাতন অনুভূতিকে নব উপলব্ধি করিবার যে পটভূমিকা রচিত হইয়াছে, কবিতাটি তাহারই বাণীরূপ।

'শরৎ' কবিতার ঋতুর শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের সহিত জননী জন্মভূমির অন্নপূর্ণা কল্যাণী মূর্তির একটি সার্থক সমন্বয় ঘটিয়াছে। প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিপূর্ণতা যেন মানবের অভাবমোচনকারিণী, সন্তানবৎসলা মাতৃরূপে আরও প্রসন্ন নির্মল শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে একটি ঐক্যবিধায়ক যোগসূত্র রচিত হইয়াছে। রূপমুগ্ধতার সহিত ভক্তির আবেগ মিশিয়া, প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সহিত দেশপ্রেমের একটি অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়া একটি যুগ্মসত্তার সৌন্দর্যপ্রতিমা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে মানুষ ও প্রকৃতি কেহ কাহাকেও আড়াল না

করিয়া পরস্পরের আকর্ষণ-বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে, পরস্পরের জ্যোতিরশ্মি মিশাইয়াছে। এই সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যরক্ষাই কবিতার উৎকর্ষের প্রধান হেতু। অবশ্য এখানে কীট্‌সের স্বপ্নালু নৈর্ব্যক্তিকতা নাই, আছে সুপরিকল্পিত, কলাসম্মত মানবীয় সত্তার আরোপ। 'রাত্রি' কবিতাটিতে গম্ভীর, অধ্যাত্মরহস্যভেদী দার্শনিক মননের প্রাধান্য। রাত্রির বহিরঙ্গের রূপ এই মননশক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে। রাত্রিকে বিশ্বের ক্ষয়ক্ষীণ ভাণ্ডার-পূর্ণকারিণী, জীবনের পরমতত্ত্ব-উদ্ভাসিনী, মৌন ধ্যানের সিংহাসনাসীনা রাজ্ঞীর রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে প্রকৃতি অপ্রাকৃত দিব্যলোকে উন্নীত হইয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যে ক্লাসিক্যাল ভাবগাম্ভীর্য ও রোমান্টিক কল্পনার অভিনব বিস্ময় কিরূপ আশ্চর্যভাবে যুক্ত হইয়াছে 'রাত্রি' কবিতাটি তাহারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'বসন্ত' কবিতায় ঋতুবর্ণনা নয়, ঋতুর দেবত্ব-পরিকল্পনা, মানবমনের উপর উহার বর্ষে বর্ষে নবীভূত প্রভাব ও উহার প্রাচীন যুগের আনন্দস্মৃতির উদ্বোধক, ঘন ভাবানুষঙ্গ, শত-শতাব্দীর যৌবনের আনন্দ-বেদনার হিল্লোলিত প্রকাশ ছন্দে, ভাষায় ও মননে অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। শেষে এই বসন্ত যে কবির ব্যক্তিগত যৌবনাবেশের স্মৃতি-সুরভিত সত্তা লাভ করিয়াছে তাহারই আবেগময় ও ভাবগূঢ় উল্লেখে কবিতাটির পরিসমাপ্তি।

অমর বেদনা মোর হে বসন্ত রহি গেল তব
মর্মর নিশ্বাসে—
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

বহিঃপ্রকৃতি মহাকবির কল্পনায় কেমন করিয়া প্রথমে সার্বভৌম মানবিক তাৎপর্য-মণ্ডিত ও পরে কবির নিজস্ব অনুভূতিরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিতে পারে কবিতাটি তাহারই নিদর্শন।

'চৈত্ররজনী'তেও প্রকৃতির নির্লিপ্ততায় মানবজীবনের আবেগ-কৌতূহলের অনুপ্রবেশ ও যেখানে উহার অভাব সেখানে নিঃসঙ্গতার বিষাদের দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভিভব স্বল্পকথায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

'কল্পনা'র প্রেমকবিতাগুলির মধ্যে একটু লঘু কৌতুকের সুর 'ক্ষণিকা'র নিরাসক্ত মেজাজের পূর্বাভাস বহন করে। কোথায়ও বা রূপকের ইঙ্গিত বা রূপকথার ঘটনাংশের অনুবর্তন গভীরতর অনুভূতির আবরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রেমের বহু বিচ্ছিন্ন, ক্ষণিক অনুভব গানের মধ্যে অলস-শিথিল চরণক্ষেপ করায় 'কল্পনা'য় প্রেমকবিতার বৈশিষ্ট্য অনেকটা অনিশ্চিতই রহিয়া গিয়াছে। 'প্রকাশ' কবিতাটি এই মন্তব্যের একটি ব্যতিক্রম। এখানে প্রণয়াকর্ষণের নিখিলবিশ্বসংবৃত গূঢ় তত্ত্বটি অপরূপ, পরিহাস-মধুর কল্পনালীলার সাহায্যে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সংস্কৃত অলঙ্কারের বহু-ব্যবহারজীর্ণ উদাহরণগুলি কবির সরস অনুভব ও সাবলীল প্রকাশের বৃত্তে বিধৃত হইয়া যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে, প্রথাসিদ্ধ প্রয়োগ-সমূহের জন্মমুহূর্তটিতে নবীনতার আস্বাদ যেন আমরা ফিরিয়া পাই। কবি নিজের মনের কথাটি গোপন করিয়াই প্রকৃতির রহস্য-অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছিল। যখন হইতে তাহার গূঢ় অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন হইতে প্রকৃতি নিজ হৃদয়ের উপর ঘনতর যবনিকার আবরণ টানিয়া দিল। শেলীর 'Love's Philosophy' নামে ক্ষুদ্র গীতিকবিতায় মানবের প্রেমাকৃতি বহিঃপ্রকৃতির আচরণের দৃষ্টান্তে সমর্থন প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে কবির এই লাজুক-মুখচোরা সম্বন্ধটির কোন ইঙ্গিত নাই। বরং গ্রে, ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ও হার্ডির কোন কোন কবিতায় কবির এই উদাসীন, আত্মভোলা মনের পিছনে যে রহস্যভেদী দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন থাকে তাহার উপলব্ধি দেখা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কল্পনার যে ঔদার্য ও প্রসার লক্ষিত হয় অন্য কোন কবির রচনায় তাহা দুর্লভ।

স্পর্ধা (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩) এ 'প্রণয়-প্রশ্ন'-এ প্রেমের ছলনাময় ছদ্মগৌরবের আবরণে উহার আসল মহিমা তির্যক ভাবে প্রকাশিত। 'পসারিণী'-তে প্রেম বা কাব্যসাধনা কোন্‌টির রূপক কবির মনোগত অভিপ্রায়কে অর্ধাবৃত করিয়াছে তাহা অনিশ্চিত। 'পসারিণী' এই অভিধা কবির কাব্যভাণ্ডারকেই সূচিত করে মনে হয়। বিশেষতঃ পসারিণীর উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে স্নিগ্ধশীতল বিশ্রাম ও আরামশয্যা-বিস্তারের জন্য কবির যে শুশ্রূষার আয়োজন, ও বিদেশের রাজপুরে রতনের হাটে পণ্যদ্রব্য না লইয়া যাইবার জন্য কবির যে অনুরোধ তাহাতে মনে হয় যে সমস্ত রূপকটি কাব্যচর্চাসম্বন্ধীয়। মনে হয় যে এই সমস্ত বর্ণনা ও নির্দেশের লক্ষ্য 'খেয়া'-

জাতীয় কবিতার কাব্যাদর্শের প্রতি প্রশস্তি-জ্ঞাপন। পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শ-প্রভাবিত, অপ্রাপণীয়ের প্রতি ব্যর্থ আকৃতিতে অশান্ত, হতাশক্ষুব্ধ চিত্তের উত্তাপ-ক্লিষ্ট কবিতার পরিবর্তে ভগবৎ-সান্নিধ্যের স্নিগ্ধ শান্তি, বহুবিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত মনের অবিচল একনিষ্ঠতা, সম্পূর্ণরূপে অধিগত না হইয়াও, কাব্যসাধনার উপায়রূপে কবির নিকট বিশেষভাবে কাম্য বলিয়া মনে হইতেছে।

'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতাটি একদিকে 'মানসী'র-'সোনার তরী'-পর্ব, অন্যদিকে 'খেয়া'-'নৈবেদ্য'-'গীতাঞ্জলি'-পর্বের মধ্যে একটি সেতু রচনা করিয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু এখনও অবিমিশ্র প্রেম; কিন্তু ইহা যে অদূর ভবিষ্যতে দিব্য প্রেমের পটভূমিকা রচনা করিবে তাহারও ইঙ্গিত আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়।

'ঝড়ের দিনে' কবিতায় 'পসারিণী'-র মত কাব্য-অভিপ্রায় সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। কবিতাটির গোড়ার দিকে বর্ষা ও ঝড়ের দিনে অভিসারের অসমসাহসিকতা ও অনৌচিত্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে কবিকে সঙ্গে লইলেই সমস্ত অবিবেকের ফল নিরাকৃত হইত এইরূপ দাবী শোনা যায়। শেষের তিন স্তবকে কবি ও অভিসারিকার যুগ্মযাত্রা যে দুই দুঃসাহসিক প্রাণের মিলিত হৃৎস্পন্দনে এক মত্ত, ভয়ংকর ছন্দে অনুরণিত হইয়া উঠিত, এক প্রলয়ের সার্বিক বিপর্যয়ের সঙ্কেতবাহী হইত তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। মনে হয় এই অতর্কিত ভাবান্তরে কবিতাটির ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অন্ততঃ প্রেম-কবিতার অভ্যস্ত ছন্দ ও ভাববৃত্তে ইহার মধ্যে একটি গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেবল এই অভিসারের পট-ভূমিকা রচনা না করিয়া উহার অন্তঃপ্রকৃতির মর্মানুপ্রবেশ করিয়াছে। অথচ এই পরিণতির জন্য কবি পাঠকমনকে পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করেন নাই।

'কল্পনা'য় 'দুঃসময়' (১৫ই বৈশাখ, ১৩০৪) ও 'অসময়' (১৩০৬) এই দুইটি কবিতা পরস্পরের পরিপূরকরূপে কল্পিত হইয়া কবির কাব্যপ্রেরণার এক নূতন উৎসের সন্ধান দিয়াছে। এই কবিতাদ্বয় কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ অপেক্ষা দুইটি কল্পিত মানস পরিস্থিতির সচেতন পরিবেশরচনার প্রয়াস বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পনা ও মনোভাব-উপযোগী চিত্রকল্পবিন্যাস লক্ষিত হয়। এগুলিতে যেন অনিবার্য স্বতঃস্ফূর্তি অপেক্ষা মণ্ডন-

কলার প্রয়োগপ্রবণতা অধিকতর পরিস্ফুট। দুইটি কবিতারই দ্বিতীয় স্তবকে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কারের অবতারণা—অলঙ্করণ-রীতি-প্রভাবিত বলিয়া ধারণা জন্মে। বিভ্রান্তির প্রকৃতি, এককে অপর বলিয়া ভ্রম করার হেতুও ঠিক স্বাভাবিক না হইয়া স্বেচ্ছাকৃত মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ যেন এখানে তাঁহার অন্তরানুভূতিকে কতকটা ছন্দমোহের অধীন করিয়াছেন—সুইনবার্নের মত ধ্বনিঝঙ্কারময় শব্দ-গ্রন্থনপ্রবণতা তাঁহার কবিকল্পনাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তথাপি ভাব-সঙ্গতির দিক দিয়া 'দুঃসময়' কবিতাটি অপেক্ষাকৃত অধিক দৃঢ়বদ্ধ ও হতাশার অবসাদে আত্মসমর্পণ না করার দৃঢ়সংকল্পদ্যোতক একটি মানবিক ভাবের সার্থক প্রকাশ। ইহার সহিত তুলনায় 'অসময়' কবিতাটির ভাব যেন অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত। যাত্রাশেষের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া সিদ্ধিসম্বন্ধে অনিশ্চয়, অতীত-অবহেলা ও কালক্ষেপের জন্য অনুতাপ, সফল সহযাত্রীদের আনন্দ-কল্পনা ও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধিলাভসম্বন্ধে নিশ্চিত প্রত্যয় প্রভৃতি নানা ভাব ব্যর্থ পথিকের মনে ভিড় জমাইয়াছে, ও কবিতার ভাবকেন্দ্রকে বহুধা-বিভক্ত করিয়াছে। দুইটি কবিতার দুইপ্রকার ধুয়াই উহাদের কেন্দ্রগত ভাবোদ্দীপনের বিভিন্নতা দ্যোতিত করিয়াছে। একটিতে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের অবিরত পক্ষসঞ্চালন, আর একটিতে বিভ্রান্তিবশে বৃথা কালহরণের জন্য সান্ত্বনাহীন ক্ষোভ কবিতা দুইটির মূল সুর রূপে ধ্বনিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কবিতায় বসন্তোৎফুল্ল নর-নারীর উৎসব-বিভোরতা ও উদ্দীপনামুখর শোভাযাত্রার বর্ণনা কবিতার মূলসুরের পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে মনে হয়।

'কল্পনা'-য় 'অশেষ' ও 'ক্ষণিকা'-য় 'আবির্ভাব' (১০ই আষাঢ়, ১৩০৭), 'অন্তরতম' (৩রা আষাঢ়, '৩০৭) ও 'সমাপ্তি'—এই কবিতা কয়টিতে অন্তর্যামী-জীবনদেবতা-কল্পনার নবরূপে পুনরাবির্ভাব সূচিত হইয়াছে। কবি তাঁহার অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীর সহিত রহস্যময় একাত্মতার যুগ অনেকদিন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কাব্যপ্রেরণা এখন আদিম উৎসের আঁধার গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আত্মনির্ভরতার আবেগে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সম্মুখের দিকে চলিয়াছে। এখন আর নিজের কাব্যশক্তির স্বরূপবিশ্লেষণে পিছনদিকে তাকাইবার তাগিদ নাই—অন্তরের অদৃশ্যদেবতা এখন বিশ্বদেবতা-রূপে কবির অন্তর-বাহিরকে পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য অনুকূল লগ্নের প্রতীক্ষায় আত্মসংহরণ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব অনুভূতির ক্ষীণ রেশ এখনও রহিয়া রহিয়া কবির কাব্যাকাশে নিঃশ্বসিত হইয়া উঠে। একটা অজ্ঞাত শক্তির অনিবার্য

আহ্বান এখনও কবির বিশ্রাম-বাসনা ও বিরতি-সঙ্কল্পকে বিচলিত করে। 'আহ্বান'-এ সেই মর্মমূলনিবাসিনী দেবীর অবশ্য-প্রতিপাল্য নির্দেশ সমস্ত বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করিয়া অবসরস্বপ্নবিভোর কবির কর্ণে পৌছিয়াছে। কবি 'বলাকা'র মত এখানেও 'আরাম' চাহিয়া 'গুহা' পাইয়াছেন। কিন্তু 'বলাকা'-র কবিতার সহিত তুলনায় এই কবিতায় কল্পনার গাম্ভীর্য ও অনুভূতির নিবিড়তা অনেক উন্নততর। এই আকস্মিক সুর-গভীরতা, কবির অনিচ্ছুক, আরামপিয়াসী চিত্তের উপর এই আহ্বানের সম্মোহন প্রভাব, কবির উদাত্ত প্রতিশ্রুতি ও বিজয়ের নিশ্চিত আশা—সবই এই মহিমময়ীর পূর্বতন আকর্ষণশক্তির অমোঘতারই নিদর্শন। কবির মগ্নচৈতন্যলীনা এই লীলাময়ী এক অনভ্যস্ত পরিবেশে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার চিত্তে অতীতের ইন্দ্রজালের পুনরুদ্বোধন করিয়াছেন।

'আবির্ভাব' কবিতায় পুরাতন জীবনদেবতার নূতন পটভূমিকায় আবাহন হইয়াছে, বসন্তের দেবতা বর্ষার দিগন্তব্যাপ্ত মেঘমহিমায়, ভাবগম্ভীর মানস অনুভূতির বিদ্যুৎচকিত ছন্দে কবির নিকট পুনরাবির্ভূত হইয়াছেন। 'মানসী'-'সোনার তরী'-'চিত্রা'-পর্বে যে লীলাকৌতুকময়ী মুহুর্মুহু আবির্ভাব-তিরোধানের দ্বারা কবিকে উদ্‌ভ্রান্ত-ব্যাকুল করিয়াছেন তিনি প্রণয়রহস্যের প্রতীক ও তাঁহার লীলাক্ষেত্র কবির নববিকশিত ভাবকল্পনার পুষ্পগন্ধভরা বসন্ত-উপবন। কবি এই রহস্যময়ীকে প্রিয়ারূপে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরিতে চাহিয়াছেন ও তাঁহার মনোভূমির বসন্তবিহ্বলতার মধ্যেই তাঁহার সহিত বিহার করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। কাব্যপ্রেরণার সমস্ত অনিশ্চয়-সংশয়, সমস্ত দুর্বোধ্য-জটিল পরিবর্তনছন্দ, জানা-না-জানায় মিশ্রিত সমস্ত মধুর উদ্‌ভ্রান্তি তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের রহস্যদ্যোতনা করিয়াছে। এবার জীবনদেবতা ব্যক্তি-হৃদয়ের আলো-আঁধারি বিজনতা হইতে বিশ্বদেবতা ও ধর্মানুভূতিপ্রধান ঈশ্বরের সার্বভৌম মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছেন। তাঁহার লীলা একের অনুভূতি-রহস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র বিশ্বের বিরাট পটভূমিকায় ও ভক্ত ও ভগবানের সুনির্দিষ্ট, সর্বজনবোধ্য সম্পর্কের মধ্যে অভিব্যঞ্জনা খুঁজিতেছে। বসন্তের ভাবোন্মাদনা ও রসোচ্ছলতা বস্তুজগৎ অপেক্ষা মনোজগৎ হইতে বেশী পরিমাণে আহৃত। বর্ষা যদি প্রণয়ের ভাবাসঙ্গ হইতে বিবিক্ত হইয়া নিজ বস্তুস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ইহা সার্বভৌম, ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবের উদ্বোধনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। সেইজন্যই বসন্তলক্ষ্মীকে বর্ষায় আবাহন

কবিমনের প্রেম হইতে বিরাটত্বে অভিভূত ভক্তিতে, লঘুচঞ্চল প্রণয়োচ্ছ্বাস হইতে প্রশান্ত-গম্ভীর মহিমা-উপলব্ধিতে রূপান্তরের ইঙ্গিতবাহী। বর্ষা-প্রকৃতির সমস্ত-আকাশ-ছাওয়া শ্যাম সমারোহে যে দেবীর আবির্ভাব তিনি এখনও রমণী-মাধুর্যের নির্মোক্ ত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষ বিশ্ববিধাতার মূর্তি গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু ইনি কবিহৃদয়কে চকিত করেন না, আচ্ছন্ন-অভিভূত করেন।

'অন্তরতম' কবিতায় 'অন্তর্যামী'র অন্তরতম শব্দটি সম্বোধনরূপে নয়, অভিধা-রূপে, নামকরণের পরোক্ষ প্রয়োজনে, ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিতাটিতে কিন্তু অন্তরতমের আবেগবিহ্বল অন্তরঙ্গতার সুরটি নাই; তৎপরিবর্তে আছে একটি সুদূর সম্ভ্রমবোধ ও আত্মগোপনপ্রয়াস। প্রিয়কে দেবতা ও দেবতাকে প্রিয় করার কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের পূর্বে শোনাইয়াছেন। এখানে কবি যে আরাধ্য দেবতার স্নেহধন্য হইয়াছেন এই তথ্যটি তিনি কাব্যের সমস্ত ছলনাকৌশল ও অনামিকতা দিয়া ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন সহৃদয় নর্মসখা পর্যন্ত তাঁহার এই গোপন অভিসারের কাহিনী জানেন না। কবির মুখর বীণা পর্যন্ত এই বিরল সৌভাগ্য সম্বন্ধে নীরব। বহু নামের অন্তরালে কবির উদ্দিষ্ট একটি নাম আবৃত। প্রকৃতি, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, সংসারের প্রিয় পরিজন প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বজগৎ কবির এই জগৎস্বামীর প্রতি গোপন-নিবেদিত গানের সুরে সাড়া দিয়া তাঁহার নিকট প্রিয়তর হইয়া উঠে ও ভগবানের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতার পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে। ভগবানের বিরাট প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে প্রজ্বলিত দীপমালা হইতে কবি নিজ কাব্যদীপ জ্বালাইয়া লইয়া তাহাতে তাঁহার কাব্যভুবন আলোকিত করেন, কিন্তু এই আলোকের উৎস তিনি সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখেন। পার্থিব সুখদুঃখের অন্তরালে, সংসারজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছলনায়, তিনি আদর্শকল্পনাতে এক ভগবানের রূপই ধ্যান করেন। এই কবিতাটিতে কবির অন্তর্জগতের পট-পরিবর্তন ও এই অন্তর্জগতের নিয়ামক-শক্তির রূপান্তর-প্রক্রিয়াটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। মনে হয় 'খেয়া'র অনেকগুলি গূঢ় রূপকার্থসংবলিত কবিতা এই আঁচল ঢাকা দীপজ্যোতির কনক-রেখা বিকীর্ণ করিয়াছে।

'সমাপ্তি'তে এই সুদীর্ঘ পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে। দীর্ঘ পথপরিক্রমা এক লক্ষ্যে পৌঁছিয়া শেষ হইয়াছে। অনুভূতির বৈচিত্র্য সমুদ্রগামী নদীসমূহের ন্যায় এক চরম সার্থকতার মোহনায় নিজ নিজ স্বতন্ত্রধারা

মিশাইয়াছে। কবির এক প্রশ্ন যে পরমতীর্থে উপনীত তাঁহার কাব্যসত্তায় পথিকজীবনের ক্লান্তি ও নানামুখী অভিজ্ঞতার দুঃখদীর্ণ রেখাজাল কি কোন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে? দিন শেষে সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয় কবি ও তাঁহার আরাধ্য বিশ্বদেবতার বিশ্রব্ধ-নির্জন মিলন ঘটিয়াছে। এই মিলন-যবনিকার অন্তরালে চিরপথিক কবির ক্ষণিক যাত্রাবিরতি ও নবকাব্যজীবনের জন্য প্রস্তুতি।

৬

'ক্ষণিকা'-কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের একটি সম্পূর্ণ নূতন চিত্র উদ্‌ঘাটিত করে। কবি যেন তাঁহার পূর্বতন কাব্যজীবনের সমস্ত দুরূহ আদর্শ-সাধনা ও ঘন-আবেশময় ভাবানুশীলন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইয়া একটা লঘু, নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যে যে সমস্ত মানস-অভ্যাস এতদিন ধরিয়া বদ্ধমূল হইয়াছিল—তাঁহার নিষ্ঠাবান প্রেম, তাঁহার আদর্শসন্ধানে আত্মনিবেদন, তাঁহার ভাবাবেগের অশান্ত বিক্ষোভ, তাঁহার গভীরাশ্রয়ী অনুভূতি, —সবই যেন হঠাৎ শিথিল হইয়া এক মুহূর্তেই তাঁহার মনকে বন্ধনমুক্ত ও স্বচ্ছন্দচারী করিয়া দিয়াছে। যাহা তিনি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া চাহিয়াছিলেন, সমস্ত আত্মা দিয়া নিবিড়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন, যাহা হইতে বিন্দুমাত্র চ্যুতি তাঁহার সমস্ত অন্তরকে বেদনাদীর্ণ করিয়াছিল তাহা হঠাৎ তাঁহার নিকট মূল্যহীন হইয়া পড়িল। তিনি স্বর্ণমুষ্টিকে যেন ধূলিমুষ্টির ন্যায় অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিলেন। অথচ এই যে নিজ স্বভাবের বিপরীত বিন্দুতে আশ্রয়গ্রহণ ইহার মধ্যে আস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। কবি এমন সরস কৌতুকময়তায় সহিত, এমন সাবলীল ভঙ্গীতে, উক্তি ও মন্তব্যের এমন যথাযথ বিন্যাসে তাঁহার এই লঘু, সঞ্চরণশীল, মোহমুক্ত মনের স্বেচ্ছাবিহারকে কাব্যরূপ দিয়াছেন যে মনে হইবে এইরূপ রচনাই যেন কবির চিরাভ্যস্ত রীতি। যে কবি অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ভাবসঞ্চয়কে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গাঁথিয়া একটি শাশ্বত জীবনসত্যের মহিমায় সংহত করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিই অকস্মাৎ একটি বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের ক্ষণিক আনন্দকেই প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতেছেন। যিনি কবিতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষণের প্রকাশ ভাবিতেন, তিনি এখন উহাকে বন্ধুহীন জীবনের শূন্যতা-পূরণের উপায়মাত্র ভাবিতেছেন। কঠোর সংযম যাহার অব্যভিচারী জীবনাদর্শ ছিল, তিনি এখন "মাতাল হয়ে পাতাল পানে

খাওয়া''কে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। প্রেমে একনিষ্ঠতা ও আদর্শবাদের যিনি বরাবর প্রশস্তি গাহিয়া আসিয়াছেন তিনিই আজ প্রেমের ক্ষণভঙ্গুরতাকেই স্বভাবের নিয়ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন ও নিষ্ঠাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেও কুণ্ঠিত নন। মনে হয় যেন প্রৌঢ় কবি তাঁহার যৌবনারম্ভের 'মায়ার খেলা'র প্রণয়ের স্বভাবচঞ্চলতা, উহার মনদেওয়া-নেওয়ার অহেতুক খেয়ালখুশির ধারণায় ফিরিয়া গিয়াছেন। তবে কবির রচনার মধ্যে তারুণ্যের তরল ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্তেবিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত জীবনসমীক্ষার পরিচয় মিলে।

প্রণয়িনীর প্রতি একনিষ্ঠতার আশ্বাস কবি একেবারেই দেন নাই ; প্রণয়িনীর সঙ্গে যদি তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে তবুও তিনি যে সান্ত্বনাহীন হইয়া পড়িবেন তাহাও স্বীকার করেন নাই। এই অভিনব প্রণয়দর্শন 'সোজাসুজি' কবিতাটিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে কবি প্রণয়ের রহস্যগভীরতার মধ্যে বারে বারে দিশা-হারা হইয়াছেন, অসীমের ব্যঞ্জনায় যে প্রেম তাঁহার নিকট দুরধিগম্য ছিল তাহা এখন অতি সরল ও সহজবোধ্য আকর্ষণে রূপান্তরিত হইয়াছে। 'যাত্রী' কবিতাটিতে 'সোনার তরী' কবিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থটিই প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে খেয়াতরীতে যাত্রিনী ও তাহার এক আঁটি ধান উভয়েরই স্থান আছে। 'সোনার তরী'তে কবির ফসল গেল, কিন্তু কবি নিজে নদীতীরে পরিত্যক্ত হইলেন। তরীর যে কাণ্ডারী সে চেনা হইয়াও অচেনা, তাহার সিদ্ধান্ত নির্মম ও অপরিবর্তনীয়। 'সোনার তরী'কে ঘিরিয়া সমাধানহীন প্রশ্নপরম্পরার ঘূর্ণাবর্ত রচিত হইয়াছে। 'যাত্রী'তে মাঝির জিজ্ঞাসায় ক্ষীণ কৌতূহলের আভাস-মাত্র আছে—উত্তরের জন্য কোন নির্বন্ধাতিশয্য নাই। 'সোনার তরী'র ক্ষুরধার নদী শুধু স্রোতে নহে, অসমাহিত সঙ্কেততীক্ষ্ণতায়ও 'খরপরশা'। উহার চারিদিকে একটি রহস্যময়, থমথমে আবহাওয়া মেঘান্ধকার প্রভাতের মতই এক অজ্ঞাত সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত। এখানে বিষয়বস্তু অনেকটা এক হইলেও বাতাবরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রহস্য সম্পূর্ণ উবিয়া গিয়াছে, ঘন সাঙ্কেতিকতা ক্ষীণ আগ্রহের রেশে পর্যবসিত, নিয়তির অমোঘতা সাধারণ সৌজন্যপ্রশ্নের নীরব প্রত্যাখ্যানে নিরস্ত।

তেমনি 'শেষ' কবিতাটিতে 'সোনার তরী'র 'যেতে নাহি দিব' কবিতার ঠিক বিপরীত মেজাজ ও সিদ্ধান্ত উদাহৃত হইয়াছে। মানবের সুকোমল হৃদয়বৃত্তি এখানে করুণ অসহায়তা অথচ অটুট সঙ্কল্পের সহিত মৃত্যুর অনিবার্যতাকে

অস্বীকার করিয়াছে। সমস্ত রৌদ্রস্নাত হেমন্ত আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে শায়িত সমস্ত বিশ্ব এই করুণ সুরের রেশে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সহিত তুলনায় 'শেষ' কবিতাটিতে জীবনের নশ্বরতা ও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা কবিচিত্তকে এক মোহমুক্ত, বে-পরোয়া আনন্দে পূর্ণ করিয়াছে ও প্রতি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের রসাস্বাদনে আরও উৎসুক করিয়াছে। পূর্বে যে চিন্তা কবিকে এক গভীর বিষাদময় বিশ্ববিধানের সন্ধান দিয়াছিল, তাহা এখন তাঁহার সহজ আনন্দময় ও প্রসন্ন, অনুযোগহীন স্বীকৃতির দ্বারা অভিনন্দিত। যে মৃত্যুর আহ্বান প্রত্যেকটি জীবনতরঙ্গকে এক প্রতিকারহীন সর্ববিলুপ্তির অভিমুখে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহা এখন একটা লুকোচুরি খেলার আনন্দ-কৌতুকে রূপান্তরিত হইয়াছে। এইরূপে দেখি অতীতকালের উপলব্ধিগুলি এক নূতন লঘুসঞ্চারী ও নিরুদ্বেগ ভাবছন্দে এক অভিনব জীবনবোধের বাহন হইয়া পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

কবির মনোভঙ্গীর এই আশ্চর্য পরিবর্তন কোন্ কাব্যপ্রয়োজনসিদ্ধির সহায়তা করিয়াছে তাহা এবার অনুধাবন করা যাইতে পারে। যেমন বেগবান নদীস্রোত নিজ অগ্রগতির পথে পূর্বরচিত আবর্তচক্রসমূহকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ধাবমান হয়, তেমনি বিচিত্র বিবর্তনের পথে অগ্রসরণশীল কবিপ্রতিভাও পুরাতন ভাববৃত্ত ও গভীররেখাঙ্কিত আবেগচিহ্নকে মুছিয়া ফেলিয়া নূতন প্রেরণার প্রতিষ্ঠাভূমি রচনা করে। যৌবনের শেষ প্রান্তে উপনীত কবি তাঁহার চিরাভ্যস্ত কাব্যপ্রত্যয়গুলিকে অনেক পরিমাণে অস্বীকার করিয়া প্রৌঢ়জীবনভূমিকায় প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। জীবন হইতে দীর্ঘলালিত আসক্তির ঘন প্রলেপ অপসারিত করিয়া, কবি-কল্পনার বহু-অনুশীলিত ভাব-ভঙ্গী বদলাইয়া কবি নূতন বেণী-বেদী-রচনার উদ্দেশ্যে নিজ মানস মুক্তি খুঁজিয়াছেন। হাসির দম্‌কা হওয়া আবেগ-গাম্ভীর্যকে উড়াইয়া দিয়া, অতীতের ভাবাদর্শকে না-মঞ্জুর করিয়া, কবি-কল্পনার সুপ্রতিষ্ঠিত কাঠামোটিকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করিয়া, রবীন্দ্রনাথ 'নৈবেদ্য'-'খেয়া' ও তাহার পর 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র সম্পূর্ণ নূতন জগতে প্রবেশের সোপান নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তা-মনন-অনুভূতিকে ভগবৎ-কেন্দ্রিক করার দুঃসাধ্য-প্রয়াসে অতীতের সহিত যে সম্পর্কচ্ছেদ, পুরাতনের ভাবসম্মোহের প্রভাব হইতে যে সর্বাত্মক মানস মুক্তির প্রয়োজন ছিল তাহাই তির্যকভাবে 'ক্ষণিকা'র মধ্য দিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। প্রেমকল্পনার অসীমতাবোধ হইতে ধর্মসাধনার অসীমতাবোধে উত্তরণের জন্য

প্রেমমন্দিরে যে আরতিদীপ জ্বালা হইয়াছিল তাহাকে খেয়ালী বাতাসে নিবু-নিবু করিয়া দিয়াই পূজামন্দিরে নূতন দীপ জ্বালার ব্যবস্থা সম্ভব। 'ক্ষণিকা'তে ভগবদভিমুখী বাতায়নটি খুলিবার জন্যই প্রণয়দেবতার আবির্ভাব-পথের বাতায়নটি আপাততঃ রুদ্ধ করিবার আবশ্যক ছিল।

৭

'ক্ষণিকা'র সমস্ত কবিতাই হাল্‌কা সুরে লেখা নয়। উহার ঋতুবর্ণনাবিষয়ক কয়েকটি গভীর রসের কবিতার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তা ছাড়া ছোট বিষয়ে লেখা অনেকগুলি কবিতায় কল্পনার গভীরতা না থাকুক স্বল্পতম মিতপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'নষ্ট স্বপ্ন'-এ কবিমনের ঈষৎ ব্যাকুলতা প্রকাশিত; 'কূলে', 'দুই তীরে' নদীতীরের স্বল্পতথ্যসংবলিত, অথচ ব্যঞ্জনাময় বর্ণনার মধ্যে কবিমনের নির্লিপ্ততা অথবা মৃদু আগ্রহের আকর্ষণ একটি নূতন অনুভূতি সঞ্চার করিয়াছে। 'সুখদুঃখ' ও 'খেলা'-তে শিশুমনের সুখদুঃখের মাত্রাধিক্য ও কবির বাল্যজীবনের ক্রীড়াসক্তি ও উহারই আত্মকেন্দ্রিক মানদণ্ডে বিশ্ববিধানের শুভাশুভনির্ণয় বর্ণরিক্ত বর্ণনায় একটু বিস্ময়ের রং মাখাইয়াছে।

কয়েকটি রূপকধর্মী কবিতায় কবির পূর্ব প্রবণতার অনুস্মৃতি ও ভবিষ্যৎ পরিণতির আভাস দুয়েরই লক্ষণ আবিষ্কার করা যায়। 'অতিথি', 'কৃতার্থ', 'স্থায়ী-অস্থায়ী' ও 'অকালে' এই চারিটি কবিতায় কবি একটা অস্পষ্ট রূপক-ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা একদিকে 'সোনার-তরী'-'চিত্রা'-যুগের কল্পনাবৈশিষ্ট্যের স্মারক, অপর দিকে 'খেয়া-গীতাঞ্জলি' যুগের বহুব্যাপ্ত সংকেত-ধর্মের নির্দেশক। এই কবিতাগুলি কবির কোন একটি স্থির মানস আদর্শের আশ্রয়হীন বলিয়া ইহাদের তাৎপর্য নিশ্চয় করিয়া ধরা যায় না, তবে ইহারা কবির সঙ্কেতশিল্পদক্ষতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে।

'ক্ষণিকা'র মানস অনিশ্চয়তা ও আদর্শ-শৈথিল্যের বাতাবরণ কয়েকটি প্রেম-কবিতা এক অভূতপূর্ব মাধুর্যরসে ভরিয়া উঠিয়াছে। কবির সাধারণ ঔদাসীন্য ও আবেগরিক্ততার মধ্যে এই মিতভাষী ও ক্ষণিক অনুভবের অনিবার্যতায় উদ্বুদ্ধ কবিতাগুচ্ছ অসাধারণ অর্থগভীরতার দাবী করিতে পারে। 'এক গাঁয়ে', 'বিরহ' (২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭), 'ক্ষণেক দেখা' (৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭), 'দুই বোন' (১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭), 'দুর্দিন' (১লা আষাঢ়, ১৩০৭), 'অবিনয়' (১লা

আষাঢ়, ১৩০৭), 'কৃষ্ণকলি' (৪ঠা আষাঢ়, ১৩০৭), 'ভর্ৎসনা' (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭), 'চিরায়মানা' (২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭) ও 'কল্যাণী' (২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭) প্রভৃতি কবিতাগুলিতে প্রেমের নানা মেজাজ ও ঘটনা-ইঙ্গিত উদাহৃত হইয়াছে। কতকগুলি Pastoral বা পল্লীজীবনসুলভ—'ক্ষণের দেখা', 'দুই বোন', 'কৃষ্ণকলি' ও 'ভর্ৎসনা' এই পর্যায়ভুক্ত। গ্রামের পথে-ঘাটে বর্ষাপুষ্ট বন্য কুসুমের মত যে ক্ষণজীবী হৃদয়াকর্ষণ পল্লীপ্রতিবেশের দৌত্যসহায়তায় হঠাৎ উন্মেষিত হইয়া উঠে, যাহা কাব্যের রসগভীরতায় অভিষিক্ত না হইয়া, স্বল্পতম কাব্যানুরঞ্জনের কৃপায় উহার প্রত্যন্ত প্রদেশে একটা সঙ্কুচিত স্থান লাভ করে, এই কবিতাগুলি সেই জাতীয়। বৈষ্ণব কবিতার দিব্য রূপান্তরের পিছনেও হয়ত অনুরূপ লোকজীবনসম্ভূত উৎস অনুমান করা যায়।

'চিরায়মানা', 'বিরহ', 'অবিনয়', 'দুর্দিন' ও 'কল্যাণী' কাব্যকলার সমৃদ্ধতর, কবি-অনুভূতিতে প্রগাঢ়তর প্রেম-কবিতা। 'চিরায়মানা' 'ক্ষণিকা'র আভরণরিক্ত ও খেয়ালী সুরে বাঁধা। কবি এখানে বর্ষার আকস্মিক দুর্যোগের অজুহাতে প্রণয়িনীকে প্রসাধনহীন অবস্থায় ও ত্বরান্বিত গতিতে আসিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রাবৃট মেঘের কালো ছায়া নয়নে কজ্জললেপনকে নিরর্থক করিবে। 'বিরহ'-এ রৌদ্রতপ্ত নির্জন দ্বিপ্রহরের ও উদাস, অন্যমনস্ক মনের শূন্যতাবোধের পটভূমিকায় বিরহের ভাবান্তর মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে অন্তরের কোন অসংবরণীয় ব্যাকুলতা, হৃদয়বেদনার কোন উদ্বেলিত মত্ততার বর্ণনা বা ইঙ্গিত নাই, আছে গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে পল্লীপথের জনবিরলতা ও বিরহিণীর অলস কল্পনা-জাল-বয়ন। এই স্বল্প আধারেই মনোভাব অপূর্বভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। 'অবিনয়'-এ বর্ষার বর্ষণোচ্ছ্বাস প্রেমিকের মনে সমস্ত সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির দৃষ্টান্ত ও ঋতু-সাধিত নায়িকার রূপসজ্জা প্রণয়ীর আচরণে অসংযমের কৈফিয়ৎ রূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। যেখানে বকুলবীথিকা মুকুলমত্ত, বিদ্যুৎশিখা নায়িকার নির্জন কক্ষে অনধিকারপ্রবেশ করে, যেখানে বৃষ্টিধারার মুখরতা, কানায় কানায় পূর্ণ নদীর কল্লোলধ্বনি, বায়ুতাড়িত নবীন পল্লবের মর্মর সব মিলিয়া এক বাদলগাথার সুরবৈচিত্র্যসমন্বিত রাগিণী সৃষ্টি করে, জগৎ যেখানে স্তব্ধ ও নিয়মিতকক্ষচ্যুত, বিশেষতঃ বর্ষা যেখানে নিজে নায়িকার প্রসাধনতৎপর, সেখানে প্রণয়ীর অভ্যস্ত সংযম ও শিষ্টাচার নিতান্তই বে-মানান। 'দুর্দিনে' ঠিক প্রেমকবিতা নয়, মনে হয় বর্ষণবিস্রস্ত, রিক্তকুসুম প্রভাতে অন্তর্যামীরই পূজারিণীবেশে নবরূপগ্রহণের কাব্য। বসন্তের দেবতার

বর্ষাদিনে আগমন কবির মনে যে ভাবান্তরের বিস্ময় জাগাইয়াছে কবিতাটি যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিকায় তাহারই প্রকাশ। 'কল্যাণী'তে প্রণয়াবেশের মধ্যে শুচি-শুভ্র গৃহলক্ষ্মীর মূর্তি পরিস্ফুট। কবি-কল্পনা প্রকৃতি হইতে প্রকৃতিনাথের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মধ্যপথে থামিয়া বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত পূজার অর্ঘ্য অকস্মাৎ এক কল্যাণময়ী আদর্শ গৃহবধূকে নিবেদন করিয়াছে। প্রভাত ও সন্ধ্যা এই কল্যাণীর আরতি সাজায়, রূপসী বিদুষীরা অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে অর্ঘ্যোপহার দেয়, সে জরামৃত্যু-পরিবর্তনের অতীত এক নিত্যশ্রী ও সৌন্দর্যে বিরাজিত, সাগরবাহিনী গিরিনদীর ন্যায় তাহার গতি এক অসীম হইতে আর এক অসীমের অভিমুখী, তাহার পুণ্য প্রভাব সমস্ত গৃহস্থালীর উপর নদীস্রোতের ন্যায় গভীর রেখায় অঙ্কিত, শান্তির আশ্রয় ও প্রীতির অখণ্ড তাৎপর্য দ্বারা সে জীবনে ছন্দ প্রতিষ্ঠা করে ও সর্বশেষে কবির অধীর, অপচয়শীল কাব্যপ্রেরণা তাহারই মধ্যে যেন একটা পরম পরিণতির চেতনায় সমাহিত হয়। কবির প্রেম বিশ্বের সমস্ত পূজারতি, কল্যাণশক্তি ও জীবনের পূর্ণতাবিধায়িনী পুণ্যদীপ্তির এক অপূর্ব সমাহার। এ প্রেমে পূর্বতন প্রেমের মত কোন সম্মোহ বা ব্যাকুলতা নাই, কোন পূর্বনির্দিষ্ট ভাবাদর্শের অনুসরণ নাই, আছে এক নির্মল অনুভূতির অবারিত উৎসার, বিশ্বের বহুব্যাপ্ত লাবণ্যরশ্মিনিচয়ের এক স্বতঃস্ফূর্ত কেন্দ্রীকরণ।

সর্বশেষে কয়েকটি কবিতায় 'ক্ষণিকা'র আপাতলঘু, খেয়ালী কল্পনার পিছনে যে এক নূতন জীবনদর্শনের নেপথ্যসজ্জা চলিতেছিল তাহারই কিছু সচেতন দ্যোতনা অনুভূত হয়। 'উদাসীন' কবিতাটিতে কবির এই নূতন মনোভঙ্গীর বর্ণনা পাওয়া যায়। কবি আজ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, মন দেওয়া-নেওয়ার জটিল জাল হইতে তিনি নিজেকে গুটাইয়া লইয়াছেন। সমস্ত বেড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি মনের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছেন ও ছুটির আনন্দে বিভোর হইয়াছেন। তীর্থযাত্রী যেমন সংসারের সব দায় মিটাইয়া, সমস্ত বোঝা ফেলিয়া দেবদর্শনে যাত্রার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করে, কবিও সমস্ত মানস-আসক্তিমুক্ত হইয়া অবিভক্ত চিত্তে পরমাশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। যতদিন ফুল কুড়াইবার ও মধুসঞ্চয়ের জন্য ব্যস্ততা ছিল ততদিন পুষ্পসম্ভারের অজস্র বৈচিত্র্য চোখে পড়ে নাই। আজ তিনি বৈরাগী, নিরাসক্ত মন লইয়া বিশ্বভ্রমণ করিতেছেন, সুতরাং ত্রিভুবনই তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। 'নৈবেদ্য'-'খেয়া'-'গীতাঞ্জলি'-পর্বের ইহা অপেক্ষা আর কি সুষ্ঠুতর ভূমিকা হইতে পারে?

'শেষ হিসাব'-এ অতীত কাব্যজীবনের হিসাব-নিকাশ করিয়া জের না টানিবারই সঙ্কল্প কবি ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সমস্ত দেবতা এতদিন তাঁহার আনুগত্য দাবী করিয়াছিলেন তাঁহাদের সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়াই তিনি তাঁহাদের বিস্মৃতিলোকে বিসর্জন করিবার কথাই বলিয়াছেন। যেমন দেশসেবার ক্ষেত্রে, তেমনি কাব্যচর্চার ক্ষেত্রেও একলা থাকার উদাত্ত মন্ত্র তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছে। এই একাকীত্বের মধ্যে যে একের দর্শন তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, বিশ্বের শূন্যতা যে বিশ্বনাথের দ্বারা পূর্ণ হইবে এই প্রত্যয়ই তাঁহাকে অতীত-বিস্মরণে উৎসাহ দিয়াছে।

'যৌবনবিদায়'-এ কবির জীবনের চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার যে কাব্য-অধ্যায় ধীরে ধীরে রচিত হইয়াছে তাহার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই এই পরিবর্তন ও নব-আরম্ভের একটা প্রতিশ্রুতি দিতে অভ্যস্ত। তাঁহার যৌবন একাধিকবার অবসিত ও প্রৌঢ়ত্বও বারবার অভিনন্দিত হইয়াছে। কৈশোরের ধোঁয়াটে, অর্ধ-অবাস্তব কল্পনা, প্রথম যৌবনের আবেগমত্ত, রঙীন নেশা, শেষ যৌবনের প্রজ্ঞাঘন জীবনবোধ, অন্তর্বর্তী-কালের নানা ক্ষণিক মনোভঙ্গী ও শিল্পকৃতির প্রয়োগ-পরীক্ষা—এ সবই রবীন্দ্র-কাব্যজীবনে মুহুর্মুহু রূপান্তরের ছন্দ রাখিয়া গিয়াছে ও কবিও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহার মানস পরিবর্তনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাস্তবিক এগুলি একই শাখাতে নানা পল্লবোদ্‌গমের মত গৌণ পর্যায়ের পার্থক্যের নিদর্শন। কিন্তু 'ক্ষণিকা'-য় অতীতের দিকে পিছন ফেরার যে বিবরণ পাই তাহা একটা মুখ্য দিক্‌পরিবর্তন সূচিত করে। ইহাতে যে যৌবনবিদায়ের সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা কেবল সাময়িক বিচ্ছেদ নয়, সামগ্রিক সম্পর্কের অবসানমূলক। কবি যে দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহার পূর্বতন কাব্যের বিচার ও মূল্যায়ন করিয়াছেন তাহা একটি চিরন্তন ব্যবধানেরই ইঙ্গিত দেয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অতীত রচনার বৈচিত্র্য, ভাবোন্মত্ততা ও রসোচ্ছলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু তথাপি এই যৌবনা-বেশের গানগুলি তাঁহার বর্তমান জীবনবোধের নিকট অনেকটা ছায়াময়, অবাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তিনি ইহাদিগকে ঘাট হইতে সরাইয়া ভাঁটার স্রোতে ভাসাইয়া অস্তাচলের কূলে চিরসংলগ্ন করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ঘাটে বাঁধা তরী ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়; স্রোতে ভাসানো তরী চিরদিনের মতই পরিত্যক্ত। তিনি যে বারে বারে পারে যাওয়ার আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহা ভোরের সুরে, অর্থাৎ তরুণ মনের উচ্ছ্বাসপ্রাবল্যের

জন্য; উহার মধ্যে সত্যিকার বৈরাগ্য-নিরাসক্তি বা লৌকিকজীবনপরিহারের দৃঢ় সংকল্প ধ্বনিত হয় নাই। এখন তিনি জানাইতেছেন যে জীবনে রসবৈচিত্র্য-আস্বাদনের মধ্যে তাঁহার গোপন অভিপ্রায় ছিল ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর মত কোন রাতুল চরণস্পর্শে তরীকে স্বর্ণময় করার সম্ভাবনা। তাঁহার যে কাব্যগ্রন্থকে তিনি 'সোনার তরী' নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি কি রহস্যময় অভাবনীয়তার পরিবর্তে দিব্য ঐশীশক্তির সংস্পর্শই কামনা করিয়াছিলেন? তাঁহার নিরুদ্দেশযাত্রা কি নানা অজ্ঞাত সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস, নানা অস্তসূর্যের স্বর্ণপ্লাবনের ঘুরপথে তাঁহাকে ঐশী করুণার নিরাপদ ও সুনির্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই কল্পিত হইয়াছিল? বিলম্বিত উদ্দেশ্যঘোষণার এই নূতন আলোকে কবির পূর্বতন কাব্যসমূহ এক নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যাহাই হউক, কবি এখন এই সোনার চরণস্পর্শ তাঁহার কাব্যতরীতে পাইবার জন্যই উৎসুক হইয়াছেন ও 'ক্ষণিকা'র সমস্ত লঘুচিত্ততার অন্তরালে এই পরম উদ্দেশ্যই যে কবির আগামী কাব্য-পর্যায়ের গতি-প্রকৃতি নিরূপিত করিবে এই ঘোষণাই কবির কাব্যবিবর্তনে উহার স্থান নির্ণয় করে।

সপ্তম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাট্যের দ্বিতীয় পর্ব—নাট্যকাব্য

চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, কর্ণকুন্তীসংবাদ, গান্ধারীর আবেদন (১৮৯২—১৯০০)

১

রবীন্দ্রকাব্যের বনবীথিতে নাট্যকলার মায়ামৃগী নানা ছলে, নানাবিচিত্র ছদ্মবেশে লীলাসঞ্চরণ করিয়াছে। প্রথমতঃ 'বাল্মীকি প্রতিভা'-য় (১৮৮১) গীতিসুরে নিজ চরণক্ষেপ নিয়মিত করিয়া ও 'মায়ার খেলা'-য় (১৮৮৮) গীতি-মুগ্ধতার উৎকর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে এই নটহরিণীর প্রথম অভ্যাগম। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ (১৮৮৪) রবীন্দ্র মানসতত্ত্বের, তাঁহার সহজাত মানবপ্রীতির সহিত উদাসীন বৈরাগ্যের কল্পিত দ্বন্দ্বের ভারে পীড়িত হইয়া নাটক কিয়ৎ পরিমাণে উহার স্বচ্ছন্দ গতি হারাইয়াছে। 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯) ও 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকদ্বয়ে এই ক্রীড়াশীলা কুরঙ্গিণী পঞ্চাঙ্ক নাটকের পূর্ণাঙ্গ, ভারী উপাদানে নির্মিত রথ টানিবার প্রথাসম্মত কাজে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহারা পূর্ণ সফলতা লাভ করুক বা না করুক ইহাদের নাট্যপ্রেরণার প্রাবল্য ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত লেখকের কবিস্বভাব তাঁহার নাট্যপ্রয়োজনের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করে নাই, কিন্তু তাঁহার নাট্যউদ্দেশ্য ও নাট্য-নির্মিতপ্রয়াস অবিসংবাদিত। এই দুইটি নাটক ও 'মালিনী' (১৮৯৬) সম্বন্ধে আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হইবে।

এই নাট্যস্তরের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ও পরে রবীন্দ্রনাথ এক জাতীয় কাব্য-গুণপ্রধান নাটক লিখিবার প্রেরণা পান। 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায়-অভিশাপ' (১৮৯৪), ও ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'কাহিনী'র অন্তর্ভুক্ত 'সতী' (১৮৯৭), 'নরকবাস' (১৮৯৭), 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (১৮৯৭), 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ও 'গান্ধারীর আবেদন' (১৯০০) এই পর্যায়ে পড়ে। এগুলিতে মোটামুটি কাব্যগুণের প্রাধান্য বলিয়া ও নাট্যরস কাব্যবেষ্টনীসংহত বলিয়া ইহাদিগকে **নাট্যকাব্য** এই আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। সেখানে কাব্যগুণ নাট্যগুণকে অতিক্রম না করিয়া হয় উহার সমশক্তিসম্পন্ন সহযোগিতা অথবা আনুগত্য-সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে সেখানে **কাব্যনাট্য** অভিধাই বিধেয়।

রবীন্দ্রনাট্যকলায় মায়ামৃগীর সহিত তুলনা তাঁহার রূপক বা সাঙ্কেতিক নাটকপর্বে আরও সুপ্রযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এই নাটকে বাহিরের ঘটনা বা ঘটনাবিন্যাসপরিপোষক উক্তিসমূহ উহাদের আপাতপ্রতীয়মান অর্থের অন্তরালে একটি নিগূঢ়তর ভাবব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই ছদ্মবেশপ্রবণতা ও বোধশক্তির পক্ষে বিভ্রান্তিকরতাতেই নাটকগুলির মায়াপ্রকৃতি পরিস্ফুট। ইহারা পাঠক বা দর্শকের নিকট প্রত্যক্ষঘটনাজাত আবেদন বহন না করিয়া একটি তির্যক উপায়ে সৃষ্ট ভাবপরিমণ্ডলের সূক্ষ্মতর আবেদনবাহী হয়। হরিণের বনান্তরাল হইতে দ্রুত অন্তর্ধান যেমন দর্শকের চোখে একটি চকিত চমক, একটি আকস্মিক বিভ্রমের ঘোর লাগায়, তেমনি এই সাঙ্কেতিক নাটকগুলিও একটি রহস্যময় সত্যের ইঙ্গিত দিয়া নাটকের স্থূলতর ভাবপারম্পর্যের মধ্যে একটি চমকিত অনুভূতির সঞ্চার করে।

নাট্যরচনার একেবারে শেষ পর্বে নৃত্যনাট্যের প্রবর্তন ও পুরাতন নাটক বা নাট্য-আখ্যানগুলির এই আঙ্গিক-রূপান্তর এই মায়াকে আরও অমূর্ত ও বস্তুসম্পর্কহীন ছায়ায় পর্যবসিত করিয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা' নৃত্য-নাট্যে সংলাপ মাধ্যমে ঘটনার গতি ও আবেগপ্রকাশের স্থান লইয়াছে গীত ও নৃত্যের ভাবদ্যোতক অঙ্গভঙ্গি। আর শ্যামা নৃত্যনাট্যে একা নৃত্যের সাহায্যেই কারাবরোধ, হত্যা প্রভৃতি স্থূল ও জটিল ঘটনাবলী ও নানা বিপর্যয়মূলক ভাবসংঘাতের দ্যোতনা সম্পন্ন হইয়াছে। মনে হয় যে এই আখ্যানগুলির ঘটনাংশ ও আবেগছন্দ আমাদের কবির পূর্ব রচনা হইতে জানা না থাকিলে শুধু নৃত্যের দ্বারাই সমস্ত অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি নূতন করিয়া আমাদের বোধগম্য হইত কি না সন্দেহ। সে যাহাই হউক রবীন্দ্র-নাট্যকলা-বিবর্তনের এক প্রান্তে গীতাশ্রিত নাটক আর বিপরীত প্রান্তে নৃত্যনির্ভর ও বাণীহীন নাট্যপরিস্থিতিনির্যাস। এই উভয় প্রান্তের মধ্যে নাটক কখন কখন কায়াগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই উহার গতি হেঁয়ালি-ভরা মায়া হইতে নির্বাক ছায়ার দিকে। রবীন্দ্রকাব্যাঙ্গনে এই বনহরিণী সম্পূর্ণভাবে পোষ মানে নাই বা কোন নিয়মরজ্জুতে বরাবরের জন্য বাঁধা পড়ে নাই।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যরচনার প্রেরণা প্রথম অঙ্কুরিত হয় 'কথা ও কাহিনী'র নাট্যগুণসম্পন্ন দ্রুতগামী আখ্যায়িকা-কবিতায়

সম্পর্কে। এই আখ্যানপ্রবাহ যে নাট্যসম্ভাবনার পলিমাটি বহন করিয়া আনিয়াছিল সেই উর্বরা ভূসংস্থানে নাট্যকাব্যের এই নাট্যবীজ নিজ আশ্রয়ভূমি খুঁজিয়া পায়। আখ্যানকবিতায় যে নাটক সুপ্ত ও অন্তরালশায়ী ছিল নাট্যকাব্যে তাহাই প্রকট রূপ লইয়া কাব্যপ্রবাহিণীর মাঝে দ্বীপের মত মাথা তুলিয়াছে ও প্রবাহকে এই নাট্যাকর্ষণের বলে কিছুটা তির্যকপথগামী ও মৃদু ঘূর্ণীচক্রে আবর্তিত করিয়াছে। আখ্যান কাব্যনির্দিষ্ট পথে চলিতে চলিতে নাটকীয় সমস্যা ও সংঘাতের মগ্নশৈলে প্রতিহত হইয়া বাঁক ফিরিয়াছে। কাব্যে নেতৃত্ব কোথাও অস্বীকৃত হয় নাই, তবে নাট্যের পিছন টানও সরল রেখাকে কতকটা বৃত্তচারী ও ভাবসংঘাতে ঘটনার দিকে মন্থরগামী করিয়া আবেগের দিকে জটিল ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

২

'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২) এই নবরীতির প্রথম উদাহরণ; এখানে অচিরস্থায়িত্বের বেদনায় করুণ ও তৃপ্তিহীন প্রেমের একটি আদর্শসৌন্দর্যস্বপ্ন কবিপ্রতিভার ইন্দ্রজালে চিরতরে বন্দী হইয়া রমণীয় ভাবরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। নাটক যেন একটি অন্তর্গূঢ় মানস দ্বন্দ্বে অতৃপ্ত, প্রতি স্তরে নবোদ্ভিন্ন সংশয়সন্দেহে বিভ্রান্ত, অপরিচয় ও অর্ধপরিচয়ের আলো-আঁধারিতে অনিশ্চিত, প্রেমের পটভূমিকা প্রস্তুত করিয়া উহার রসনিষ্পত্তির দায়িত্ব কাব্যের সুকুমার সৌন্দর্যসারনির্মিত শিল্পের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। নাট্যসমস্যার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব মৃদু বায়ুপ্রবাহের ন্যায় সৌন্দর্যসরসীর উপরিভাগকে মাঝে মধ্যে তরঙ্গিত করিয়াছে, উহার গভীরতায় কোন আলোড়ন জাগায় নাই। রূপমুগ্ধতার নিবিড় যোগসমাধি যেন রহিয়া রহিয়া নাটকীয় চিত্তবিহ্বলতার স্বপ্নঘোরে ঈষৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু উহার অবসান ও চরম পরিণতি আসিয়াছে নাটকীয় উপায়ে নহে, কাব্যোচিত স্বতঃউন্মীলনে। শরৎ-শেফালিতে স্বচ্ছ শিশিরবিন্দু নিজের অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মেই সঞ্চিত হইয়াছে—নাটক প্রভাতসমীরের ন্যায় সেই শিশিরবিন্দুকে নাড়া দিয়া উহার সুরভি-স্নিগ্ধতা দূরবিকীর্ণ করিয়াছে মাত্র।

'চিত্রাঙ্গদা'র আরম্ভ নায়িকার মানস সঙ্কটের একটি নাটকীয় মুহূর্তে।

রূপহীনা ও পুরুষ-আচরণে শ্রমকর্কশা চিত্রাঙ্গদা ব্রহ্মচারীবেশী অর্জুনের সহিত প্রথম সাক্ষাতে অকস্মাৎ অন্তরে অনভ্যস্ত প্রেমোন্মেষ অনুভব করিয়াছে ও অর্জুনের প্রতি তাহার প্রেমনিবেদনের প্রত্যাখ্যানে অসহ্য লজ্জায় মুহ্যমান হইয়াছে। নারীপ্রকৃতির এই প্রথম উন্মোচনের পর সে নিজ রূপহীনতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে ও কৃত্রিম রূপসম্ভারের জন্য মদন ও মদনসখা বসন্তের অনুগ্রহলাভের জন্য তপশ্চরণ করিয়াছে। দেবপ্রসাদ তাহার অঙ্গে বর্ষাকালের জন্য বসন্তের পুঞ্জীভূত লাবণ্যসঞ্চারের বর দিয়াছে। দেবতার নিকট তাহার এই লজ্জাকর অভিজ্ঞতার বিবৃতি তাহার আত্মকাহিনীতে কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে এক নাটকীয় আক্ষেপের আবেগ-স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া কাব্যোৎকর্ষের সঙ্গে নাট্যগুণের এক চমৎকার সমন্বয় ঘটাইয়াছে। এই সংলাপের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার চরিত্র-পরিচয়ও বিন্যস্ত হইয়াছে। সে নিজ চরিত্র-গৌরব ও কর্মে সহযোগিতা দ্বারা অর্জুনের চিত্তজয় করিবার অবসর পাইল না বলিয়াই তাহার এই ঋণ-করা রূপের উপর নির্ভরশীলতা। এইরূপে কাব্যপ্রধান কাহিনীতে নাটকের বীজ উপ্ত হইয়াছে।

ইহার পর এই দিব্যরূপপ্রসাধিতা রমণীর সহিত অর্জুনের সাক্ষাতে অর্জুনের তৎক্ষণাৎ ব্রতভঙ্গ হইয়াছে ও তাহার মুখে যে সৌন্দর্যপ্রশস্তি উদ্গীত হইয়াছে তাহা নারীরূপকে অতিক্রম করিয়া এক সার্বভৌম, নিখিলব্যাপ্ত আদর্শ-সুষমার স্তব রচনা করিয়াছে। উহাদের মধ্যে সংলাপে অর্জুনের রূপমুগ্ধতা ব্রহ্মচর্য-ব্রতভঙ্গের জন্য চিত্রাঙ্গদার মৃদু অনুযোগ ও নীতিগত ধিক্কারকে উপেক্ষা করিয়া উদ্বেল হইয়াছে ও সে যে চিত্রাঙ্গদার ঈপ্সিত প্রণয়পাত্র এই সৌভাগ্য তাহার সমস্ত পূর্বকীর্তিকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। অর্জুন চিত্রাঙ্গদার মধ্যে সমস্ত বিশ্ব-ঐশ্বর্যের সমন্বয়, সমস্ত সৃষ্টিরহস্যের সমাধান ও তাহার রূপের স্বচ্ছ, পূর্ণপরিচয়-প্রতিবিম্বী অতলতায় জীবনের চিরশান্তিময় পরম আশ্রয়ের সন্ধান পাইয়াছে। যে উপমা-ঋদ্ধ ভাষার সহায়তায় অর্জুন নিজ রূপতন্ময় মনের বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে কবিকল্পনার পেলবতা ও সুদূরচারিতা চিত্রের বর্ণময় রেখাবিন্যাসের সহিত অপূর্বভাবে সমন্বিত হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদার অপরাধ-সচেতন মন এই স্তবোচ্ছ্বাসকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে একদিকে অর্জুনকে তাহার শপথভঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়াছে, অপরদিকে সৌন্দর্যের প্রতি এই অর্ঘ্যনিবেদন যে তাহার প্রাপ্য নহে, তাহাকে আড়াল-করিয়া-রাখা অপর এক রূপসী-সত্তারই ন্যায্য প্রাপ্য এই বোধ ও তাহার অস্বীকৃতিকে

তীব্রতর করিয়াছে। এই উভয় সত্তার নেপথ্যচারী দ্বন্দ্বই কাব্যের মধ্যে নাট্যরসের ইঙ্গিত দিয়াছে।

তাহার পর চিত্রাঙ্গদা কর্তৃক মদনের নিকট প্রথম মিলনের বিহ্বল, কল্পনা-বাস্তবের প্রদোষমায়ায় অস্পষ্ট বর্ণনা। যে স্তবমদিরাকে সে বাহিরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাই নির্জন স্মৃতিচারণার অবসরে তাহার অন্তরের শিরায় শিরায় মাদকতা সঞ্চার করিয়া তাহাকে বাস্তব ইতিহাস ভুলাইয়াছে। অর্জুনের প্রণয়নিবেদনে যে বিশুদ্ধ, বিদেহী সৌন্দর্যসারের ধ্যানরূপ ফুটিয়াছে সে কল্পনায় নিজেকে তাহারই প্রতিচ্ছবি মনে করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে এই সম্মোহের ক্ষণিকতাও তাহার মধ্যে স্বল্পায়ু অরণ্যকুসুমের ন্যায় এক নিমেষে সমস্ত সম্ভোগতৃষ্ণা নিঃশেষ করিবার ব্যাকুলতা জাগাইয়াছে। রূপের একই প্রদীপ্ত শিখা অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার দুই বিভিন্ন প্রকৃতির, অথচ মূলতঃ অভিন্ন জীবনবোধকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। অর্জুনের পুরুষমন এই জ্যোতির্ময় আবির্ভাবের সম্মুখে সমস্ত জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর, সমস্ত খ্যাতিপিপাসার নিবৃত্তি ও পরম শান্তির আশ্রয় পাইয়াছে। চিত্রাঙ্গদার রূপহীনতার দুঃস্বপ্ন সমস্ত অতীতের বিস্মৃতিতে ও ক্ষণজীবী প্রকৃতি-সৌন্দর্যের সহিত একাত্মতা-প্রত্যয়ে বিলীন হইয়াছে। দুই সমস্যা-জটিল, অগ্রপশ্চাৎভাবনায় দোলায়িত মানবজীবন এক সর্বগ্রাসী রূপ-চেতনার বিদ্যুৎশিখায় গলিয়া এক-একটি সুকুমার অনুভববিন্দুতে সংহত হইয়াছে ও এই বস্তুভারহীন চিন্ময় রূপে জীবনমরণের সন্ধিস্থলস্থিত এক মহামিলনের তীর্থসঙ্গমে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এই ভূমিকার পর অসহ্য পুলক-কুহেলিকায় অন্তরায়িত দৈহিক মিলন। তাহার পর প্রভাত ও প্রত্যাবৃত্ত বাস্তবজীবনে জাগরণ। এই জাগরণের প্রথম প্রতিক্রিয়া চিত্রাঙ্গদার আত্মকল্পনার আবেশমুক্তি, নিজ কল্পিতসত্তা হইতে পলায়ন "আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো"। তাহার পরে আত্মসমীক্ষণ ও নিজ বহিরঙ্গলীনা রূপসী সত্তাকে নিজ সপত্নীরূপে অনুভব। কাল যে নারী প্রণয়ের সুধাপাত্র আকণ্ঠ পান করিয়াছে সে কি চিত্রাঙ্গদা, না তাহার বক্ষপঞ্জরগুপ্তা কোন মায়াবিনী নিশাচরী? প্রণয়ের তপ্ত উপহার, মধুর আস্বাদন সবই যে মধ্যপথে লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা আত্মানুশোচনার প্রাবল্যে মদনকে তাহার ধার-দেওয়া রূপসজ্জা ফিরিয়া লইবার জন্য অনুনয়, প্রায় অনুজ্ঞাই করিয়াছে। মদন অর্জুনের সম্ভাব্য মানস প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত করিয়া ও ফল পাকিলেই ফুল আপনা হইতে ঝরিয়া পড়ে এই প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লেখ করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে

বর্ষব্যাপী ছদ্মবেশধারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়াছে। চিত্রাঙ্গদার অন্তরে পরিপূর্ণ সুখের মুহূর্তে এই তীব্র অতৃপ্তির উচ্ছ্বাস আসিয়াছে কাব্যটির অন্তর্লীন নাট্যপ্রেরণা হইতে। মদনের উক্তি "হায় মানবনন্দিনী,·· ···তবু এ ক্রন্দন" খাঁটি কাব্য-মনোভাবপ্রসূত। চিত্রাঙ্গদার ক্ষোভ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে নাটকের জ্বালাময় অন্তরাগ্নির উৎস হইতে।

৩

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মিলন এখন অভ্যস্ত ভোগের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। অর্জুনের শ্রান্তি নানা পরোক্ষ ইঙ্গিতে দেখা দিয়াছে। প্রথমতঃ চিত্রাঙ্গদার সামগ্রিক রূপ হইতে দৃষ্টি সূক্ষ্মসূচিশিল্পরত অঙ্গুলিগুলির লীলাকম্পনে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। সুখের প্রত্যক্ষ ভোগ হইতে সুখস্মৃতিরোমন্থনের দিকে মনের দিক্‌পরিবর্তন ঘটিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা তাহার রূপের ছলনা সম্বন্ধে সচেতন বলিয়া এই স্মৃতিসঞ্চয়ে কোন আস্থা স্থাপন করে নাই। সে ভোগপাত্রের সুধা সম্মুখে ধরিয়া অর্জুনের নির্বাপিতপ্রায় রূপতৃষ্ণাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিতেছে। অর্জুন কিন্তু প্রণয়মাদকতার রক্তকল্লোলধ্বনির পিছনে আরতির শান্তিশঙ্খের নিবৃত্তি-মন্ত্র শুনিতে পাইয়াছে। যেমন রতির দুর্দম জোয়ার সরিয়া সেখানে আরতির মৃদু প্রবাহ ধীরে ধীরে পূর্ণতার সূচনা আনিতেছে, তেমনি কাব্যোচ্ছ্বাসের মন্দীভূত বেগের মধ্যে নাটকীয় বিবর্তনের নিদর্শন ভাসিয়া উঠিতেছে।

এই শ্রান্তি নরলোক হইতে দেবলোকেও সংক্রামিত হইয়াছে। বসন্ত তাহার অস্থির মতি ও ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যসম্ভার লইয়া মদনের চিরকালীন মানস ক্রীড়ার সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। মদন বসন্তকে অচিরাৎ খেলাশেষের আশ্বাস দিয়াছে। মানবমনে ও মানবমন-নিয়ন্ত্রণকারী দৈবশক্তির মধ্যে যুগপৎ একই পরিবর্তনের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে।

প্রণয়ের আবেশময়, আলস্যমন্থর জগৎ ও ক্ষত্রিয়ের বীরত্বপূর্ণ কর্মসাধনার জগতের ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে মৃগয়াবৃত্তি। অর্জুনের নিশ্চেষ্টতার মধ্যে তাহার অতীত অরণ্যমৃগয়াস্মৃতি তাহার ভোগক্লিষ্ট মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতেছে। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তাহাকে স্মরণ করাইয়াছে যে প্রেমেও শিকারের অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বর্তমান। সে যাহাকে নিশ্চিতভাবে পাইয়াছে

মনে করিতেছে বস্তুতঃ তাহাকে পায় নাই। এই সতর্কবাণীর মধ্যে দ্ব্যর্থব্যঞ্জনা নাট্যরসস্ফুরণের হেতু হইয়াছে। তাহার উক্তি সমস্ত প্রেম সম্বন্ধে সাধারণভাবে সত্য হইয়াও তাহার নিজের সম্বন্ধে নাটকীয়-অর্থবহ। এখানে কাব্যবর্ণনার মধ্যে একদিকে হৃদয়ের ঔৎসুক্য, দীর্ঘবঞ্চিত মনের ব্যগ্রতা, অন্যদিকে আত্ম-জিজ্ঞাসার ব্যাকুল সংশয় নাটকীয় দ্রুতগতি ও মানস উত্তেজনা সঞ্চার করিয়াছে।

মদন ও চিত্রাঙ্গদার তৃতীয় সাক্ষাতে চিত্রাঙ্গদা নিজ রূপমত্ততার ফলে তাহার অন্তরে যে নির্মম বিজিগীষা জাগিয়াছে তাহাই বর্ণনা করিয়াছে, তবে এই নির্মমতা যে উদ্বেলপ্রায় ক্রন্দনের নিরোধ-উপায় তাহাও জানাইয়াছে। এই অংশে চিত্রাঙ্গদার মনস্তত্ত্বের নূতন বিকাশ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। শিকারের উপমা আবার মদনের মুখে তৃতীয়বার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে—তবে এ শিকার অর্জুন। 'শিকারে দয়ার বিধি নাই'—নির্দয় প্রেমসমরের মোহাচ্ছন্নতা নিবিড় করিবার ইহা একটি রীতি।

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার পরিচয়ের পরবর্তী দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার বৃন্তহীন পুষ্পের ন্যায় নাম-ও-গোত্রহীন আত্মপরিচয়ের বিষয়ে অর্জুনের অতৃপ্ত কৌতূহল ও ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হইয়াছে। অর্জুন এখন প্রেমের মধুপানে শ্রান্ত; সে চায় প্রেমের পরিণত ফলকে চিরন্তন গার্হস্থ্য সম্পদ্‌রূপে ঘরে তুলিতে। যেখানে আনন্দ ক্ষীয়মাণ সেইখানেই প্রশ্ন জাগে; প্রিয়ার চুম্বন যখন মদিরাহীন তখনই তাহাকে সংসারের স্থায়ী বন্ধনে অবরোধ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। চিত্রাঙ্গদার মনের সংশয়, অবাস্তবতার অর্ধ-অনুভূত বঞ্চনা-বোধ অর্জুনের চিত্তেও সংক্রামিত হইয়াছে। অর্জুন বলিয়াছে যে প্রেম আকাশকুসুম নয়। চিত্রাঙ্গদা সে আক্ষেপ এড়াইয়া ক্ষণস্থায়ী আনন্দের শেষ কণাটুকু পান করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান জানাইয়াছে। এই প্রেমকুহকের নিশ্চিত অন্তর্ধান কোন স্মৃতির জালে আবদ্ধ হইবার নয়। এখানেও কাব্য-রমণীয়তার অন্তরালে নাটকীয় মনস্তত্ত্বের আভাস লক্ষণীয়—মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সৌন্দর্য-প্রাসাদকে ধরিয়া আছে।

এইবার পার্বত্যদস্যুর আক্রমণ-আশঙ্কা অর্জুনের সুপ্ত ক্ষত্রবীর্য ও মোহগ্রস্ত কর্তব্যবোধের নিকট সুস্পষ্ট আহ্বান জানাইয়াছে। ইহা শিকারের ক্ষণিক ব্যসন নয়, চিরন্তন রাজধর্ম। এই সংকটমুহূর্তের তীক্ষ্ণ বায়ু অপরিচয়ের কুহেলিকা সরাইয়া রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে নামধামপরিচয়ে ও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব-দ্যোতনায় অর্জুনের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে। অর্জুনের বাষ্পবৎ অস্পষ্ট

জিজ্ঞাসা ও ইতস্ততঃ অনুমানের পথে সঞ্চরণশীল কৌতূহল একটি সংহত বিন্দুতে দানা বাঁধিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার বীরত্ব ও পুরুষোচিত রাজকার্যদক্ষতা অর্জুনের মনে সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে—তাহার চরিত্রগৌরবের নিকট রূপাকর্ষণ গৌণ হইয়া গিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে তাহার রূপহীন সত্তার প্রত্যাখ্যানের কথা স্মরণ করাইয়াছে ও মোহভঙ্গের অভিঘাতে অর্জুনের প্রণয় টিকিবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। অর্জুন কিন্তু এই সতর্ক-বাণীতে কান দেয় নাই। সে চিত্রাঙ্গদার বীর্যবতী জগদ্ধাত্রী মূর্তিটিকেই ধ্যানের দ্বারা সুস্পষ্ট করিতে চাহিয়াছে ও তাহার কর্মসাধনার অংশী হইবার প্রার্থনা জানাইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা পুনঃ পুনঃ নারীর কোমল, সৌন্দর্যসর্বস্ব, বাস্তবতার পরুষস্পর্শহীন লাবণ্যপ্রতিমাটিকেই উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়া অর্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত অর্জুন এক অভিনব জীবন-রহস্যবোধের উন্মেষ-কাহিনীর ইঙ্গিত দিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার সহিত প্রথম পরিচয়ে সে নিশ্চিত বিশ্বাসে বলিয়া উঠিয়াছিল যে সে তাহার সত্তারহস্যের অতলতায় অবগাহন করিয়াছে, তাহার আত্মার, তাহার জীবনতাৎপর্যের পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রেমিকের মত্ত আত্মবিভ্রান্তির সিদ্ধান্ত—ইহা গভীরতর আস্বাদনে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। অর্জুনও তাই স্বীকার করিয়াছে যে সে তাহার অন্ত পায় নাই, তাহার অনুসন্ধিৎসা কোন এক অদৃশ্য বাধায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার প্রেমে তাহার সমস্ত দেহ-মনের, তাহার সমস্ত বস্তুময় পরিবেশ ও গভীরতর জীবনবোধের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল না বলিয়া তাহার মধ্যে এক অনির্দেশ্য শূন্যতা ও অতৃপ্তি সঞ্চিত হইয়াছে। তাহার রূপ যেন তাহার সত্তার ছদ্মবেশ ও উহার সংবেগ-ধারণে অসমর্থ। রূপের অন্তরাল হইতে পুষ্পিত যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া এক মহত্তর সত্য যেন আসন্ন-আবির্ভাব। তাহার প্রথমদর্শনের রূপচ্ছবি যেন সাধকের প্রাথমিক সাধনার নিকট দৃশ্যমান মায়ামোহ—সে শেষ সাধনার শুভ্র, রূপাতীত সত্যের জন্য প্রতীক্ষমান। এই অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাসের পর সে চিত্রাঙ্গদার অশ্রু-আপ্লুত বেদনার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

শেষ রাত্রিতে বসন্ত চিত্রাঙ্গদার মন্দীভূত সৌন্দর্য-নদীতে শেষ বারের মত নূতন স্রোতোবেগ সঞ্চার করিয়াছে। সর্বশেষে আসিয়াছে চিত্রাঙ্গদার অন্তিম রূপনিবেদন ও সূর্যোদয়ে নিজ স্বরূপ-উদ্ঘাটন। যে বিহ্বল প্রেম রূপমত্ততার আসবে আপনাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল তাহা মোহাবসানে সত্যের দৃঢ় আশ্রয়ে, চরিত্রগৌরবের অপ্রমত্ত পরিচয়ে, সঙ্কল্পের তেজোময় ঘোষণায় যথার্থ স্বরূপে

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রূপের ছলনামুক্ত চিত্রাঙ্গদা আত্মিক মহিমায় জ্যোতির্ময়ী হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুন্নত আদর্শেই দেহনিষ্ঠ প্রেমের দিব্য রূপান্তর। অর্জুন একটি ক্ষুদ্র বাক্যে নিজের ধন্যতা ঘোষণা করিয়া এই পুণ্য প্রেমের পাবক দীপ্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কাব্যবর্ণিত যে প্রেম ভস্ম-অপমান-শয্যায় বিলীনপ্রায় হইয়াছিল তাহা নাটক-সংঘাতস্পৃষ্ট অগ্নিময় সত্তার উত্তাপে আবার ভাস্বরতা লাভ করিয়াছে।

এককালে 'চিত্রাঙ্গদা'র দুর্নীতি ও ভোগসর্বস্বতা লইয়া উহা অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছিল। এখন আমাদের সেই দূরশ্রুত কোলাহলকে অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রেমের ইন্দ্রিয়ালুতা ও দৈহিক রূপাকুলতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগপ্রধান প্রেমই যে সর্বথা নিন্দনীয় তাহা নহে। বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠী দেহলাবণ্যকে অধ্যাত্মব্যঞ্জনার উপায়রূপে প্রয়োগ করিয়া উহার স্থূলতাকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার রূপ-মোহকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ভাবস্তরে উন্নীত করিয়া ও উহার আকৃতি-কামনার উপর কাব্যানুভূতির এক অতি সূক্ষ্ম, পেলব আবরণ বিস্তৃত করিয়া উহাকে পরিশ্রুত করিয়াছেন। যে আগুনে পুড়িয়া ভোগ-প্রবণ মানবাত্মা কাঞ্চন-কান্তি ধারণ করে তাহা সমস্ত স্থূল উপাদানকে গ্রাস করিয়া নিজ দীপ্তি বিকীর্ণ করে।

চিত্রাঙ্গদার ছন্দবিন্যাসে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। ইহা অমিল পয়ারের ছাঁচে রচিত হইলেও ইহার পাঠ-মসৃণতা মাঝে মধ্যে প্রতিহত হয়। ইহা কাব্য বা নাটক কোনটারই সম্পূর্ণ উপযোগী বাহনরূপে পরিকল্পিত হয় নাই। মনে হয় কবির মনে ইহার রূপকল্প সম্বন্ধে একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কখনই সম্পূর্ণরূপে অবসিত হয় নাই। কবিতাটি অপূর্ব কাব্যসম্পদে ভূষিত হইলেও এবং ইহার আখ্যানভাগের মধ্যে নাটকীয় বিন্যাসদৃঢ়তা ইহাকে সাবলীল গতি দান করিলেও, ইহার প্রকাশভঙ্গী কাব্য ও নাট্যজগতের মধ্যে দোদুল্যমান হইয়া উহার সৌন্দর্যের পূর্ণ উপভোগে কিঞ্চিৎ বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই যুগের অন্যান্য নাট্যকাব্য এই ত্রুটি হইতে মুক্ত।

'চিত্রাঙ্গদা'-র দুই বৎসর পরে লেখা 'বিদায়-অভিশাপ'-এ (১৮৯৪) কাব্য-ধর্মের অতি-প্রাধান্য নাটকীয়তা-বিকাশের উপায়কে সঙ্কীর্ণ করিয়াছে। এই কাব্যে নাটকীয় সংলাপ অনেকটা বহিরঙ্গমূলক স্থান লইয়াছে। দেবযানীর ক্ষুণ্ণ অভিযোগ ও যত্নরুদ্ধ আবেগ কচের নিকট হইতে কোন প্রতিঘাত না পাইয়া ও তাহার নিঃস্পৃহতার শীতল বায়ুর সংস্পর্শে নাটকীয়-উত্তাপ-বঞ্চিত হইয়াছে। সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের পর আসন্ন বিদায়ের ব্যথাভরা, পূর্বস্মৃতিঘন মুহূর্তটি যে নাট্যসম্ভাবনাপূর্ণ ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু রচনারীতি কাব্যপ্রধান ও নাট্যবিমুখ হওয়ায় এই প্রতিশ্রুতি অর্ধমুকুলিতই রহিয়া গিয়াছে। দেবযানীর অসহিষ্ণু, কামনার অসংবৃত প্রকাশে উষ্ণ, উপ-যাচক প্রেম কচের স্থির সংকল্প ও ঈষৎ অনুতাপস্পৃষ্ট, কিন্তু দৃঢ় অস্বীকৃতির সম্মুখীন হইয়া উহার জ্বলিয়া-ওঠা অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলিকে নিষ্প্রভতার ভস্মে আচ্ছাদিত হইতে দিয়াছে। সুদীর্ঘ পূর্বস্মৃতিচারণার মন্থর বাতাসে কাব্য-সৌন্দর্যের অপরূপ ফুল ফুটিয়াছে, স্নিগ্ধ শান্ত তপোবন-পরিবেশটি বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে, দুইটি তরুণ প্রাণের প্রীতিপূর্ণ সহচারিতার কাহিনীটি মৃদু সুরভি বিলাইয়াছে, কিন্তু দুর্বার প্রেরের আগ্নেয় দীপ্তি ও নাট্যোচিত ছন্দোবেগ ইহাতে তরঙ্গিত হয় নাই। এমন কি অন্তিম অভিশাপ ও প্রত্যুত্তরে উচ্চারিত কল্যাণকামী আশীর্বাদের মধ্যেও নাটকীয় ক্রান্তিলগ্নের সুরটি ফুটিয়া উঠে নাই—উহারা যেন বিশুদ্ধ কাব্যাদর্শের স্নিগ্ধতাবাহী উপসংহাররূপে আমাদিগকে স্পর্শ করে। কেবল এক স্থলে মাত্র কাব্যের মধ্যে ফল্গুপ্রবাহী নাট্য-উত্তেজনা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। যখন কচ দুরূহ ব্রত-উদ্‌যাপনের আত্মপ্রসাদে নিজ অন্তরের বঞ্চিত প্রেমের আর্ত রোদনকে চাপা দিবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে তখন দেবযানী কোন উচ্চ আদর্শের দ্বারা অপ্রশমিত নিজ চির-অতৃপ্ত অন্তর-বুভুক্ষার কথা স্মরণ করিয়া তীব্র শ্লেষে অন্তরনিরুদ্ধ আবেগের নাটকীয় মুক্তি দিয়াছে। মধ্যবিরতির যতিতে প্রবহমান, সমিল পয়ারবদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ-মসৃণ গতি কাব্যটিকে যে সুষমা দিয়াছে তাহাও নাটক অপেক্ষা কবিধর্মেরই অধিক উপযোগী।

'গান্ধারীর আবেদন' (১৯০০) সংলাপ-বিনিময়ের দ্রুত ঘাত-প্রতিঘাতে ও বিরোধী যুক্তি-উপস্থাপনা ও নীতি-প্রতিপাদনের সংঘর্ষময় গতিবেগে অনেকখানি

নাট্যধর্মসম্পন্ন। ইহার স্মরণীয় বাক্যাবলীগ্রন্থনে কবিপ্রতিভা ও উচ্চ মনীষার যুগ্ম প্রভাব এক অন্তরঙ্গ সহযোগিতায় একীভূত হইয়াছে। তথাপি সংলাপের দৈর্ঘ্য ও ত্বরাহীন বিস্তার যেন অনেকটা শ্রোতৃনিরপেক্ষ আত্মমতপ্রতিষ্ঠার ধারণাই জন্মায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ও আসন্ন প্রত্যুত্তর সম্বন্ধে পূর্ণ-অবহিত নাট্যকার স্বগতোক্তি ছাড়া অন্যত্র এই বিস্তারপ্রবণতার আশ্রয় লন না। অবশ্য একজনের উক্তি প্রত্যক্ষভাবে অপরের প্রত্যুত্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে ইহা ঠিক। কিন্তু এই মতসংঘর্ষজনিত উক্তিসমূহ সংঘর্ষের আগ্নেয় মুহূর্তকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া আপনাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রেরণার বশেই এক শাশ্বত সত্যের শান্ত পরিমণ্ডলে পল্লবিত হইতে থাকে। আমরা যখন দুর্যোধনের হিংসাতত্ত্ব, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ নিয়তিবশ্যতাতত্ত্ব ও গান্ধারীর উদাত্ত শাশ্বত ন্যায়দণ্ডতত্ত্বের অপূর্ব সম্প্রসারণ অনুসরণ করি তখন যেন উহাদের উদ্ভব-উপলক্ষ্যগুলিকে সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হই। কবিত্ব ও নীতিবাদের হিমালয় সমতলভূমির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে। কবিত্বচ্ছটায় ও নীতিমহিমায় দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতি বক্তাসমূহ তাহাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র উৎস লইয়া, তাহাদের ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্ম-বৃহৎ পার্থক্য লইয়া আমাদের সম্মুখ হইতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায়। সচল মানব মূর্তিগুলি ভাস্কর্য-শিল্প-খোদিত এক-একটি বিরাট পাষাণপ্রতিমার নিশ্চল মহিমায় প্রতিভাত হয়। বক্তাকে আড়াল করিয়া উদাত্ত বাণীই আমাদের মনে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। এই ভাস্কর্যশিল্পস্পর্ধী কাব্য কবিতাজগতের একটি অপূর্ব গৌরব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লক্ষণগুলি যে নাট্যধর্মবিরোধী তাহাও অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের হাতে নাট্যাদর্শের একটা নূতন মহিমা উদাহৃত হইয়াছে, যাহা ঠিক আমাদের প্রচলিত ধারণার অনুবর্তন করে না। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবিকশিত আভাস আছে, ঠিক অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ অপত্যস্নেহ মাঝে মাঝে বিবেকদংশনে ও নীতির অমোঘ প্রতিবিধানের আশঙ্কায় বিচলিত হয়, কিন্তু পুত্রের সহিত তাহার মতভেদ কোনও দিন তাহাকে কর্মবিরোধিতায় উত্তেজিত করে না। গান্ধারীর পরিচয় কুরুমাতা রূপে নহে, সমগ্র নারীজাতির পক্ষে বিচারপ্রার্থী প্রতিনিধিরূপে। মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহদুর্বলতা জয় করিয়াই তাহার কণ্ঠে শাশ্বত ন্যায়নীতির অনিবার্য বিজয়বার্তা বজ্রনিঃস্বনে উদ্গীরিত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা কেহই অন্তর্দ্বন্দ্বমথিত নাটকীয় চরিত্ররূপে পরিকল্পিত হয়নি। সুখের বিষয় মহাভারতীয়

আখ্যানে ও ধর্মশাস্ত্রপাঠকের মনে ইহাদের চরিত্র-ভূমিকা এতই সুনির্দিষ্ট যে রবীন্দ্রনাথকে চরিত্র-পরিস্ফুটনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যে গৃহীত হইবার পূর্বে উহাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব নিঃশেষিত হইয়াছে—ধৃতরাষ্ট্র দ্বিধাহীনভাবে অন্যায়ের ও গান্ধারী সমান দৃঢ়তায় ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ নির্বাচিত প্রতিষ্ঠা-মঞ্চের উপর প্রস্তরমূর্তির ন্যায় দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান আছে।

'কর্ণকুন্তীসংবাদ' (১৯০৯)-এ কাব্য ও নাট্যধর্মের সুষ্ঠুতর সমন্বয় হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যে চরিত্রের বাহুল্য বা নীতিবাদের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা নাই। ইহার পটভূমিকার মত অন্তর-কাহিনীও একদিকে এক সংশয়-দোলায়িত, ভীরু ইচ্ছা ও করুণ আকৃতিতে কোমল, অপর দিকে স্নেহপিপাসার সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠ, প্রত্যাখ্যান-দৃঢ়তার মিশ্রণে পরিণামকঠোর, অনিশ্চিত বাতাবরণে নিহিত। অথচ এই আখ্যানের মধ্যে প্রকৃত নাট্য-প্রতিশ্রুতি বর্তমান। কুন্তী এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, এক লজ্জাকর, মর্মান্তিক সত্য-উদ্‌ঘাটনে উন্মুখ হইয়া নির্জন নদীতরে সায়াহ্ন-অন্ধকারে কর্ণের সম্মুখীন হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অব্যবহিতপূর্ব সন্ধ্যায় সে তাহার দীর্ঘকালনিরুদ্ধ মাতৃস্নেহের দুঃসহ পীড়নে কর্ণের জন্মরহস্য ও তাহার সহিত নিজ গোপন সম্পর্ক ব্যক্ত করিবার সঙ্কল্প লইয়া তাহার সহিত দেখা করিয়াছে। এই সাক্ষাতে তাহার মনে নানা লজ্জা-সংকোচ, তাহার দৌত্যের ফলাফল সম্বন্ধে তীব্র অনিশ্চয়তা ও কর্ণের সম্ভাব্য মানস প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নানা পরস্পরবিরোধী পূর্বানুমান; ও কর্ণের দিকে অবিমিশ্র বিস্ময়ের ঘোর কাটাইয়া ধীরে ধীরে প্রকৃত অবস্থার উপলব্ধি ও এই অবস্থাসঙ্কটে তাহার কর্তব্য-নির্ণয়—এই সমস্ত দ্রুত-আবর্তনশীল মনোভাবের সমাবেশ একটি অপূর্ব নাট্যরসঘন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। নাট্যকাব্যের ভাব-উপস্থাপনে ও ভাবসংঘর্ষজাত হৃদয়াবেগের বর্ণনা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতেও এই নাট্যপরিস্থিতির প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য কুন্তীর এই সনির্বন্ধ আমন্ত্রণের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করিতে কর্ণের বহু বিলম্ব হইয়াছে। কোন্ অধিকারে কুন্তী এই জোরাল অনুরোধ তাহাই সে বুঝিতে পারে নাই। কর্ণের এই বিলম্বিত উপলব্ধির পিছনে লেখকের নাট্যকলাকৌশল চমৎকারভাবে ক্রিয়াশীল। কুন্তীর সন্ধ্যার তিমির নিবিড়-লজ্জাবরণকারী হইবার জন্য অপেক্ষা, অস্ত্রপরীক্ষার দিন অপ্রভিভ, নীচকুলোদ্ভব বলিয়া অবজ্ঞাত কর্ণের প্রতি তাহার স্নেহ কেমন করিয়া সহস্র বাহু মেলিয়া

ধাবিত হইয়াছিল তাহার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা, সেইদিন হইতেই কর্ণের প্রতি তাহার নীরব-উচ্চারিত শুভকামনার উল্লেখ এক সুদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করিয়া কুন্তীকে তাহার চরম লজ্জাকর উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে ও কর্ণকেও অর্জুন-জননী তাহার প্রতি এত দয়াশীল কেন তাহার মর্মোদ্‌ঘাটনে বিস্ময়-বিহ্বল করিয়াছে।

এই অভাবনীয় গুহ্যতত্ত্বের আবিষ্কার প্রথম মুহূর্তে কর্ণের সমস্ত চেতনাকে বিপর্যস্ত করিয়া তাহাকে যেন স্বপ্নলোকে, জননীগর্ভের আদিম ভ্রূণ-অন্ধকারে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার পর মাতার দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ তাহার মনে মাতৃস্নেহক্ষুধার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। তৃতীয় মুহূর্তে এই সান্ধ্য অন্ধকারে রহস্যময়, আসন্ন মহাযুদ্ধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মারক ইঙ্গিতে অশুভশংসী, সংগ্রামের মহতী বিনষ্টির প্রাক্‌কালে মাতৃস্নেহের সঞ্জীবনীসুধালাভের প্রস্তাবে পরিহাস-ক্রূর পটভূমিকায় সমস্ত ব্যাপারটার অসঙ্গতি ও অবাস্তবতা তাহার মনে বিদ্যুৎ-চমকবৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই বিপর্যয়-পরম্পরার পর তাহার স্থিতধী অবস্থা ফিরিয়াছে। সে মাতার অস্বাভাবিক আচরণের জন্য তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া নিজ নিরুদ্ধ মনোবেদনাকে মুক্তি দিয়াছে। ইহার পর ধীর স্থির ভাবে সে আপনার কর্তব্য নির্ণয় করিয়াছে; জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের সমস্ত মর্যাদা ও সুনিশ্চিত জয়গৌরবকে উপেক্ষা করিয়া যে পক্ষে ধ্রুব পরাজয় তাহাই বাছিয়া লইয়াছে। কর্ণের মনুষ্যত্ব কেবল যুক্তিসিদ্ধ নয়, আচরণ-সমর্থিত। এই নাট্যকাব্যটিতে নাটকীয় উপাদান সুবিন্যস্ত ও দুইটি চরিত্রের সংলাপ নাট্যরীতিসম্মত। ইহার দীর্ঘসংলাপগুলি শুধু কাব্যাশ্রয়ী নয়; তথাপি নাট্যকার যে কবির উচ্ছ্বাস ও অসংবরণীয় ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া যাওয়ার প্রবণতাকে সম্পূর্ণ সংযত করিতে পারেন নাই এ সংশয় সম্পূর্ণভাবে উন্মূলিত হয় না।

'কাহিনী'-তে অন্তর্ভুক্ত বাকি তিনটি নাট্যকাব্যের—'সতী' (১২৯৭), 'নরকবাস' (১২৯৭) ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র (১২৯৭) মধ্যে প্রথম দুইটি ক্ষুদ্র কথিকা ও তৃতীয়টি কৌতুকনাট্য। এই তিনটি কাব্যেই লেখকের কাব্যপ্রবণতা অনেকটা সংযত হইয়া নাট্যগুণবিকাশকে অবাধ অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছে। তথাপি এই নাট্যপ্রয়াসগুলিতে আবেগ অপেক্ষা তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'সতী'-তে সংলাপ অনেকটা সংহত ও বাদপ্রতিবাদ-মুখর। যবন-পরিণীতা অমাবাই পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পিতা অমাবাইএর যুক্তি ও পাতিব্রত্যনিষ্ঠার নিকট পরাজয় মানিয়া কন্যার

পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু মাতা রমাবাইএর ধর্মসঙ্কীর্ণতা ও [illegible] এত বিস্ফোরকশক্তিসম্পন্ন যে সে কন্যার সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ, এমন কি স্বাভাবিক দুহিতাস্নেহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক নির্মম সংকল্পে অবিচলিত-ভাবে দাঁড়াইয়াছে। এমন কি সে সৈন্যের সাহায্য লইয়া ও স্বামীর কাতর অনুরোধের বিপক্ষে কন্যাকে বাগ্‌দত্ত পতির চিতায় তুলিয়া তাহার সতীখ্যাতি রক্ষা করিয়াছে। মনে হয় যে এই ক্ষুদ্রায়তন নাটিকা এইরূপ বিপরীত ইচ্ছা-শক্তির সংঘর্ষ ও বিরুদ্ধ আবেগের ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর। আরও বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় এই সংঘর্ষের তীব্রতা আরও সুপরিস্ফুট হইত। কাব্যের জোয়ার সরিয়া গিয়া নাটককে যে সঙ্কীর্ণ, সূচ্যগ্রমুখ অন্তরীপের উপর দাঁড় করাইয়াছে তাহাতে উহার সমস্যার পূর্ণ বিকাশের জন্য যথেষ্ট স্থানের অভাব। কন্যা, পিতা, মাতা ও উহারা যে অসাধারণ পরিস্থিতির অন্তর্ভুক্ত—সকলেরই যেন সমস্যারূপ তাহাদের মানবিক ও ভৌগোলিক আশ্রয়-ভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

'নরকবাস'—পৌরাণিক মহিমাখ্যাপক আখ্যানের নাট্যরূপ। মহারাজ সোমক স্বেচ্ছায় স্বর্গসুখ পরিত্যাগ করিয়া একই অপরাধে সহযোগী তাঁহার ঋত্বিকের নরকবাসের সঙ্গী হইয়াছেন। অতিরিক্ত পুত্রবৎসল মহারাজ রাজ-কার্যে অবহেলা করিয়া পুত্রমুখনিরীক্ষণে উৎসুক হওয়ায় ঋত্বিক্ তাঁহাকে পুত্রকে বলি দিয়া শতপুত্রলাভের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানে প্ররোচিত করে এবং অতি নৃশংস-ভাবে মাতৃক্রোড় হইতে পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া আসে। মহারাজ প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য এই অস্বাভাবিক বলিদানে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকেন। আন্তরিক অনুতাপানলে পুড়িয়া মহারাজের পাপস্খালন হয় ও মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গ-লাভের অধিকারী হন। ঋত্বিকের স্বভাবনৃশংসতা ও অনুতাপের অভাব তাহাকে নিরয়গামী করিয়াছে। সেই অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বর্ণনা—অন্তঃপুরে মহিষীদের স্নেহহস্তের দুর্ভেদ্য রক্ষাব্যূহ হইতে বালককে হোমানলে সমর্পণের জন্য আনয়ন, অবোধ শিশুর দীপ্ত অগ্নিশিখা দেখিয়া নূতন খেলার কৌতুক-অনুভব, অগ্নিস্পর্শে দাহজ্বালায় শিশুর কৌতুহলস্মিত চক্ষে নীরব ভর্ৎসনার ভ্রূকুটি, সমবেত সভাসদবৃন্দের তীব্র ধিক্কার এবং পূর্বস্মৃতিজর্জর রাজার নবীভূত শোকোচ্ছ্বাস, এমন কি প্রেতমণ্ডলীরও ঋত্বিকের প্রতি অনিবার্য ঘৃণার প্রকাশ—সব মিলিয়া অপূর্ব জীবন্ত ও ভাবব্যঞ্জনাময় হইয়াছে। তথাপি প্রকাশরীতি উক্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রসার ও বর্ণনার এককেন্দ্রিকতার জন্য নাট্যোপযোগী-উত্থান-

পতনে, বিভিন্ন মানস প্রক্রিয়ার একাভিমুখী সংশ্লেষে ছন্দায়িত হয় নাই। ভাবের একটি বৃহৎ, অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছে, কিন্তু উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপরীতমুখী ঢেউ-এ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আমাদের দ্বন্দ্ববোধকে উদ্দীপ্ত করে নাই। কাব্যছন্দে নাটকীয় বেগের সঞ্চার, পরিতৃপ্ত সৌন্দর্য-বোধের মধ্যে এক অনতিলক্ষ্য স্রোতের টানের অনুভব—ইহাই নাট্যকাব্যটির ফলশ্রুতি বলিয়া মনে হয়।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'—রবীন্দ্রনাট্যকাব্যধারায় এক অভাবনীয় আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথকে আমরা সাধারণতঃ গার্হস্থ্যজীবনের খুঁটিনাটি, নারী-মজলিশের ছোট-খাট ঈর্ষা, কলহ, বঙ্কিম কটাক্ষ প্রভৃতি সংযোগে সরস বাক্‌যুদ্ধের বহু উর্ধ্বেস্থিত আদর্শলোকবিহারী, তত্ত্বনিষ্ঠ কবি বলিয়াই জানি। তিনি পল্লী-জীবনের শান্তি, সৌন্দর্য ও বৃহৎ বিকার ও অবসাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু পল্লীনারীদের নিতান্ত ঘরোয়া সংসারযাত্রা, তুচ্ছ স্বার্থসাধনা, নির্লজ্জ যাচ্ঞা ও মিথ্যাচারিতা ও চাটুভাষণের নিখুঁত ছবিও যে তিনি আঁকিতে পারেন ইহা আমাদের ধারণা ছিল না। এই সরস কৌতুক-নাটিকায় তাঁহার সৃষ্টিশক্তির এই অপ্রত্যাশিত দিকটি ব্যঙ্গমধুর উপভোগ্যতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাণী কল্যাণী ও তাঁহার অজস্র দানশীলতার আকর্ষণে যে নারী-সভাসদ্‌গুলি সমবেত হইয়াছে তাঁহারা যেন আমাদের সুপরিচিত বাস্তব জগতের একটি নিখুঁত প্রতিনিধি-সংসদ। সর্বোপরি রাণীর প্রধানা দাসী ক্ষীরোদা নিজের আত্মীয় ও পোষ্যবর্গ লইয়া একটি উপরাজ্য গঠন করিয়াছে। তাহার বুদ্ধিমত্তা, উপায়কুশলতা, ফাঁকি ধরা পড়িলেও অক্ষুণ্ণ সপ্রতিভতা, অন্যান্য প্রার্থিনীবৃন্দের প্রতি তাহার মুখ-নাড়া-দেওয়া মুরুব্বিয়ানা, সর্বোপরি রাণীর প্রতি তাহার গোপন ঈর্ষা ও অবচেতন মনে রাণী হইবার সুপ্ত উচ্চাভিলাষ—এই সমস্ত চরিত্রবৃত্তি তাহাকে একটি অদ্ভুত জীবন্ত সত্তায় পরিণত করিয়াছে। এই রাণীত্বলাভের সুপ্ত ইচ্ছা তাহার স্বপ্নে অভাবনীয়রূপে পূর্ণ হইয়াছে ও এই স্বপ্নকল্পনা তাহার চেতনাকে এরূপ অধিকার করিয়াছে যে ইহা একটি দীর্ঘকাল-স্থায়ী বাস্তব সত্যের বিভ্রম সৃষ্টি করিয়াছে। লক্ষ্মী দেবী ক্ষীরির নিকট আবির্ভূত হইয়া সে ধনের সদ্ব্যবহার করিবে এই শর্তে তাহাকে ঐশ্বর্য বর দিয়াছেন। কিন্তু ক্ষীরি রাণী হইয়াই রাণীমর্যাদার এক অভেদ্য আদব-কায়দাবিধি প্রণয়ন করিয়াছে—কোন যাচিকা তাহার নিকট হইতে কানাকড়ি পায় নাই। অবশেষে সে কল্পনা করিয়াছে যে রাণী কল্যাণী পর্যন্ত তাহার অনুগ্রহপ্রার্থিনী

হইয়াছে এবং এই প্রার্থনা-প্রত্যাখ্যানই তাহার চরম বিজয় বলিয়া সে মনে করিয়াছে। ইতিমধ্যে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া বাস্তব সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রতিবেশীগণ তাহাদের নিজ নিজ প্রার্থনা জানাইয়া, অনুপস্থিতার নিন্দা করিয়া, ক্ষীরির বাক্যবাণ নিঃশব্দে হজম করিয়া, রাণীর প্রকাশ্যে প্রশস্তি করিয়া ও পরোক্ষে নির্বুদ্ধিতা ও পক্ষপাতের অভিযোগ আনিয়া একটি পরম উপভোগ্য রসাল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ নিজ কাব্যরাজবেশকে আঁটো-সাঁটো করিয়া, নিজ কবি-কল্পনাকে বিষয়োপযোগী সঙ্কোচন করিয়া, এই নারীমজলিশের রসনাটুকু পূর্ণভাবে ধরিবার পাত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ত্রিপাদবিশিষ্ট, দ্রুতগতি অর্ধপয়ারগুলি যেন নারীকণ্ঠের কাকলীর সহিত মিল রাখিয়াই, জিহ্বার প্রতিটি বাঁকের, ক্ষুদ্র ইচ্ছার ক্ষুদ্র পরিধির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই লঘু পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে চরিত্রের আভাস, সংলাপের যথাযথ বিনিময় ও স্বল্পপরিসরের মধ্যে মৃদু ঠোকাঠুকির ইঙ্গিত প্রভৃতি কমেডিসুলভ উপাদানের প্রাচুর্য আছে। কিন্তু ইহার প্রাণময়-গতিতে পরিণতির অভাব, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার কোন তাগিদ নাই বলিয়াই ইহা পূর্ণাঙ্গ নাটক হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরবর্তী কাব্যজীবনে গদ্যকবিতার পরীক্ষামূলক প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার মনোভাব ছিল কবি ও মননশীলের, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী ছিল অযত্নসিদ্ধপ্রয়াস গদ্যরীতির। যেখানে তিনি আপাততুচ্ছ বিষয়ের গল্প লিখিয়াছেন, সেখানেও তাঁহার গোপন লক্ষ্য আছে গল্পবিবর্তনের কোন অকস্মাৎ-উৎক্ষিপ্ত ফাটলে, যেখানে কবিত্ব অথবা তত্ত্বমননের প্রচ্ছন্ন বীজ আশ্রয় পাইতে পারে। এ যেন গদ্যের সোপানশ্রেণী ভাঙ্গিয়া কাব্যের নীলাকাশ-দর্শন অথবা তত্ত্বের তুঙ্গশিখরে আরোহণ। কিন্তু যেখানে অবিমিশ্র কাহিনী-রস অথবা জীবনের কৌতুকদ্বন্দ্ব পদ্যের বহিরঙ্গের সহিত গদ্যের আত্মার সহজ সমন্বয়ের প্রতীক্ষা করে, যেখানে গদ্য বা পদ্য কেহ কাহারও রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ না করিয়া সীমান্তপ্রদেশে মিতালির সমতায় বদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেদিকে বড় একটা পড়ে নাই। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' গদ্য-পদ্যের সীমান্তস্থিত ও নাট্যাকর্ষণসূত্রে একীভূত এই বিরল সমন্বয়ের বিরলতর দৃষ্টান্ত।

অষ্টম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাট্যের দ্বিতীয় পর্ব—কাব্যনাট্য

রাজা ও রাণী ১৮৮৯ (১২৯৬)
বিসর্জন ১৮৯০ (১২৯৭)
মালিনী ১৯১২ (১৩১৮)

১

রবীন্দ্ররচনায় এই যুগে কাব্য ও নাট্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নাট্যপ্রাধান্যের দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইখানি কাব্যরীতিতে রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক, আর তৃতীয়টি চারিটি-দৃশ্য-সমন্বিত একটি স্বল্পায়তন নাটক। এই নাটকগুলির রচনার পেছনে প্রধানভাবে সক্রিয় নাট্যপ্রেরণা, তবে রবীন্দ্রনাথের মত স্বভাবকবি কবিধর্মের সুষ্ঠু ও সময় সময় মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগেই নিজ নাট্য-অভিপ্রায়ের সিদ্ধি খুঁজিয়াছেন। পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত নাট্যকাব্যগুলির সঙ্গে কাব্যনাট্যগুলির পার্থক্য হইল যে পূর্ব রচনায় একটি বিশেষ নাট্যমুহূর্ত বা মৃদু নাটকীয় সংঘাতের আশ্রয় লইয়া লেখক তাঁহার কাব্যরীতিসুলভ ভাববিস্তারকে মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—কাব্যপ্লাবনের মধ্যে নাটকীয় অংশগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছে। এখন কিন্তু লেখক নাট্য-উদ্দেশ্যকেই প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়াছেন ও কাব্যকে ঐ মুখ্য-উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়রূপেই প্রয়োগ করিয়াছেন। রবীন্দ্রমানসে নাট্যপ্রেরণা গৌণ হইতে মুখ্য পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে—কোন একটি জটিল ঘটনা-পরিস্থিতির নাট্যরূপই তাঁহার কল্পনায় প্রধান হইয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। নাটকীয় লক্ষ্যভেদে কাব্য তাঁহার হাতে অস্ত্র মাত্র, এবং হয়ত সব সময় খুব নির্ভরযোগ্য ঋজুগতি অস্ত্র নহে। তথাপি কবি যদি নাটক লেখায় ব্রতী হন, তবে তাঁহার চিরাভ্যস্ত কাব্যরীতিকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না। সুতরাং এই কাব্যমাধ্যমে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত কতখানি সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে সেই মানদণ্ডেই উহার উপযোগিতা শেষ পর্যন্ত বিচার্য।

'রাজা ও রাণী' নাটকটির রূপবিন্যাসে লেখক সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাই উহাকে 'তপতী' নাম দিয়া নূতন রূপ দিয়াছেন। নাটকের প্রাথমিক গঠন সম্বন্ধে লেখকের প্রধান সঙ্কোচ কুমারসেন ও ইলার প্রণয়ের অতিরিক্ত ভাববিলাস

ও কাব্যধর্মিতা। সুতরাং পরবর্তী পরিবর্তনে তিনি এই অতি আর্দ্র প্রণয়লীলাকে বাদ দিয়া উহার পরিবর্তে নরেশ ও বিপাশার তীক্ষ্ণতর, আপাতবিরোধমূলক হৃদয়-সম্পর্ক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহাতে নাট্যধর্মের ও নাটকের গঠন-সুষমার যে বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা মনে হয় না। প্রতিভাবান নাট্যকার কোন বিশেষ পরিস্থিতির যে স্বতঃস্ফূর্ত নাট্যরূপ প্রথম মনঃসংযোগেই অনুভব করেন তাহা পুনর্বিবেচনায় বড় একটা রূপান্তরিত হয় না। মুহুর্মুহু রূপান্তরের প্রেরণা নাট্যানুভূতির অস্থিরতা ও অগভীরতারই পরিচয় দেয়। যে সৃষ্টিকল্পনা ঘটনাসংস্থানের কেন্দ্রস্থলভেদী তাহা এক দৃষ্টিতেই উহার পরিপূর্ণ নাট্যসম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে। ভারকেন্দ্রের স্থানান্তরীকরণ, বিষয়বিন্যাসের নূতন পূতন প্রয়াস, নাট্যরসের বিভিন্ন পাত্রে সঞ্চরণ—এ সমস্তই অপরিণত, আত্মপ্রত্যয়হীন নাট্য-শিল্পের নিদর্শন। কবির জীবনবোধের নবরূপায়ণ, তাঁহার শিল্পসাধনার নূতন আঙ্গিক-অন্বেষণ, তাঁহার ভাষণভঙ্গীর শাণিত তীক্ষ্ণতার প্রতি ঔৎসুক্য ও কাব্য-সৌন্দর্যের চেষ্টাকৃত সঙ্কোচন—এগুলি সব সময় নাট্যধর্মের কেন্দ্রশক্তির সহিত সম্পর্কিত নহে।

রবীন্দ্রনাথের অসমর্থন ও আত্ম-অবিশ্বাসী মনোভাব সত্ত্বেও 'রাজা ও রাণী' একটি সত্যকার উৎকৃষ্ট নাটকের মর্যাদালাভের অধিকারী। প্রথম কথা ইহার মধ্যে কোন তত্ত্বপ্রক্ষেপ নাই, কোন তত্ত্বপ্রতিপাদনের গোপন অভিপ্রায় ইহার নাট্যপরিণতিকে প্রভাবিত করে নাই। উহার চরিত্রগুলি কোন পূর্বনির্ধারিত ভাবের বাহন বলিয়া মনে হয় না, সকলেই রক্তমাংসের সজীব নরনারী। উহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে আতিশয্য আছে, কিন্তু তত্ত্বানুরঞ্জন নাই। বিক্রমদেব প্রণয়মুগ্ধ, অভিমানী রাজা; তাহার মধ্যে যে দুর্বার, নির্মম শক্তি আছে তাহা প্রণয়ের আবেশমত্ততা হইতে প্রতিহত হইয়া এক সর্বগ্রাসী জিঘাংসায় তাহার প্রিয়াকে প্রতিঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ধাবিত হইয়াছে। তাহার এক কোটি হইতে বিপরীত কোটিতে সংক্রমণ একদিকে যেমন তাহার প্রকৃতি-বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ মনস্তাত্ত্বিক সঙ্গতি লাভ করিয়াছে। কুমার-সেন ও ইলার প্রণয় উহার ভাবাতিশয্যে ও নৃত্যগীত-আবেগতরলতায় কিয়ৎ-পরিমাণে 'মায়ার খেলা'র যুগের স্মারক। তথাপি এই প্রেম শুধু কাব্যপ্লাবন-নিমগ্ন জলাভূমি নয়, ইহার মধ্যে কিছুটা বৈপরীত্যমূলক নাট্যোপযোগিতাও আছে। ইলা তাহার সম্পূর্ণ প্রণয়-পারবশ্যের জন্য বিক্রমের সমধর্মী; কুমার তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও আবেগসংবরণের জন্য সুমিত্রার কেবল রক্তসম্পর্কিত

নয়, অধ্যাত্মস্বভাবসহোদর। কুমারের চরিত্র অবশ্য নিষ্ক্রিয়; অদৃষ্টের ক্রূরতম নির্যাতন তাহার জীবন পরিণতিতে রূপায়িত হইয়াছে। তাহার স্নেহশীলা সহোদরা যে তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে ইহাই তাহার জীবনে নিদারুণ দৈব পরিহাস। মালিনীতে কতখানি গ্রীক ট্র্যাজেডির সাদৃশ্য আছে জানি না, কিন্তু সে সাদৃশ্য যদি আবিষ্কার করিতেই হয় তবে তাহা কুমারের ভাগ্যহত জীবনলীলায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ কুমার-ইলা আখ্যানটিকে যতটা অনাবশ্যক প্রক্ষেপ বিবেচনা করিয়াছেন ও ইহার বর্জনের পক্ষপাতী হইয়াছেন নিরপেক্ষ বিচার-দৃষ্টিতে ইহা তাদৃশ প্রতিভাত হয় না। কুমারের চরিত্রে ট্র্যাজেডির বিষাদ ঘনীভূত হইয়াছে। বিক্রমের ক্ষমা ও পুনর্মিলন যখন আসন্ন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহার আত্মহনন তাহার মৃত্যুকে এক অলৌকিকপ্রায় তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়াছে। কুমার ও বিক্রম সার্থক বৈপরীত্যে পরস্পর চরিত্রকে আরও স্বাভাবিক ও তাৎপর্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

সুমিত্রার চরিত্র শ্রেণী-প্রতিনিধিত্ব হইতে ব্যক্তিত্ব-ভাস্বরতায় উন্নীত হয় নাই। সে স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যে হঠকারিতা দেখাইয়াছে, কাশ্মীর হইতে কুমারের নেতৃত্বে সহায়ক সৈন্য আনিয়া তাহার উপর আরও অদূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। বিক্রমের প্রজ্বলিত ক্রোধে এই অবিবেকী শুভাকাঙ্ক্ষা ঘৃতাহুতি দিয়াছে ও বিক্রম ও কুমারের মধ্যে ব্যবধান আরও দুস্তর করিয়াছে। সুমিত্রার মহৎ সঙ্কল্প ভ্রান্ত আচরণের জন্য শূন্যগর্ভ আদর্শবিলাসে পর্যবসিত হইয়াছে। সে প্রজাজননী হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু তাহার চরিত্রের দুর্বলতা তাহাকে কুমারের আত্মহত্যার প্রশ্রয়দাত্রীর অবজ্ঞেয় অংশে অবতীর্ণ করাইয়াছে। কতকগুলি কাব্যগুণোপেত আদর্শপ্রশস্তিমূলক বক্তৃতা তাহার মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহারা কুমারের নৈরাশ্যপূর্ণ সুরের প্রতিধ্বনি বলিয়া বিশেষ নাট্যোপযোগিতা লাভ করে নাই। ইলা প্রমোদ ও প্রেমাবেশের একটি উজ্জ্বল বিন্দু; একমাত্র বিক্রমের সহিত বিবাহে অসম্মতি জানাইয়া ব্যাকুল মিনতি করা ছাড়া উহার চরিত্র-সংহতির আর কোন পরিচয় নাই। বিক্রমের উদারতা ও মহৎ প্রকৃতির পুনরুদ্ধার তাহার অভিজ্ঞতার আলোকে অস্বাভাবিক বা অতি-নাটকীয় বলিয়া মনে হয় না।

অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে খুড়া মহারাজ চন্দ্রসেন ও তাহার স্ত্রী রেবতীর চরিত্র স্বল্পপরিসরে নাটকোচিত ভাবেই ফুটিয়াছে। দেবদত্ত ও নারায়ণী নাট্যক্রিয়ার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় চরিত্র—তাহাদের কাব্যগন্ধী দাম্পত্য প্রেম সংস্কৃত নাটকের

প্রথানুযায়ী কিছুটা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের উপলক্ষ্য যোগাইয়াছে মাত্র ও রাজসভার একটা সাধারণ চিত্র-প্রস্ফুটনে সহায়তা করিয়াছে। মন্ত্রী, সেনাপতি, ত্রিবেদী বিদ্রোহী সামন্তরাজগণ ও চর প্রভৃতি একটি ষড়যন্ত্র-কুটিল, বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে বিক্ষুব্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অন্য নাটকে রাজমহিমা ও রাজসভার একটা পরোক্ষ প্রতীকী দ্যোতনাই পাওয়া যায়, এরূপ বাস্তব জটিলতাপূর্ণ, প্রাণচঞ্চল চিত্র দুর্লভ। এই দিক দিয়া 'রাজা ও রাণী' রবীন্দ্র-নাটকধারায় অনন্যতা দাবী করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাট্যে জনসাধারণ নামে নির্বোধ, প্রগল্‌ভভাষী ও অস্থিরমতি লোকসমষ্টির আবির্ভাব ঘন ঘনই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত শেকস্‌পিয়ারের দৃষ্টান্তে এই পারদধর্মী চরিত্রটির প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন। মনে হয় ইহাদের কৌতুককর বাক্‌স্খলন ও আচরণগত অসঙ্গতির প্রতি কবির একটা স্বাভাবিক পক্ষপাত ছিল। আদর্শবাদের আতিশয্যের পরিপূরক রূপেই এই মুখর মৃৎপিণ্ডগুলি পুনঃ পুনঃ রবীন্দ্রনাটকে কৌতুকরস ও বস্তুতন্ত্রতার দাবী মিটাইয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সাধারণ মানবজীবনের কতকগুলি বিচিত্র খণ্ডচিত্র সন্ন্যাসীর উদাসীন মানববিমুখতার বৈপরীত্যসূচনার জন্যই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দশম দৃশ্যে দুই পথিকের মমতার্দ্র বিদায়-সম্ভাষণ, ও কয়েকটি স্ত্রীলোকের সন্তানবৎসলতা ও পঞ্চদশ দৃশ্যে কয়েকজন নাগরিক-নাগরিকার উৎসব-উল্লাস ও পথিকদের ভক্তিপ্রণতি সন্ন্যাসীকে জীবনের স্নেহমমতাময়, সহজ-আনন্দ-উদ্বেল দিকের সহিত পরিচিত করাইয়া তাহার নিজের আদর্শের শূন্যগর্ভতার প্রতি তাহাকে সচেতন করিয়াছে। বালিকা যে করুণা ও জীবনশক্তির ঘনীভূত নির্যাস ইহারা তাহারই ছিটেফোঁটা বিন্দু। 'রাজা ও রাণী'র প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যে লোকারণ্যের সাক্ষাৎ পাই তাহাদের চক্ষে বিদ্রোহের বহ্নি-স্ফুলিঙ্গ সমস্ত প্রলাপবৎ কলকাকলীকে ছাপাইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং নাটকে এই দৃশ্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কাশ্মীরের জনসাধারণও কখনও বা কুমার সেনের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য প্রদর্শন, কখনও বা বিক্রমদেবের আক্রমণে যে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইয়াছে, ধনীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-প্রকাশ ও লুটতরাজের জন্য তাহার সুযোগ-গ্রহণ—এই উভয় উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করিয়াছে। মোট কথা এই নাটকের জনসাধারণ শুধু অলস কবিকল্পনা ও পরিহাসরসিকতার উপলক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হয় নাই; রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝটিকায় অটল মহাবৃক্ষ ও ইতস্ততঃতাড়িত জীর্ণ পত্রের যুগ্মভূমিকার ন্যায় একই

অন্তঃকম্পনের বাহনরূপে নাট্যক্রিয়ার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নাটকীয় অভিপ্রায়ের সহযোগিতা করিয়াছে।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই নাটকটির মধ্যে কাব্য ও নাট্যধর্মের একটি সুন্দর সমন্বয় রক্ষিত হইয়াছে। নাটকটির সংলাপগুলি অথবা দীর্ঘায়ত নহে, নাটকীয় সংঘাতের ছন্দানুসারী সুমিত কাব্যরীতিপ্রয়োগ। বিক্রমদেবের মানস পরিবর্তন-পরম্পরা, তাহার অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষার মৃদু ক্ষোভ হইতে অটল দৃঢ়সংকল্প ও দানবীয় বিশ্ববিজিগীষায় পরিণতি কাব্য ও নাট্যপ্রয়োজন উভয় দিক্ দিয়াই যথাযথ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। পংক্তিগুলির ছন্দোবিন্যাসের মধ্যে এক অনর্গল ভাবপ্রবাহ যেন নাটকোচিত দৃঢ় সংসক্তিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নাটকের ভাবপ্রকাশিকা ও চরিত্রানুসারিণী শক্তির সহিত 'চিত্রাঙ্গদা' ও পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন'-এর তুলনা করিলে একদিকে কাব্যমুখ্যতা ও ও নাট্যমুখ্যতার, ও অপরদিকে নাট্যপ্রয়োজনের পক্ষে অপ্রচুর কাব্যোপকরণের পার্থক্য বুঝা যাইবে। এই নাটক সম্বন্ধে লেখকের অনুকূল অভিমত না থাকিলেও ইহা কয়েকটি দুর্বল ও অসংলগ্ন দৃশ্য বাদে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা ও নাট্যকার-অভীপ্সা এই দ্বৈত অংশের মধ্যে এক বিরল ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

২

'বিসর্জন'-এর নাট্যরূপ কবির আখ্যান-পরিচিতির প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পনির্মিতি নয়, উপন্যাসের পরবর্তী রূপান্তর। নাটকের রূপ-বিন্যাস উপন্যাসের পরোক্ষ প্রণালী বাহিয়া কবিচিত্তে সচেতন ভাবনার ফলে ধীরে ধীরে স্ফুরিত হইয়াছে। উপন্যাস-তথ্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমেই নাট্যশিল্প অঙ্গ-পরিগ্রহ করিয়াছে। ঠিক এই জাতীয় উদ্ভব-প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ নাটকের জন্ম হয় না। উপন্যাসের দত্তকপুত্র হিসাবে নাটকের বংশ-কৌলীন্যের প্রমাণ মিলে না। শেকস্পিয়ার অনেক নিকৃষ্ট নাটককে শ্রেষ্ঠ নাটকে রূপান্তরিত করেন, প্লুটাক, হলিনশেড প্রভৃতি আখ্যানকারদের রচনা হইতেও অনেক তথ্য ভাষাসমেত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যে রহস্যময় নাট্যপ্রতিভা স্থূল উপাদানকে নাটকীয় প্রাণশিখায় ভাস্বর করিয়া তোলে তাহা ভিন্নজাতীয় শিল্পের উপর আরোপিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'-নাটকটি পূর্ববর্তী উপন্যাস 'রাজর্ষি'র নাট্যসংস্করণ।

সুতরাং প্রধানতঃ উপন্যাসের সহিত উহার বস্তু-সন্নিবেশ ও সংঘাতপ্রকৃতির পার্থক্যই আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপন্যাসের কয়েকটি সূত্র নাট্যকার বর্জন করিয়াছেন, কতকগুলি নূতন সূত্র সংযোজনা করিয়াছেন ও মোটের উপর উপন্যাসের শান্ত মন্থর গতিতে আরও ত্বরিত বেগ সঞ্চার করিয়াছেন। উপন্যাসের তাতা, হাসি চরিত্র নাটকে বর্জিত ও বালক ধ্রুব নামমাত্রে উল্লিখিত। নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের যে সম্পর্কটি উপন্যাসে পল্লবিত তাহা এখানে একটি ক্ষুদ্র দৃশ্যে সংহৃত। যে শান্ত প্রকৃতিচেতনা উপন্যাসের মানস পটভূমি-রচনা ও যে অধ্যাত্ম আদর্শ গোবিন্দমাণিক্যের রাজর্ষি অভিধানের সার্থকতা-বিধান করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রথমটি একেবারে লুপ্ত ও দ্বিতীয়টি ঘনীভূত সাররূপে সংক্ষেপে উপস্থাপিত। রঘুপতির প্রতিহিংসা, মোগল অভিযান ও রাজপরিষদের বিস্তারিত বর্ণনা নাটকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসিত জীবনযাত্রার আত্ম-সমাহিত শান্তি ও সন্তোষ নাটকের পরিধির মধ্যে স্থান পায় নাই। নাটকটির ভাবকেন্দ্র হয়ত উপন্যাসের সহিত অভিন্ন কিন্তু উহার বস্তুবিন্যাস ও ঘটনা-বিপাক গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিবর্তিত। নূতন প্রবর্তনের মধ্যে রাণী গুণবতী নাটকে প্রথম আগন্তুক; অপর্ণা হাসির রূপান্তরিত সংস্করণ—নাটকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে ও রঘুপতির প্রতিস্পর্ধী শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে। চাঁদপাল ও নয়নরায়—সেনাপতিদ্বয়—খানিকটা সক্রিয় অংশে ও কিছুটা অনির্ণীত চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নবপ্রবর্তন-পরম্পরা নাট্যক্রিয়ার স্বরূপনির্ণয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

নূতন চরিত্রগুলির প্রবর্তনে ও তজ্জনিত নাট্যসংঘাতের বর্ধিত বেগ ও জটিলতর রূপ-সঞ্চারে রবীন্দ্রনাথের সদ্য-অর্জিত নাট্যসংস্কার বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ সন্ন্যাসী ও বালিকার বিপরীত দিকে আবর্তিত সম্পর্ক-জটিলতা জয়সিংহ ও অপর্ণার গ্রহণ-বর্জন-মিশ্র সম্পর্কটির উপর গভীর ছায়াপাত করিয়াছে। 'রাজা ও রাণী'-র বিক্রম-সুমিত্রার দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ দাম্পত্য সম্বন্ধটি নূতন ভাবে 'বিসর্জন'-এ রাজা ও রাণীর আদর্শসংঘাত-জনিত মনোবেদনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-আবিষ্ট চিত্তে মানবিক-সংঘাতের দুইটি রূপ বারে বারে পুনরাবৃত্ত, বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বৈরাগ্য ও মানবপ্রীতি, এবং দম্পতির মধ্যে বিপরীত

আদর্শ-প্রসূত মনোমালিন্য ও সাময়িক বিচ্ছেদ একাধিক নাটকে এই দ্বন্দ্বসমস্যার পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কাজেই জয়সিংহ সন্ন্যাসীর অনুসরণে অপর্ণার প্রতি একবার আকৃষ্ট ও পরমুহূর্তে বিমুখ হইয়াছে, কেবল পূর্বনাটকের পিতা-কন্যা-সম্পর্ক বর্তমান নাটকে কোমলতর প্রীতি ও হৃদয়াবেগের রূপ লইয়াছে। গোবিন্দমাণিক্যের সংঘাত শুধু গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও তন্ত্রপূজার সমর্থক রঘুপতির সঙ্গে নহে, তাঁহার নিজ পারিবারিক কেন্দ্র পর্যন্ত ইহা আরও মর্মান্তিকভাবে প্রসারিত। বিক্রম ও সুমিত্রার মর্মভেদী বিচ্ছেদের স্মৃতি নাট্য-কারের মনে পুনর্জাগরিত হইয়া তাঁহাকে গুণবতী চরিত্রের উদ্ভাবনায় ও স্বামীর প্রতি তাঁহার চিত্তবিমুখতার কল্পনায় প্রণোদিত করিয়াছে।

নাটকটির নায়ক কে সে সম্বন্ধে নানা বিরুদ্ধ অভিমত পোষণ করা সম্ভব ও স্বাভাবিক। নাটকের ভাব-আলোড়ন যাহার চরিত্রে প্রবলতম প্রতিক্রিয়া জাগায় ও মর্মকথা যাহার মধ্যে কেন্দ্রীভূত রূপ ধারণ করে সেই প্রকৃত প্রস্তাবে নায়কপদবাচ্য। এই মানদণ্ডে বিচার করিলে নায়কপদবীতে জয়সিংহের দাবী সর্বাগ্রগণ্য মনে হয়। রঘুপতির দ্বন্দ্ব এককেন্দ্রিক ও ইহা তাত্ত্বিকতার উপাদান প্রধান। সে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতীকরূপে রাজশক্তির প্রতি স্পর্ধিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানাইয়াছে। ইহার সঙ্গে গৌণভাবে যুক্ত হইয়াছে জয়-সিংহের সহিত তাহার স্নেহকোমল, সময় সময় দ্বিধাচঞ্চল সম্পর্ক ও উহার উপর একটা অসপত্ন অধিকারবোধ। ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা ও সংকল্পদুর্জয়তার দিক দিয়া তাহার স্থান নাটকে সর্বোচ্চে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি যোগ্য উপলক্ষ্যের সহিত সংযুক্ত না হইলে, মর্মগভীরতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত না হইলে উহার অধিকারীকে নায়কপদে উন্নীত করিতে পারে না। রঘুপতি যতদিন গোবিন্দমাণিক্যের সহিত প্রতিরোধ-সংগ্রামে ব্যাপৃত আছে ততদিন তাহার মধ্যে একটা অন্ধ, নীতিহীন অধিকারপ্রতিষ্ঠার আক্রোশই প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। ইহা তাহার সত্তাশক্তির পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু নৈতিক মহিমার বিন্দুমাত্র ইহাতে নাই। যে ব্যক্তি গোবিন্দমাণিক্যের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য ভ্রাতৃহত্যায় উত্তেজিত করিতে পারে, রাজপরিকরবর্গের আনুগত্যনাশের কুমন্ত্রণা যোগায়, এমন কি নিজ পুত্রবৎপ্রিয় শিষ্যকে বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে সর্বব্যাপী হনন-প্রক্রিয়ার বিশ্বনীতিমূলক তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার মনের গভীরে অরাজকতাদর্শনের বীজ বপন করিতে পারে, সে যে ট্র্যাজিক নায়কের গৌরব-বঞ্চিত তাহা নিঃসন্দেহ। সে যে ধর্মরক্ষক হইয়াও ধার্মিক নয়, রাজশক্তি ও

দৈবশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বকে যে আদর্শলোক হইতে একটা হীন ক্ষমতালোলুপতার পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছে, ভক্তিমূঢ় জনসাধারণকে প্রতারণা করিতে যে তাহার বিবেক-বুদ্ধিতে তিলমাত্র বাধে না ইহাই তাহার নায়কত্ব-স্বীকৃতির বিপক্ষে প্রধান যুক্তি। জয়সিংহের প্রতি তাহার অধিকারবোধের মধ্যেও একটা উগ্র অসহিষ্ণুতা প্রকট—জয়সিংহের গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি ভক্তি ও অপর্ণার প্রতি মানবিক আবেগময় সহানুভূতি সবই সে ঈর্ষাকষায়িত চক্ষে নিরীক্ষণ করে। তাহার চরিত্রের ট্র্যাজিক মহিমা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে জয়সিংহের মৃত্যুর পর, তাহার আজন্মপোষিত, বদ্ধমূল সংস্কারের উন্মূলনে ও জয়সিংহের প্রতি লালিত স্নেহকে এক মুহূর্তে অপর্ণার প্রতি প্রয়োগ। 'রাজা' নাটকে কাঞ্চীরাজের মত এখানেও রঘুপতির মধ্যে যে সুপ্ত মহত্ত্ব নিহিত ছিল তাহা উন্মেষিত হইয়াছে দৈবের এক নিদারুণ আঘাতে, হৃদয়বৃত্তির এক আমূল পরিবর্তনে। যে পর্বতচূড়া অক্ষত থাকিতে লতাগুল্মজালের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল তাহাই বজ্রদীর্ণ হইয়া রিক্ত, দগ্ধ নিঃসঙ্গতায় এক করুণ মহিমামণ্ডিত হইয়া দেখা দিল।

গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে যে নায়কোচিত উদার স্বভাবমহিমা বর্তমান তাহা অনস্বীকার্য। তবে তাঁহার মধ্যে যে নায়কের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় গুণের—সংগ্রামশীলতার একান্ত অভাব তাহাও সুনিশ্চিত। তাঁহার অন্তরবেদনা অন্তরের মধ্যেই আবর্তিত হইয়াছে। কদাচিৎ বাহিরে কোন তীব্র সক্রিয়তায় তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। রঘুপতির সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ সম্পূর্ণ আদর্শমূলক; তবে তাঁহার আন্তরিক প্রত্যয় রঘুপতি অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়ায় তাঁহার মনোবেদনাও সোচ্চার না হইয়াও বেশী মর্মভেদী। এই বাহিরের সংঘর্ষের সহিত অন্তঃপুরের সহানুভূতি-কামনার অতৃপ্তির বেদনা সংযুক্ত হইয়া গোবিন্দমাণিক্যের সত্তাকে অনুভূতি-গভীরতা দিয়াছে। স্ত্রীর অসহযোগ ও বিমুখতা, ভাই-এর অবিশ্বাসিতা, রাজকর্মচারীবৃন্দের আনুগত্য-শিথিলতা সব মিলিয়া তাঁহার জীবনকে এক বিক্ষুব্ধ পরিবেশে আবদ্ধ করিয়াছে। তথাপি ইহাদের প্রতিক্রিয়া অন্তর-সংবৃত ও বাহ্য-উত্তাপহীন হওয়ায় তিনি অনেকটা আদর্শের প্রতীকই রহিয়া গিয়াছেন। রক্তমাংসের মানবচেতনা তাঁহার মধ্যে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং নাটকে তিনি একটি প্রধান চরিত্র হইলেও নায়কত্বের শীর্ষদেশে উঠিতে পারেন নাই।

এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দাবী বাদ দিলে জয়সিংহের প্রাধান্যই নিঃসংশয়ে গৃহীত

হইতে পারে। জয়সিংহের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যত বহুমুখী ও গভীরপ্রসারী এমন আর কাহারও ক্ষেত্রে নহে। তাহার সমস্ত মানস-সংস্থা যেন দুর্নিবার ভূকম্পনে বিপর্যস্ত হইয়াছে। রঘুপতির পরস্পরবিরোধী নীতিব্যাখ্যা তাহার মনে এক দারুণ স্ববিরোধ ও গভীর শূন্যতাবোধের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার অন্তর রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য এই উভয়ের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে তুমুলভাবে আন্দোলিত হইয়াছে। তাহার সমস্ত নৈতিক জগৎ দ্বিধা-বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন করিয়াছে। সে কখনও কর্তব্য-পালনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে, পরমুহূর্তে সমস্ত নীতি-আশ্রয়-বিচ্যুত হইয়া জীবনের সর্বতোমুখী অসারতায় দিশাহারা হইয়াছে। ইহার উপর অপর্ণার প্রতি তাহার সঙ্গলিপ্সা ও আকর্ষণ ও রঘুপতির কড়া নিষেধের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বকে উদ্‌ভ্রান্তির পর্যায়ে লইয়া গিয়াছে। তাহার সংলাপ ও স্বগতোক্তিগুলিই এই মানস বিপর্যয়ের মর্মবিদারী প্রকাশ। তাহার আত্ম-বলিদান একদিকে যেমন একটি অপ্রত্যাশিত ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটাইয়াছে, অন্যদিকে রঘুপতি ও অপর্ণার জীবনধারাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া সমস্ত নাটকের ভাবতাৎপর্যটিকে এক অভাবনীয় পরিবর্তনের পথে চালিত করিয়াছে। জয়সিংহের বেদনা সমস্ত নাটকটির অন্তর্নিহিত বেদনার রক্তপদ্ম ও উহার প্রগাঢ় ব্যঞ্জনা সেই রক্তপদ্মের সুরভিত ভাবনির্যাস।

'বিসর্জন'-এর ঘটনাবিন্যাসও খানিকটা অসম ও এলোমেলো মনে হয়। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই নিঃসন্তানা রাজমহিষীর সন্তানকামনার ব্যাকুলতার বর্ণনা যেন এইটিকেই নাটকের মূল সুররূপে নির্দেশ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে বলিদানবন্ধ ব্যাপার লইয়া রাজার সহিত রাণীর যে আবেদন-নিবেদন-করুণ মতবিরোধ ঘটিয়াছে তাহাতে রাণীর এই অপত্যবুভুক্ষার কোনই উল্লেখ নাই। রাজা যে ধ্রুবকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রথম সংবাদ আমরা পাই রাণী কর্তৃক নক্ষত্ররায়ের দ্বারা শিশু-হত্যার প্ররোচনায়, অথচ রাজা-রাণীর বহু সংলাপের মধ্যে এই বিরোধের গভীর-প্রোথিত কাঁটাটি একবারও খচ্-খচ্ করিয়া উঠে নাই। সুতরাং মনে হয় রাজা-রাণীর বিরোধটি পূর্ব পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে, কতকটা কৃত্রিম সংযোজনা। দ্বিতীয় দৃশ্যেও রঘুপতি ও রাজার যে বিরোধ চরমে উঠিয়াছে, উহার ধূমায়িত প্রথম অবস্থাটি নাটকে উহ্য আছে। তৃতীয় দৃশ্যে রঘুপতি জয়সিংহের পারস্পরিক স্নেহ-ভক্তিসম্পর্কটি বিশদ হইবার পূর্বেই জয়সিংহের সহিত অপর্ণার সাক্ষাতে জয়সিংহের ক্লান্ত নিঃসঙ্গতাবোধ আভাসিত

কাছে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বপ্নের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। উহার বিষয় কিন্তু ধর্মবিরোধ নয়, রাজবিদ্রোহী দুই বন্ধুর মধ্যে একের আকস্মিক মতপরিবর্তন ও গোপন ষড়যন্ত্রের প্রকাশ। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে কবির ব্যক্তিজীবনে ধর্মানুভূতির তত্ত্বনির্মুক্ত এক আবেগ-ও-কর্মময় রূপান্তর। এই দুই মিলিয়া নাটকের ভাবদেহ গঠিত হইয়াছে।

মালিনী এক নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে, যাহা বাহ্যতঃ বৌদ্ধধর্ম কিন্তু বস্তুতঃ সর্বজনপ্রসারিত দয়ার প্রবাহে শীতল ও অন্তরের সাধনাস্ফূর্ত আলোকে জ্যোতির্ময়। উহার সহিত বিরোধ পুরাতনশাস্ত্রনির্দিষ্ট ও বিধিনিষেধশৃঙ্খলিত হিন্দুধর্মের। কিন্তু নাটকে এই বিরোধের তাত্ত্বিক রূপটি একেবারেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। নাটকে আমরা পাই মালিনী-চরিত্রের ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ, সর্বসাধারণের সহিত তাহার সহজ, অমোঘ সহানুভূতি ও একাত্মতা। সে যেন মন্ত্রবলে সমস্ত বিরোধ জয় করিয়াছে, সেনাদের বিদ্রোহোন্মুখতা ও ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর বদ্ধমূল বিরাগ তাহার ব্যক্তিসত্তার ইন্দ্রজালপ্রভাবে যেন অকস্মাৎ বিপরীত স্রোতে বহিয়াছে। এইখানেই নাটকটির দুর্বলতা। মালিনীর যে চরিত্রমাধুর্য কাব্যরসসঞ্চারে ফুটিয়াছে, তাহার কোন নাটকীয় বস্তুঘনতা বা বিশ্লেষণযোগ্যতা নাই। কাজেই নাটকীয় পরিণতির হেতুরূপে ইহা অনেকটা অনির্ণীতই থাকিয়া যায়।

মালিনী লালিত হইয়াছে স্নেহাতিশয্যের এক আশঙ্কা-উদ্বেল পারিবারিক পরিবেশে। সে বালিকা মাত্র, মাতার নয়নের মণি, পিতার অতন্দ্র অভিভাবকত্বের পক্ষপুটে ঢাকা। মাতার নিকট সে যে নিজ নবলব্ধ ধর্মের আভাস দিয়াছে তাহা কন্যার শৈশবস্মৃতিবিভোর মাতৃচিত্তে বিস্ময় ও অবিশ্বাসেরই উৎপাদন করিয়াছে। মাতা তাহাকে ব্রতানুষ্ঠানপ্রধান প্রাচীন ধর্ম ও নারীহৃদয়ের নিঃসন্দেহ আবেগ-আচরণকেই নিজ আশ্রয়রূপে অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন। রাজা যখন প্রজারা মালিনীর নির্বাসনদণ্ডপ্রার্থী এই সংবাদ জানাইয়াছেন, তখন রাণী নিজের পূর্ব-উপদেশ ভুলিয়া মালিনীর ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপন করিয়াছেন ও মালিনীও প্রজার সহিত মিশিবার উপায়রূপে এই নির্বাসনদণ্ডকে যাচ্ঞা করিয়াছে। শেষে মালিনী নিজ ধর্মাদর্শের যে স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয়ের অনুগামী কিন্তু নাটকে এই তরীর উপমা বেগের প্রতীক ছাড়া আর কোন সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিচয় বহন করে না।

প্রথম দৃশ্যে কোথাও প্রশান্ত-গম্ভীর, কোথাও বা ব্যাকুল আত্মসন্ধানের সুরে

পূর্বস্মৃতিরোমন্থন ও নব যাত্রার আকৃতি। ইহাতে নাটকীয় সংঘাত অপেক্ষা কাব্যধর্মই প্রবলতর। দ্বিতীয় দৃশ্যে উত্তেজিত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উত্তর-প্রত্যুত্তরে, বিশেষতঃ সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকরের বিপরীততত্ত্ব-প্রতিপাদনে নাটকীয়তার উন্মেষ ঘটিয়াছে, যদিও ক্ষেমংকরের ভাষণবিস্তারে কাব্যধর্মের প্রভাবও লক্ষণীয়। তাহার পর সৈন্য-আনয়ন-প্রস্তাবে বলপ্রয়োগবিরোধী ব্রাহ্মণদের তীব্র অসম্মতি-জ্ঞাপন ও প্রলয়ংকরী দৈবশক্তির আবাহন। ঠিক সেই মুহূর্তে মালিনীর প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের চিত্তে মোহজালবিস্তার। মালিনীর নবধর্ম-প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণ করিলে দুইটি উপাদান পাওয়া যায়—প্রথম, রাজান্তঃপুর-অবরোধ হইতে বহিরাগমন করিয়া সমস্ত জাতির সহিত অবাধ মিলন, দ্বিতীয়, চন্দ্রালোকস্নিগ্ধ প্রকৃতি-সৌন্দর্যের পটভূমিকায় সমস্ত বিশ্বের ধর্মক্ষুধাশান্তির অঙ্গীকার। কোন ব্রাহ্মণই এই প্রতিশ্রুতির অন্তর্নিহিত যাথার্থ্য যাচাই করিয়া দেখিল না। সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকরের মধ্যে এই নবধর্ম লইয়া উচ্চমনীষাসম্পন্ন আলোচনা হইয়াছে। তাহাতে সুপ্রিয় যে সর্বপ্রথম প্রাণময়, গতিশীল ধর্মের সন্ধান পাইয়াছে তাহা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু ক্ষেমংকর এক সুদীর্ঘ ভাষণে এই ধর্ম যে জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় মায়াময় ও ইহার গ্রহণে যে খাণ্ডবদাহনের মত দাবানল উত্থিত হইয়া পিতৃকুলসমাশ্রিত প্রাচীন ধর্মের বিরাট বটবৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়া দিবে তাহাই দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিপন্ন করিয়াছে। সুপ্রিয় ক্ষেমংকরের বাগ্মিতায় মুগ্ধ হইয়া প্রাচীন ধর্মের রক্ষক হইতে স্বীকার করিয়াছে ও বহিরাগত সৈন্যের সাহায্যে নবধর্ম-উন্মূলনের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছে। এইখানেই নাটকীয় ক্রান্তিমুহূর্তের বীজ উপ্ত হইয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্যে মালিনীর নবধর্মের উল্লাসময় বিজয়-অভিযানের একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রজাসাধারণ ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ মালিনীর এই ধর্ম-প্রচারে, বিশেষতঃ তাহার সার্বজনীন দয়াতে মুগ্ধ, অভিভূত। ইহার তত্ত্বের দিকটা ও প্রাচীন ধর্মের সহিত ইহার মূল পার্থক্য গৌণ হইয়া পড়িয়াছে—ইহার আবেগময় তৃপ্তি ইহার সম্বন্ধে সমস্ত সতর্ক বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। প্রাসাদ-অন্তঃপুর ও সার্বভৌম জনজীবনের ব্যবধান যেন এক উত্তাল অনুভূতির তরঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। মালিনী নিজে জয়গৌরবের উৎফুল্লতা ও আপনার বালিকা-চিত্তের এক অসম্ভব ভাবোচ্ছ্বাসের বিপুলতার মধ্যে দ্বন্দ্বে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রাণী নিজ কন্যার এই অকল্পিত শক্তির পরিচয়ে যেমন অভিভূত, তেমনি ইহার পরিণাম-চিন্তায় শঙ্কিত। তিনি এই নবধর্মের ছেলেখেলাকে

বিশেষ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই—বিবাহের চিরাভ্যস্ত কল্যাণ-পরিণতি যেন এই বিপদজনক, অনিশ্চিত পরীক্ষার অবসান ঘটায় এই প্রার্থনাই তিনি করিয়াছেন। এই স্নেহ-শংকা, সূক্ষ্ম অন্তর-অনুভূতির আলোছায়ায় কল্পিত মনোভূমি কতখানি নাটকের দৃঢ় পদক্ষেপের উপযুক্ত হইয়াছে সে বিষয়ে সংশয় স্বাভাবিক।

চতুর্থ দৃশ্যে মালিনী ও সুপ্রিয়ের মধ্যে সংলাপে মালিনীর ধর্মবিষয়ক স্থির অন্তরপ্রত্যয় যেন অনেকটা সংশয়ান্বিত ও দ্বিধাদুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সে নিজ ধর্মের উৎস ও স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণ মনোবল অনেকটা হারাইয়াছে ও ইহা তাহার নিকট এক অনিশ্চিত ভাবাদর্শরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এই অস্পষ্ট, কুহেলিকাজড়িত ধর্মবোধ নাট্যসংঘাতের দৃঢ়ভিত্তিরচনার যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এখানে মালিনীর ধর্মবোধের সহিত আর একটি সুকুমার, নবোন্মোষিত হৃদয়াবেগের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সুপ্রিয় ও মালিনীর মধ্যে সম্পর্ক ধর্মচর্চা হইতে আর একটু নিগূঢ় অন্তরঙ্গতায় উন্নীত হইয়াছে। সুপ্রিয় বিশেষভাবে মালিনীর ধর্মোপদেশনার জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত রাখিবে বলিয়াছে ও এই উপলক্ষ্যে ক্ষেমংকর ও তাহার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কিছুটা পরিচয় দিয়াছে। এই দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে সে যে বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসরক্ষার অমর্যাদা করিয়াছে ও বিদেশী সৈন্য-আনয়নের চক্রান্ত উচ্চতর কর্তব্যের আহ্বানে রাজার নিকট ফাঁস করিয়াছে তাহা জানাইয়াছে। এইখানেই নাটকীয় চরক মুহূর্তের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মালিনী বিশ্বাস করে যে সে ক্ষেমংকরের উপরেও নিজ আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিত।

ইতিমধ্যে রাজা আক্রমণকারী সৈন্যকে পরাভূত ও ক্ষেমংকরকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়াছেন ও সুপ্রিয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে তাহাকে কন্যাদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব মালিনীর সুপ্ত প্রেমবৃত্তির সমর্থন পাইয়াছে, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ববিক্ষত সুপ্রিয় বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যে ক্রীত এই সুখস্বর্গ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মালিনী রাজার নিকট ক্ষেমংকরের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে ও রাজা আবেগময় কাব্যভাষায় দুহিতার প্রথম সলজ্জ নবারুণ প্রেমোন্মেষের অপূর্ব শ্রী বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহার পরেই ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয়ের ধর্মাদর্শের বিভিন্নতার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাটকীয় চরমমুহূর্ত আসন্ন হইয়াছে। এই বিচার-বিতর্কের মধ্যে যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও গভীর হৃদয়ালোড়ন সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাতেই ইহা

কাব্যসৌন্দর্য হইতে নাট্যমহিমায় উন্নীত হইয়াছে। বিশেষতঃ ক্ষেমঙ্করের উক্তিসমূহের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুর উহাদিগকে যেন বহ্নিজ্বালাময়ী করিয়াছে। সুপ্রিয় বন্ধুর শ্লেষকে নিজ অন্তরের পরীক্ষিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধর্মবিষয়ে উদার মতপার্থক্যের যে অবসর আছে তাহা জানাইয়াছে। ক্ষেমঙ্কর একমাত্র মৃত্যুমানদণ্ডের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছে ও তাহারই দাঁড়িপাল্লায় নিজেদের বিরুদ্ধ মতবাদ যাচাই করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। আর কোন অবসর না দিয়া মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রতীক্ষমান ক্ষেমঙ্কর সুপ্রিয়কে শৃঙ্খলপ্রহারে মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে ও উভয়ের মতকেই এই অমোঘ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে। সুপ্রিয়ের মৃত্যুর পর মালিনী তাহার নবধর্মাদর্শপ্রসূত দয়ার প্রেরণায় ক্ষেমঙ্করের জীবন ভিক্ষা লইয়াছে ও মৃত্যুর বিচারালয় হইতে জীবনের দুরূহতর পরীক্ষায় তাহাদের বিরুদ্ধ ধর্মাদর্শের সত্যতার শেষ প্রমাণ দিয়াছে।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে মালিনীর কাব্যধর্মের মর্মমূলে নাটকের ঘূর্ণীবেগ প্রবল ধারায় প্রবাহিত। উহার তাত্ত্বিকতাও ঋজু ও অবিসর্পিত প্রকাশভঙ্গীতে ও হৃদয়াবেগের উত্তাপে নাট্যগুণ-সম্পন্ন। এই নাটকটিতে ইংলণ্ডের কোন কোন বিদগ্ধ সমালোচক গ্রীক্ ট্র্যাজেডির সাধর্ম্য অনুভব করিয়াছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে তিনটি তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়। প্রথমতঃ, ইহার ট্র্যাজিক আবেদন স্বল্পতম উপকরণনির্ভর, ইহার সংকীর্ণ পরিসর-পরিধির মধ্যে একটি ঋজু ও প্রত্যক্ষ ঘটনাস্রোত প্রবহমান। ইহাতে কোন শাখাকাহিনী আখ্যানরসকে কোন জটিল পথে পরাবৃত্ত করে নাই। গ্রীক্ ট্র্যাজেডির ঘটনা ও স্থানগত ঐক্য ও কিয়ৎপরিমাণে কালগত ব্যবধানের স্বল্পতা ইহার মধ্যে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীক্ ট্র্যাজেডির অশুভশংসী পূর্বাভাস ও গীতিসুরের সংযত, কেন্দ্রানুগামী অভিপ্রকাশ এখানে রাণীর অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও মালিনীর নিজের মুহুর্মুহুস্তিমিত আত্মপ্রত্যয় ও অনির্দেশ্য কল্পনানুভূতির মধ্যে দৈবের ইঙ্গিতের মত প্রতিভাত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, গ্রীক্ নাটকের ন্যায় এখানেও বিপদ-পরিণতি আসিয়াছে বন্ধু বা নিকট আত্মীয়ের মধ্যবর্তিতায়, স্নেহকোমল স্পর্শ যেন দৈবদুর্বিপাকে বজ্রমুষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত গুণসাধর্ম্যের জন্যই রবীন্দ্রনাটকের ভাবকেন্দ্র ও ঘটনাবিন্যাসের পার্থক্য সত্ত্বেও ইহার মূল আবেদন অনেকটা গ্রীক্ ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমায় 'মালিনী' নাটকের

ও কন্যা খেয়াল-মাফিক বদল হইতে হইতে হঠাৎ এক সময় ঈপ্সিত মিলনে পরস্পরকে লাভ করে ; এমন কি অভিভাবকশ্রেণী পর্যন্ত তাহাদের গাম্ভীর্য ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি হারাইয়া তরুণদের খেয়াল-খেলায় যোগ দেয়। দাম্পত্য কলহে প্রাচীন শাস্ত্রমত বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া ; অসম্ভব প্রতিজ্ঞা মুহূর্তে কর্পূরের মত উবিয়া যায় ; তরুণী পুরুষের ছদ্মবেশে প্রেমিকের চিত্ত জয় করে। অবাঞ্ছিত বা অমনোনীত পাত্র-পাত্রীর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা অতি সহজেই সম্ভব হয়।

সকল দেশের কাব্য-সাহিত্যেই প্রণয়কলাচর্চার একটি প্রথাসিদ্ধ শিল্পরূপ নির্মিত হইয়া থাকে। উহাতে প্রণয়ীর ভাবমুগ্ধতা, সরস বাক্যবিন্যাস ও আচরণ-রীতির রমণীয়তা বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া এক আদর্শ পরিবেশ রচনা করে। ইংরেজি সাহিত্যে মধ্যযুগে প্রেমাদর্শের প্রথম উদ্ভব হইলেও ইহার তত্ত্বাধিক্য ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব ইহার ভাবমাধুর্যকে অনেকাংশে ক্ষুন্ন করে। সিডনির 'আর্কেডিয়া' ও লিলির 'ইউফিয়ুস' প্রণয়-সংহিতা-রূপে গৃহীত হইলেও উহাদের মধ্যে প্রেমরসস্ফুরণ অপেক্ষা এক কৃত্রিম, অলঙ্কারবহুল বাগ্‌রীতিই অধিক পরিমাণে অনুশীলিত হইয়াছিল। ইহাদের কিছু পরে শেক্‌স্‌পিয়ারের As You Like It প্রভৃতি রোমান্সধর্মী নাটকেই প্রণয়সম্মোহের বিদ্যুৎস্ফুরণ, উহার ভাষা ও ভাবের মধ্যে এক দুর্বার, অথচ সূক্ষ্মভাবে যাথার্থ্যানুসারী প্রাণোচ্ছ্বাস উহার ছন্দটি চিরকালের জন্য নিরূপণ করিয়া দেয়। প্রণয়রীতির ধরন-ধারন, উহার দ্রুতস্পন্দিত আবেগচাঞ্চল্য উহার স্থান ভাবোন্মাদের একটি পর্যায়ে নির্দিষ্ট করে।

রবীন্দ্রনাথের এই নাটকদ্বয়ে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যভাবধারাপুষ্ট, অথচ প্রাচীন সংস্কারের মাদকতা-জারিত, নূতন সৌন্দর্যপিপাসা ও অনির্দেশ্য অতৃপ্তিতে ক্লিষ্ট, তরুণ মনের স্বপ্নাতুর, অথচ বাস্তবসচেতন প্রণয়াবেশের একটি কল্পসুন্দর পরিবেশ রচিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে অন্য কোন বাংলা নাটকে প্রণয়ের অনুকূল এরূপ কোন আবহাওয়া দেখা যায় না। মধুসূদনের দুইটি প্রহসনে স্থূল ইন্দ্রিয়-লালসা ও সুরাপানমত্ততা বারবিলাসিনীর কৃত্রিমবিলাসবিকৃত কুৎসিত ও বীভৎস আবেষ্টনে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে কামনার অতি স্থূল, অমার্জিত প্রকাশ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার, যিনি প্রণয়লীলার একটি সুরুচিপূর্ণ ও পরিহাস-রসিকতায় স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতির প্রকাশে রমণীয় ভাবাবহ সৃষ্টি করিয়াছেন। 'গোড়ায় গলদ'-এ কয়েকটি যুবকের প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্য কয়েকটি তরুণীর স্বভাবমাধুর্যের সহিত অন্বিত হইয়া ও ভুল বোঝাবুঝির ফলে এক কৃত্রিম বাধার

গোলোকধাঁধায় ঘুরিয়া জ্যামুক্ত তীরের ন্যায় বর্ধিতবেগে লক্ষ্যের মর্মস্থল ভেদ করিয়াছে। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এ চিরকৌমার্যপালনের প্রতিজ্ঞা সহজসিদ্ধ প্রেমাকুলতার অনুপ্রবেশে খণ্ড-খণ্ড হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছে ও তরুণ হৃদয়ের প্রণয়তৃষাকে আরও অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে। নাটকদ্বয়ের আকাশ-বাতাস প্রেমের বৈদ্যুতীশক্তিতে স্পন্দমান; আভাসে, ইঙ্গিতে, খেদে মননে, নিষ্কর্মার অলস কল্পনায়, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর বিস্রব্ধ গুঞ্জনে সর্বত্রই প্রণয়চেতনার অণুপরমাণু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এক দক্ষিণা পবন মনের অলি-গলিকে সৌরভসিঞ্চিত করিয়া প্রেমের শতদল ফুটাইবার আয়োজনে চিরপ্রবহমান। এমন কি প্রেমের অস্বীকৃতিও স্বীকৃতিরই বিপরীত অর্থ দ্যোতনা করিতেছে। বাংলা গদ্যের এরূপ অনুরাগমধুর, এরূপ প্রণয়বিহ্বল সুরঝঙ্কার ও ভাবব্যঞ্জনা পূর্বে কোথাও শোনা যায় নাই। সংস্কৃত প্রেমকবিতা এই গদ্যসংলাপের ভিত্তি রচনা করিয়াছে—সংস্কৃত শ্লোকের পরাগসুরভি আধুনিক যুগের চলমান দূরপ্রসারিত হৃদয়াবেগের বায়ুচালিত হইয়া নব নব ভাবক্ষেত্রে সংক্রামিত হইয়াছে। রসিকের উচ্চারিত শ্লোকসমষ্টি শ্রীশ, বিপিন ও পূর্ণের মনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছে। এই শ্লোকে উদ্দিষ্ট নৈর্ব্যক্তিক নায়িকা বিশেষ বিশেষ নায়িকাসত্তার স্মৃতিসংশ্লিষ্ট হইয়া ব্যক্তি-হৃদয়ের প্রণয়তৃষাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকে যাহা ছিল স্থাবর বাংলা নাটকে তাহা জঙ্গমে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকের মুদিত পদ্মকোরকে আবদ্ধ,মৃদুগুঞ্জনরত প্রণয়-ভ্রমর বাংলা সাহিত্যের মুক্ত আকাশে মধুমত্ত প্রগল্‌ভতায় উড্ডীন হইয়া দিক্-বিদিক মুখরিত করিয়াছে। যে পারিবারিক ও বান্ধব-পরিবেশ রবীন্দ্রনাটকে প্রণয়চর্চাকে একটি নিবিড় কবোষ্ণতা দান করিয়াছে তাহার অভাব ও বিশেষ করিয়া তরুণ-তরুণীর প্রথমমিলনসঙ্কোচের অপসারণ রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যে প্রেমের উদ্ভব-রহস্য ও প্রকাশছন্দকে যেন তাহার আবেশ-ঘনতা হইতে মুক্তি দিয়াছে। কমলমুখী, ইন্দুমতী, পুরবালা, নৃপবালা, নীরবালা এমন কি বিধবা শৈলবালা সকলেই সংস্কৃত নায়িকার কুল-ঐতিহ্য-অনুসারিণী; অক্ষয় ও রসিক আধুনিক যুগে জন্মিয়াও প্রাচীন সংস্কৃতির রসসায়রে অভিস্নাত। তাহাদের প্রণয়োন্মেষ ও প্রেমকলার চর্চা কালিদাসের যুগ না হইলেও বৈষ্ণব-পদাবলীর যুগ পর্যন্ত পিছন ফিরিয়া তাকায়। আধুনিক কালের প্রণয়ী দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের বন্ধনমুক্ত—তাহার আদর্শ স্বদেশী সমাজ নয়, বিশ্বসমাজ। রবীন্দ্র-রচনায় ভারতীয় প্রেমকাহিনী উহার কুসুমদলগ্রথিত, ভাবসৌকুমার্যমণ্ডিত অন্তিম শয্যা বিছাইয়াছে।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রণয়প্রসঙ্গহীন খেয়ালীপনা ও ঠকামির কৌতুককর নাট্য-বিবৃতি। বৈকুণ্ঠ একজন সঙ্গীততত্ত্ববিদ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রাচীন পুঁথিসংগ্রাহক, উদারচেতা, সংসারবুদ্ধিহীন ব্যক্তি। তাহার খেয়াল হইল বাহিরের অতিথি-অভ্যাগতকে তাহাদের ক্লান্তি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহার রচনা পড়িয়া শোনান। কেদার নামে একজন শঠ ব্যক্তি তাহার শ্যালিকাকে বৈকুণ্ঠের ভাই অবিনাশের সঙ্গে বিবাহ দিবার ও এই আত্মীয়তাসূত্রে তাহাদের বাড়ীতে বাসের কায়েমি স্বত্বপ্রতিষ্ঠার মতলব লইয়া তাহাদের নিকট আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহার সঙ্গী ও সহকারী তিনকড়ি এক সরল ও সঙ্কোচহীন যুবক, যে উদরের তাগিদে সূক্ষ্মতর আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। নাটকের প্রারম্ভে কেদার ও তিনকড়ির সঙ্গে বৈকুণ্ঠের প্রথম পরিচয় ও তাহার খাতার শ্রোতা হিসাবে উহাদিগকে কাজে লাগাইবার সূচনা। কেদারের ধৈর্যের বড় কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গেল—একদিকে অবাঞ্ছিত বিষয়ের ক্লান্তিকর পাঠশ্রবণ, অন্যদিকে তাহার গোপন উদ্দেশ্যপূরণের উপায়ের প্রতীক্ষা—এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তাহার ধৈর্য পুনঃপুনঃ বিপর্যস্ত হইয়াছে। এদিকে অবিনাশেরও প্রথম গাছকেনার শখ মনোরমার সহিত বিবাহ-প্রস্তাবের পর প্রণয়োপহারদানের যোগ্যভাষানির্বাচনে অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে কিছুতেই তৃপ্তি-না-পাওয়া রুচিবিকারে ঘনীভূত হইয়াছে ও এই ব্যাপার অনাবিল হাস্যরসের উপাদান যোগাইয়াছে।

শেষ পর্যন্ত কেদারের উদ্দেশ্য আপাতসিদ্ধ হইয়াছে। সে শ্যালীর বিবাহের পর বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশের গৃহে শুধু নিজেকে নয়, নিজের সমস্ত অবাঞ্ছিত আত্মীয়স্বজনদেরও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ও নানাবিধ উৎপাতের দ্বারা নিরীহ বৈকুণ্ঠকে ঘরছাড়া করিবার উপক্রম করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে অবিনাশের শুভবুদ্ধি ও প্রতিকারস্পৃহা এই অত্যাচারে জাগ্রত হইয়াছে ও সে বৈকুণ্ঠের আপত্তি সত্ত্বেও তাহার অনধিকারপ্রবেশকারী আত্মীয়দের বহিষ্কার করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কেদারের শঠবুদ্ধি ব্যর্থ ও তিনকড়ির ভবিষ্যৎবাণী সফল হইয়াছে।

নাটকটি হাস্যরসের প্রাচুর্যে ও কৌতুককর ঘটনার পৌনঃপুনিক আবর্তনে প্রহসন-পর্যায়ভুক্ত হইতে পারিত, কিন্তু ইহার সংলাপের মননশীল বৈদগ্ধ্য ও মাঝে মধ্যে গভীরতর আবেগের উপস্থিতি ও করুণরসের ফল্গুপ্রবাহের জন্য ইহা উচ্চতর কমেডির স্তরে উন্নীত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠ উৎকেন্দ্রিক হইলেও স্বভাব-

মহান; তাহার খাতা হাসির উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিলেও সঙ্গীতের উচ্চ আদর্শের অনুভবে ও উহার বর্তমান অধোগতির জন্য ক্ষোভপ্রকাশে ইহা সমুন্নত সাহিত্য-মর্যাদায় আসীন হইয়াছে। বৈকুণ্ঠের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানসের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। নাট্যকার তাহার বেকুবি সম্বন্ধে যেরূপ সজাগ তাহার উদারতা সম্বন্ধেও সেইরূপ অবহিত। বৈকুণ্ঠের চরিত্রমাধুর্য তাহার সমস্ত খেয়ালী আচরণের মধ্যেও পাঠককে গভীরভাবে স্পর্শ করে। ঈশানের রূঢ়ভাষিতা ও প্রভুভক্তি একই সূত্রে গ্রথিত; তথাপি মুনিব যখন তাহার অবাধ্যতায় সত্যই রাগ করেন, তখন তাহার আন্তরিক অনুতাপ তাহাকে আমাদের নিকট জীবন্ত করিয়া তোলে। এমন কি কূটবুদ্ধি ও স্বার্থপর কেদারের উপরও আমরা খুব রাগ করিতে পারি না। যে যাহা হইয়াছে তাহা অভাবের তাড়নাতেই হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহার সরল আত্ম-উদ্‌ঘাটন তাহার চক্রান্তকে আমাদিগের নিকট অনেকটা সহনীয় করে। যে শঠ তাহার শাঠ্য সম্বন্ধে অকপট তাহার প্রতি আমাদের মনের কোণে কিছুটা মার্জনা সঞ্চিত থাকে। তিনকড়ির প্রতি তাহার হৃদয়হীন আচরণই তাহার প্রতি আমাদের কিছুটা ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে। শেষ পর্যন্ত যখন তাহার সমস্ত শঠ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল, যখন সিদ্ধির কূলে পৌছিয়া তাহার সাধনার তরীর ভরাডুবি হইল, তখন আমরা এই শাস্তিতে আমাদের ন্যায়বুদ্ধির পূর্ণ পরিতৃপ্তি অনুভব করি ও তাহার বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত অভিযোগ ধুইয়া মুছিয়া যায়। এই চরম লাঞ্ছনার মুহূর্তে তাহার সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ীর জন্য হুকুম তাহার অফুরন্ত প্রাণশক্তির ইঙ্গিতরূপে আমাদিগকে তাহার প্রতি অনুকূলভাবাপন্ন করে ও এই ঘোড়ার গাড়ীতে সওয়ার হইয়া আবার সে কোন্ নূতন অভিযানে বাহির হইবে এই কল্পনা আমাদের নিকট নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। তিনকড়ি চরিত্রটিও দুর্ভাগ্যকে সহজ-প্রসন্নভাবে গ্রহণ, উদাস নিস্পৃহতা, অক্ষুণ্ণ ন্যায়মর্যাদাবোধ ও আশ্চর্য বাচনদীপ্তির জন্য খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। অবিনাশ স্বল্পপরিসরে অঙ্কিত হইলেও, সে যে নূতন প্রেমের মাদকতায় কর্তব্যভ্রষ্ট হয় নাই ও সংসারের বিশৃঙ্খলা এক মুহূর্তে দূর করিবার শক্তি রাখে সেই জন্য নাটকের ভাগ্যবিধাতারূপে তাহার আসন সুদৃঢ় হইয়াছে।

এই নাটকে কোন নারীচরিত্র মঞ্চসম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু নেপথ্য-বর্তিনী, নীরবে গৃহকর্তব্যরতা তরুণী বিধবা নিরু সকল সময়েই আমাদের অনুভূতিতে চিরজাগ্রত থাকে। এই অদৃশ্য উৎস হইতেই করুণরস প্রবাহিত হইয়া

হাস্যরস-প্রধান প্রহসনটিকে এক বিষণ্ণ বেদনাবোধে আপ্লুত করিয়াছে। সে অপরের উল্লেখ ও বর্ণনা হইতে জীবনীশক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রাণবতী হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত হাসি-ঠাট্টা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও [illegible] অন্তরালে, খাদ্যের জন্য সমস্ত নির্লজ্জ তাগিদের পিছনে যে একটি ম্লানমুখী, উদ্‌গতাশ্রু, আপনার বিরাট দুঃখ সম্বন্ধে আত্মসংবৃতা নারী ব্রতধারিণীর মত নীরবসাধনমগ্না, তাহার অস্তিত্বের আভাস সমস্ত নাটকটিকে অবর্ণনীয় ভাবে করুণ করিয়া তুলিয়াছে।

৩

'গোড়ায় গলদ' ও 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' বই দুইখানির সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এখন উহাদের নাট্যকলা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। 'গোড়ায় গলদ'-এ কয়েকটি খেয়ালী যুবকের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাদের খেয়াল তরুণ-মনের প্রণয়-কল্পনা-প্রসূত, অথচ ইহাতে স্বাভাবিকতার বিশেষ কোন ব্যত্যয় হয় নাই। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রকান্ত বিবাহিত ও বয়োজ্যেষ্ঠ; অন্যান্য তরলমতি তরুণের সহিত তুলনায় উহার সাংসারিক অভিজ্ঞতা কিছু বেশী, অথচ তারুণ্যের স্পর্শ তাহার মনেও নানা অবাস্তব স্বপ্ন-কল্পনা মুকুলিত করিয়া তোলে। তরুণ-সংঘের মধ্যে বিনোদবিহারী সর্বাপেক্ষা বেশী খেয়ালী; সে একমুহূর্তে জীবনপণ করিয়া অজ্ঞাত ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপিয়া দেয়। একদিনের মধ্যেই তাহার নেশা টুটিয়া যায় ও সে কঠোর বাস্তবের নিকট অসহায় ভাববিলাসীরূপে প্রতিভাত হয়। নলিনাক্ষর নাটকে বিশেষ কোন সার্থকতা নাই; সে আর একরকম অসম্ভব খেয়ালের প্রতীক। বিনোদের মত অস্থিরমতি, অব্যবস্থিতচিত্ত যুবককে সে নিজের আদর্শ ও পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া মানুষের মনের পারদ যে কত তরল হইতে পারে তাহার উদাহরণ দিয়াছে। নিমাই ইহাদের সহিত তুলনায় কিছু বাস্তবতর উপাদানে গঠিত; কিন্তু সে আবার ঘটনার এরূপ পরিহাসের সম্মুখীন হইয়াছে যে নাটক-মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা উপহাস্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রেমব্যাধিগ্রস্ত যুবক মিথ্যা পরিচয়ের গোলোকধাঁধায় ঘুরিয়া যে কি উদ্ভট পাগলামির ঘূর্ণী-বায়ুতে আবর্তিত হইতে পারে নিমাই তাহারই দৃষ্টান্ত। নাট্যকারের কারসাজিতে যে সর্বাপেক্ষা সুস্থমস্তিষ্ক সেই সর্বাপেক্ষা কাণ্ডাকাণ্ডহীনরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। শিবচরণ ও নিবারণ প্রৌঢ়বয়স্ক ও সংসারের কর্তা; কিন্তু তাহাদের সংসারজ্ঞান যে

তাহাদের উৎকেন্দ্রিকতাকে বিশেষ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই, তাহারাও যে তরুণ ছেলে-মেয়ের খেয়ালের ঝড়ে নিজেদের ভারসাম্য হারাইয়াছে নাট্যকার তাহাও দেখাইতে ভোলেন নাই। ইহাদের মধ্যে চন্দ্রকান্তও প্রাজ্ঞতম হইয়াও স্ত্রীসম্বন্ধে তরুণসুলভ রোমান্টিক আদর্শের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়া প্রবল দাম্পত্য বিচ্ছেদে জড়াইয়া পড়িয়াছে ও নাটকে হাস্যকরতার উপকরণ যোগাইয়াছে। তিনটি স্ত্রীচরিত্র—ক্ষান্তমণি, কমলমুখী ও ইন্দুমতী স্বভাবমাধুর্যে এক হইয়াও অবস্থা-তারতম্যের জন্য বিভিন্নরূপ মেজাজ দেখাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত নাটকের উপসংহারে চন্দ্রকান্ত যে ঐকতানসংগীতে নায়কত্ব করিয়াছে তাহাই নাটকের মর্মবাণীটি প্রকাশ করিয়াছে। যে তিনপ্রকার প্রেম নাটকে উদাহৃত হইয়াছে—চন্দ্রকান্ত-ক্ষান্তমণির আ'পৌরে প্রেম, বিনোদ-কমলমুখীর একপক্ষে অতি-রোমান্টিক ও অপর পক্ষে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপী প্রেম ও নিমাই-ইন্দুমতীর বাস্তবে-রোমান্সে মেশান, একই ভ্রান্তির কটাহে আবর্তিত ও ঘনীভূত প্রেম—সবই যে সমান কল্যাণকর ও তৃপ্তিপ্রদ, সমীকরণের এই ছন্দে তাহাদের প্রশস্তিগীত হইয়াছে।

'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এ নাটকের সহিত ঔপন্যাসিকরীতির সংমিশ্রণে নাট্য-প্রকৃতি কতখানি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহাই প্রথমতঃ আলোচ্য। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে চরিত্রের পরিচয়দান, পূর্বঘটনার ভূমিকারচনা ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোন কোন চরিত্রের মানস প্রতিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত নির্দেশ এই ঔপন্যাসিকরীতির দ্বারা সাধিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পরবর্তী বিশুদ্ধ নাট্যরূপের অঙ্গীভূত হওয়ায় ইহা লেখকের ক্ষমতার অভাব সূচিত করে না, নিষ্ঠা-শৈথিল্যেরই পরিচয় দেয়। যে কোন কারণেই হউক এই রচনায় লেখক নাট্যকলার পরিপূর্ণ দাবী মানিয়া লন নাই, প্রত্যক্ষ-ব্যাখ্যা-বিবৃতির সাহায্যও লইয়াছেন। হয়ত 'চিরকুমার সভা'র মত একটি অদ্ভুত খেয়ালী প্রতিষ্ঠান, চন্দ্রমাধববাবুর মত একজন উদার-কল্পনা-প্রবণ, বস্তুজ্ঞানহীন, আত্মভোলা মানুষ, অক্ষয় ও রসিকের মত বিশেষ পরিস্থিতিতে লালিত, কাব্যগন্ধী ও পরিহাসনিপুণ চরিত্র, পুরুষবেশী শৈলবালার প্রণয়দৌত্যে আত্মনিয়োগ—সবই একটু প্রাক্-কথনের অপেক্ষা রাখে। কাজেই নাটকে নাটকাতিরিক্ত কিছু বস্তুনির্দেশের সূত্র-সংযোজনার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু এই পরিচিতি ও বস্তুনির্দেশপর্ব শেষ হইলে ঘটনার সমস্ত অগ্রগতি ও যেটুকু চরিত্র-পরিণতি ঘটিয়াছে তাহা অবিমিশ্র নাট্যরসপ্রবাহের দ্বারাই নিষ্পন্ন

হইয়াছে। নাটকের সংলাপে, উক্তি-প্রত্যুক্তির সরস ঘাত-প্রতিঘাতে ও সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির ঘটনা-প্রভাবিত আচরণের স্বাভাবিকতায় আমরা এতই অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়ি যে লেখকের নিজ জবানী-মন্তব্য বা ব্যাখ্যা প্রায় অলক্ষিতই থাকিয়া যায়। নাটকের চাকা ঘুরিবার পূর্বে হয়ত বিবৃতির বহিরাগত সহায়তা প্রয়োজনীয় মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা পূর্ণ গতিবেগ আহরণ করিলে ইহাই আমাদের সমগ্র রসবোধকে আকর্ষণ করিয়া লয়। উপন্যাসের ল্যাবেল (label) প্রথম পরিচিতিপত্ররূপে কিছুটা মূল্যবান; কিন্তু সকলকে চিনিয়া ফেলিলে তাহাদের নাটকীয় আত্ম-উদ্‌ঘাটনই প্রত্যেকের মেজাজ ও ব্যক্তিসত্তাকে আমাদের মনে অবিস্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত করে।

এই নাটকে ও প্রায় সমস্ত কমেডিতেই, প্রস্তুতিপর্বটাই বড়, সাধনপর্বটা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। জগত্তারিণীর কন্যাদায়-উদ্ধারের আয়োজন খুব বহুবিস্তৃত ও অনেক বীর ও বীরজায়া এই কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন। অক্ষয়ের শ্বশুরালয়ে স্থায়ী নিবাস ও রসিকের অফুরন্ত রসিকতার স্রোত, জগত্তারিণী ও সুরবালার পাত্রসন্ধানে কাশীপ্রয়াণ, দারুকেশ্বর ও মৃত্যুঞ্জয়ের ন্যায় দুই বানররূপী সম্ভাব্য জামাতার রাহুগ্রাস হইতে দুইটি ক্ষীণ শশিকলার উদ্ধারের জন্য আধুনিক স্বয়ংক্রিয় দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ, পুরুষবেশিনী শৈলবালার চিরকুমারব্রতভঙ্গের জন্য দুশ্চর তপস্যা—সবই কার্যসিদ্ধির সহজ নিষ্পন্নতার মানদণ্ডে অযথা আতিশয্য-বিড়ম্বিত বলিয়া মনে হয়। কমেডির গূঢ় ফলশ্রুতির বীজ এই উপায় ও উদ্দেশ্যের অসঙ্গতির মধ্যেই নিহিত। দেখা গেল যে শ্রীশ ও বিপিনের ন্যায় দুই প্রণয়স্বপ্নপ্রবণ যুবকের তপোভঙ্গের জন্য এত অপ্সরাসংঘের সমাবেশের প্রয়োজন ছিল না। যাহাদের হৃদয় অন্তর্গূঢ় উষ্ণবাষ্পের দ্বারাই দ্রবীভূত হয়, তাহাদের মন গলাইবার জন্য বিরাট ও বিচিত্র দাহ্যপদার্থসঞ্চয় নিতান্ত বাজে খরচ বলিয়া ঠেকে। তাহা ছাড়া 'চিরকুমার সভা'র অন্তর্বিরোধই উহার পতনের পথকে সুগম করিয়াছে। নির্মলার প্রতি পূর্ণের ও অবলাকান্তের প্রতি নির্মলার আকর্ষণ, স্বয়ং সভাপতি চন্দ্রমাধববাবুর আজগুবি কর্মসূচির বাঁধ দিয়া মানব-প্রবৃত্তির গূঢ় অতৃপ্তির দ্বারা ক্ষয়িতমূল, কৃত্রিম আদর্শের পতন-নিরোধের ব্যর্থ প্রয়াস ও অদ্ভুত ন্যায়শাস্ত্র-প্রয়োগে 'চিরকুমার সভা'র মধ্যে কুমারীর অনুপ্রবেশের স্বীকৃতি, ইহার তিনটি তরুণ সদস্য, শ্রীশ, বিপিন ও পূর্ণের অন্তরলোকে ভারসাম্যের অভাব ও বিপ্লবের আভাস এই বাস্তবসমর্থনহীন প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসোন্মুখিতাই সূচিত করে। কাজেই মেয়েদের জন্য পাত্র খুঁজিতে দূর

অভিযানের ক্লেশ-স্বীকার করিতে হয় নাই। অক্ষয় ও রসিকের কাব্যচর্চা ও সুভাষিতবর্ষণই পাত্রদের আকর্ষণ করিয়া কন্যাদের দ্বারস্থ করিয়াছে। সমস্ত নাটকটি বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ও নাটকের সরসতার মূলও সামান্যকে অসামান্য করিয়া তুলিবার শিল্প-কৌশলে।

রবীন্দ্রনাথের এই হাস্যরসপ্রধান নাটকগুলির নিরপেক্ষ মূল্য যাহাই হউক আপেক্ষিক বিচারে বাংলাসাহিত্যের তাৎকালিক অবস্থায় ইহাদের যে একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে তাহা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রপ্রতিভা অভিনব ও অভূতপূর্ব-পথে অগ্রসর হইবার পূর্বে যে ক্ষণকালের জন্য ও সর্বসাধারণের অনুসৃত প্রথাসিদ্ধ পথে নিজ দীপ্তির চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, ইহাতে ঐ প্রতিভার সম্পূর্ণমণ্ডলত্বেরই নিদর্শন পাওয়া যায়।

দশম অধ্যায়

রবীন্দ্রগদ্যের প্রথম পর্ব—ভ্রমণকাহিনী, সাহিত্যসমালোচনা ও বিবিধ

য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র ১৮৭৮–১৮৮০

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি ১৮৯১, ১৮৯৩

বিবিধ প্রসঙ্গ ১৮৮৩

অন্যান্য রচনা ১৮৭৯-১৮৮৪

১

একজন শ্রেষ্ঠ কবির গদ্যরীতি একটা গৌণ বা বিকল্প শিল্পকৃতিরূপে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে। প্রথমতঃ, এই গদ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গী না অনেকটা কবির কাব্য-প্রভাবিত, কাব্যেরই একটা অধীনস্থ শাখা, এই জিজ্ঞাসা উত্তরের দাবী করে। দ্বিতীয়তঃ কাব্যবিবর্তনের সঙ্গে গদ্যরীতির অগ্রগতির কোন নিশ্চিত সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায় কি না তাহাও বিচার্য। তৃতীয়তঃ, গদ্যের রীতিবৈচিত্র্য, কাব্যে যে প্রেরণায় রূপপরিবর্তন ঘটে তদনুরূপ প্রেরণাসঞ্জাত কি না তাহাও সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণের বিষয়। সাধারণতঃ কাব্যরীতি কবি-কল্পনার স্বরূপ প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল, অনেকটা বিষয়-নিরপেক্ষ। কবির কল্পনা-বৈশিষ্ট্য পরীক্ষামূলক অনিশ্চয়তার স্তর অতিক্রম করিয়া একটি চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করিলে তাহা প্রায় সকল রকম বিষয়ের প্রতিই প্রযোজ্য হইয়া থাকে, অন্ততঃ বিষয়ভেদে তাহার কোন গুরুতর বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। পরিপক্বতা-লাভের পরও প্রকাশভঙ্গীর নূতন নূতন আদর্শ কবির তাৎকালিক মেজাজ ও মনোভাবের প্রতিফলনে আবির্ভূত হয়। রবীন্দ্রকাব্যে এই নব-আদর্শ-প্রতিষ্ঠার উদাহরণ উহার শিল্প-পরিণতির ও ভাবান্তরের প্রতি পর্যায়েই দেখা গিয়াছে। 'চৈতালি', 'কথা ও কাহিনী' এবং 'ক্ষণিকা'-য় এই রূপান্তরের আকার আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু এগুলি আমূল পরিবর্তনের নিদর্শন নয়, পথের ঈষৎ মোড় ফেরার দৃষ্টান্ত মাত্র। কাব্যের সহিত তুলনায় গদ্যে রচনারীতি আরও প্রবলভাবে বিষয়নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ গদ্যের মাধ্যমে যে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন—ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিমূলক, সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি বা সুকুমার কল্পনামূলক, সাহিত্যরসাস্বাদন ও তাৎপর্যবিশ্লেষণমূলক, ভ্রমণকাহিনী-

জাতীয় ও হাস্যকৌতুকরসোচ্ছল লঘু খেয়ালাত্মক—তাঁহার গদ্যপ্রয়োগও সেই বিচিত্র প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তথ্যপ্রধান, তত্ত্বব্যাখ্যাপ্রধান, কবিকল্পনাপ্রধান ও সুকুমার-অনুভবপ্রধান বিষয়ের আলোচনায় তিনি বিষয়োপযোগী ও তাঁহার উদ্দেশ্যানুকূল রীতি, শব্দ-সন্নিবেশ, বাক্যবিন্যাস ও অন্তঃপ্রেরণার সহযোগিতায় গঠিত শিল্পরূপেরই অনুবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গদ্যরীতিবিবর্তনের সূত্রটি ধরিবার জন্য তাঁহার গদ্যরচনার দুইভাবে আলোচনা করিতে হইবে—প্রথম, কালানুক্রমে, দ্বিতীয় বিষয়-বৈচিত্র্যের অনুসরণে।

এই কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে কাব্য ও গদ্যরচনার একটি মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। কাব্য ছন্দঝঙ্কারে, পদলালিত্যে, সুরস্পন্দনের অন্তঃপ্রবাহে ও সর্বোপরি সর্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যসৃষ্টিতে নানা বিভিন্ন বিষয়ের রন্ধ্রসমূহকে ভাবরসে পরিপূর্ণ করিয়া রচনাকে বিষয়নিরপেক্ষভাবে এক সুডৌল, রূপময় অবয়ব-সৌষ্ঠবের অভিন্নতা দান করে। কবিকল্পনার সর্বগ্রাসী পরিপাক-শক্তিতে বিষয়ের বিভিন্নতা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া কাব্যজগৎপ্রসারিত সৌন্দর্যের উপাদানে রূপান্তরিত হয়। আগুন জ্বলিলে যেমন ইন্ধনের স্বাতন্ত্র্য আর লক্ষ্য-গোচর হয় না, সমুদ্রের অতল জলে নিমগ্ন দ্বীপপুঞ্জ যেমন উহাদের গঠন-উপাদানের পার্থক্য হারাইয়া ফেলে, প্রবল কাব্যানুভূতি হইতে উৎসারিত সৌন্দর্যপ্লাবনে সেইরূপ বিষয়ের প্রতিযোগী অস্তিত্ব শ্রেষ্ঠতর যৌগিক সত্তার মধ্যে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। এখানে কবিমনের স্বীকরণশক্তির দ্বারা বস্তুর নিরপেক্ষ পরিচয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। বর্ষাঋতুর একই বস্তুপরিচয় কবির তাৎকালিক মেজাজ বা অনুভবশক্তি অনুসারে নানা ভাবব্যঞ্জনাময় মূর্তি পরিগ্রহ করে। কাজেই কাব্য-আলোচনায় বিষয়ের খুব বেশী গুরুত্ব নাই। কিন্তু গদ্যের রূপান্তরসাধন-প্রক্রিয়া আপেক্ষিকভাবে অসম্পূর্ণ ও অপ্রচুর বলিয়া, ইহার আলোচনাপদ্ধতি মুখ্যতঃ যুক্তিনির্ভর ও তত্ত্বপ্রতিপাদনমূলক বলিয়া, ইহাতে বিষয়ের প্রাধান্য রচনাভঙ্গীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সেইজন্য গদ্যলেখকের রচনারীতির বিবর্তনরেখা অনুসরণ করিতে হইলে উহার বিষয়োপযোগিতা প্রধানভাবে লক্ষণীয়। কবির Style-এর পরিণতি যত স্পষ্টভাবে ধরা যায়, গদ্যলেখকের ক্ষেত্রে ততটা সুস্পষ্ট অনুভব সম্ভব নয়। কাব্যের ছন্দোবদ্ধ সীমার মধ্যে, কল্পনার সূক্ষ্মনিয়মাধীন লীলার মধ্যে প্রকাশপরিণতি যেমন নিঃসন্দিগ্ধ আত্ম-পরিচয়টি মুদ্রিত করে, গদ্যের অনিয়ন্ত্রিত বিস্তার, বিষয়ের বহুমুখী মাধ্যাকর্ষণ ও মগ্নতা ও তন্ময়তার নানা পরিমাণগত মিশ্রণ-সাঙ্কর্যের মধ্যে সেই পরিণত

রূপটি, অগ্রগতির সেই সরলরেখাঙ্কিত যাত্রাপথটি তেমন সুপরিস্ফুট নয়। রবীন্দ্রকাব্যে 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর পর হইতেই রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমোন্নতিশীল ; রবীন্দ্রগদ্যরচনায় রীতিটি দ্বিধাগ্রস্ত, নানা অগ্র-পশ্চাৎ-গতির অসম ছন্দে আন্দোলিত, মুহুর্মুহু পরিত্যক্ত ও পরিবর্তিত, বিষয় ও মেজাজের অনুবর্তনে অস্থির ও স্থির, ভারসাম্য ও প্রকাশ-ছন্দলাভের পরেও আবার ব্যক্তিত্বের নব অভিঘাতে, পারিপার্শ্বিকের নব প্ররোচনায় নূতন পরীক্ষাবৃত্তে আবর্তিত।

এই আদিপর্বের গদ্যরচনার বিষয়ানুসারী ও কালানুক্রমিক তালিকা হইতে লেখকের প্রেরণার বহুমুখিত্ব ও অগ্রগতির সঙ্কেত-রেখার একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

ভ্রমণকাহিনী

(ক) 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' (ভারতী, ১২৮৬ বৈশাখ হইতে ১২৮৭ শ্রাবণ পর্যন্ত প্রকাশিত ; গ্রন্থাকারে মুদ্রিত, ১৮৮১ অক্টোবর)

(খ) 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' (১৮৯১ ও ১৮৯৩ খৃঃ অঃ দুই খণ্ডে প্রকাশিত)—কালসীমাবহির্ভূত হইলেও বিষয়বিন্যাসের অনুরোধে আদিপর্বে সন্নিবিষ্ট হইল।

(গ) 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর অন্তর্ভুক্ত 'সরোজিনী-প্রয়াণ' (লিখিত জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, প্রকাশ ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১২৯১) ও 'ছোটনাগপুর' (বালক, আষাঢ় ১২৯২)

সাহিত্যসমালোচনা ও অন্যান্যজাতীয় রচনা

(ক) 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (ভারতী, ১২৮৭ শ্রাবণ হইতে ১২৮৮ শ্রাবণ পর্যন্ত প্রকাশিত ; গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ১২৯০ ভাদ্র, ১৮৮৩ সেপ্টেম্বর)

(খ) বিবিধ রচনা : 'যথার্থ দোসর' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) ; 'গোলাম-চোর', (ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮) ; 'চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮) ; 'দারোয়ান' (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮) ; 'জুতা-ব্যবস্থা', 'চীনে মরণের ব্যবসায়', (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) ; 'নিমন্ত্রণ-সভা' (ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮) ; 'এক চোখো সংস্কার' (ভারতী, পৌষ ১২৮৮) ; 'বাঙ্গালি কবি নয়' (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭) ; 'বাঙ্গালি কবি নয় কেন', (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭) ; 'অকারণ কষ্ট', (ভারতী,

আশ্বিন ১২৮৭); 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা', (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৮); 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি', (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৮); 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮); 'বসন্ত রায়', (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯); 'মেঘনাদবধ কাব্য', (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯); 'বাউলের গান', (ভারতী, বৈশাখ ১২৯০); 'দেশজ প্রাচীন ও আধুনিক কবি—শ্রীরঃ প্রত্যুত্তর', (ভারতী ভাদ্র ১২৮৯); 'বিজ্ঞতা', (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯); 'তার্কিক', (ভারতী, আশ্বিন ১২৯০); 'অনাবশ্যক', (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০); 'তৃতীয় পক্ষ', (ভারতী, আশ্বিন ১২৯০); 'চেঁচিয়ে বলা', (ভারতী, চৈত্র ১২৮৯); 'জিহ্বা-আস্ফালন', (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০); 'ন্যাশনাল ফণ্ড', (ভারতী, কার্তিক ১২৯০); 'টৌনহলের তামাসা', (ভারতী, পৌষ ১২৯০); 'অকাল কুষ্মাণ্ড', (ভারতী, চৈত্র ১২৯০); 'হাতে কলমে', (ভারতী, আশ্বিন ১২৯১); 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', ('সমালোচনা' গ্রন্থে প্রকাশিত, ১২৯৪)।

এই অসম্পূর্ণ ও নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত রচনার তালিকা হইতে রবীন্দ্র-গদ্যের বিষয়-বৈচিত্র্য ও রীতি-বিভিন্নতার কিছুটা ধারণা জন্মিবে। ১২৮৬ হইতে ১৩০০ পর্যন্ত এই পনর বৎসরে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনা যেমন নব নব বিষয়ের দিকে প্রসারিত হইতেছিল, তেমনি মেজাজ, ধরন ও আদর্শের দিক দিয়াও নানা বিচিত্র প্রকারের উৎকর্ষ অনুশীলন করিতেছিল। আলোচনার দ্বারা মনে হয় যে তাঁহার রচনার মানের উন্নয়ন ততটা কালানুক্রমিক নয়, যতটা বিষয়-নির্ভর ও মানসিক আবেগ-প্রভাবিত। তাঁহার রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি, কিঞ্চিৎ পরবর্তী-কালের রচনা হইলেও অতিরিক্ত যুক্তিপ্রাধান্য ও মাত্রাহীন অতিদৈর্ঘ্যের জন্য, কিঞ্চিৎ ক্লান্তিকর বলিয়া মনে হয়। ইহাদের মধ্যে লেখকের এমন একটা সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার জিদ প্রকাশ পাইয়াছে, এমন একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তিশৃঙ্খলাবিস্তারের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে, পুনরুক্তি-প্রবণতা এমন উৎকট হইয়া উঠিয়াছে যে লেখকের সামগ্রিক উদ্দেশ্য যে তাহাতে ব্যাহতই হইয়াছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। তীক্ষ্ণযুক্তি, স্মরণীয়উক্তি, শ্লেষনৈপুণ্য ও বাক্যবিন্যাসের চমৎকৃতি পাঠকের প্রশংসা উদ্রেক করিলেও গুণাতিশয্যের জন্য শেষ পর্যন্ত এক প্রকারের বিহ্বলতা সৃষ্টি করিয়াছে। পাঠক যখন সুদীর্ঘ প্রবন্ধের শেষে পৌছিল তখন উহার গোড়ার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রবন্ধের শিরোনাম পৃথক থাকিলেও উহাদের বক্তব্য বিষয় যেন

পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া মিশিয়া গিয়াছে। লেখকের মননের একই প্রণালী বাহিয়া উহাদের বিভিন্ন যুক্তিধারা এক অভিন্ন ও বৈচিত্র্যহীন ভাব-প্রবাহের অংশীভূত হইয়াছে। কাজেই রচনাকৌশল প্রশংসনীয় হইলেও উহাদের মধ্যে লেখকের শিল্পসংগঠনশক্তি ও ব্যক্তি-অনুভূতির প্রকাশ বক্তব্যের গুরুভারে ও লেখকের তর্কমনোভাবের অতিপ্রাধান্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, বিচ্ছিন্ন অংশের সরসতা সমগ্রপ্রবন্ধের উদ্দেশ্যগৌরবে ক্ষুণ্ন হইয়াছে। সুতরাং এই জাতীয় প্রবন্ধ, পরিণত মননের পরিচয় বহন করিলেও, রচনারীতির সামঞ্জস্যের আদর্শ-বিচারে খুব উচ্চস্থান অধিকার করে না।

২

ভ্রমণ-কাহিনীই রবীন্দ্রগদ্যরচনার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত আদিমতম প্রয়াস। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' ('ভারতী' পত্রিকায় ১৮৭৯ হইতে ১৮৮০ পর্যন্ত প্রকাশিত ও গ্রন্থাকারে ১৮৮১ অক্টোবরে প্রকাশিত) রচনারীতির দিক দিয়া কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। ইহাতে লেখকের বর্ণনা ও মনন যেমন প্রাথমিক পর্যায়ের ও তরুণ অপরিণত মনের নব নব দৃশ্যসঞ্জাত কৌতূহলের তরল প্রকাশমাত্র, Style-ও সেইরূপ বিশেষত্বহীন ও শিথিলগ্রন্থিত। ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে কোথাও প্রকৃতিবর্ণনায় কি সমাজচিত্রাঙ্কনে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় নাই, আছে অপরিচিত সমাজের সহিত প্রথম পরিচয়ের প্রগল্‌ভ বিস্ময় ও সহজে উত্তেজিত পার্থক্যবোধ। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের যুগেই অনেকটা ব্যঙ্গচিত্র বলিয়া ঠেকিত—বর্তমানযুগে তাহা একেবারে অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বিলাতে নাচগানের সান্ধ্য সম্মিলন, মিঃ ব.-এর দাম্পত্যজীবন প্রভৃতির বর্ণনা নিতান্তই মামুলি ধরনের বাস্তব চিত্র, সময় সময় তরুণ লেখকের পরিহাসরসিকতায় সরস ও উপভোগ্য। লণ্ডনে মিঃ ক-এর পারিবারিক জীবন-বর্ণনায় লেখকের কিঞ্চিৎ হৃদয়াবেগ ও অপেক্ষাকৃত গভীর মানস আগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, কেন না এখানে তিনি সাধারণের বহিরঙ্গন অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী-জীবনের স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায় যে এই পরিবারের তুইটি কুমারী মেয়ের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক সাধারণ শিষ্টাচার অপেক্ষা কিছু উত্তপ্ততর পর্যায়ে উঠিয়াছিল।

'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-এর দশ ও বার বৎসর পরে

১৮৯১ ও ১৮৯৩-এ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। দশ-বার বৎসরের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি বহু চিচিত্র ক্ষেত্রে অনুশীলিত হইয়া অনেকটা পরিণত রূপ লাভ করিয়াছিল। এই মনন ও ভাষণভঙ্গীর পরিণতি ইহার বহু স্থলেই পরিস্ফূট হইয়াছে; তথাপি মোটের উপর পূর্বতন ভ্রমণগ্রন্থের কাঠামো ও দৃষ্টি-পাতের বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ত্রিশ বৎসরের প্রৌঢ় বৈদেশিক জীবনযাত্রাকে আঠার বৎসরের কিশোরের বিস্ময়াপ্লুত ও উপরি-স্তরবদ্ধ মানস কৌতূহল দিয়াই দেখিয়াছেন। লেখকের হাত পাকিয়াছে, বর্ণনাশক্তি পরিণত হইয়াছে, কিন্তু বিচার-পদ্ধতি প্রায় অপরিবর্তিতই আছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভেই লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে দ্রুত গমনাগমনের উন্নতির জন্য যে সময়-সংক্ষেপ ঘটিতেছে তাহাতে বিচ্ছেদবেদনা ঘনীভূতরূপে, কিন্তু স্বল্প আয়তনে আপনাকে নিঃশেষিত করিবার প্রবণতা দেখাইতেছে। তীরসন্নিহিত আলোকস্তম্ভের কম্পিত দীপশিখা যেন "সমুদ্রের শিয়রের কাছে ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি"। প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে নিগূঢ় উপলব্ধির সুর লাগিয়াছে। এডেন বন্দরের পরিবেশে লেখকের অনু-ভূতিতে "নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্যবিজড়িত, অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে স্বপ্নমরীচিকার মতো লাগছে।" "সংগীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নানিশীথে মনে হতে লাগল, অর্ধরাত্রে আরবের উপকূলে আরব্য উপন্যাসের মতো কী একটা মায়ার কাণ্ড ঘটবে"।

"সূর্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতল রেখায় বিস্তৃত করে দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্য পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে।" "যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব মহিমান্বিত করে তুলেছে।" "জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মতো আপন প্রশান্ত সৌন্দর্যে নিঃশব্দে চতুর্দিকে দল প্রসারণ করল।" "প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র সহস্র হিংস্র নখের বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক্ অনেকখানি করে আঁচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।"

এই জাতীয় সূক্ষ্মঅনুভূতিময়, কবিত্বমধুর, ভাবচমৎকৃতিস্পন্দিত মন্তব্য

লেখক প্রকৃতি-প্রীতির নিবিড়তায়, উহার মর্মরহস্যবোধে ও বিচিত্রব্যঞ্জনাগর্ভ ভাবের প্রকাশে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহারই নিদর্শন। অবশ্য এই সময় কবি কাব্যে মানসী-সোনার তরীর যুগে আসিয়া পৌছিয়াছেন ও সেই যুগোচিত সৌন্দর্যভাবুকতা তাঁহার সমকালীন গদ্যরচনাতেও যে পাওয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় বিশেষ নাই।

অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার মন্তব্য বেশ সুসঙ্গত ও মননসমৃদ্ধ মনে হয়। জাহাজে এক সুন্দরী যুবতীর প্রতি নিক্ষিপ্ত বহু উৎসুক দৃষ্টি তাঁহাকে একটি সুন্দর উপমার কথা মনে পড়াইয়া দিল। "একটা অনাবৃত আলোকশিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন কালো কালো পতঙ্গের মতো চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়ে পড়ছে।" ড্যুরা-রচিত একটি বসনহীন মানবীর ছবির সম্বন্ধে তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি স্মরণীয়: "দূর থেকে চকিতের মতো সেই (অমরসুন্দর মানবাত্মার) অনির্বচনীয় চিররহস্যকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।" ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। "কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।"

তাঁহার বর্ণনাভঙ্গীও যে পূর্বাপেক্ষা পরিণত তাহার নিদর্শন প্রচুর। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-এ যে সামুদ্রিক পীড়ার বর্ণনা আছে তাহা তথ্যপ্রধান; 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'-তে উহা আরও সাহিত্যগুণসম্পন্ন ও রসোচ্ছল। ইউরোপীয় বেশভূষা ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশে ত্রিশ বৎসরের পরিণতবুদ্ধি ও জীবনাভিজ্ঞ লেখক আরও সংযত ও সতর্ক হইয়াছেন—সরাসরি ভালমন্দ রায় দিতে তিনি আর প্রস্তুত নহেন। বরং ইংরেজের সমাজে অল্পদিন বাস করিয়া উহার মর্মানুপ্রবেশ যে-কোনও বিদেশীর পক্ষে অসম্ভব তাহাই তিনি কথামালার বক ও শৃগালের গল্পাশ্রয়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সাহিত্য-পাঠে ইংরেজ চরিত্রের যে আদর্শ রূপটি অন্তরে গ্রহণ করি, বাস্তব সমাজজীবনে তাহা সমর্থিত হয় না। সুতরাং না-বোঝার একটা বিমূঢ়তা উভয় জাতির মধ্যে একটা চিরন্তন ব্যবধানই স্থায়ী করে।

রেলযাত্রার বর্ণনা পূর্বগ্রন্থের ন্যায়ই বিচ্ছিন্ন ও কেন্দ্রীয়যোগসূত্রহীন। তথাপি ফরাসী দেশের দেশপ্রেমের সহিত বাঙালীর দেশপ্রেমের পার্থক্যটি সূক্ষ্মবিচারশক্তির দৃষ্টান্তস্থল। সৌন্দর্য সম্বন্ধে লেখক যে উদার, অপক্ষপাত

রসানুভবের পরিচয় দিয়াছেন তাহাও পরিণত মননের নির্দেশক। পাশ্চাত্ত্য পুরুষেরা যে স্ত্রীলোকের নানা উৎপাত ও উৎপীড়ন শুধু ধৈর্যের সঙ্গে নয়, খানিকটা স্নিগ্ধ উপেক্ষার সঙ্গে উপভোগ করেন ইহাতে বলিষ্ঠ পুরুষ ও দুর্বল নারীর মধ্যে একটা ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যই রক্ষিত হয়। লেখক আমাদের দেশের পুরুষের স্ত্রী সম্বন্ধে একান্ত উদাসীনতাকে কাপুরুষতারই লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। পাখাটানা কুলির প্রতি ইংরেজ নর-নারীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা লেখককে অনেকটা মাত্রাতিরিক্ত ও মামুলি প্রতিবাদে উত্তেজিত করিয়াছে। ইহা সেই বিশেষ যুগের একটি জাতিবিদ্বেষপ্রসূত অন্যায় আচরণ যাহা তৎকালীন বাঙালীর মনে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভের ও ধিক্কারবোধের উদ্রেক করিয়াছিল। সাহিত্য, বিশেষতঃ ভ্রমণকাহিনীতে এই বিষয়ের অতিপল্লবিত আলোচনা কলাসঙ্গতির বিরোধী বলিয়া মনে হয়। ফিরতি পথের যাত্রাবর্ণনা প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যে মনোযোগের অপব্যয়রূপেই প্রতিভাত হয়; এই বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো খণ্ড-ঘটনাগুলি হইতে না ফুটিয়াছে মানস আগ্রহের দীপ্তি, না কোন সামগ্রিক সংহতিবোধ। লেখকের দেশে ফিরিবার জন্য অধীরতা এই খণ্ডাংশগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

'জাপান যাত্রী' (১৯১৯), 'জাভাযাত্রীর পত্র' (১৯২৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), 'পারস্যভ্রমণ' (১৯৩৬), 'পথের সঞ্চয়' (১৯৩৯) প্রভৃতি পরবর্তী জীবনের ভ্রমণগ্রন্থসমূহে যে পরিণত মনন, সভ্যতা-সংস্কৃতির গভীরে অনুপ্রবেশশীল অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্যময় জীবনপ্রজ্ঞার প্রকাশ একটি নূতন আদর্শকে রূপ দিয়াছে, লেখকের অনুভূতির মধ্যে একটা নূতন সুর উন্মোচিত করিয়াছে এ পর্যন্ত তাহার কোন পূর্বসূচনা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের ভ্রমণ কেবল চক্ষুর তৃপ্তি ও মনের বিস্ময়ের খোরাক জোগাইয়াছে, তাঁহার সমগ্র চেতনাকে আলোড়িত করে নাই। পরবর্তীকালে নূতন দেশে পদক্ষেপ তাঁহার কাব্যানুভূতি, দার্শনিক সমীক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির নিগূঢ় উপলব্ধিকে একসঙ্গে উদ্রিক্ত করিয়া তাঁহাকে জীবনের নব নব তাৎপর্যগভীরতার সন্ধান দিয়াছে।

উপরি-উক্ত দুইটি ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে যে কালগত ব্যবধান তাহারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্রতর পরিধির মধ্যে ভ্রমণরসের অনুশীলন করিয়া তাঁহার অন্তরের সূক্ষ্ম ভাবুকতা ও বিশেষ করিয়া প্রকৃতির বর্ণনার মাধ্যমে উহার আত্মার নিগূঢ় স্পর্শানুভবটি ক্রমশঃ প্রাণস্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর

অন্তর্ভুক্ত 'সরোজিনী-প্রয়াণ' (লিখিত জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, প্রকাশিত 'ভারতী' শ্রাবণ-ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১২৯১) ও 'ছোটনাগপুর' ('বালক', আষাঢ় ১২৯২) তাঁহার এই সমস্ত গুণের দ্রুত বিকাশের সুন্দর নিদর্শন। 'সরোজিনী-প্রয়াণ' কাদম্বিনী দেবীর শোচনীয় আত্মহত্যার একমাসের মধ্যে লেখা ; ইহা রবীন্দ্রনাথের মনের স্থিতি-স্থাপকতা ও শোকপ্রতিরোধী চিত্রপ্রফুল্লতার আশ্চর্য প্রমাণ। হয়ত বৌঠাকুরাণীর মৃত্যুশোক কবিচেতনার যে গভীর স্তরে বিদ্ধ হইয়াছিল, এই কৌতুকস্নিগ্ধ ভ্রমণ-কাহিনীটি তাহার প্রভাবসীমাবহির্ভূত একটি সাময়িক আনন্দ-বিস্মৃতির তরল অংশ হইতে উৎসারিত হইয়াছে। ক্ষণিক উত্তেজনা ও উপভোগের ক্লোরোফর্মে, সৌন্দর্যানুভূতির শীতল প্রলেপে মর্মান্তিক বেদনাকেও যে ভুলিয়া থাকা যায় রচনাটি কবিমানসের সেই অনায়াসলভ্য নির্লিপ্ততার সত্যকেই প্রমাণ করিতেছে। কলিকাতার রাস্তাঘাটের বর্ণনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয়ের পরিবর্তে একপ্রকার ছেলেমানুষী, হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত কৌতুকপ্রবণতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সহসঙ্গিনী বৌঠাকুরাণীকে (বোধ হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) লইয়াও কিছুটা হাসি-ঠাট্টা উতরোল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একবার গঙ্গার প্রশস্ত, নির্মল প্রবাহের মধ্যে পড়িতেই কবির গভীর অনুভূতি, নিবিড় সৌন্দর্য-বোধ, প্রকৃতির সহিত হৃদয়ের একাত্মতা পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হইয়া উঠিল। গোধূলির স্বর্ণাভ আলোকে, সন্ধ্যার জোনাকি-জ্বালা আলো-আঁধারিতে ও গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণপক্ষের ম্লান জ্যোৎস্নায় নদী ও তটভূমির যে অপূর্ব রহস্যময় রূপান্তর ঘটিল তাহার সমস্ত ইন্দ্রজাল রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-প্রদীপ্ত বর্ণনার মধ্যে যেন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘপোষিত পূর্বস্মৃতির সৌন্দর্যাকুলতা ও অচিরলব্ধ শোকের আঘাত যে বর্তমান মুহূর্তের রমণীয়তাকে আবেগ-স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা কবি স্বীকার করিয়াছেন—"ইহারা বড় সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি।"

এই প্রকৃতি-তন্ময়তার সহিত জলযাত্রার নানা ছোটখাট দুর্ঘটনা ও শেষ পর্যন্ত ইহার হাস্যকর ব্যর্থতার সরস বর্ণনা যুক্ত হইয়া সমস্ত কাহিনীটিকে একটি বিশেষ আনন্দরসে সিঞ্চিত করিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া শুধু দুরন্ত বায়ুর অবাধ্য উচ্ছ্বাস নয়, মানস-মুক্তির একটা হিল্লোলও প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। নূতন নূতন দৃশ্য, প্রকৃতির নূতন নূতন লীলা কবির প্রাণেও এক কৌতুক-উল্লাসের ফোয়ারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ভ্রমণকাহিনী শুধু বাহিরের ঘটনার নয়, তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া অন্তরের এক নব-উচ্ছ্বসিত ভাবুকতারও মানচিত্র

আঁকিয়াছে। এই অন্তর-বাহিরের নিবিড় পারস্পরিক সংযোগই যে ভ্রমণ-কাহিনীর সার্থকতা তাহা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছেন।

অবশ্য প্রকৃতি-বর্ণনা এখনও কিছুটা বিক্ষিপ্ত ও বাহুল্যপ্রবণ, এখনও সম্পূর্ণ-ভাবে একই ভাবকেন্দ্রে-সংহত হয় নাই। লেখকের রূপপিপাসু চক্ষু ও কৌতূহলী পর্যবেক্ষণ এখনও ভাবের কেন্দ্রানুগ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার না করিয়া অপরিমিত বিস্তারের দিকে ঝুঁকিয়াছে। আত্মার গভীর অনুভূতি বহির্জগৎকে সম্পূর্ণভাবে নিজের রং-এ রঞ্জিত করে নাই। গঙ্গাতীরের দৃশ্যাবলীর মধ্যে অনেক বিসদৃশ উপাদানের সমাবেশ হইয়াছে। কবি-ভাবুকতার ঈষৎ-তপ্ত কটাহে সমস্ত বস্তু রাসায়নিক সংযোগে এক হইয়া যায় নাই, কিন্তু এই পরিণতির দিকেই যে লেখক অগ্রসর হইতেছেন তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন মিলে।

'ছোটনাগপুর'-এ ভাবুকতার একটা পাতলা আবরণ ক্ষীণ কুয়াশার মত সমস্ত বর্ণনার উপর পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এখানে প্রকৃতির মোহ-নিবিড়তা কিছুটা কম, উহার রূপের ও রিক্ততার বৈচিত্র্য এবং আদিম মানুষের গ্রাম্য সরলতা ও প্রাথমিক জীবনপ্রয়োজনসাধনের শিথিল-উদাস প্রয়াস প্রকৃতির মুখে যেন একটা বিষণ্ণ নির্লিপ্ততার ধূসরতা বিকীর্ণ করিয়াছে। এই অসমাপ্ত রচনাটির মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'র কিছুটা ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। তবে সঞ্জীব-চন্দ্রের মধ্যে মানবিক সহানুভূতি ও কৌতূহল আরও বেশী প্রকট।

৩

রবীন্দ্রসাহিত্যের গদ্যরচনায় হাতে-খড়ি সাহিত্যসমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধ দিয়া। 'ভারতী' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ (শ্রাবণ ১২৮৪ ; জুলাই ১৮৭৭) ও উহার সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবই তাঁহার এই জাতীয় রচনার প্রেরণা ও প্রকাশের সর্বক্ষণের উপলক্ষ্য জোগাইয়াছে। এই প্রথম শ্রাবণ সংখ্যাতেই কিশোর লেখক মেঘনাদবধ কাব্যের উপর তাঁহার পরিণত বিচারবুদ্ধির দ্বারা অস্বীকৃত, ঝাঁঝালো, যৌবনসুলভ দুঃসাহসে স্ফীত অভিমত প্রকাশ করেন। বর্তমান কালে আমরা এই অভিমতের মধ্যে মূলতত্ত্বের যথেষ্ট যথার্থ্য আবিষ্কার করিয়া বিস্মিত হই। তরুণ লেখকের ত্রুটি তাঁহার মতের ভ্রান্তিতে নয়, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত-প্রয়োগের হঠকারিতায়। মহাকাব্যের দোষগুলি তিনি ঠিকই ধরিয়াছিলেন ; মধুসূদনে সেই দোষের যথার্থ দৃষ্টান্ত আছে কি না এই বিষয়েই তাঁহার বিচার-বিভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে এই সদ্যোউদ্‌গতশৃঙ্গ

মৃগশিশু অরণ্যের সর্বাপেক্ষা মজবুত বৃক্ষকাণ্ডের উপরেই তাহার অচিরলব্ধ অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করিয়াছে। এই বালখিল্য-সমালোচকের আর যাহারই অভাব থাকুক, নিজ মতবাদে দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব নাই।

১২৮৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে, 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য' (ভাদ্র), 'পেট্রার্ক ও লরা' (আশ্বিন) ও 'গেটে-ও-তাঁহার প্রণয়িনীগণ' (কার্তিক) প্রভৃতি ইউরোপীয় কবিদের বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। মনে হয় যে পাশ্চাত্ত্য কবিগোষ্ঠী সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান আকর্ষণ তাঁহাদের কাব্য নয়, তাঁহাদের প্রণয়াদর্শ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমসাময়িক কাব্যে যে প্রণয়স্বপ্নে বিভোর ছিলেন এই কবিকাহিনীগুলি সেই স্বপ্নাতুরতাকেই ঘনীভূত করিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রথম ভ্রমণ হইতে ফিরিবার পর রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালে তিনটি সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন—'সংগীত ও ভাব' (জ্যৈষ্ঠ), 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' (আষাঢ়) এবং 'সংগীত ও কবিতা' (মাঘ)। এই প্রবন্ধগুলিতে তিনি 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-তে গানের উপর নাট্যসংলাপ ও নাট্যক্রিয়ার উদ্দেশ্য-সাধনের যে নূতন দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গীতের স্বধর্মের পুনর্বিচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশ্য তাঁহার যে প্রতিপাদ্যগুলি সবই গ্রহণীয় বা সঙ্গীতের উচ্চ আদর্শের সহিত সঙ্গতিশীল তাহা বলা যায় না। তথাপি সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যৎ সুরকারের প্রতিশ্রুতি-বাহী। গানের সুরের উদ্দেশ্য যে গানের কথাকে পরিস্ফুট করা, বা মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে যদি উহা ভাবের সহায়ক হয়, তবে এই পরিবর্তন অকুণ্ঠভাবে অভিনন্দনীয় এই অভিমতগুলি সঙ্গীতের নিগূঢ় স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ও ইহাদের মধ্যে মতদার্ঢ্য যতটা প্রকট, অনুভবগভীরতা ততটা নয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধে আলাপের মধ্যে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর লেখক জোর দিয়াছেন। এই তত্ত্ব সঙ্গীতের একটি মূল সত্য, যদিও অনেক ভাবমূঢ় ওস্তাদ ব্যবহারিক প্রয়োগে ভাবপ্রকাশের উপর সুরের যদৃচ্ছ ও আড়ম্বরপূর্ণ খেলাকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। তৃতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের উপর কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন, কেননা সঙ্গীত একটি স্থির ভাবমুহূর্তের উপর আসীন, কবিতার গতিশীলতা ও ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ এখনও সঙ্গীতের অনায়ত্ত। রচনাশৈলীর দিক্ দিয়া এই প্রবন্ধগুলি খানিকটা আড়ষ্ট ও দীপ্তিহীন, যদিও ইহাদের মধ্যে যুক্তিশৃঙ্খলার একটি উন্নত মান রক্ষিত হইয়াছে।

ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে, 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-যুগে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-ধারা আরও অগ্রসর ও বিস্তৃততর হইয়া চলিয়াছে। 'বাঙ্গালি কবি নয়' (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭) ও উহার সংশোধিত ও সম্প্রসারিতরূপ 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' ('সমালোচনা, ১২৯৪) বঙ্কিমচন্দ্রের বহুবৎসর পূর্বে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'বাঙ্গালি কবি কেন' প্রবন্ধের দ্বারা প্রভাবিত। 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবানুভূতি ও ভাষার উপর অধিকার উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। 'কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮), 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি' (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৮), 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' [বিদ্যাপতি] (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮), 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি' (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮), 'বসন্তরায়' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৯)—এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথের মানস আগ্রহের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও রসানুভবশক্তির ক্রমগভীরতা এবং প্রকাশসৌন্দর্যের অগ্রগতি—এই সমস্তেরই পরিচয় দেয়।

১২৮৯ ভাদ্র, 'ভারতী'-তে রবীন্দ্রনাথ পুনর্বার পাঁচ বৎসর পূর্বে লেখা 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্যের সমালোচনার সূত্র আরও পরিণত মন ও ব্যাপকতর সাহিত্যজ্ঞান লইয়া অনুসরণ করিয়াছেন। এই নূতন সমালোচনায় তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের দৃষ্টান্তের পটভূমিকায় ট্রাজেডির স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন ও 'মেঘনাদবধ'-এ উচ্চতর ট্রাজেডির কোন লক্ষণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণের দ্বারা নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতের হত্যায় হয়ত ট্রাজেডি অপেক্ষা করুণরস বা নিয়তিবাদের দুর্জ্ঞেয়তা মুখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু রাবণের মহাশোক ও প্রমীলার সহমরণের মধ্যে ট্রাজেডির মহনীয় বিষাদগাম্ভীর্য অনুভব না করা রসবিচারের একটা আশ্চর্য অক্ষমতাই সূচিত করে। ট্রাজেডির গৌরব সব সময় উপাদাননির্ভর নয়, কবির ভাবোদ্দীপনশক্তির উপর ইহা প্রধানতঃ নির্ভরশীল। একিলিস ও আগামেমননের, বা দুর্যোধন ও শকুনির চরিত্রে বিশেষ কোন মহত্ত্ব দেখা যায় না; তথাপি তাহাদের মানস দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বহির্জগতের ঘটনার আলোড়ন আমাদের মনে ট্রাজেডির সুগভীর রহস্যবোধ, জীবনের উদাত্ত গৌরব ও করুণ পরিণতি সম্বন্ধে প্রত্যয় জাগাইয়া তোলে।

'বাউলের গান'-সংগ্রহের উপর সমালোচনায় (ভারতী, বৈশাখ ১২৯০) ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'দেশজ প্রাচীন ও আধুনিক কবি' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লেখা

প্রবন্ধে (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯) রবীন্দ্রনাথ একদিকে গ্রাম্যগাথা ও লোকগীতির আন্তরিকতা ও বাঙালী মনের সহিত তাহাদের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগের জন্য তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন, অপরদিকে আধুনিক কবিগোষ্ঠীর প্রেমকবিতার প্রথাবন্ধনমুক্ত ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য প্রাচীনের সঙ্গে তুলনায় তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

৪

'বিবিধ প্রসঙ্গ'-গ্রন্থে সংগৃহীত (ভাদ্র ১২৯০) 'ভারতী' পত্রিকায় শ্রাবণ ১২৮৮ হইতে বৈশাখ ১২৮৯ পর্যন্ত প্রকাশিত নানাবিধ রচনা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র মেজাজ ও অনুভূতির প্রকাশরূপে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে 'দয়ালু মাংসাশী' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮) রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিসম্বন্ধীয় প্রথম পরিহাস-রচনা। 'শূন্য', 'স্ত্রৈণ', 'জমাখরচ' (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮) কয়েকটি লঘু সুরের খেয়ালী রচনা। 'বসন্ত ও বর্ষা' (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮) ও 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' পরবর্তী যুগের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর পূর্বসূচনারূপ ভাবুকতাময় সুকুমার-অনুভূতি-সুরভিত প্রবন্ধ। 'আদর্শ প্রেম' (ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮), 'যথার্থ দোসর' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) ও 'গোলাম-চোর' (ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮) প্রবন্ধগুলি লেখকের প্রেম সম্বন্ধে অতৃপ্তি, অনুসন্ধান ও আকৃতির পরিচয়। 'চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮), 'দারোয়ান (ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮) প্রবন্ধ দুইটিতে লেখক যুক্তিবাদের খবরদারীতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া সাহিত্যে প্রয়োজনাতীত আনন্দ বিতরণের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। 'নিমন্ত্রণসভা' (ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮) ও 'এক চোখো সংস্কার' (ভারতী, পৌষ ১২৮৮)-এ রবীন্দ্রনাথের সমাজসংস্কারস্পৃহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে ও 'জুতাব্যবস্থা' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) ও 'চীনে মরণের ব্যবসায়', (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) তাঁহার ক্রমোদ্ভিদ্যমান রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দিতেছে। 'অকারণ কষ্ট' (ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭) লেখক যে তাঁহার 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর সর্বব্যাপী দুঃখবাদের কৌতুককর ও কৃত্রিম দিকটার প্রতি অন্ধ ছিলেন না তাহার প্রমাণ।

'অনাবশ্যক' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০), 'তৃতীয় পক্ষ' (ভারতী, আশ্বিন ১২৯০) প্রবন্ধদ্বয় নব্য ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কার-বিষয়ক অত্যুৎসাহের মৃদু সমালোচনা। 'চেঁচিয়ে বলা' (ভারতী, চৈত্র ১২৮৯), 'জিহ্বা-আস্ফালন'

(ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০), 'ন্যাশনাল ফণ্ড' (ভারতী, কার্তিক ১২৯০), 'টৌন-হলের তামাশা' (ভারতী, পৌষ ১২৯০) ও 'হাতে কলমে' (ভারতী, আশ্বিন ১২৯১) প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে ধারণা ও কর্মসাধনার দ্বারা আত্মপ্রস্তুতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের রাজনীতিচর্চার মূল আদর্শটির প্রথম সূচনা মিলে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি প্রবন্ধ —যাহা 'আলোচনা' নামে ১৮৮৫ খৃঃ অঃ-এ প্রকাশিত হয়—লেখকের দার্শনিক মননের পরিচয় মিলে। এইগুলিতে গদ্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের একটি মূল দার্শনিক সুর—জীবনে অসীমত্ব-উপলব্ধির প্রয়াস – লক্ষ্য করা যায়।

এই সূত্রে রবীন্দ্রজীবনে দুইটি মুখ্য পারিবারিক ঘটনার অভিঘাত চেতনার এক গভীরতর স্তর-উন্মোচনে সহায়তা করিয়াছে। প্রথম, ১২৯০, ২২শে অগ্রহায়ণ তাঁহার বিবাহ। 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), ও 'মানসী'র গভীরতর প্রেমচেতনা-উদ্বোধনের মধ্যে তাঁহার বিবাহিত জীবনের প্রভাব কতখানি আছে তাহা অনুমান-সাপেক্ষ কিন্তু উহাদের মধ্যে কিছুটা সম্বন্ধ আরোপ করিলে হয়ত তাহা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু কবির জীবনে সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক আঘাত কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক অকালমৃত্যু (৮ই বৈশাখ ১২৯১, এপ্রিল ১৯, ১৮৮৪)। এই আঘাতেই কবি আবেশমত্ত কৈশোর ও রূপমুগ্ধ যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ত্বের সর্ববিধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়কারী জীবনসত্যে স্থির আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহার সমস্ত কল্পনা, অনুভূতি ও জীবনবোধের মধ্যে একটা পরিণত মনন, একটা চেতনার গাঢ়তা, একটা বেদনাজয়ী প্রশান্তি ও আনন্দের সুর ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার গদ্যরচনার মধ্যেও এই প্রগাঢ়তর ভাবানুভূতির সুর, এই সূক্ষ্ম অন্তরাগগাহী ভাবুকতার লীলা, জীবনের এক নূতন প্রজ্ঞা-উদ্ভাসিত রূপ, অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিল। এইখানেই তাঁহার সৃষ্টিজীবনের এক নব অধ্যায়ের সূচনা হইল।

একাদশ অধ্যায়

রবীন্দ্রগদ্যের দ্বিতীয়পর্ব

ভাবুকতাময় রচনা, সাহিত্যসমালোচনা ও জীবনচরিত

১৮৮৫—১৮৯৫

১

দ্বিতীয় পর্বের বিভিন্নবিষয়ক রচনার কালানুক্রমিক সংকলন দিয়া এই পর্বের আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে।

(ক) ভাবুকতাময় রচনা

পুষ্পাঞ্জলি ('ভারতী', বৈশাখ ১২৯২); রুদ্ধগৃহ ('বালক', আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২); পথপ্রান্তে ('বালক', অগ্রহায়ণ ১২৯২); লাইব্রেরী ('বালক', পৌষ ১২৯২)।

(খ) সাহিত্য-সমালোচনা ও জীবনচরিত

কাব্য, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ('ভারতী', চৈত্র ১২৯৩); সাহিত্যের উদ্দেশ্যে ('ভারতী', বৈশাখ ১২৯৪); সাহিত্য ও সভ্যতা ('ভারতী', বৈশাখ ১২৯৪); আলস্য ও সাহিত্য ('ভারতী', শ্রাবণ ১২৯৫); পত্রালাপ (ফাল্গুন ১২৯৮ হইতে ভাদ্র আশ্বিন ১২৯৯—লোকেন পালিতের সহিত পত্র-মাধ্যমে সাহিত্যবিচার); বিদ্যাপতির রাধিকা (চৈত্র ১২৯৮); রাজসিংহ (চৈত্র ১৩০০); সঞ্জীবচন্দ্র (পৌষ ১৩০১); ফুলজানি (অগ্রহায়ণ ১৩০১); আর্যগাথা (অগ্রহায়ণ ১৩০১); যুগান্তর (চৈত্র ১৩০১); কৃষ্ণচরিত্র (মাঘ, ফাল্গুন ১৩০১); ছেলেভুলানো ছড়া ১ ও ২ (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১; মাঘ ১৩০১, ১৩০২); কবি-সঙ্গীত (জ্যৈষ্ঠ ১৩০২);

রামমোহন রায় (মাঘ ১২৯১); বঙ্কিমচন্দ্র (বৈশাখ ১৩০১); বিহারীলাল (আষাঢ় ১৩০১) বিদ্যাসাগর-চরিত (ভাদ্র ১৩০২ ও অগ্রহায়ণ ১৩০৫)।

(গ) মননপ্রধান রচনা

'চিঠিপত্র' (বালক. জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, চৈত্র ১২৯২—মুদ্রিত ১৮৮৭, ১২৯৪); পঞ্চভূত (মাঘ ১২৯৯ হইতে ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২—মুদ্রিত ১৮৯৭, ১৩০৪)।

(ঘ) সমাজনীতি

(১)	হিন্দুবিবাহ	সমাজ, পরিশিষ্ট	১২৯৪
(২)	রমাবাঈ-এর বক্তৃতা উপলক্ষে	„ জ্যৈষ্ঠ	১২৯৬
(৩)	নূতন ও পুরাতন	স্বদেশ	১২৯৮
(৪)	প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ও ‘প্রাচ্যসমাজ’	সমাজ	১২৯৮
(৫)	মুসলমান মহিলা,	সমাজ, পরিশিষ্ট	১২৯৮
(৬)	আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত	„	১২৯৮
(৭)	কর্মের উমেদার	„	১২৯৮
(৮)	আদিম আর্যনিবাস	„	১২৯৯
(৯)	আদিম সম্বভ	„	১২৯৯
(১০)	আচারের অত্যাচার	সামজ	১২৯৯
(১১)	সমুদ্র যাত্রা	„	১২৯৯
(১২)	শিক্ষার হেরফের	শিক্ষা	১২৯৯
(১৩)	শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি	„ পরিশিষ্ট,	১৩০০
(১৪)	শোকসভা	আধুনিক সাহিত্য, পরিশিষ্ট,	১৩০১

রাজনীতি

(১)	নব্যবঙ্গের আন্দোলন—ভারতী,	আশ্বিন	১২৯৬
(২)	সার লেপেন গ্রিফিন	সমূহ, পরিশিষ্ট,	১২৯৯
(৩)	ইংরাজের আতঙ্ক	„	১৩০০
(৪)	ইংরাজ ও ভারতবাসী	রাজাপ্রজা	১৩০০
(৫)	রাজনীতির দ্বিধা	„	১৩০০
(৬)	অপমানের প্রতিকার	„	১৩০১
(৭)	সুবিচারের অধিকার	„	১৩০১
(৮)	রাজা ও প্রজা	সমূহ, পরিশিষ্ট	১৩০১

(ঙ) ছোটগল্প ও উপন্যাস

১। ছোটগল্প—‘ঘাটের কথা’ (ভারতী, ভাদ্র ১২৯১); ‘রাজপথের কথা’ (নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯১)।

২। উপন্যাস—‘করুণা’ (১২৮৫-১২৮৫); ‘মুকুট’ (ছোটদের উপযোগী—বালক, বৈশাখ ১২৯২); ‘রাজর্ষি’ (বালক ১২৯২ আষাঢ় হইতে ফাল্গুন, ২৬টি

অধ্যায়; শেষ পরিচ্ছেদগুলি—চৈত্র ১২৯২ ও বৈশাখ ১২৯৩—গ্রন্থাকারে প্রকাশ, বৈশাখ ১২৯৩, এপ্রিল-মে ১৮৮৬)।

২

ভাবুকতাময় রচনা

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ প্রভাব ১২৯২ সালে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে সুপরিস্ফুট। 'পুষ্পাঞ্জলি' (ভারতী, বৈশাখ ১২৯২) এই মর্মন্তুদ বেদনায় তরুণ লেখকের অদম্য ও সান্ত্বনাহীন শোকোচ্ছ্বাসের প্রকাশ। ইহাতে আর্টের সংযমহীন, মননশক্তির ঘনত্ববিধান-ও-পরিশ্রুতি-বর্জিত শোকের আদিম আবিলতার স্মৃতিবাষ্পে বিহ্বল, ব্যক্তিগত বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় অধীর ভাবাতিশয্য বার বার নিষ্ফল ক্ষোভে মাথা কুটিয়াছে। কিন্তু বেগবান নদীপ্রবাহের মত প্রবল ভাবও যে উচ্চতর কলাচেতনা ব্যতিরেকেও নিজের পথ নিজে করিয়া লয়, একটা ঋজু গতিছন্দে সমস্ত দ্বিধা কাটাইয়া ও বাহুল্য বর্জন করিয়া আগাইয়া চলে, রচনাটি তাহারই নিদর্শন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ শোকাবেগের এই অ-শালীন ব্যক্তিক আতিশয্যের জন্যই রচনাটিকে তাঁহার অনুমোদিত রচনাবলীর মধ্যে স্থান দেন নাই।

'রুদ্ধগৃহ' (বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২) এই শোককেই দার্শনিক মনন ও জীবনতত্ত্বের ফ্রেমে বাঁধাইয়া, রূপকের ভাবঘনত্বের নীচে ইহার সদা-প্রবহমান তরলতাকে জমাট করিয়া লেখকের বেদনাস্তব্ধ মনোভাবের দর্পণরূপে তাঁহার সৃষ্টিশালায় টাঙাইয়া রাখিয়াছে। যে ভাবাবেগ অশ্রান্ত ও অদম্য দীর্ঘশ্বাসরূপে আপনাকে অপচয় করিতেছিল, তাহাই এক গভীর জীবনসত্যের আধারে বিধৃত হইয়া আর্টের অবিনশ্বরতা লাভ করিল। মৃত্যুর প্রেতায়িত নিশ্চলতার সহিত জীবনের সবল আনন্দপ্রবাহের যোগ হইয়া জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। রচনাটির মধ্যে ভাবের যেরূপ সূক্ষ্ম অনুভব, ভাষারও সেইরূপ স্বচ্ছ ও সুষমাময় প্রকাশ। মর্মান্তিক দুঃখের আঘাতে লেখকের দার্শনিক ও শিল্পিমনের অর্ধরুদ্ধ কপাট পূর্ণভাবে উন্মোচিত হইল।

'পথপ্রান্তে' (বালক, অগ্রহায়ণ ১২০২) পূর্ব প্রবন্ধে উপলব্ধ সত্যকে নবোন্মেষিত আনন্দের কনককিরণে অভিষিক্ত করিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছে। 'রুদ্ধ গৃহ'-এ মৃত্যুর পাষাণ সমাধি ভাঙিতে যে শক্তি নেপথ্যে কাজ করিতেছিল

তাহা প্রেমের শক্তি, যদিও সেখানে প্রেমের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হইয়া জীবনের আহ্বানের কথাই বলা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে প্রেমই জীবনযাত্রার প্রেরণাশক্তি। প্রেমই মানুষের অগ্রগতির পথ বাধামুক্ত করিতেছে, জীবন হইতে অতীতের ভার হরণ করিতেছে, আসক্তির বন্ধনের দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া না রাখিয়া সম্মুখে চালনা করিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রভাতের আলো ও সমস্ত নবীন সৌন্দর্য এই যাত্রারম্ভের আশীর্বাদ। কবির রচনার প্রকৃতির আলো-ছায়ার মধ্যে চলমান পথিক জনতার শোভাযাত্রার বিচিত্র বর্ণালী প্রতিবিম্ব ফেলে। প্রেম মৃত্যুশোক ভুলাইয়া জীবনের আনন্দের মধ্যেই মৃত্যুর স্মৃতিকে জীয়াইয়া রাখে। প্রেমের এই উচ্ছ্বসিত স্তুতি, জীবনের এই উৎসাহপূর্ণ জয়গান রচনাটিকে ভাবুকতা হইতে গীতিসুরের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। কল্পনার মৌলিকতা, চিন্তার স্বচ্ছন্দ প্রসার, কাব্যানুভূতির সহজ প্রাচুর্য, যুক্তিক্রমের অদৃশ্য প্রভাবে ভাবের দৃঢ়, অথচ অলক্ষিত অগ্রগতি—সমস্তই লেখকের পরিণত শক্তির পরিচয়বাহী। মৃত্যুর অন্ধকার-ভূগর্ভস্তর হইতেই এই ফুল ফুটিয়াছে ও ইহার সুরভি সমস্ত রচনায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

'লাইব্রেরী' (বালক, পৌষ ১২৯২)—এই নবজাত অনুভূতিগভীরতাকে এক বিশুদ্ধ মননের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিয়াছে। ইহাতে চিন্তার কি সুদূর-প্রসারী মৌলিকতা, ভাবনার সহিত ভাবকল্পনার উদারতার কি সুষ্ঠু সংমিশ্রণ, পূর্ণতার সহিত সংযমের কি আশ্চর্য সমন্বয়, প্রকাশের কি অর্থগূঢ়, চমৎকৃতিজনক দ্যুতি, অপূর্ব সাহিত্যিক উৎকর্ষের হেতু হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি তাঁহার এই অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই যে এক প্রকারের উৎকর্ষ-শীর্ষে অধিরূঢ় হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৩

সাহিত্য-সমালোচনা ও জীবনচরিত

(ক) সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক

সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও এই পর্বে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়। 'কড়ি ও কোমল'-এ কবি যে নূতন রীতির কবিতা রচনা করিয়া সমকালীন সমালোচনা-জগতে কিঞ্চিৎ প্রতিকূল আলোড়নেরই সৃষ্টি করিলেন তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি নব সমালোচনার মানদণ্ডে কাব্যের স্বরূপ-

নির্ণয়ের প্রেরণা লাভ করিলেন। 'কাব্য স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' (ভারতী, চৈত্র ১২৯৩) 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' (ভারতী, বৈশাখ ১২৯৪), 'সাহিত্য ও সভ্যতা' (ভারতী, বৈশাখ ১২৯৪), 'আলস্য ও সাহিত্য' (ভারতী, শ্রাবণ ১২৯৫)—এই প্রবন্ধগুলি সবই সাহিত্যের প্রকৃতি ও পরিবেশ-নির্ধারণের সাধারণ উদ্দেশ্য-সূত্র-গ্রথিত। প্রথমটিতে সমালোচক কাব্যে অস্পষ্টতার কারণ দেখাইতে গিয়া মনোলোকের কত গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন—"সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোন কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে"। হয়ত 'কড়ি ও কোমল'-এর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়মুগ্ধতা সম্বন্ধে এই অতীন্দ্রিয়ভাবাদের যুক্তি ঠিক প্রযোজ্য নহে। তথাপি উক্ত কাব্যের ইন্দ্রিয়াকুলতা অতীন্দ্রিয়তার পূর্বাভাস বহন করে। যখন কোন কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখেন, চিত্তের সমস্ত আকুলতা দিয়া আলিঙ্গন করিতে চাহেন, যখন উপভোগের নিবিড়তার পর ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করেন, তখন তিনি যে পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজের কুঁড়ি লক্ষ্য করিয়াছেন, রূপমোহের আতিশয্যের মধ্যে রূপাতীতের আভাস পাইয়াছেন তাঁহার উদ্বেলিত ও অস্থির ভাবাকৃতিই সেই গোপন বার্তার কিছুটা ইঙ্গিত দেয়। কস্তুরিগন্ধে উন্মনা মৃগ যেমন দেহোত্থিত সুরভির দ্বারাই দেহসীমা অতিক্রম করিয়া আত্মার প্রথম মদির আকর্ষণ অনুভব করে, তেমনি কবিও দেহভোগসাধনার মাধ্যমে রূপসমুদ্র উত্তরণ করিয়া অরূপের তটভূমিতে প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপ করিয়াছেন। 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' প্রবন্ধে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যপ্রেরণাই সাহিত্য-সৃষ্টির মূল কারণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মোটামুটি জীবনের শেষ পর্যন্ত এই সৌন্দর্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের আস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল, যদিও ঐশী-লীলারহস্যের সর্বব্যাপিত্বে প্রত্যয়দৃঢ়তার ফলস্বরূপ এই সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা শ্রেয়োবোধও পরবর্তীকালে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়াছে। 'সাহিত্য ও সভ্যতা' প্রবন্ধে পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রায় বহির্মুখীন উত্তেজনার অতিপ্রাদুর্ভাবের জন্য পাশ্চাত্ত্য দেশে সাহিত্যের বিকাশ ব্যাহত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 'আলস্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে যে সুশৃঙ্খল অবসর জীবন-সাধনার ফল, কেবলমাত্র কর্মহীনতার উদ্‌ভ্রান্ত শূন্যতা নয়, তাহাই সাহিত্য-বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করে, এই মতবাদ ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম পর্বের সহিত তুলনায় এই প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথের অনুভবশক্তি যে আরও সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় হইয়াছে ও তাঁহার সাহিত্যতত্ত্বব্যাখ্যা চিন্তার সুপুষ্টতায় ও

প্রকাশের যথাযথতায় আরও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই সমস্ত গুণে আরও এক স্তর অগ্রসর হইলে রবীন্দ্রসমালোচনা ভাবগ্রাহিতার চরমোৎকর্ষে পৌছিবে।

'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে সমালোচনা-তত্ত্বের আশ্চর্যরূপ সূক্ষ্মদর্শী ও মর্মানুপ্রবেশী আলোচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত পত্রযোগে সাহিত্যতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিতর্ক খুব উন্নত মানের অনুভব ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দেয়। এই 'পত্রালাপ' ফাল্গুন ১২৯৮ হইতে ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ পর্যন্ত সংখ্যায় সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাকে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে। প্রথম পত্রে দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যটি নিরুপিত হইয়াছে। এই পথনির্দেশ-উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক সত্য সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রবন্ধে সত্যের একটি চিরতরে নির্দিষ্ট, প্রমাণ-প্রয়োগ ও বিরুদ্ধমত-খণ্ডনের দ্বারা বর্মাবৃত একটি ইস্পাত-কঠিন রূপ প্রকাশিত হয়। বন্ধুকে লেখা পত্রে সেই সত্যেরই একটি ঢিলে-ঢালা, ক্রমোদ্ভিদ্যমান, ব্যক্তিচেতনার স্পর্শে কোমল, চূড়ান্ত মতপ্রতিষ্ঠার দার্ঢ্যহীন তরলতার রূপ আত্মপ্রকাশ করে। সত্য মানবজীবনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রক্তমাংসের ও হৃদয়বৃত্তির স্পর্শকাতরতা লাভ করে। লেখকের ব্যক্তিত্ব-বিচ্ছিন্ন, জন্মভূমির ধূলিবর্জিত "অমানুষিক স্বয়ম্ভু সত্য" দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা খণ্ড-নামে পরিচিত হয়। "কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপনার মানবাকার গোপন করে না, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে, তখনই সেটা সাহিত্যের শ্রেণীতে ভুক্ত হয়।" সুতরাং কালব্যবধানে দর্শন, বিজ্ঞানের সত্য সাহিত্যিক সত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সাহিত্যে বাস্তব-জীবনের চঞ্চল, খণ্ডরূপে প্রকাশিত মানুষ আপনার পূর্ণ পরিচয় উদঘাটিত করে—এই চির-মনুষ্যের সঙ্গ আমাদের নিজের পূর্ণ মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি উপন্যাসের অতিকায়তা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বঙ্কিমের উপন্যাস যে বাংলায় এই বৃহদায়তনের আদর্শের অনুসরণ না করিয়া অতিভাষণের ও সত্যসন্ধানকে অযথা ভারাক্রান্ত করার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে তাহা আনন্দের সহিত স্মরণ করিয়াছেন। "জর্জ এলিয়টের এক একটি নভেল এক একটি সাহিত্যকাঁঠালবিশেষ······একটাকে ভেঙে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা ফল গড়লে সেগুলো দেখতে ভালো হ'ত।"

সাহিত্য যে কেবল লেখকের আত্মপ্রকাশ প্রথমপত্রে উপস্থাপিত এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে লোকেন পালিত শেক্‌সপীয়রের নাটকের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই আপত্তি আলোচনা-প্রসঙ্গে সাহিত্যের মর্মরহস্যের আরও গভীরে প্রবেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত মৌলিকতা-ভাস্বর উক্তি করিয়াছেন তাহা আধুনিক কালে মহাকবি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্য নূতন ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহেন যে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের একটি প্রত্যক্ষ ও আর একটি সংকীর্ণ তাৎপর্য আছে। ইহার মধ্যে নানা জটিল ভাবপ্রেরণার রাসায়নিক সংযোগে গঠিত, সূক্ষ্ম ও অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল, আপাত-আত্মবিলোপের অন্তরালে আত্মপ্রসারণের লক্ষণান্বিত একটি নিগূঢ় অর্থও আছে। গীতি-কবিতায় এই আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ ও সহজঅনুভববেদ্য; নাটকে এই আত্ম-প্রকাশ নানা চরিত্র-সমাবেশের নেপথ্য-অন্তরালে অলক্ষ্য ফল্গুধারায় প্রবাহিত। এমন কি মহাকাব্য বা গাথাকাব্যের কবিসত্তা অভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম আত্মপ্রতিরূপপ্রসূত পার্থক্য সৃষ্টি করে তাহার প্রমাণ ব্যাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সহিত কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রভেদ। কালিদাসের নায়ক-নায়িকা তাঁহার প্রত্যক্ষ আত্মপ্রতিফলন নয়, কিন্তু তাঁহার আত্মার সুকুমার প্রেমচেতনা ও আদর্শপূত সংযম এই চরিত্রগুলির মধ্যে যে প্রতিফলিত তাহাতে সন্দেহ নাই। মানবপ্রকৃতির সাধারণ জ্ঞানের সহিত আত্মপ্রকৃতির সুরভিত নির্যাস মিশাইয়া ইহাদের সৃষ্টি। তেমনি শেক্‌সপীয়রের চরিত্রাবলীর অশেষ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের কেন্দ্রস্থলে এক "অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্‌সপীয়রকে" অনুভব করা যায়, তাঁহারই বিচিত্র জীবনাস্বাদ, তাঁহারই অন্তঃপ্রকৃতির দ্বারা জীবনাভিজ্ঞতার রস-গ্রহণ ও প্রজ্ঞাপরিণতি ইহাদের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। কাজেই শেক্‌সপীয়রের নাটকেও আত্মপ্রকাশ আছে, তবে তাহা ঋজু ও সবল নয়, "সম্মিশ্রিত, বৃহৎ এবং বিচিত্র" ও নানা বর্ণের রশ্মিজালে বিচ্ছুরিত।

সাহিত্য-সত্য সম্বন্ধে আরও কিছু নূতন কথা এই দ্বিতীয় পত্রে বলা হইয়াছে। জীবনের সামগ্রিক অনুভূতি ও আস্বাদন হইতে আমাদের বিশেষ মানসিক গঠনের মাধ্যমে যে একটি মৌলিক জীবনবোধ উদ্ভূত হয়, তাহাই আমাদের রচনার মধ্যে একটা গভীর ছাপ রাখিয়া যায়। সুতরাং আমাদের লেখার মধ্যে কেবল যে তাৎকালিক মনোভাব প্রকাশ পায় তাহা নয়, ইহাতে আমাদের

চিরজীবনলব্ধিত গভীর মর্মসত্যটিও প্রতিফলিত হয়। এই জীবনসাধনাসম্ভূত মূলতত্ত্বটিই সাহিত্যিক সত্যরূপে অভিহিত হইতে পারে। এই মূলতত্ত্ব কোন লেখকের সংকীর্ণ, আবার কোন লেখকের বৃহৎ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা প্রদর্শন করেন, তখন তিনি বহিঃসৌন্দর্যের মধ্যে এক অনন্ত বিস্তার ও গভীরতা সঞ্চার করেন, এবং এক বৃহৎ সত্যের সহিত পরিচয়ে আমাদের আনন্দকে বৃহত্তর ও গাঢ়তর করেন। কল্পনাশক্তিসম্পন্ন করিয়া, সৌন্দর্যকে বস্তুকারাগার হইতে মুক্তি দিয়া উহার মধ্যে একটা আনন্দময় ইচ্ছাশক্তি ও আত্মিক প্রসারের ক্রিয়া উপলব্ধি করেন। "অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য।" "যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাকে ততই উচ্চ শ্রেণীর কবিতা বলে সম্মান করি।"

ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধের অতিবিস্তারকে রবীন্দ্রনাথ ঢিলেঢালা প্রৌঢ়া গিন্নীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধকেও যে এই পরিহাসসূচক আখ্যা দেওয়া যায়, দুর্ভাগ্যক্রমে সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না।

তর্কের খোঁচায় রবীন্দ্রনাথের অন্তঃরুদ্ধ অনুভূতিগুলি মুক্ততর নিষ্ক্রমণের উপলক্ষ্য পাইয়া বিশদভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পত্রে এই আত্ম-প্রকাশতত্ত্বের তিনি সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যাও প্রয়োগ করিয়াছেন। সকল আত্মার স্বচ্ছতা ও চিত্রগ্রহণক্ষমতা এক পর্যায়ের নহে। যে কবির মধ্যে জীবনের বৃহত্তম ও গভীরতম তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত হয়, জীবনের উদার সমগ্রতা অনুভূতির স্বচ্ছতার সহিত মিলিত হইয়া এক বস্তু-অতীত, ব্যঞ্জনাময় রূপে অভিব্যক্তি লাভ করে, তিনিই জীবনসত্যের উদ্‌গাতারূপে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি বিজ্ঞানের সূর্যাস্ত, চিত্রের সূর্যাস্ত ও সাহিত্যের সূর্যাস্তের মধ্যে প্রকৃতিভেদটি অপূর্ব সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত নির্ণয় করিয়াছেন। সাহিত্যের সূর্যাস্ত সমুদ্র-জলে সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রদীপ্ত প্রতিবিম্বের মত মানবের মর্মানুভূতির সহিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রাসায়নিক সংযোগে এক নূতন অনির্বচনীয়তা ও প্রাণকুহকের উদ্বোধন করে। "শেক্‌সপীয়রের লেখার ভিতর থেকে তাঁর একটা বিশেষত্ব খুঁজে বের করা কঠিন এইজন্যে যে, তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব।" "তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে তুলেছেন তাকে দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মতপাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এইজন্যে

ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন একটি রচয়িতৃ-ঐক্য নেই।" শেক্‌স্‌পীয়রের সার্বভৌমতার এরূপ মনোজ্ঞ ও মৌলিক ব্যাখ্যা তাঁহার স্বগোষ্ঠীর সমালোচকের মধ্যেও দুর্লভ।

শেক্‌সপীয়রের নাটকের সহিত তুলনায় একটি সোসাইটি নভেলের জীবনচিত্রণ অধিকতর বাস্তবানুসারী এবং আমাদের অধিক সুপরিচিত। তথাপি এই সমস্ত নভেলে আমরা জীবনের খণ্ডচিত্র ও ক্ষণিক তথ্য পাই, শেক্‌সপীয়রের নাটকের মত শাশ্বত সত্য পাই না। "মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেক্‌সপীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবলই মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করছে না—কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মতো অবাধে ঝরে আসছে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মতো প্রমোদে ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শন-শিখর আছে সেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।"

সাহিত্য-সত্য সম্বন্ধে আর একটি মতবাদও রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করিয়া অপূর্ব প্রজ্ঞাবলে উহার যাথার্থ্যের সীমানির্দেশ করিয়াছেন। 'সাহিত্যের সত্য কেবল প্রকাশের সত্য'—ক্রোচের মতবাদের এই পূর্বাভাসটি রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে—"সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।...সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার।" অর্থাৎ কেবল প্রকাশের চারুতা নয়, কি প্রকাশিত হইল তাহার গৌরব ও ব্যাপকতাও সত্যমূল্যনির্ণয়ে সহায়ক। এই দুরূহ তত্ত্বের এমন সহজ, অথচ সুন্দর মীমাংসা আশ্চর্য ঠেকে না কি?

চতুর্থপত্রে রবীন্দ্রনাথ লোকেন পালিতের আর একটি যুক্তির বিচার করিতেছেন। প্রাচীন সাহিত্যে তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ছিল না, তত্ত্বনিরপেক্ষ এক অখণ্ড জীবনরসই সাহিত্যের উপজীব্য ছিল। ইহা ঠিকই, কেননা সে যুগে সন্দেহ জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে বিচ্ছেদ-চেতনা আনে নাই। "অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূলদেশে মিলিত হয়ে একটি অপূর্ব ঐক্যলাভ করেছে; সাহিত্য সেই অতিদুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী।" এই বিভিন্ন উপাদানগুলি "যত মিলিত ভাবে থাকে মনুষ্যত্ব ততই অবিচ্ছিন্ন সুতরাং আত্মসম্বন্ধে অচেতন থাকে। সেগুলোর মধ্যে যখন বিরোধ

উপস্থিত হয় তখনই তাদের পরস্পরের সংঘাতে একটা স্বতন্ত্র চেতনা জন্মায়। ...তখন আমাদের একান্নবর্তী মানস পরিবারকে পৃথক করে দিই এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রাধান্য উপলব্ধি করি।"

"কিন্তু শিশুকালে যেখানে এরা একত্র জন্মগ্রহণ করে মানুষ হয়েছিল পৃথক হয়েও সেইখানে এদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য সেই আনন্দ-সংগমের ভাষা।...এখনকার এ মিলন চিরমিলন নয়, এ বিচ্ছেদের মিলন।"

শেক্‌সপীয়র বা রামায়ণ-মহাভারত নিরাবরণ মানবচিত্র প্রদর্শন সত্ত্বেও অশ্লীল নয়, কিন্তু ভারতচন্দ্র বা জোলা অশ্লীল কেন এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর মননশীল মন্তব্য করিয়াছেন, অশ্লীল সাহিত্যের যাথার্থ্যের দাবীর ইহার অপেক্ষা নিপুণতর খণ্ডন এ পর্যন্ত হয় নাই। সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষ, অন্ততঃপক্ষে প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষকে প্রত্যাশা করি। কতকগুলি অভিজাতবৃত্তিসম্পন্ন মানুষকে আমরা প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করি না, কেননা জীবনে ইহাদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বস্বীকৃত। কিন্তু ইতরবৃত্তি-প্রধান মানুষকে—যেমন ঔদরিক বা কামুক ব্যক্তিকে—আমরা এই প্রতিনিধির মর্যাদা দিতে চাহি না, কেননা কেবল এই সমস্ত বৃত্তির মাধ্যমে আমরা সাহিত্যের উপযোগী মানবপ্রতিনিধি পাই না। সুতরাং তাহাদের চরিত্রে বাস্তব সত্য থাকিলেও মর্যাদার অভাববশতঃ তাহারা সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না। কেননা আমরা দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি হইতে সত্য পাইতে পারি। একমাত্র সাহিত্য হইতেই সমগ্র মানুষ প্রাপ্তব্য।

মানুষকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য; আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া যদি মানবপ্রকৃতির সম্পূর্ণতা ব্যঞ্জিত হয়, তবেই তাহা সাহিত্য-মর্যাদার উপযোগী। তেমনি প্রকৃতি-বর্ণনা, সৌন্দর্যপ্রকাশও মানবমহিমাদ্যোতনার উপায় মাত্র, স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নহে। "হ্যামলেটের ছবি সৌন্দর্যের ছবি নয়, মানবের ছবি, ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।" "লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব-প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।"

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে যে সুদূরপ্রসারী চিন্তাশক্তি, দুরূহ তত্ত্বপ্রতি-পাদনের অসাধারণ ক্ষমতা, সাহিত্যবিচারে অপূর্ব রসানুভব ও জটিল তর্কজালের গ্রন্থিমোচনে আশ্চর্য দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সবে মাত্র যৌবনোত্তীর্ণ, ত্রিংশবর্ষবয়স্ক লেখকের পক্ষে এক অত্যাশ্চর্য কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। চিঠিপত্রের হালকা সুরে লেখা বলিয়া ইহাতে প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর ছাঁদ একেবারে

অনুপস্থিত। সহজ, কথ্য ভাষায় গভীর ভাবপ্রকাশ ও দুরূহ সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠার এরূপ সাবলীল দৃষ্টান্ত সমালোচনাসাহিত্যে খুব বিরল। এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রপাঠকের বিশেষ সুপরিচিত নহে বলিয়াই ইহাদের এইরূপ বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে হইল। বিশেষতঃ শেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমতের আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতা শেক্‌সপীয়রের চারিশততম জন্মোৎসববৎসরে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বিবেচিত হইবে।

৪

খ. জীবনচরিতবিষয়ক

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাক্ষেত্রে অগ্রগতির পরবর্তী স্তর কয়েকটি গ্রন্থের রসপূর্ণ আলোচনায় ও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ও সমাজনেতার জীবনী ও সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নের মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে। কালানুক্রমিকভাবে এই রচনাগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় (মাঘ ১২৯১, 'চারিত্রপূজা'-র অন্তর্ভুক্ত), বঙ্কিমচন্দ্র (বৈশাখ ১৩০১, 'আধুনিক সাহিত্য'-এর অন্তর্ভুক্ত), বিহারীলাল (আষাঢ় ১৩০১), বিদ্যাসাগর-চরিত (ভাদ্র ১৩০২ ও অগ্রহায়ণ ১৩০৫)।

প্রথমতঃ চরিতপ্রবন্ধগুলি আলোচনা করা যাইতে পারে। এগুলি পুরাপুরি সাহিত্যসম্বন্ধীয় নয়, প্রধানতঃ কর্মসাধনারত ও গৌণভাবে সাহিত্যচর্চাসংশ্লিষ্ট কয়েকজন মহনীয়-চরিত্র ব্যক্তির জীবনী-আলোচনার সাহায্যে তাঁহাদের জীবন-মহিমা-উপলব্ধির প্রয়াস। কালের দিক দিয়া সর্বাগ্রবর্তী 'রামমোহন রায়'। ইহার রচনাকাল মাঘ ১২৯১, যখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেইশ অতিক্রম করিয়াছে মাত্র। এই প্রবন্ধে লেখকের গদ্যরীতি তীক্ষ্ণ যুক্তি ও প্রবল আবেগকে সমন্বিত করিয়া, নিজ উদ্দেশ্য-প্রতিপাদনের প্রতি অবিচল লক্ষ্য রাখিয়া, ভাষার গাম্ভীর্য ও ভাবের ক্ষুরধার ব্যঙ্গঝলক মিশাইয়া, দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর যথাযথ বিন্যাসে রচনার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া একটি প্রকাশ-পরিণতি লাভ করিয়াছে। অবশ্য এই সুশৃঙ্খল, দৃঢ়চ্ছন্দ, মোটের উপর একটু মন্থরগামী ভাষানির্মিতির মধ্যে কাব্যানুভূতি বা সূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা কোন রমণীয় মুগ্ধ আবেশের সৃষ্টি করে নাই। তরুণ লেখক তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে এত বেশী সচেতন যে তিনি কোথায়ও বিষয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই; রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব-

প্রতিষ্ঠায় ও তাঁহার প্রতি দেশবাসীর ঔদাসীন্যের অনুযোগক্ষুব্ধ প্রতিবাদে তিনি তাঁহার সর্ব শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। সর্বত্র একটা যুদ্ধোদ্যমের চাপা আক্রোশ, একটা অবিচারের ন্যায়সম্মত প্রতিকার-প্রয়াস, ভ্রান্ত মত সংশোধনের প্রচণ্ড আগ্রহ লেখকের মনকে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিয়াছে যে উচ্চতর শিল্পজগতের কোন সৌন্দর্যপ্রেরণা তাঁহার কঠোর উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতাকে কিছুমাত্র শিথিল ও সরস করে নাই।

রামমোহন রায়ের জীবনসাধনার তত্ত্বরূপ-উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ যে অন্তঃপ্রবেশশীল মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সর্বথা স্বীকার্য। তথাপি তৎকালীন হিন্দুসমাজ ও ধর্মের যে চিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে রামমোহনের কৃতিত্বের প্রশস্তি-রচনায় তিনি ঠিক মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুসমাজকে শ্মশান-নিশীথিনীর নীরন্ধ্র অন্ধকারের আধাররূপে দেখিয়াছেন ও উহার কুসংস্কারকে কালজীর্ণ মন্দিরের ভগ্নভিত্তির ছিদ্রস্থিত বাস্তুসর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন। রামমোহনের সংস্কারকার্যের গৌরব লাঘব না করিয়াও এই চিত্র যে অতিরঞ্জন-বিকৃত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এই উপমাগুলি যেমন যাথার্থ্যের দিক দিয়া তেমনি সাহিত্যিক শোভনতার দিক দিয়া সম্পূর্ণ রুচিকর হয় নাই। মনে হয় তরুণ ব্রাহ্মসমাজ-সম্পাদকের যে অত্যুৎসাহ তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তর্কযুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল তাহার উত্তাপ কিছুটা এখনও তাঁহার মনে ধূমায়িত ছিল। রামমোহনের জন্মের কিছু পূর্বে রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলী ভক্তিসাধনার যে অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাস ধ্বনিত করিয়াছিল তাহার মধ্যে রামমোহন বা রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের সমকালীন জড়তা ও বিকারের মধ্যে অকৃত্রিম ধর্মবোধের কি কিছু নিদর্শন খুঁজিয়া পান নাই?

রামমোহনকে দেশের লোক যথোপযুক্ত মর্যাদা দেয় নাই এই সম্বন্ধে তাঁহার একটি গূঢ় অভিমান ছিল; এই অনুযোগ বিদ্যাসাগরের জীবনীতেও বাঙালীর বিদ্যাসাগরের প্রতি আচরণের উপর মন্তব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলেও রামমোহনের প্রতি উপেক্ষার যে কিছু সঙ্গত কারণ ছিল তাহাও অস্বীকার করা চলে না। রামমোহন বাংলা সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা পথিকৃতের কাজ; তাঁহার প্রবর্তিত গদ্যরীতি গদ্যসাহিত্যের সৌধভিত্তির নিম্নেই আত্মগোপন করিয়াছিল। বিশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ পাঠকের সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। রামমোহনের উদারতা, বিশ্বচেতনা ও ঔপনিষদিক ব্রহ্মানুরাগ অবশ্য-স্বীকার্য, কিন্তু জনজীবনের সহিত

তাঁহার তো কোন ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলই না বরং ছিল একটা সুদূর, দুরতিক্রম্য ব্যবধান। লৌকিক হিন্দুধর্ম তাঁহার চক্ষে ছিল একটা কুসংস্কারের পঙ্ককুণ্ড, উহার মধ্যে প্রশংসা বা সহানুভূতির বিন্দুমাত্র উপলক্ষ্য তিনি পান নাই। ব্রাহ্মধর্ম-প্রবর্তন বা আত্মীয়সভা-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে তিনি হিন্দুসমাজের জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, নেতৃবৃন্দকেও পর্যন্ত আহ্বান জানান নাই। তিনি স্বেচ্ছায় হিন্দু-ধর্মের মূল প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক শাখাপথে নিজ ধর্মসাধনা ও তত্ত্বব্যাখ্যাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। হয়ত সে যুগে ইহা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক সংস্করণকে জনসমাজের প্রতিকূল পরিবেশে প্রচার করিতে হইলে একটি সুসংবদ্ধ, সম-আদর্শনিষ্ঠ, অনুরাগী শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ইহাকে আগে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। ব্রাহ্মোপাসনার ব্যাপক প্রবর্তনের জন্য হয়ত ব্রাহ্মগোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল, কিন্তু হিন্দুর সহিত নবদীক্ষিত ব্রাহ্মের যাহাতে সম্পর্কের হৃদ্যতা অক্ষুণ্ণ থাকে, হিন্দুর আচার-ব্যবহারের উৎকট লঙ্ঘনে যাহাতে তাহার মনে সন্দেহ ও বেদনা উদ্রিক্ত না হয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে যাহাতে প্রাচীনপন্থী হিন্দুকে অমর্যাদা করা না হয়, সামাজিক মেলা-মেশায় যাহাতে ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া না উঠে সে দিকে রাজার বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। মহর্ষি কিছুটা এই সমন্বয়নীতি-অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু বিভেদের স্রোত ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া তাঁহার মিলনস্পৃহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। রামমোহন শুধু উপাধিতে বা চরিত্রগৌরবে রাজা ছিলেন না, তাঁহার রাজোচিত সম্ভ্রমবোধ ও মানস আভিজাত্যও তাঁহাকে জনসাধারণ হইতে দূরে রাখিয়াছিল। তিনি তাঁহার কৃতিত্বের জন্য ভবিষ্যৎকালের ঐতিহাসিকের সাধুবাদ অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গুণ ও দোষ উভয়ই তাঁহার সমকালীন বা ভবিষ্যৎ জনপ্রিয়তালাভের অনুকূল ছিল না ইহা সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার চরিত্রে যুক্তির প্রাধান্য ও আবেগের স্বল্পতাও তাঁহার জনপ্রিয়তা-লাভের অসামর্থ্যের অন্যতম কারণ। এই দিক দিয়া তাঁহাকে বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের সহিত তুলনা করিলেই তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের সীমাস্বরূপটি সুস্পষ্ট হইবে।

রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের চরিত্রমহিমার উৎসরূপে তাঁহার অসাধারণ আত্ম-নির্ভরশীলতা, আত্মবিলোপশক্তি, তাঁহার সংগঠন ও বর্জন এই উভয়বিধ কার্যের সুষম সমন্বয়, তাঁহার প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মসাধনার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বিশ্বজগতে বিতরণের জন্য উহার সংরক্ষণ ও অনুশীলন, তাঁহার

তথাকথিত বিশ্বজনীন উদারতার মোহে ভারতের উত্তরাধিকার-ঐশ্বর্য অস্বীকার না করার সত্যানুরাগ ও অন্যান্য দেশের ঈশ্বরের ধারণার সহিত ভারতের ব্রহ্মানুভূতির পার্থক্য-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিক ও মানসিক গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। রামমোহনের জীবনচিত্রটি রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণাঙ্গ ও অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুটা অতিকথনজনিত ও অত্যধিক বিষয়াধীনতার জন্য কিঞ্চিৎ গুরুভারগ্রস্ত হইয়াছে। আমরা রামমোহনকে যথার্থভাবে দেখি, কিন্তু যে পারিপার্শ্বিকতায় তিনি কর্মপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন তাহার চিত্র কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হওয়ায় এই পারিপার্শ্বিকের সহিত তাঁহার পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নাই। তিনি যেন খানিকটা ভূত-প্রেত-প্রতিষেধক আভিচারিক বা বাস্তুসর্পবিভীষিকা নাশক মন্ত্রস্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। সমগ্র জগতে ব্রহ্মপ্রচারের যে পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ রামমোহনে আরোপ করিয়াছেন তাহা রামমোহন নিজে সচেতনভাবে অনুভব করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে, পাশ্চাত্ত্য জগতের সহিত অন্তরঙ্গতর সাংস্কৃতিক পরিচয়ের যুগে বিবেকানন্দ এই উপনিষদের বাণীর দৌত্যকার্য আশ্চর্য কুশলতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রামমোহনে যাহা নিশীথ স্বপ্ন ছিল, বিবেকানন্দে তাহা প্রভাতের নব-আশা-দীপ্ত বাস্তব কার্যক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'বিদ্যাসাগরচরিত'-এও (ভাদ্র ১৩০২ ও অগ্রহায়ণ ১৩০৫) রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ উদারহৃদয়, কর্মবীর বিদ্যাসাগরের মানবিক চরিত্রই ফুটাইতে চাহিয়াছেন, সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর এই প্রবন্ধে অতিশয় গৌণ। তথাপি স্বল্প পরিসরের মধ্যেই লেখক বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির মর্মগত তাৎপর্যটি চমৎকারভাবে ধরিয়াছেন ও স্মরণীয় বাক্‌বিন্যাসের মধ্যে উহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর-গদ্যের সমস্ত পরবর্তী আলোচনা রবীন্দ্রনাথ-নির্দেশিত এই মূলসূত্র-অনুসরণেই পল্লবিত হইয়াছে। বাংলা গদ্যের উৎপত্তিযুগে উহার ভাবের গুরুত্ব বা আবেগের মাত্রা অপেক্ষা উহার সুষম বাক্যগঠনের উপরই অধিক জোর দেওয়া হইত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচার-মানদণ্ডের প্রয়োগে বিদ্যাসাগরের রচনার ভাবগভীরতার দিকটা মোটেই আলোচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে প্রবহমান ভাষাস্রোতের উপর কোন ব্যক্তিবিশেষের শিল্পরীতি চিরকালের জন্য মুদ্রিত থাকে না, চিরগতিশীল নদীজল কাহারও কারুকার্যকে চিরদিন ধরিয়া রাখে না। এই অভিমত দীর্ঘমেয়াদী বিচারে সত্য হইতে পারে, কিন্তু স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ আলোচনায় এক একটি

যুগ এক একটি প্রতিভাশালী লেখকের শিল্পপ্রভাবাঙ্কিত হইয়া থাকে। গদ্যরীতির দিক দিয়া আমরা এখনও সবুজপত্রোত্তর রবীন্দ্রনাথের যুগে বাস করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভা অপেক্ষা মনুষ্যত্বকে জীবনে উচ্চতর স্থান দিয়াছেন ও দুরূহতর সাধনার ফলরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। অসাধারণত্ব উভয়েরই স্বরূপ-লক্ষণ। বিদ্যাসাগর সমাজনীতির গতানুগতিকতা অতিক্রম করিয়া সকল সমাজে সার্বভৌম শ্রেষ্ঠত্বের যে আদর্শ আছে তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্বপুরুষের পরিচয় দিয়া তাঁহার পিতামহের তেজস্বিতা, অকুতোভয়তা ও মাতার প্রথাবন্ধনমুক্ত পরদুঃখমোচনেচ্ছা যে তাঁহার রক্তধারায় সংক্রামিত হইয়াছিল তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার পিতার কর্তব্যনিষ্ঠা ও শান্ত ক্লেশসহিষ্ণুতাও তাঁহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য-নির্দেশ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনমনীয় স্বাধীনতাপ্রিয়তা ও স্বভাবতঃ করুণার্দ্র হৃদয়বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন এই উভয় গুণেরই অপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। তাঁহার চরিত্রের এই পৌরুষ সূক্ষ্ম তর্কজালে নিঃশেষিত না হইয়া বলিষ্ঠ, একাগ্র কর্মসাধনায় আত্মপ্রকাশ করিত ও তাঁহার ধর্মবোধকে জটিল আচার-আচরণজালে আবদ্ধ না রাখিয়া উদার, আত্মবঞ্চনামুক্ত শ্রেয়োসাধনের পথে চালনা করিত। তাঁহার বিধবাবিবাহের সমর্থন এই নির্মোহ, সার্থক কর্মের শতধারায় উৎসারিত দয়াপ্রবৃত্তিপ্রসূত। সাধারণ বাঙালী চরিত্রের ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অভ্রভেদী চরিত্রমহিমার পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া এক চমৎকার উপমায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের উপরে লেখা দ্বিতীয় প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মননক্রিয়ার প্রবলতার দ্বারা তাঁহার পারমার্থিক জীবনযাপনের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ শাস্ত্র ও লোকাচারের অনুসরণে চিরাভ্যস্ত কর্মের দ্বারা একটা কৃত্রিম সজীবতা রক্ষা করে। বিদ্যাসাগর সেইখানে নিজ স্বাধীন মননের প্রেরণায় নিজ জীবনবোধ ও কর্মসাধনাকে পারমার্থিক অনুভূতির স্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা ক্ষণিক উল্লাস, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাহা স্থির ও অনির্বাণ আলোক। এই নিঃসঙ্গ আদর্শবাদের বেদনা তিনি সান্ত্বনাহীনভাবে আজীবন বহন করিয়াছেন। মহৎ প্রকৃতির অনুষঙ্গী দুঃখবোধের অভিশাপ তাঁহার অন্তরে সদাপ্রজ্বলিত বহ্নিশিখার দাহজ্বালা বিকীর্ণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লেস্‌লি ষ্টিফেন ও

কার্লাইলের জনসনের উপর অভিমত উদ্ধৃত করিয়া জনসনের সহিত বিদ্যাসাগরের বীর-আত্মার গভীর সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধের বহির্জীবন-বিবৃতি দ্বিতীয় প্রবন্ধের অন্তঃপ্রেরণা-বিশ্লেষণের সহযোগিতায় একটি অন্তরে-বাহিরে সম্পূর্ণ, কর্মে ও দার্শনিকতায় পরস্পরের পরিপূরক, জীবনচিত্র রচনা করিয়াছে।

গদ্যরীতির দিক হইতে 'বিদ্যাসাগর-চরিত' 'রামমোহন রায়'-এর সহিত তুলনায় অনেক উন্নততর পর্যায়ের। রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ বিচার করিয়াছেন ভাবাদর্শের মানদণ্ডে, তাঁহার কর্মকৃতির বিস্তৃতির পরিমাপে। তাঁহার অন্তরলোকে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার মানবিক জীবনস্পন্দন তাঁহার বিরাট কর্মপুঞ্জের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছে। ইহার সহিত তাঁহার স্মৃতির প্রতি তথাকথিত অবিচারের ক্ষোভ ও বেদনা যুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের বিচারবুদ্ধিকে ভাববাষ্পে কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিয়াছে। রামমোহন তাঁহার নিকট এক অস্বীকৃত আদর্শের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ও অনুযোগের বাষ্প তাঁহার মূর্তিকে অতিরঞ্জিত মহিমায় স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে। এই অত্যুচ্ছ্বাসস্ফীতি লেখকের রচনানৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁহার ভাব ও ভাষার মধ্যে কোথায়ও কোথায়ও প্রতিফলিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের জীবন বইএর খোলা পাতার মত তাঁহার কাছে একেবারে দ্ব্যর্থতাহীনভাবে সুপরিস্ফুট। তাঁহার বাহিরের প্রভাব ও অন্তরের প্রেরণা, তাঁহার কর্ম ও উহার উৎস, তাঁহার কঠোরতা ও কোমলতা, তাঁহার নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম অথচ সমাজধর্মের প্রতি স্পর্ধিত বিদ্রোহের অভাব, শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর হৃদয়বৃত্তির অনুশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস—এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথের রচনায় যথাযথ-বিন্যস্ত ও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক। তাঁহার মন্তব্যগুলিও যথাযথ ও বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলির যোগসূত্র-রচনায় ও তাৎপর্য-উদ্‌ঘাটনে সহায়ক। তাঁহার বাঙালীর প্রতি ধিক্কার বা বিদ্যাসাগরের চরিত্রগৌরবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন কোথায়ও আতিশয্য-বিড়ম্বিত হয় নাই। প্রতিভা ও মনুষ্যত্বের মধ্যে তুলনা, বিদ্যাসাগরের দয়ার মধ্যে পৌরুষমহত্ত্বের ক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে বলিষ্ঠতা, ধর্মবোধের মধ্যে সবল বাস্তবচেতনা প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের অভিমতগুলি যেমন বুদ্ধিদীপ্ত তেমনি তীক্ষ্ণ অর্থগূঢ়তার সহিত প্রকাশিত। বাক্যগঠনের দিক দিয়াও সাধারণতঃ সরল, সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ্ণভাবব্যঞ্জক বাক্যপরম্পরাই বিন্যস্ত হইয়াছে। 'রামমোহন'-এর সহিত তুলনায় এই ভাষা অনেক দ্রুতগামী ও শক্তিশালী। ক্বচিৎ কখনও আবেগঘন মুহূর্তে সংস্কৃতশব্দবহুল, অন্তশ্ছন্দঝঙ্কৃত

দীর্ঘ বাক্য আমাদের সৌন্দর্যানুভূতি ও শ্রুতিসুখকরতা উভয় বৃত্তিরই পরিতৃপ্তি-সাধন করে। রবীন্দ্রনাথের গদ্যপ্রবন্ধে যে অতিপল্লবিত বিস্তারের দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায় এখানে বিষয়গৌরব ও লেখকের অকৃত্রিম আবেগ তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। 'বিদ্যাসাগরচরিত' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিতপ্রবন্ধ।

'বঙ্কিমচন্দ্র' (বৈশাখ ১৩০১) ও 'বিহারীলাল' (আষাঢ় ১৩০১) এই দুইটি প্রবন্ধ দুইজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত শ্রদ্ধার্ঘ্য। প্রথমটিতে চরিত্র ও বাংলাসাহিত্যসেবার কল্যাণকর প্রভাব-নির্ণয়ই প্রধান; দ্বিতীয়টিতে কবির কাব্যের ও কল্পনা-বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ-নির্ধারণই মুখ্য স্থান অধিকার করে। বঙ্কিমের উপর প্রবন্ধে বঙ্কিমসৃষ্ট সাহিত্যের প্রত্যক্ষ মূল্যায়ন নাই, আছে তাঁহার আবির্ভাবের ফলে বঙ্গসাহিত্যের অভাবনীয় রূপান্তর ও রবীন্দ্রনাথের উন্মেষোন্মুখ তরুণ-জীবনে উহার পুলকিত, মাদকতাময় উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব সংযত ও সত্যনিষ্ঠ ভাবোচ্ছ্বাসের সহিত বাংলাসাহিত্যের সেই প্রথম যৌবনের অসীম আশা ও সম্ভাবনার উদ্বেলিত উল্লাস-চাঞ্চল্যের রূপটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিমের মহৎ দান সম্বন্ধে আধুনিক বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি আবার তাঁহাকে তাঁহার চিরাভ্যস্ত রামমোহনের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমের পরিণত শিল্পসৌন্দর্য আর রামমোহনের প্রাথমিক দুর্বল প্রয়াস সাহিত্যসৃষ্টির এক পর্যায়ে পড়ে না। রামমোহনের সাহিত্যিক ভূমিকা গৌণ, সমাজসংস্কারকের ভূমিকা মুখ্য। বঙ্কিমে ইহার ঠিক বিপরীত। উপন্যাস ও শুষ্ক ধর্মালোচনার আকর্ষণও সমান নয়; আর রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে অর্ধশতাব্দীর ব্যবধান তাহাতে বাঙালী পাঠকের রুচি, সাহিত্যবোধ ও স্বদেশানুরাগ অনেক বেশী মার্জিত ও উন্নত হইয়াছে। কাজেই উভয়ের মধ্যে তুলনা ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সাহিত্যসাধনাকে ঐতিহাসিক সমীক্ষা দিয়া দেখিয়াছেন, উহার নিজস্ব উৎকর্ষের বিচার করেন নাই। বঙ্কিমের প্রধান কীর্তি দরিদ্র, অপরিণত মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান, ঐ ভাষার জীর্ণ আধারে তাঁহার উচ্চশিক্ষিত মনের সমস্ত ঐশ্বর্যসম্ভারের অবিচলচিত্তে ও একান্ত বিশ্বাসে সমর্পণ ও বাংলা রচনায় তাঁহার নিজ বোধের মধ্যে যে সমুন্নত আদর্শের কল্পনা ছিল, তাহারই পূর্বদৃষ্টান্তনিরপেক্ষ, পাঠকের প্রত্যাশার সহায়তাহীন, নিষ্ঠাবান্ প্রয়োগ। লেখক বঙ্কিম যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমালোচক

বঙ্কিম অপটু রচনাকারের হাতে তাহার অমর্যাদা কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় তিনি নিজের উপর যে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা সহ্য করিবার মত তাঁহার চরিত্রবল ছিল।

বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা' ও 'কাল্পনিকতা' এই নিকটাত্মীয় দুইটি মনোবৃত্তির মধ্যে একটি চমৎকার ও সুস্পষ্ট পার্থক্যের রেখা টানিয়াছেন। এই গ্রন্থে বঙ্কিমের দৃঢ় যুক্তিবাদ ও উচ্ছ্বাসাতিশয্যবর্জনের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অতিভাষণজনিত লঘুতার নিদর্শন দিয়াছেন। এই অংশটি প্রবন্ধগৌরবের সর্বাংশে উপযুক্ত হয় নাই।

বঙ্কিমের হাস্যরসের শুভ্রোজ্জ্বল শুচিতাসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য খুব সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচায়ক এবং ইহা বঙ্কিমসাহিত্যের একটি দিকের বিষয়ে চূড়ান্ত সত্য। এই প্রসঙ্গে অশ্লীল রসিকতার প্রতি একান্ত ঘৃণাব্যঞ্জক বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের যে ঘটনাটির রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাঁহার সমস্ত সাহিত্যরুচির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করে।

প্রবন্ধটির উপসংহারে সদ্যোপরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নৈর্ব্যক্তিক শোকাভিব্যক্তির আদর্শস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহাতে শোকের মহৎ গাম্ভীর্য, লোকান্তরিত প্রতিভার বিবিধ গুণাবলীর স্মরণ ও সম্যক্ বিচার দ্বারা উদ্দীপ্ত কৃতজ্ঞতাবোধ ও ঋণস্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়াছে ও একটা ভাবুকতাপ্রসূত, সংযত আবেগ চিত্তকে অনুভূতির উচ্চগ্রামে পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত শোকের কোন বিহ্বল আতিশয্য বা অসংবরণীয় উচ্ছ্বাস নাই। সাহিত্যসম্রাটের মর্যাদার উপযোগী সম্ভ্রান্ত ভাষাতে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন। গদ্যরীতিও ক্রমশঃ সরলতা ও আয়তন-সংক্ষেপের দিকে অগ্রসর হইতেছে, অথচ প্রয়োজনানুসারে, আবেগের মাত্রাভেদে কবিত্বময় প্রকাশভঙ্গীও লেখকের নিপুণ হস্তের স্পর্শের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

বিহারীলালের উপর প্রবন্ধটি (আষাঢ় ১৩০১) প্রায় সম্পূর্ণরূপেই কাব্য-বিশ্লেষণ-ও-রসাস্বাদনমূলক। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত থাকিলেও এই প্রবন্ধে সেই ব্যক্তিপরিচয়ের বিশেষ কোন ছাপ দেখা যায় না। বিহারীলালের কবিপ্রকৃতির অনন্যসাধারণ মৌলিকতার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কল্পনা-বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও ইহার স্বরূপ-নির্ণয়ে

প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবের আপাত-অসংলগ্নতা ও মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীলতা সমালোচকের নিকট মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য ঠেকিলেও মোটের উপর রবীন্দ্রনাথ কাব্যের পরিকল্পনা ও কবির মনোগত অভিপ্রায়ের সুন্দরভাবে মর্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিহারীলালের ছন্দপ্রয়োগের নূতনত্বও রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করিয়া উহার দ্বারা কিরূপ নূতন সৌন্দর্যসৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনে বিহারীলালের কবিতা কিরূপ অপরূপ মায়ালোক উদ্বোধন করিত ও বিহারীলালের প্রভাব তাঁহার প্রথম কবি-জীবনে কিরূপ কার্যকরী হইয়াছিল তাহারও একটি বিশদ, মনোমুগ্ধকর বিবরণ তিনি দিয়াছেন। মোট কথা এই যে, সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কবিতার সৌন্দর্য-আবিষ্কারের ও রস-আস্বাদনে, অন্তর্দৃষ্টিময় সমালোচনা কেমন অভ্রান্ত পথনির্দেশ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি তাহার নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কাব্য-সমালোচনার মূলসূত্রটি এ প্রবন্ধে যেরূপভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, পরবর্তী সমালোচনা আরও বিস্তারিতভাবে তাহারই অনুসরণ করিয়াছে। হয়ত অধিকতর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বিহারীলালের ভাব-পারম্পর্যটি আমাদের নিকট আর পূর্বের ন্যায় বিভ্রান্তিকর মনে হয় না। রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে আমরা যে সূক্ষ্ম, সুকুমার ও অমূর্ত ভাবরাজির সহিত পরিচিত হইয়াছি, তাহারই আলোকে আমরা বিহারীলালের কাব্য-গোলোকধাঁধার মধ্যে এক অখণ্ড ভাবানুভূতির, এক মধুর-ব্যাকুল প্রণয়াবেশের বিভিন্ন পর্যায়ের উৎক্ষেপ লক্ষ্য করিতে পারি, এক মিষ্টিক রহস্যের যুক্তি-অতীত, কিন্তু ধ্যানগম্য এককেন্দ্রিকতার ছন্দটি অনুভব করিতে সমর্থ হই। কবি-আত্মার প্রাণকেন্দ্রে অনুপ্রবেশের শক্তি রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি অর্জন করিয়াছিলেন, এই অনির্দেশ্য অনুভব-প্রকাশের উপযোগী শব্দব্যঞ্জনা যে তিনি কতখানি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটিতে তাহারই প্রমাণ নিহিত।

৫

গ. গ্রন্থকার-সমালোচনাবিষয়ক

'বিদ্যাপতির রাধিকা' (চৈত্র ১২৯৮) বিদ্যাপতি-বর্ণিত নবোন্মেষিত কিশোরী-প্রেমের পুলক-চঞ্চল, অস্থির উচ্ছ্বাসের অপূর্ব রস-বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিপ্রকৃতির সবটুকু সুকুমার অনুভূতি দিয়া, পৃথিবীর পেলব, আবেগ-কম্পিত সৌন্দর্য-সঞ্চয় হইতে উপমা ও চিত্র চয়ন করিয়া এই প্রেমবিহ্বলতার মাধুর্য

ফুটাইয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রণয়কলার সমস্ত চাতুরী, সমস্ত মধুর ছলনা, সমস্ত অপরিস্ফুট রহস্যগোধূলির বিভ্রান্তি তিনি তাঁহার অনুভবের সূক্ষ্মজালে ও প্রকাশের ব্যঞ্জনাময় চারুতায় ধরিয়া ফেলিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত এই আত্মবিস্মৃত নবীন প্রেম নিজ তরঙ্গলীলায় আবর্তিত হইতে হইতে হঠাৎ যে অতলস্পর্শ রহস্যের সন্ধান পাইয়াছে, ভাবের যে অসীম, গহন সত্যস্বরূপের মধ্যে অবগাহন, করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির সেই অধ্যাত্ম প্রেমানুভূতির উল্লেখ করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়াছেন। নবীনের মধ্যে এই চিরন্তন অতৃপ্তির আবিষ্কার, চিরপুরাতনের ছায়াপাত বৈষ্ণবপদাবলীতে বিদ্যাপতির ভূমিকা শেষ করিয়া চণ্ডীদাসের ভূমিকার জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছে। অবশ্য এই সমালোচনার ধারা কতকটা বঙ্কিমচন্দ্র-প্রভাবিত, তবে বঙ্কিমের তত্ত্বপ্রাধান্যের পরিবর্তে এখানে রসানুভবের গভীরতা।

'সঞ্জীবচন্দ্র' (পৌষ ১৩০১) আর একটি অন্তর্দৃষ্টিতে বহিরাবরণভেদী সমালোচনার সুন্দর দৃষ্টান্ত। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রারম্ভিক মন্তব্য যেরূপ সূক্ষ্মদর্শী সেইরূপ যথার্থদ্যোতক। "সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিণী নহে"—এই উক্তিতে উহার মর্মকথাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। অবান্তর প্রসঙ্গের সমাবেশপ্রবণতা, পল্লবিবৃতির মধ্যে তত্ত্বের অযথা অনুপ্রবেশ তাঁহার 'পালামৌ' ভ্রমণবৃত্তান্তের গঠনসুষমার যে কিছুটা হানি করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা চলে না।

অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার তত্ত্বচেতনা শুধু তাঁহার পর্যবেক্ষণশক্তিকেই তীক্ষ্ণতর করে নাই, তাঁহার সৌন্দর্যসৃষ্টিতেও একটু মননসূক্ষ্মতা আরোপ করিয়া উহাকে খানিকটা ভাবুকতাধর্মী করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'পালামৌ' হইতে শিশু-মনস্তত্ত্ব-মূলক একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উৎকলন করিয়া ইহাতে শিশুর প্রতি আমাদের স্নেহরসকে কিরূপ ঘনীভূত করিয়াছে তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু পর্বতমধ্যে প্রতিধ্বনির শব্দতরঙ্গের কৌতুককর হ্রাসবৃদ্ধির বর্ণনা সাহিত্যরসহীন তথ্যপর্যবেক্ষণের বৃত্তান্ত। রবীন্দ্রনাথের চমৎকার প্রবন্ধটি চন্দ্রনাথ বসুর পূর্বতন প্রবন্ধের অতি-খুঁতখুঁতে দোষানুসন্ধানে কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। অপরাহ্নে মেয়েদের জল আনিতে যাওয়ার আগ্রহকে চন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইয়া উহাকে পর্যবেক্ষণশক্তির নয়, জল আনিতে যাওয়ার নানা সম্ভাব্য কারণের মধ্যে সুন্দরতম কারণটি আবিষ্কারের মূলীভূত কল্পনাশক্তির নির্দেশরূপে লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের

বিশ্লেষণটিই সত্য হইলে প্রশ্ন উঠে না কি যে এই কল্পনা কি নিছক অভিজ্ঞতা-ভিত্তিশূন্য অনুমান মাত্র? রবীন্দ্রনাথের নিজের 'মানসী'-কাব্যে নগরের অট্টালিকাজালে আবদ্ধা যে গ্রাম্যবালিকা 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্' এই ধুয়ার সাহায্যে তাহার অবরুদ্ধ মনের বেদনা প্রকাশ করিতেছে, তাহার ব্যাকুল স্মৃতিচারণা কি চিত্তের মুক্তিকামনার সহিত জড়িত অপরাহ্ণ গ্রাম্য প্রকৃতির মোহময় আকর্ষণ-প্রসূত নয়? মানবের জটিল ও পরস্পরসম্পৃক্ত মনোবৃত্তিগুলির মধ্যে কখন কোন্ ভাবের উদ্দীপনে কোন সূত্রের টান পড়ে সে বিষয়ে কি নিশ্চিত হওয়া যায়? পর্যবেক্ষণের পিছনে কল্পনাগত সহানুভূতি ক্রিয়াশীল হইবার কোন বাধা নাই। কাজেই এই প্রতিবাদের অনিবার্যতা সংশয়হীন নয় বলিয়াই মনে হয়।

আরও একটি স্থলে রবীন্দ্রনাথ যে চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে নিজ মতপার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও যেন কিছুটা অযথা দোষ ধরার প্রবণতাপ্রসূত ঠেকে। সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছেন যে একই রূপ বিভিন্ন সজীব ও নির্জীব পদার্থ, মানব ও ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই উক্তি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ মন্তব্য সংযোজনা করিয়াছেন; "সঞ্জীববাবুর সৌন্দর্যতত্ত্ব ভালো করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না, ভালো করিয়া সম্ভোগ করা যায় না।" এই আপাত-নিরীহ মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদস্পৃহা অনেকটা উগ্রভাবে উত্তেজিত হইয়াছে ও উহার খণ্ডনকল্পে তিনি অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ তত্ত্বের সহিত সৌন্দর্য-উপভোগের কোন সম্বন্ধ নাই। যে নিরক্ষর ব্যক্তি প্রিয়মুখকে চাঁদমুখের সহিত তুলনা করে, সে তত্ত্ব না জানিয়াও উভয় বস্তুর দর্শনে সমজাতীয় আনন্দ অনুভব করে। দ্বিতীয়তঃ ইহা না কি বর্তমান সমালোচন-প্রণালীতে অনুসৃত সহজ বিষয়কে জটিল করিয়া দেখাইবার একটা বিকৃত রুচির দৃষ্টান্ত, যাহার উদ্দেশ্য পাঠককে সাহিত্যরসোপভোগের আনন্দদান নয়, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের দ্বারা তাহার মনে বিস্ময়-বিভ্রান্তি-উৎপাদন।

রবীন্দ্রনাথের মত একজন সুস্থমস্তিষ্ক, সহানুভূতিশীল ও মতবিরোধে অনুত্তেজিত সমালোচকের এই ব্যাপারে এতটা অসহিষ্ণুতা-প্রকাশ সত্যই আশ্চর্য লাগে। চন্দ্রনাথ বসুর বিরুদ্ধে তাঁহার ধর্ম ও সমাজবিষয়ক মতভেদ কি দীর্ঘকাল অজ্ঞাত-সারে অবচেতন মনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অকস্মাৎ এই উপলক্ষ্যে তীব্রভাবে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে চন্দ্রনাথের মতবাদ অসঙ্গত মনে হয় না। যে লেখকের সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তাত্ত্বিক উপাদানের সংমিশ্রণ আছে

তাঁহাকে বুঝিতে গেলে তাঁহার তত্ত্বের সহিত পরিচয়ের কিছুটা প্রয়োজন আছে বৈকি! যে ভাবমুগ্ধ ব্যক্তি প্রিয়মুখের মধ্যে চাঁদমুখের সাদৃশ্য উপলব্ধি করে, সে কোন নূতন তত্ত্বপ্রেরণা অনুভব করিতেছে না, ভালবাসা-প্রকাশের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথারই অনুসরণ করিতেছে মাত্র। মানুষ ও চাঁদ তাহার নিকট দুই স্বতন্ত্র বস্তু নহে, উপমার সূত্রে ও চিরাভ্যস্ত প্রয়োগের বন্ধনে উহারা এক হইয়া গিয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্র যে একটা নূতন সৌন্দর্যানুভূতির রস পরিবেশন করিতেছেন তাহার প্রমাণ এই যে তিনি চিরস্বীকৃত সৌন্দর্যের সীমার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি সৌন্দর্যের চিরপ্রচলিত সংজ্ঞাকে অতিক্রম করিয়া যে সমস্ত বস্তু সাধারণতঃ অসুন্দর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও রূপদীপ্তির ঝলক দেখিয়াছেন। "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"—তাঁহার সৌন্দর্যের এই নূতন অনুভূতি একটা গূঢ়তর সামঞ্জস্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, একটা মৌলিক তত্ত্বদৃষ্টিপ্রসূত। সুতরাং তাঁহার তত্ত্ব তাঁহার সৌন্দর্য-উপলব্ধির বিষয়ে একেবারে অবান্তর নয়। আধুনিক সমস্ত সমালোচকই একমত যে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'-'সোনার-তরী'-'চিত্রা'-পর্বের সৌন্দর্যাদর্শ অনুধাবন করিতে হইলে তাঁহার অন্তর্যামী-জীবনদেবতা-তত্ত্বে অনুপ্রবেশ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ববিরোধী যুক্তি কি এখানেও প্রযোজ্য? উপরের যুক্তিক্রমের সারবত্তা স্বীকার করিলে চন্দ্রনাথ যে ইচ্ছা করিয়া সাহিত্যরস-আস্বাদনকে জটিল ও দুর্বোধ্য করিতেছেন এই অভিযোগও অসার হইয়া পড়ে।

কোল যুবতীবৃন্দের মণ্ডলীনৃত্যের যে অপূর্ব বর্ণনা সঞ্জীবচন্দ্র দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহার অপরূপ সৌন্দর্যরসপরিস্ফুটনে উহার মধ্যে তত্ত্বপ্রভাব অস্বীকার করিয়াছেন ও অবিমিশ্র কল্পনাশক্তিরই সুষমাময় প্রকাশ দেখিয়াছেন। সমস্ত বর্ণনাটি সুন্দর ও অতীত যুগের মহাকবিবৃন্দের সৌন্দর্যসৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সার্থক অনুসরণ—ইহাই উহার চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও প্রশংসা—ইহাই রবীন্দ্রনাথের সমাপ্তি-মন্তব্য। সাহিত্যে সৌন্দর্যই চরম ফলশ্রুতি ইহা সত্য, কিন্তু এই সৌন্দর্যের মধ্যে কোন নূতন স্বাদ আছে কি না, কোন নূতন মেজাজ ইহার মধ্যে প্রতিফলিত কি না, সার্বভৌম সৌন্দর্যের কোন নব লাবণ্যচ্ছটা বা ভাবকান্তি ইহা হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে কি না এ সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তিও সমালোচনার একটি প্রত্যাশিত কর্তব্য। অন্যথা সমালোচনার কাজ অত্যন্ত গতানুগতিক হইত। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস ও গোবিন্দদাসের রূপ-দ্যোতনায় ব্যবহৃত দুইটি উপমা উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহাদের সাহায্যে নায়িকার দেহে-মনে

একটি পরিচিত সৌন্দর্যভঙ্গী বা বর্ণনাতীত সৌন্দর্যব্যাকুলতা কেমন সুকৌশলে সঞ্চারিত হইয়াছে। সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনায় কোন উপমা নাই, সুতরাং তিনি কোন প্রথাসিদ্ধ ফলের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন না ইহা সহজেই অনুভবগম্য। তিনি নৃত্যপ্রতীক্ষায় কথঞ্চিৎ রুদ্ধচাঞ্চল্য কোল যুবতীদের অধীর উত্তেজনা ব্যঞ্জিত করিবার জন্য 'তেজঃপুঞ্জ অশ্বের দেহবেগসংযম' ও মাদল বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক্ষামুক্তির নির্দেশক 'দেহে কোলাহল' এই দুইটি সম্পূর্ণ নূতন চিত্রকল্প প্রয়োগ করিয়াছেন। এগুলি সার্থকভাবে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং ইহারা নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য অতীত কাব্য-ঐতিহ্যের অনুসারী নয়। কোল যুবতীদের নিকষকৃষ্ণদেহে অবদমিত, অথচ ঈষৎস্পন্দিত নৃত্যছন্দহিল্লোল্ যে একটি সমষ্টিগত গতিবেগের সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে লেখক তাহাই এখানে ব্যক্ত করিতে চাহেন বলিয়া প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁহার প্রয়োজন মেটে নাই। এই অভূতপূর্ব রূপব্যঞ্জনা অভিনব চিত্রকল্পপ্রয়োগের প্রতীক্ষা করে। ইহার সঙ্গে লেখকের সৌন্দর্যতত্ত্ব কি একেবারেই অসংপৃক্ত? এই নূতন রূপদৃষ্টি তাঁহার সৌন্দর্যবোধের অভিনবত্ব-প্রসূত ও সৌন্দর্যসৃষ্টির উপায় ও উপকরণও এই নূতন রূপদৃষ্টিরই ফল। সুতরাং এই বর্ণনাকে কেবল সুন্দর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে ও প্রাচীন কাব্যের সহিত ইহাকে সম্পর্কিত করিয়া দেখাইলে ইহার অসাধারণ বিশেষত্বটুকু প্রতিভাত হয় না। সৌন্দর্য-আলোচনায় তত্ত্বের প্রতি অতিরঞ্জিত গুরুত্ব-আরোপ ও তত্ত্বের সামগ্রিক বর্জন—এই উভয় প্রকারের অতিরেকই যথার্থ সমালোচনার পরিপন্থী।

৬

ঘ. গ্রন্থসমালোচনাবিষয়ক

ইহার পর কয়েকটি গ্রন্থের সমালোচনা 'আধুনিক সাহিত্য'-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (চৈত্র ১৩০০) ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটি আদর্শ-স্থানীয় সমালোচনার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই উপন্যাসটির মাধ্যাকর্ষণ-ভারমুক্ত, কার্যকারণশৃঙ্খলে শিথিলবন্ধন, উদ্দাম গতিবেগের উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা উপন্যাসের মন্থর চিত্তবিশ্লেষণে অভ্যস্ত (এবং এই পাঠকশ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথও গোড়ায় ছিলেন) তাঁহারা লেখকের এই আপাত-দায়িত্বহীন ঘটনা-প্রবাহের ত্বরা-তাড়িত অনুসরণে বিশেষ প্রসন্নতাবোধ করিতে পারেন নাই।

উপন্যাসটি ভাল করিয়া পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ বুঝিয়াছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনার দুর্দম বেগের সহিত মানবজীবনের ছন্দে সমতা রক্ষা করাই উহার উচ্চতম আর্ট, এবং এই ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে মানবজীবনের যে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণতর পর্যবেক্ষণ বিসর্জন দিতে হয়, তাহা নিছক লোকসান নয়, তাহা মানবের ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনে ইতিহাসের ঝটিকাবর্ত প্রবেশ করাইবার দুরূহ সাধনায় সিদ্ধিলাভের অনিবার্য মূল্যদান।

তাহার পর মানবজীবনে ইতিহাসের এই দুরন্তবেগ কিরূপ সার্থকভাবে সংক্রামিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহা অপূর্ব সাঙ্কেতিকতার সহিত চঞ্চলকুমারী, জেবউন্নিসা, মানিকলাল, মোবারক ও দরিয়ার জীবনক্রমের অভাবনীয় রূপান্তরের ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতিহাসের প্রলয়-ঝটিকা ইহাদিগকে আপন আপন অভ্যস্ত জীবনের সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ হইতে উন্মুলিত করিয়া নিয়তির গূঢ় অভিপ্রায়-সাধনের উপায়ে পরিণত করিয়াছে, উহাদের মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনার বীজ রোপণ করিয়া এক একটি অচিন্তিতপূর্ব ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করাইয়াছে। অথচ সর্বত্রই চরিত্রের একটি মূল সূত্রের উপরেই এই ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। রাজসিংহ ও আরংজেব—এই দুই ঐতিহাসিক নেতা কিন্তু ইতিহাসের এই নববেশবিধাত্রী মায়াশক্তির, এই প্রকৃতিবিপর্যয়কারী লীলাভিনয়ের বাহিরে রহিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস ইঁহাদিগকে কোন নূতন রূপে উপস্থাপিত করে নাই, ইঁহাদের মল্লযুদ্ধের রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়াছে মাত্র। রাজনৈতিক কারণে যে সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল, ব্যক্তিগত কারণ তাহাকে আরও আসন্ন ও বিস্ফোরক-শক্তিসম্পন্ন করিয়াছে। ঝড় না বহিলে চঞ্চলকুমারী তাহার ক্ষুদ্র ভুঁইয়ার অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া ভারত-ইতিহাসের পটপরিবর্তনের প্রেরণাদাত্রী শক্তির মর্যাদা পাইত না। জেবউন্নিসা বাদশাহের রংমহলের ভোগবিলাসিনী নারী হইতে প্রণয়রহস্যের অনুভবধন্যা জ্যোতির্ময়ী রমণীসত্তারূপে নবজন্মপরিগ্রহ করিত না। মাণিকলাল দস্যু হইতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের কৌশলময় যোদ্ধা হইত না, মোবারক শাহজাদীর অনুগ্রহভাজন শত প্রণয়ীর মধ্যে একতম অখ্যাত প্রসাদভোগীরূপে অপরিচয়ের চিরতিমিরাচ্ছন্ন থাকিত ও দরিয়ার উন্মত্ততা ও ঈর্ষ্যা নিয়তির অস্ত্র না হইয়া মূঢ় আত্মনির্যাতনের উপায়রূপেই ব্যবহৃত হইত। ইতিহাস-প্রভঞ্জনের প্রচণ্ড ফুৎকারে এই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি-কণাগুলি এক একটি প্রদীপ্ত জ্যোতিঃশিখায় উজ্জীবিত হইয়া জীবনে দীপালি-মহোৎসব বিকীর্ণ করিয়াছে।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ 'বিষবৃক্ষ'-এর সহিত 'রাজসিংহ'-এর প্রকৃতিগত পার্থক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 'বিষবৃক্ষ'-এ প্রথম হইতে ট্র্যাজেডির পূর্বাভাস, গভীর রসের সৃষ্টি। 'রাজসিংহ'-এ গোড়ার দিকে হৃদয়-নিঃসম্পর্ক ঘটনার লঘু দ্রুত প্রবাহ। যেমন কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে তেমনি ধীরে ধীরে সুর গভীরতর ও জীবনসংস্পর্শে, বিচিত্ররাগিণীর মিশ্রণে নিগূঢ়-আবেদনবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'রাজসিহ'-এর চরম পরিণতির মধ্যে বহু বিভিন্ন ভাবের মিশ্র কল্লোলধ্বনি শুনা যায়। ইহার কিছুটা ক্রমবর্ধমান ঘটনাবেগ, কিছুটা ঘটনাপুঞ্জের যাত্রা-সমাপ্তি-মোহানের কেন্দ্রাকর্ষণ, কিছুটা জীবন-পরিণতির নিগূঢ়তর অন্তর-আলোড়ন, কতকটা ব্যক্তিজীবনের শোকোচ্ছ্বাস ও কতকটা মানুষ ও ঘটনা উভয়ের উপরেই ইতিহাসের প্রজ্ঞা-ভাস্বর, অন্তিম বিচার-ঘোষণা। এতগুলি সুর মিলাইয়াই ঐতিহাসিক উপন্যাসের শেষ ফলশ্রুতি বিবর্তিত হয়।

ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবনের সূক্ষ্ম ভাবসঙ্গতিরক্ষার প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ একদিকে মোগলসাম্রাজ্যের অনিবার্য ধ্বংসের বেদনা, অন্যদিকে জেবউন্নিসার ইতিহাস-কারাগার হইতে মুক্ত স্বাধীন মানবাত্মার মহিমাভিষেকের উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি সমস্ত জগৎব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী তিনিই এই দুই বিভিন্ন স্তরের ঘটনার মধ্যে সমমূল্য আরোপ করিয়া মানুষ ও ইতিহাসকে একই মর্যাদার সিংহাসনে বসাইয়াছেন।

'ফুলজানি' (অগ্রহায়ণ ১৩০১), 'যুগান্তর' (চৈত্র ১৩০১) ও 'আর্যগাথা' (অগ্রহায়ণ ১৩০১) এই জাতীয় গ্রন্থ-সমালোচনা। প্রথম তিনখানি উপন্যাস ও চতুর্থটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-রচিত সংগীতপুস্তক। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রশংসার দিকে অতি-উদারতা দেখাইয়াছেন, কিন্তু ত্রুটি-নির্দেশে যাথার্থ্য-বিচারের পরিচয় দিয়াছেন। উপন্যাস দুইখানির ত্রুটিই যে তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ামক, তাহারই মানদণ্ডে যে তাহাদের যথার্থ সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে সমালোচকের অতি-প্রশস্তিও উহাদিগকে বিস্মৃতিস্রোতের উপরে ভাসাইয়া রাখিতে পারে নাই। 'ফুলজানি'-তে পল্লী-জীবনের যে শান্ত, কৌতুকমণ্ডিত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বর্ণনার স্বচ্ছতার স্তর অতিক্রম করিয়া চরিত্রের গভীরতায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। কাজেই যখন দুর্ভাগ্য আকস্মিক বজ্রপাতের মত আপতিত হইয়া এই স্নিগ্ধ জীবনযাত্রাকে ভস্মীভূত করিয়াছে তখন এই ভস্মস্তূপের মধ্যে জীবনতাৎপর্যের শেষ চিহ্নও বাকী থাকে না। বিশেষতঃ

পুরন্দরের চরিত্র-পরিবর্তন অনেকটা অভাবনীয় বলিয়াই মনে হয় ও উপন্যাসে কেন্দ্রস্থ শক্তি হইবার মত গুরুত্ব ও প্রভাবশালিতা উহার নাই। 'যুগান্তর'-এ ব্যক্তিচরিত্রের উজ্জ্বলতা ও মতবিরোধের উদ্দামতা, স্থির ভাবের সৌন্দর্য ও দ্রুত পরিবর্তনের অস্পষ্ট ছায়া উভয়ে মিলিয়া সমস্ত উপন্যাসটির সুষমা বিপর্যস্ত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটি ঘটনাবাহুল্যে, তর্কের আতিশয্যে ও অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের ভিড়ে ভাবকেন্দ্র হারাইয়াছে।

'আর্যগাথা'র উপর সমালোচনাটি সঙ্গীত ও কাব্যের মধ্যে সম্পর্কের মূলনীতি-নির্ধারণ হিসাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য ও কথার ভূমিকা সুরের বাহনরূপে নিতান্ত গৌণ। হিন্দী গানের ছন্দও কোন বাঁধা-ধরা নিয়মের অনুবর্তী নয়, উহা একান্তভাবে সুরের প্রবাহের উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে কাব্যে কথারই প্রাধান্য ; সুর যদি কিছু থাকে তাহা প্রকট নয়, অন্তঃস্পন্দরূপে শব্দসমাবেশের গ্রন্থনসূত্র রচনা করে মাত্র। যেখানে কাব্য ও সঙ্গীত উভয়েই উপস্থিত, সেখানে প্রত্যেকেই আপনার অসপত্ন অধিকার বিসর্জন দিয়া একটা যৌগিক ঐক্যে মিলিত। কখন কোন্‌টির প্রাধান্য তাহা ভাবের জটিলতা বা সরলতা, রচনার একভাবকেন্দ্রিকতা বা বহুভাবসমন্বয়চেষ্টার মানদণ্ডে নির্ণীত হয়। কতকগুলি রচনায় সুর না থাকিলেও উহারা সুরের অনুচ্চারিত আকৃতিতে অনুরণিত। আবার কতকগুলি সুর তালযোগে গেয় হইলেও আসলে কাব্যের মত মিশ্রভাবপ্রকাশক, গানের অ-দ্বিতীয় আবেগ-কম্পন ইহাদের মধ্যে শ্রুত হয় না। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই শ্রেণীগত পার্থক্যটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। অবশ্য কবিতা যে গান নহে, তাহা উহার মননপ্রাধান্য ও ভাবের ওজন হইতে বুঝা যায়। কিন্তু যেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ গান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহাদের কারুকার্য ও আবেগের বিক্ষেপ ও বিস্তার গানের আদর্শ হইতে তাহাদের বিচ্যুতি ঘটাইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের যে বাৎসল্যরসের গানটি রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও হাস্যরসউদ্দীপক বিসদৃশ ভাবের সমাবেশে গীতিধর্মী আবেগময়তার একনিষ্ঠ পরিণতি লাভ করে নাই। অবশ্য আধুনিক যুগে গানও পূর্ব ঐতিহ্য লঙ্ঘন করিয়া নূতন নূতন রসের উদ্রেক করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান হাস্যকর উদ্ভট সুরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া আমাদের অসঙ্গতিবোধকেই তীব্রতর করিয়া তোলে। আর রবীন্দ্রনাথের গান সুরসর্বস্ব না হইয়া ভাবসৌকুমার্য ও কাব্যসৌন্দর্যের সহিত সুরবৈচিত্র্যের সমমর্যাদামূলক সূক্ষ্ম সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কবিতা ও গানের মধ্যে এক নূতন প্রীতিসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর উপর প্রবন্ধটি (মাঘ ফাল্গুন, ১৩০১) রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনৈপুণ্যের পরিচয় বহন করিলেও সামগ্রিকভাবে খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। ইহার কারণ যে প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে নেতিমূলক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। তিনি বঙ্কিম-কল্পনার দোষ-ত্রুটি-অপূর্ণতা উদ্‌ঘাটন করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কোন গঠনমূলক বিচারপদ্ধতির নির্দেশ দেন নাই। প্রথমতঃ বঙ্কিম-প্রতিভার স্বাধীনচিত্ততার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন —শাস্ত্রকে অন্ধভাবে অনুসরণের পরিবর্তে যুক্তিবাদের মানদণ্ডে ও মহৎ আদর্শবাদের আলোকে উহার অন্তর্নিহিত সত্যকে বরণ করার যে শ্লাঘ্য মনোবৃত্তি তাহা রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। তবে মহাভারতের আদিম ঐতিহাসিক অংশ প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কিম যে বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত একমত নহেন। কাব্যের উৎকর্ষ-অপকর্ষের উপর গ্রন্থের ঐতিহাসিকতানির্ণয় নির্ভর করে না, বরং শ্রেষ্ঠ কাব্য অনেক সময় নিজ উন্নততর ভাবাদর্শের প্রয়োজনে ইতিহাসের তথ্যগত যাথার্থ্যকে অস্বীকার ও অতিক্রম করে। কৃষ্ণের মুখে যে সমস্ত ঔদার্যব্যঞ্জক উক্তি আরোপিত হইয়াছে সেগুলি যে কৃষ্ণের ঐতিহাসিক পরিচয় বহন করে তাহা না হইতেও পারে, বরং উহারা কবির উচ্চ মানসিকতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে পারে। অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রের পোষক প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রচলিত মহাভারতেই কৃষ্ণের পরস্পরবিরোধী চিত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ার জন্য মহাভারত-বর্ণিত কৃষ্ণই যে ঐতিহাসিক কৃষ্ণ ইহা প্রমাণ করা যায় না। আবার বহু ক্ষেত্রে কাব্যপ্রতিভার মায়ামুকুরে প্রতিফলিত মহৎচরিত্র ইতিহাসের বিচ্ছিন্নতথ্যসংকলিত চরিত্র অপেক্ষা বেশী জীবন্ত ও অধিকতর সত্যানুগামী তাহাও সুধীমণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত।

বিশেষতঃ কৃষ্ণচরিত্রের পুনর্গঠনে বঙ্কিম-প্রযুক্ত একটি বিচারসূত্র ভ্রান্ত মনে হয়। বঙ্কিম নিজে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিলেও মহাভারতকার যে সমকালীন একটি আদর্শ চরিত্রে দেবত্ব আরোপ করিবেন তাহা সম্ভব মনে করিতেন না। সুতরাং মহাভারতে যেখানে যেখানে কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে সেই সমস্ত অংশকে তিনি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম নিজে তাঁহার নিজের অনুশীলন-তত্ত্ব মহাভারতীয় কৃষ্ণে আরোপ করিয়া কালানৌচিত্য-দোষের হেতু হইয়াছেন। হয়ত কৃষ্ণের মধ্যে সে যুগের রাজন্যবর্গের দ্বারা অনমুশীলিত বহু নূতন বৃত্তির স্ফুরণ ও বিকাশ দৃষ্ট হয়। ক্ষত্রিয়ের সীমাবদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার পরিধিকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া তাঁহার সংস্কৃতি-পরিমণ্ডল

প্রসারিত। কিন্তু কৃষ্ণ যেখানেই অনুশীলনতত্ত্বের মূর্ত বিগ্রহরূপে প্রতিভাত না হইয়াছেন, যেখানেই তাঁহার মানস বৃত্ত এই কৃত্রিম সামঞ্জস্যকেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত হয় নাই, সেখানেই যে তিনি অনৈতিহাসিক, বঙ্কিমের এই মত তাঁহার অযথা theory-বদ্ধতারই পরিচয়। বঙ্কিমের কার্য অর্ধসম্পন্ন হইয়াছে—মহাভারতের ইতিহাস যেখানে সন্দিগ্ধ সেখানে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রামাণ্য ইতিহাসের পুনরুদ্ধারে বিশেষ অগ্রসর হন নাই।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ দুই প্রকার স্খলনের জন্য এই উপাদেয় গ্রন্থের উৎকর্ষ-হানির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্কিম গ্রন্থমধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক বা অর্ধপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহাদের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করেন নাই। ফলে পাঠকেরা মূল আলোচনা হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থের নানাস্থানে বিদেশীয়দের প্রতি অকারণ ব্যঙ্গবিদ্রূপপ্রবণতার আধিক্যে কৃষ্ণের উদার আদর্শপ্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রশান্ত নিষ্ঠা ও সমদর্শী মতসহিষ্ণুতার প্রয়োজন বঙ্কিম বার বার তাহা হইতে স্খলিত হইয়াছেন। মোটকথা রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনায় অনেটা বিচারকের দাঁড়ি-পাল্লা হাতে লইয়া ওজন করিয়া প্রশংসা ও নিন্দা মিশ্রিত করিয়াছেন, সম্পূর্ণভাবে আলোচ্য-গ্রন্থের সীমার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন ও নিজ মৌলিক অনুভূতির সংবেগ যথাসম্ভব সংহরণ করিয়া যুক্তিবিচারের রশ্মিনিয়ন্ত্রিত মন্থর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছেন।

৭

ঙ. লোকসাহিত্যবিষয়ক

'ছেলেভুলানো ছড়া': ১ ও ২ (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১; মাঘ ১৩০১, কার্তিক, ১৩০২—'লোকসাহিত্য'-এর অন্তর্ভুক্ত)—রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিধর্মী সমালোচনার অপূর্ব উদাহরণ। কয়েকটি অর্থহীন, অসংলগ্ন ছড়ার কালগত প্রতিবেশ, ভাবগত বাতাবরণ ও রূপগত খণ্ডবিচ্ছিন্নতার এমন একটি অপরূপ অন্তর্দৃষ্টিসাধিত পুনর্গঠন এই সমালোচনাতে পাওয়া যায় যাহা আর্টের সূক্ষ্ম নিয়মাধীন রচনাতেও বিরল। এই ছড়াগুলি কালের দিক দিয়া এক সুদূর বিস্মৃত অতীতের নিদর্শন; অতীতের টুকরা টুকরা অংশগুলি যেন ভাসিতে ভাসিতে স্মৃতির উপকূলে ভাষার জালে হঠাৎ আটকাইয়া গিয়া কোন মতে অস্তিত্ব-রক্ষা করিয়াছে। ভাবের দিক হইতে ইহারা এমন একটি অবোধ, মূঢ় আবেগ-প্রাবল্য

হইতে উদ্ভূত যাহা অর্থসঙ্গতির বাঁধন ছিঁড়িয়া নিজের বেগে ও সুরেই আত্ম-প্রকাশক্ষম ও হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে আবেদনবহ। রূপের দিক হইতে ইহারা মেঘমায়ার ন্যায় যেমন বর্ণাঢ্য, তেমনি নির্দিষ্ট-আকারহীন—রং ফেরানোর ও চিত্র পালটানোর মাধ্যমেই ইহারা নিজের ক্ষণিক রূপপ্রভাটি কল্পনানেত্রে মুদ্রিত করিয়া যায়। এক হিসাবে ছাপার অক্ষরের মধ্যে ইহাদের অবয়বটি চিরতরে নির্দিষ্ট হওয়ায়, ইহারা সজীব কল্পনার নবনব চিত্রকল্পসংযোজনার চমক, স্মৃতির অতল-সঞ্চিত মণিরত্নের আকস্মিক উৎক্ষিপ্ত দীপ্তিচ্ছটা হইতে বঞ্চিত হইয়া দরিদ্রই হইয়াছে। পাখীর ডানা কাটিয়া উহাকে মুদ্রাযন্ত্রের পিঞ্জরে প্রবেশ করাইলে হয়ত পাখী উড়িয়া পালাইবে না ইহা ঠিক, কিন্তু উহার ডানা হইতে যে আলো-ছায়া ঠিকরাইয়া পড়িত, যে সুর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইত তাহার কুহকটি চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল।

শিশুর মনে মোহজাল বিস্তার করিতে গেলে সর্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন তাহা নিবিড় স্নেহবিহ্বল হৃদয়ের স্পর্শ ও কিছু কিছু ছন্দকাকলী ও চিত্রকল্পনার উদ্দীপন। ইহাদের সহিত তুলনায় অর্থসংসক্তি ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য অত্যন্ত গৌণ, হয়ত বা অপ্রয়োজনীয়। শিশু কবিতার আভিধানিক অর্থ খোঁজে না, সে খোঁজে স্নেহে দ্রবীভূত কণ্ঠস্বর ও এই ভালোবাসার সোহাগ-মাখান ন্যূনতম সুরের মোহ। কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আবেগের আতিশয্য কখনও যুক্তিশৃঙ্খলিত. অর্থবন্ধনসীমিত ভাষণের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই। সমস্ত সম্ভব-অসম্ভব উপমা প্রথমে ভাবমত্ততার আবিষ্কার, পরে আবেগের হ্রাস হইলে অর্থ-গৌরব ও যুক্তিনিষ্ঠতার হস্তে প্রয়োগবিধিনিরূপণের জন্য সমর্পিত। কোন বাস্তবসচেতন কবি সূর্যের সঙ্গে কমলিনীর ও চন্দ্রের সঙ্গে কুমুদিনীর প্রণয়সম্পর্ক নিছক পর্যবেক্ষণের ফলে আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। মাত্রাতিরিক্তভাবে উত্তেজিত কল্পনাই এই স্বর্গে মর্ত্যে, দূরে নিকটে, সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী বস্তুর মধ্যে এই অন্তরঙ্গতার স্বর্ণসূত্রটি অনুভব করিয়াছে। ছড়া আরও পূর্ববর্তী অনুভূতিস্তরের প্রকাশ। এখানে কোন দৃঢ়বদ্ধ উপমা নাই, কোন সাদৃশ্যের স্পষ্ট অনুভব নাই, আছে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক চিত্রপরম্পরা বা ভাববিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা অলক্ষ্য দ্যোতনার বেতার সংযোগ। যেখানে হৃদয়ের ভাব-গদগদ তরলতা সর্বদাই সম্ভব-অসম্ভবের সীমা বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে, যেখানে স্নেহপুত্তলি শিশু-সম্রাটের ক্ষুদ্রতম খেয়াল-খুশী পূরণের জন্য জগতের নিয়ম-কানুন পালটাইয়া যাইতেছে সেখানে এই আবেগ-আতিশয্যের প্রকাশের উপায় কাব্যের সুমিত ও অর্থবহ

ভাষার প্রয়োগ নয়, একটু রং-এর ঝিলিক ও সুরের যাদুর মাধ্যমে অন্তরের এই বিহ্বল অতৃপ্তির মুক্তি। যেখানে চাঁদমুখে রোদ লাগিলে মর্মান্তিক বেদনা অনুভূত হয়, যেখানে প্রাত্যহিক জুতাকে কল্পলোকের জুতুয়া নামে অভিহিত না করিলে মনের স্নেহবুভুক্ষা মেটে না, যেখানে হৃদয়ের ধনকে লইয়া বনে গেলে নিঃসপত্ন হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনে সমস্ত অভাববোধ দূর হয়, সে জগতে কাব্যকবিতার নিয়ম-কানুন ও রূপও সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে গড়া। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই ছড়াগুলির সমস্ত অসংলগ্নতা ও উৎকট অসম্ভাব্যতার মধ্যে স্বপ্নলোকের অন্তঃসঙ্গতি, একটা সুকোমল অনুভূতি-জগতের প্রগল্ভ ছন্দ অলক্ষিতভাবে বর্তমান। সমস্ত হিজিবিজির পিছনে এক অসংজ্ঞান শিল্পবোধ ক্রিয়াশীল, এক ছবি-আঁকা মনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

একটা বিষয়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ভাবাতিশয্য তাঁহার বিচার-বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। তিনি এই ছড়াগুলিকে সুপ্রাচীন যুগের রচনা ও এক বিস্মৃতপ্রায় সুদূর অতীতের শেষ ভাঙ্গা-চোরা স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি উহাদিগকে সৌর জগতের স্থিরকক্ষবহির্ভূত নীহারিকাবাষ্পের যদৃচ্ছ সঞ্চরণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে আবোল-তাবোলের ছদ্মবেশে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত সমাজ ও পরিবার-জীবনই অদ্ভুতভাবে রূপান্তরিত হইয়া ইহাদের মধ্যে বহুভিত্তি ও ভাবপ্রেরণা যোগাইয়াছে। আর সুদূর অতীত নয়, আধুনিক জীবনের বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত ইহার কালপরিবেশ রচনা করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে যুগের সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিবিম্বিত তাহা আমাদের বহুদিনের দৃঢ়বদ্ধ, প্রথানিয়ন্ত্রিত সমাজেরই ছায়া। এখানে বহুবিবাহ, সপত্নীকলহ, শ্বশুরবাড়ীতে জামাই-এর আদর, ননদ-ভাজের মধুর, অথচ ঈর্ষ্যাতপ্ত সম্বন্ধ, বিবাহ-ব্যাপারে পুরনারীদের উৎসব, ধানভানা মাছকোটা প্রভৃতি প্রাত্যহিক গৃহস্থালীর কর্ম, শ্বশুরবাড়ীর নিষ্ঠুর পরিবেশে নববিবাহিতা বালিকার মর্মান্তিক মনোবেদনা, অসম বিবাহের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ প্রভৃতি বাঙালী সংসারে সব পরিচিত দৃশ্য ও অভিজ্ঞতাই যেন এক মায়াপরিচ্ছদে আত্মগোপন করিয়া ও উহাদের বস্তু ও ভাবের বোঝা ফেলিয়া ভারমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ইঙ্গিতধর্মিতায় পুনরাবির্ভূত হইয়াছে। ঘানিতে-জোড়া, ঘর্মাক্ত কর্তব্য যেন কোন যাদুমন্ত্রে স্বেচ্ছাবিহারের আনন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে, ভারবহনের ক্লেশের মধ্যে পরীনৃত্যের দোদুল ছন্দ কেমন করিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, মর্মান্তিক দুঃখের মধ্যে কেমন এক রকম ছেলেখেলার প্রাণোচ্ছলতা

ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আর একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইতেন যে অতি-আধুনিক যুগের নূতন দৃশ্যও ছড়াগুলির নানা বিসদৃশ দৃশ্যসমাবেশের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছে। 'বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে'—এই উক্তিটি হয়ত অচিরাগত নীলকুঠির সাহেবদের গার্হস্থ্য জীবনের সহিত পরিচয়-প্রসূত।

তাহা ছাড়া অর্বাচীন কালেও নূতন ছড়া রচিত হইয়াছে তাহারও প্রমাণের অসদ্ভাব নাই।

দাদা গো দাদা সহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও॥
ও
বৌ এনে দাও খেলা করি

এই উক্তিগুলি যেন ব্রিটিশ আমলে শহর-প্রতিষ্ঠা ও চাকুরে শ্রেণী-সৃষ্টি হইবার পরবর্তী অভিজ্ঞতার প্রকাশ ও বালিকা-ভগিনীর বউ-এর সঙ্গে খেলা করার ইচ্ছাটাও ঠিক প্রাচীন কালের বলিয়া মনে হয় না। "দাদার গলায় তুলসীমালা" পংক্তিটি দাদা যে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব এই খবরটি দেয়—ধর্মমতের এই উল্লেখ ছড়ার রূপকথারাজ্যের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, বরংচ খানিকটা আধুনিক চেতনার ছাপ বহন করে। অনুরূপভাবে "এতো বড়ো রঙ্গ যাদু" ধুয়াবিশিষ্ট কবিতাটি ছড়া নয়, রূপকথা ও গাথাকবিতার অন্তঃসঙ্গতি ও অপেক্ষাকৃত সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশক্তির পরিচয় দেয়।

এই আপাত-বৈপরীত্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি? আসল কথা, শৈশবের নির্বিচার কৌতূহল, ছেলেমানুষী স্বেচ্ছাসঞ্চরণবিলাস ও স্বপ্নকল্পনাশক্তি বাঙালীর মনে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। শিশুর প্রতি স্নেহাতিশয্য, সন্তান-বাৎসল্যের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আমাদের হৃদয়ের যেমন একটি প্রধান বৃত্তি, তেমনি আমাদের গার্হস্থ্য জীবনেরও একটা মুখ্য প্রেরণা ছিল। ছেলেকে আদর করিবার প্রবল প্রবণতায় যেমন চুম্বনে, আশ্লেষে, স্নেহ-সম্বোধনে তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতাম, তেমনি সমান অনর্গলভাবে ও অপ্রতিহত স্রোতে ছড়ার চিত্রগুলি ও সোহাগের সুরগুলিও অজস্র উচ্ছ্বসিত হইত। এই ধরনের কবিতায় অর্থসঙ্গতি, ভাবের ঔচিত্যবোধ, চিত্রের সূত্রবদ্ধতা কিছুরই প্রয়োজন ছিল না—একমাত্র লক্ষ্য ছিল হৃদয়ের অতৃপ্ত আবেগের মুক্তি ও যে শিশুরাজের প্রশস্তি করা হইত তাহার প্রত্যক্ষ তৃপ্তি, তাহার মনোহরণসাধনায় সিদ্ধি। তাহার

কানে সুরের স্রোত ঢালিয়া যদি সে দুধ খাইত বা ঘুমাইয়া পড়িত বা তাহার কান্না থামিত, তাহা হইলেই রচয়িতা বা রচয়িত্রী তাঁহার অভিলষিত পুরস্কার লাভ করিতেন। জাতীয় চেতনায় যুক্তি ও বাস্তবতার প্রভাব যত ব্যাপক ও বদ্ধমূল হইল, সংসারের দুঃখ-কষ্ট বা বিবাহাদি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব যতই গভীর রেখায় চিত্তে কাটিয়া বসিতে লাগিল, ততই অন্য প্রকারের বর্ণনামূলক ছড়া-রচনার প্রেরণা হ্রাস পাইতে লাগিল। এখন বৈজ্ঞানিক যুগে চাঁদকে মামা ডাকিয়া শিশুর মনে ভ্রান্ত ধারণা জাগাইতেই অনেক বাপ-মায়ের আপত্তি। সন্তান-পালনের বিজ্ঞানসম্মত theory একদিকে যেমন অহেতুক আবেগের ধারাকে, অন্যদিকে তেমনি কল্পনাসর্বস্ব, অর্থহীন রচনার প্রেরণাকেও শুষ্ক করিয়া আনিতেছে। কাজেই এখন ছড়া নূতন রচনার বিষয় না হইয়া সংগ্রহের বিষয় হইয়াছে। এবং রবীন্দ্রনাথ উহাদের অনুকূলে যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি না বলিলে হয়ত বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অকথিতই থাকিয়া যাইত। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত তিনি যখন বলিয়াছেন তাহার মূল্য যোগ করিয়াই তাঁহার আলোচনার সামগ্রিক মূল্য নির্ণীত হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

রবীন্দ্রগদ্যের দ্বিতীয়পর্ব—মননপ্রধান রচনা

চিঠিপত্র ১৮৮৭ (১২৯৩)

পঞ্চভূত ১৮৯৭ (১৩০৪)

১

রবীন্দ্রগদ্যের দ্বিতীয়পর্বে রচিত মননপ্রধান রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে 'চিঠিপত্র' এবং 'পঞ্চভূতের'। 'চিঠিপত্র' রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের পত্রসাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, ইহা কাল্পনিক এক জাতীয় পত্র, 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্তিক ও পৌষ হইতে চৈত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয় (১৮৮৭, ১২৯৩)।

এই পত্রগুলিতে রবীন্দ্রনাথ একজন প্রাচীনপন্থী ঠাকুরদাদা ও এক নবীন-পন্থী নাতিকে প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করাইয়া উহাদের মধ্যে প্রাচীন প্রথা, আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে মতভেদের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। এই বইখানিতে ও পরবর্তী 'পঞ্চভূত'-এ (প্রকাশিত ১৮৯৭, :৩০৪) লেখক একটা ক্ষীণ নাটকীয় পশ্চাৎপট কল্পনা করিয়া যুক্তিতর্কের মধ্যে একটু আবেগের স্পর্শ ও ব্যঙ্গশ্লেষের চমক সঞ্চারের দ্বারা বুদ্ধিগত আলোচনাকে সরস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য কিছুক্ষণ পরে এই নাটকীয় কল্পনার পাতলা আবরণ ছিন্ন হইয়া যায় ও যুক্তির সহিত চরিত্রসঙ্গতিরও সংযোগ নষ্ট হয়। লেখক নিজ নামেই তর্ক চালাইবার দায়িত্ব তুলিয়া লন, ও কাল্পনিক বিরুদ্ধমতবাদী চরিত্রের মধ্যবর্তিতা বিলুপ্ত করিয়া দেন। তখন তিনি ঠাকুরদাদা ও নাতির যুগ্মভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইহারা কেবল বিতর্কের চাকা ঘুরাইয়া উহার মধ্যে খানিকটা গতিবেগ সঞ্চার করে, শেষ পর্যন্ত লেখকই ঐ গতিবেগকে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করেন।

'চিঠিপত্র'-এর প্রথম কয়েকখানি চিঠি প্রবীণ ও নবীনের বিরুদ্ধ জীবনদৃষ্টির সংঘর্ষে উত্তপ্ত, পরস্পরের যুক্তিখণ্ডনে উপভোগ্যরূপে তীক্ষ্ণ ও ঝাঁঝালো। দাদা মহাশয়ই পত্রে প্রথম অস্ত্রক্ষেপ করিয়াছেন—প্রাচীন সমাজে ছেলেপিলের সাধারণ নামকরণের প্রতি প্রবণতা, স্বপ্রথা-পালনের প্রতি গুরুত্ব-আরোপ, দস্তুর ও আদব-কায়দা মানিয়া চলা প্রভৃতি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি আধুনিক

তরুণদের অবহেলা ও অবজ্ঞা তিনি বেশ তীক্ষ্ণ ভাষাতেই বিদ্ধ করিয়াছেন। আধুনিকেরা এই আচারহীনতার যে কারণ দেখান—সহৃদয়তার প্রাচুর্য, হৃদয়াবেগের প্রথানিরপেক্ষতা, ভক্তি-প্রকাশের বাঁধা-ধরা ভঙ্গীর মধ্যে কৃত্রিমতার প্রশ্রয়—সেগুলি বাস্তব বিশ্লেষণে অসার প্রতিপন্ন হয়।

নাতিও হাস্যপরিহাসের সুরে উত্তর আরম্ভ করিয়াছে—দাদা মহাশয়ের ভক্তি-আদায়ের জোর-জবরদস্তিকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। স্বদেশের মত স্বকালের কতকগুলি বিশেষ নির্দেশ থাকে, সেগুলি না মানিলে জীবন ও প্রতিবেশের মধ্যে একটা অসঙ্গতি দেখা দেয়। শ্রদ্ধাভক্তি কমে নাই, উহাদের আধার ব্যক্তি হইতে নৈর্ব্যক্তিক আদর্শে স্থানান্তরিত হইয়াছে। আগে ভাব ব্যক্তি-বা-বিশেষ-সম্পর্ক-আশ্রয়ী ছিল, এখন একটা সার্বভৌম উদার ও মহান হৃদয়ানুভবকে অবলম্বন করিতেছে। সুতরাং প্রথানির্দিষ্ট ভক্তিভাজন ব্যক্তিদের ভাগে নৈবেদ্য কম পড়িতেছে। দাদা মহাশয় আধুনিক কালকে অবজ্ঞা করিলেও উহার ঘ্রাণে তাঁহার অর্ধভোজন হইয়া গিয়াছে।

দাদা মহাশয়ের উত্তরে কিছু উষ্মা ও অভিমান প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ পরিবর্তনশীল কালের উপর কোন স্থির আদর্শ নির্মাণ করা যায় না—শাশ্বত আদর্শগুলি কালসীমার অতীত। অতীতের ছন্দে বর্তমানের গতি নিয়মিত করিতে হইবে। অতীতের ব্যক্তিগত ভক্তির সঙ্গে ভাবগত ভক্তিও ছিল। পাতিব্রত্যধর্ম স্বামীর ব্যক্তিসত্তানিরপেক্ষ, স্বামিত্বের ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পর দাদা মহাশয় কিছুটা বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছেন। রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, দধীচি প্রভৃতি পৌরাণিক যুগের মহাপুরুষগণের সমুন্নত আদর্শনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এগুলি কিন্তু সদ্য অতীত ও অচিরাগত বর্তমানের দোষগুণ-বিচারে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে।

নাতি এই অপ্রাসঙ্গিকতা সঙ্গে সঙ্গেই ধরিয়াছে। কিন্তু এইখান হইতে বিতর্ক একটি বিশেষ বিষয়ের সীমা ছাড়াইয়া একটা সাধারণ সত্য উপস্থাপনার পরিমিতি ও তীক্ষ্ণতা হারাইয়াছে। উহা আর তর্ক না থাকিয়া প্রবন্ধের আকারে স্ফীত হইয়াছে। বাঙালী সমাজে অতীতমোহ, দলাদলি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত বৈরসাধন প্রভৃতি যে সমস্ত দোষের কথা নাতি তুলিয়াছে তাহাদের মধ্যে এক অতীতপ্রীতি ছাড়া সব কয়টিই আধুনিক যুগেরই বিকার, সুতরাং আধুনিকতাপন্থী নাতির মুখে বে-মানান। এখানে ভাবের মধ্যে যেমন বিভ্রম তেমনি ভাষার মধ্যেও মেদবহুলতা ও অতিমুখরতা আসিয়া গিয়াছে।

দাদা মহাশয় যে এই চিঠি পড়িয়া খুশী হইয়াছেন তাহাতে বোঝা যায় যে অপটু হাতের ঢিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া আধুনিকতার গায়ে লাগিয়াই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আধুনিকতা-বিরোধকেই সমর্থন করিয়াছে। দাদা মহাশয়ের ভাষা ও ভাবের মধ্যে অতীতযুগদুর্লভ তীক্ষ্ণ শ্লেষ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি অকস্মাৎ নাতির সহিত স্থান পরিবর্তন করিয়া যথার্থ আধুনিকতার গুণকীর্তনে বিভোর হইয়াছেন। এমন কি তাঁহার অজানা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সমালোচনা হইতে তিনি প্রচুর উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। মহৎ ভাব ও নিষ্ঠা শুধু পৌরাণিক বা বর্তমান কোন যুগেরই একচেটিয়া নয় তাহা তিনি অনুভব করিয়াছেন। কেরাণিগিরি, নিদ্রাসক্তি ও হুজুগপ্রিয়তার প্রতি তাঁহার অবিমিশ্র ঘৃণা। এমন কি তিনি উনপঞ্চাশ বায়ুর গুণগানে মুখর হইয়া বাতিকবর্ধনী সভারও প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি রাতারাতি উৎকটভাবে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই তিনি নাতির সহিত ভাব করিয়া ফেলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবসত্তার যে দুইটি অংশ ঠাকুরদাদা ও নাতিরূপ কপটদ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়াছিল তাহারা আবার একই আধারে মিশিয়া গেল।

শেষ পত্রে নাতি পুরাপুরি তর্কপরিধি ছাড়িয়া অনুভূতিবৃত্তের মধ্যের প্রবেশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের সুর ইহার মধ্যে স্পষ্ট শোনা যায়। কবির প্রকৃতিপ্রীতি ও নগরবিরাগ এখানে স্পষ্ট অভিব্যক্ত। সহরের ইমারত-গুলি যেন কবিকে হাঁ করিয়া গিলিতে চায়—এই উক্তির মধ্যে আমরা আমরা আমেদাবান-প্রতিবেশে রচিত ‘ক্ষুধিত পাষাণ’-এর আদিম কল্পনাটি অনুভব করি। বিশেষতঃ সুদূরের ব্যবধান হইতে বঙ্গদেশের একটি আদর্শায়িত, জ্যোতির্ময় রূপ লেখক প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেমের কাব্যানুভূতির প্রথম বীজ যেন এইখানেই উপ্ত। এখানে যেন তাঁহার বঙ্গপ্রশস্তিমূলক কাব্যের খসড়া গদ্য সংস্করণ রচিত হইয়াছে।

বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও বিশ্বমানবতাবোধের প্রথম উন্মেষে লেখক পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন ও যে একাকারত্বের লক্ষণ সনাতনপন্থীদের মনে আশঙ্কা জাগায় তাহাই তাঁহাকে এক বিরাট শুভ সম্ভাবনার আশায় উৎফুল্ল করিতেছে। মধ্যযুগে বাঙলার চৈতন্যধর্ম এই বিশ্ববিজয়-অভিযানের প্রথম ইঙ্গিতবাহী। কীর্তনের সমবেত সুরে বাঙালীর এই বিজয়োল্লাসের আত্ম-অভিব্যক্তি। “বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিণীর বৈঠকী কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত

বিশ্বজগতে ক্রন্দনধ্বনি।" ঠাকুরদাদার বাতিকবর্ধনী সভা নাতির সমস্ত-ভেদলোপী পাগলামিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এ চিঠি ঠাকুরদাদাকে লেখা নয়, "আমিই আমাকে লিখিলাম"।

ঠাকুরদাদা পরিহাস করিয়া নাতির উৎসাহাধিক্যকে সংযত করিতে চাহিতেছে। বাঙালী মাতিতে পারে, কিন্তু মত্ততা ধারণ করিয়া রাখিবার বৃহৎ আনন্দ-শক্তি তাহার কোথায়? সে অম্লরোগে জীর্ণ, মশকদংশনে ক্লিষ্ট। কাজেই ঠাকুরদাদার মনে হয় যে আমাদের চিরাভস্ত ছায়াস্নিগ্ধ, সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ পারিবারিক জীবনই আমাদের চরিত্রশক্তির সহিত সুসঙ্গত ছিল, সভ্যতার আগুনে আমরা পুড়িয়া মরিব মাত্র। ঠাকুরদাদার আলোচনাকে আবার উচ্চ ভাবাদর্শ হইতে হাস্য-পরিহাসের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছেন।

নাতি দাদামহাশয়ের এই সতর্কবাণী সরাসরি প্রত্যাখান করিয়াছে। সম্মুখের ডাকে চলিতে হইবে। নূতন কর্তব্যই আমাদের প্রাণে আনন্দ ও শক্তি সঞ্চার করিবে। রবীন্দ্রসাহিত্যে অতি সুপরিচিত উক্তিগুলিই, দুর্গম পথে যাত্রার উদাত্ত আহ্বানের সুর এইখানেই প্রথম শোনা গেল।

দাদামহাশয়ের শেষ পত্র কবিত্বময় উপমা-সমাহার। শ্যামল কিশলয়ের অসম্পূর্ণতা দেখিয়া ধূলিশায়ী, জীর্ণপত্র যেমন অত্যন্ত শুষ্ক, পীত-হাস্য হাসিতে থাকে, অপরিণত যৌবনের সরস শ্যামলতা অনেক বৃদ্ধের মনে সেইরূপ উপহাসই জাগায়, তবে এই উপহাসের নীচে গোপন প্রশংসার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়।

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ দাদামহাশয় কবিত্বপূর্ণ, আবেগময় ভাষায় যৌবনের দৃপ্ত সাহস ও কর্মনিষ্ঠার প্রতি আশীর্বাদ জানাইয়া পত্রবিনিময় শেষ করিয়াছেন। প্রারম্ভের তীক্ষ্ণ আদর্শসংঘাত পরিণামে এক স্নিগ্ধ সামঞ্জস্যে আত্মসংহরণ করিয়াছে। যৌবনে জয়টিকা পরাইবার জন্যই বার্ধক্য নিন্দাবাদের এই কপট দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছে।

লেখকের গদ্যরীতির উন্নতির, তীক্ষ্ণ ও স্মরণীয় উক্তিবিন্যাসনিপুণতার কয়েকটি উদাহরণ এখানে সংকলিত হইল। অবশ্য তাঁহার উচ্ছ্বাসময় অতিভাষণ-প্রবণতাকেও তিনি সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। গদ্যে তাঁহার অগ্রগতি নানা রীতিপ্রয়োগের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আন্দোলিত, কোন এক নির্দিষ্ট উৎকর্ষ-মানের অস্খলিত অনুসরণে এখনও স্থির হয় নাই।

"আঠার হাজার ওয়েব্‌স্টার ডিক্‌সনারির উপর যদি তুমি চড়িয়া বস তাহা

হইলেও তোমাকে আমার হৃদয়ের নীচে দাঁড়াইতে হইবে। (১নং পত্র, ৫০৯ পৃঃ)

"কৃষক নিজ জমিতে শস্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বপন করে।" (২নং পত্র, ৫১৩ পৃঃ)

"এই বাষ্পকে খাটাইতে হইবে, এই বায়ুকে পালে আটক করিতে হইবে।" (৫নং পত্র, পৃঃ ৫২৪)

"আমরা না পড়িয়া পণ্ডিত, আমরা না লড়িয়া বীর, আমরা ধাঁ করিয়া সভ্য, আমরা ফাঁকি দিয়া পেট্রিয়ট"—(৪নং চিঠি, পৃঃ ৫২১)।

"সমস্ত জীবন যিনি আত্মত্যাগের কঠিন শয্যায় শুইয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি শরশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিলেন" (৫নং পত্র, পৃঃ ৫২৫)।

'পঞ্চভূত'-এ (প্রকাশিত, ১৮৯৭, ১৩০৪) রবীন্দ্রমনীষা ও তাঁহার গদ্যরচনা-রীতি একটি মৌলিক দীপ্তি ও স্বতন্ত্রতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিভিন্ন বিষয়-সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম অনুভূতি, সুদূরপ্রসারী ও বিচিত্রাভিমুখী চিন্তা-ভাবনা ও তৎস্-সংহত প্রকাশচমৎকৃতি এই গ্রন্থে যেরূপ আশ্চর্য অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে তাঁহার পরবর্তী পরিণততর রচনাতেও তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। বিশেষতঃ এখানে তাঁহার বিন্যাসরীতি সমস্ত রচনাটিকে এমন একটি গঠন-পারিপাট্য, নাটকীয় গতিবেগ ও কৌতূহলী উত্তেজনামণ্ডিত করিয়াছে যাহা সাধারণতঃ প্রবন্ধজাতীয় মননপ্রধান আলোচনায় দুর্লভ। এ যেন গদ্যরচনায় এক অভিনব ফর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রবীন্দ্ররচনার বিস্ময়কর রীতি-বৈচিত্র্যের মধ্যেও 'পঞ্চভূত' একটি অনন্য-সাধারণ ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রপ্রবন্ধাবলীর মধ্যে বিষয়প্রধান আলোচনাগুলিতে প্রায় একটি অতিদীর্ঘপল্লবিত, সীমাপরিমিতিলঙ্ঘী বিস্তারের প্রতি প্রবণতা দেখা যায়। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এ সংগৃহীত ভাব-ও-কল্পনা-প্রধান প্রবন্ধগুলি অবশ্য ভাবসংহতির নিয়ন্ত্রণে এই দোষ হইতে মুক্ত। 'পঞ্চভূত'-এর প্রবন্ধগুলি মননপ্রধান হইয়াও উহার পরিকল্পনাবৈশিষ্ট্যের গুণে অবয়ব-সুষমায় সুগ্রথিত। লেখক প্রতি বিষয়ের আলোচনাটিই পঞ্চভূতের উপাদানবিগ্রহ পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে বিভক্ত ও মোটামুটি প্রত্যেক মতবাদটি চরিত্রানুযায়ী করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য সব সময় যে এই চরিত্র-সঙ্গতি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে এমন দাবী করা যায় না। চরিত্রগুলি পরস্পর হইতে পৃথক হইয়াও নিগূঢ়ভাবে সমধর্মী—লেখকসত্তারই সাময়িক ভাবান্তরের বিভিন্নরূপ প্রতিফলন। তথাপি ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মোটামুটি স্থায়ী ভাব ও রুচি-বৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়া, ইহাদের বক্তব্যের সহিত বলিবার ভঙ্গীর ও

ভঙ্গীর ও আচরণের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, ইহাদের ভাবে-ভঙ্গীতে তর্কের উত্তেজনাজনিত একটি ঘাত-প্রতিঘাতের মৃদু বেগ সঞ্চার করিয়া ও তর্ককে চরম পরিণতি পর্যন্ত গড়াইতে না দিয়া একটি নাটকীয় মুহূর্তে উহার দ্রুত উপসংহার ঘটাইয়া লেখক আলোচনার মধ্যে একটি নাটকীয় রস ও জীবন-প্রতিভাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং ফর্মের দিক দিয়া উহা কৌতুক-নাট্য, ডায়েরি ও মননপ্রবন্ধের মধ্যবর্তী এক নূতন রূপাঙ্গিক গ্রহণ করিয়া নিছক তত্ত্বালোচনার ক্লান্তিকরতাকে এড়াইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে উহার স্বরূপনির্দেশ প্রসঙ্গে উহাকে একপ্রকার যৌথ ডায়েরি-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা ব্যক্তিবিশেষের স্বরচিত দিনলিপি নয়, সংঘের সমস্ত সদস্যের যথাসম্ভব সত্যানুগ মানস প্রতিলিপি। এই প্রতিলিপির প্রামাণিকতা লইয়া সংশয়-সন্দেহ যে মাঝে মধ্যে অভিব্যক্ত হয় নাই তাহা নহে। তথাপি মোটের উপর ইহা একের নহে, সমবায় জীবনের একটি ইতিহাস এই সংজ্ঞা ডায়েরি-লেখকের পক্ষপাতসম্ভাবনা সত্ত্বেও মোটামুটি-ভাবে সর্বস্বীকৃত হইয়াছে। 'মনুষ্য' প্রবন্ধে স্রোতস্বিনী তাহার মুখে কল্পিত কথা আরোপিত হইয়াছে এইরূপ অভিযোগ আনিয়াছে। ইহার উত্তরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার নির্গলিতার্থ হইল যে কথাকে ব্যক্তিসত্তার আলোকে অনুরঞ্জিত না করিলে উহার মধ্যে বক্তার মনোগত অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সুতরাং স্রোতস্বিনীর উক্তিগুলি এই ব্যক্তিত্বের মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ঠ হইয়াছে। ইহাতে ডায়েরির তথ্যনিষ্ঠা যে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের কল্পনা-নিগূঢ়তায় রূপান্তরিত হইতে পারে ইহা অভিনব শিল্পসত্য স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা'-য় 'পঞ্চভূত'-আলোচনা পদ্ধতির অভিনবত্ব সম্বন্ধে লেখকের মৌলিক কারণটা পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা যুক্তিতর্কপ্রয়োগে চূড়ান্ত মীমাংসা ও সত্যপ্রতিষ্ঠার দুরূহ আদর্শ অনুসরণ করে না। ইহা কেবল মাত্র নানা পরস্পর-পরিপূরক মতের ও দৃষ্টিভঙ্গীর চমকপ্রদ সমাবেশে বুদ্ধির সচলতা বিধান করেও একটা বিশিষ্ট মানস ক্ষেত্রের উপর একটা চকিত আলোক-সম্পাত করে। ইহার যাহারা পাত্র-পাত্রী তাহাদের উদ্দেশ্য সত্যসন্ধানের একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য নয়, ভাববিনিময়ের স্পন্দনশীলতায় মনোলোকে গতিবেগ সঞ্চার। সুতরাং ইহারা মূল্যবান সিদ্ধান্তসংগ্রহে ব্রতী নয়, মানস স্বাস্থ্য আহরণের জন্য স্বচ্ছন্দভ্রমণপ্রয়াসী। 'পঞ্চভূত'-এর মূল্য সত্যপ্রতিষ্ঠায়, যুক্তিতর্কের অমোঘতায়

নয়, একটা বিষয়ের নানা দিক হইতে পর্যবেক্ষণের মানস মুক্তিতে, বিচিত্র মানসী লীলার স্বাধীন সঞ্চরণের আনন্দে। সুতরাং গ্রন্থটির প্রকৃত ভূমিকাটি—উহার মনীষায় প্রখর, কিন্তু অসংহত দীপ্তি, ও সত্যানুসন্ধানের আপেক্ষিক অনীহা—রবীন্দ্রনাথ অভ্রান্তভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থটির প্রারম্ভিক প্রবন্ধে সভার সদস্য পঞ্চভূতের ও সভাপতি ভূতনাথের কিছুটা চরিত্র-পরিচিতি দেওয়া হয়য়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্ত্রী—অপ্ (স্রোতস্বিনী নামে নবসংজ্ঞিত) ও তেজ (দীপ্তি নামে নারীসুলভ প্রখর সৌন্দর্যে অভিষিক্ত) ও অপর তিন জন—ক্ষিতি, বায়ু (সমীর নামে পুনরভিহিত) ও ব্যোম) অপরিবর্তিত-নামা) আপন আপন মানস বৈশিষ্ট্যে ও মেজাজের বিভিন্নতায় প্রকাশিত। ইহাদের মধ্যে স্রোতস্বিনীই কবির সহানুভূতির প্রলেপে সর্বাধিক মানবায়িত ও সৌকুমার্যমণ্ডিত হইয়াছে। রমণীসুলভ সলজ্জ শ্রী, মতপ্রকাশে কিঞ্চিৎ মৃদু কুণ্ঠা, আত্মপ্রচারবিমুখতা তাহাকে একটি মাধুর্য-পরিমণ্ডলে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে। প্রখর, সতেজ মানস ঔজ্জ্বল্য ও অভিভবশীল অথচ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বই দীপ্তির বিশিষ্ট পরিচয়। ক্ষিতি রক্ষণশীলতার অটল প্রতীক্ ও নূতন নূতন মতবান ও কল্পনাবিলাসের একান্ত বিরোধী। ক্ষিতির বিপরীতপ্রান্তস্থিত ব্যোম বাহিরে অদ্ভুত বেশভূষায় সজ্জিত ও অন্তরে নানা বাষ্পীয় কল্পনায় ও সূক্ষ্মাগ্র মনন মৌলিকতার বায়ুবেগে সর্বদা আন্দোলিত। সমীর ইহাদের সহিত তুলনায় অনেকটা বৈশিষ্ট্যবর্জিত; তথাপি মাঝে মধ্যে সূক্ষ্ম মননশীলতার পরিচয় তাহার মধ্যেও দেদীপ্যমান। সভাপতি ভূতনাথ গ্রন্থের প্রবক্তা ও আলোচনার বৃত্তান্ত-লেখক, পক্ষপাতহীনতাবিষয়ে একটু আত্মগৌরব আছে, যদিও তাহা সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করে নাই। সমস্ত বক্তার মত-সমন্বয়ে একটি সর্বস্বীকৃত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার যে কৃতিত্ব সভাপতির পদগৌরবের প্রধান হেতু, তাহা সর্বক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কার্যতঃ সে সভাপতি না হইয়া ষষ্ঠ সদস্যেরই অংশ অভিনয় করিয়াছে। বস্তুতঃ পঞ্চভূত যে লেখকের সত্তারই বিভিন্ন অংশের ভাব-রূপ ও উহাদের সমবায়েই লেখক-সত্তা গঠিত এই ধারণা গ্রন্থের যুক্তিসন্নিবেশপদ্ধতি হইতে সমর্থিত হয়।

প্রথম প্রসঙ্গের আলোচনাতেই—মানবজীবনে আবশ্যক ও আনাবশ্যকের আপেক্ষিক স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য সুন্দররূপে পরিস্ফুট। ক্ষিতির মতে অনাবশ্যকের সম্পূর্ণ বর্জন ও আবশ্যকের বোঝা

বাড়ানই অগ্রগতির অপরিহার্য লক্ষণ। ক্ষিতি নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী এই অবিমিশ্র বস্তুবাদের সমর্থক। স্রোতস্বিনী ও দীপ্তি প্রায় একইরূপে যুক্তিতে, কিন্তু একজন সঙ্কুচিত ও অপরজন তীক্ষ্ন, দৃঢ় ভঙ্গীতে অনাবশ্যকের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী। স্রোতস্বিনী নিজ কমনীয় বৃত্তি স্ফুরণের জন্য ও আত্মতৃপ্তির সূক্ষ্মতর প্রেরণায় অনাবশ্যক-চর্চায় আস্থাশীলা; দীপ্তি সংসার-জীবনে নারীর কর্তব্যের সুষ্ঠু পালনের ও উহার সুখশান্তিবিধানের জন্য সুকুমার গুণের যথাযথ অনুশীলনের সপক্ষে নিজ অভিমত দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। সমীর প্রথমতঃ ক্ষিতির মানস জড়ত্বকে ব্যঙ্গ করিয়া বস্তুবিজ্ঞানের জন্য না হইলেও লোক-ব্যবহারকে রমণীয় করিবার জন্য, মানুষে মানুষে সম্বন্ধকে মধুর করিবার জন্য জীবনে অলংকরণের যে নিতান্ত প্রয়োজন, ঊর্ধ্বতর জীবনরস-আস্বাদনের জন্য ইহাঁর যে অপরিহার্যতা তাহার ইঙ্গিত দিয়াছে। ব্যোম ক্ষিতির ঠিক বিপরীতধর্মী; সে একেবারে মতবাদের অপর সীমায় দণ্ডায়মান হইয়াছে। জৈব প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া উন্নততর ভাবপ্রেরণার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করাইতে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও মুক্তির আনন্দ। কাজেই ক্ষিতি যেমন একান্তভাবে বস্তুবাদবদ্ধ, ব্যোমও সেইরূপ একান্তভাবেই ভাবলোকের ঊর্ধ্বগগনবিহারী। একজন পায়ের তলায় মাটির আশ্রয়, অপরজন মাথার উপর উড়িবার আকাশের আমন্ত্রণকে সমভাবেই মানব প্রকৃতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করে। তর্ক যখন এই মতবিরোধের সঙ্কটবিন্দুতে দোদুল্যমান, তখন সভাপতি ভূতনাথ একটা আপোস-মীমাংসার পথনির্দেশের দ্বারা বিবদমান শক্তিপুঞ্জের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান হইয়াছেন। বস্তুবাদের চরম পরিণতি হইল জড়ের অধীনতা হইতে মানবের মুক্তিসাধন ও অধ্যাত্ম চর্চার পথের সমস্ত বাধা-বিঘ্নের অপসারণ। সুতরাং গভীরতর দৃষ্টিতে ক্ষিতির বস্তুজ্ঞান ও ব্যোমের অধ্যাত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বঘোষণা পরস্পরবিরোধী নয়, একয় বৃহত্তর সত্যের পরিপূরক পার্শ্বদৃষ্টি।

এই ভূমিকা-রচনার পর ডায়েরি-লেখার দোষগুণ লইয়া এক বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক বিতর্ক সুরু হইয়াছে। ডায়েরি লেখার অনৌচিত্য বিষয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গীসমর্থিত যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, ডায়েরি একটি মনগড়া, কৃত্রিম জীবন-ইতিহাস; দ্বিতীয়তঃ, ডায়েরিতে শুধু কৃত্রিম নয়, বিকৃত জীবন-কাহিনী ব্যক্ত হয়, কেননা জীবনের বাঁকা-চোরা স্রোতকে ডায়েরি একটি বিশেষ মুহূর্তে গঠিত ধারণা-অনুসারে সরলরেখায় নিয়ন্ত্রিত করিতে

প্রয়াসী হয়। তৃতীয়তঃ, সাহিত্যিকের সৃষ্টির ন্যায় ডায়েরিতে আত্মসৃষ্টিও মুহূর্তের ভাবকে একটি স্থায়ী রূপ দিয়া জীবনে অনর্থক জটিলতা প্রবর্তন করে ও জীবনের ঐক্যনাশের কারণ ঘটায়। ডায়েরি জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত, প্রত্যেকটি অনুভূতিকে মৃত্যু-গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া উহার সমগ্রতাকে বাঁচাইয়া রাখে—দীপ্তির এই সমর্থক যুক্তির উত্তরে স্রোতস্বিনী চমৎকার বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়াছে। জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি ধরিয়া রাখিতে গেলে উহার পরিমিতি-বোধ ও সামগ্রিক ঐক্য বিধ্বস্তই হয় ও উহার বিস্মরণযোগ্য ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ে জীয়াইয়া রাখা হয়। বহু অনাবশ্যককে বাদ দিয়াই তবে জীবনের আত্মজ্ঞান যথাযথভাবে বিকাশ ও পূর্ণতা লাভ করে। শেষ পর্যন্ত একটি লঘু পরিহাসের সুরে এই অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার-বিতর্কের উপসংহার টানা হইয়াছে। ডায়েরি-লেখক সভাপতি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে তিনি প্রত্যেকের মুখের অসংলগ্ন কথাকেই লিপিবদ্ধ না করিয়া তৎপরিবর্তে আদর্শায়িত যুক্তিক্রমই সন্নিবিষ্ট করিবেন, কেবল ক্ষিতিকে শাসাইয়াছেন যে তাহার মুখে দুর্বলতম যুক্তি বসাইয়া বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার নিকট তর্কযুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানির প্রতিশোধ লইবেন। অর্থাৎ বস্তুভাবের প্রতীক ক্ষিতি আদর্শায়নের কোন সুযোগই পাইবে না—তাহার ধূলিকণা অমৃত-বিন্দুতে রূপান্তরিত হইবে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—গদ্য ও পদ্য'-এ (ফাল্গুন ১২৯৯) সভাপতির ভাবুকতার এক অতর্কিত উচ্ছ্বাস ক্ষিতির নিকট হইতে এক উপহাস-মিশ্রিত প্রতিবাদ-উদ্রেক ও গদ্যের মাধ্যমে ভাবোচ্ছ্বাসপ্রকাশের অসঙ্গতির কথা উত্থাপন করিয়া গদ্য ও পদ্যের তুলনামূলক বিচারের প্রবর্তন করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ক্ষিতির আপত্তি পদ্যের বিরুদ্ধে নয়, কাব্যোচ্ছ্বাসময় গদ্যের বিরুদ্ধে; আর দার্শনিক ব্যোমের আপত্তি গদ্যের অদ্বৈতবাদের স্থলে গদ্য-পদ্যের দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায় এবং পদ্যের কৃত্রিম অলঙ্করণরীতির প্রভাবে ভাবের স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিলোপে ও লোকচিত্তের ছন্দোপ্রীতির প্রতি বদ্ধমূল সংস্কারে। ক্ষিতির গদ্য-কাব্যবিদ্বেষ ও ব্যোমের কাব্যবিরূপতা এইরূপে তাহাদের মূল রুচির অভিব্যক্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সভাপতি ক্ষিতির যুক্তির খণ্ডন না করিয়া গদ্যের মাধ্যমে সুকুমার ভাবোচ্ছ্বাসপ্রকাশ যে স্থূলরুচি শ্রোতার নিকট অবিধেয় তাহা প্রায় স্বীকারই করিয়াছেন। অন্তঃপুরচারিণীকে বহির্ভবনে সহস্র-লোকলোচনের সম্মুখীন করা যেমন তাহার প্রতি রূঢ়ভাষণের সম্ভাবনা

বাড়ায়, তেমনি ছন্দ-উপযোগী ভাবকে গদ্যের বহির্বাস পরাইলে তাহাও কাহারও কাহারও নিকট উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিতে পারে।

ব্যোমের কাব্যালঙ্কারের বিরুদ্ধে আনীত কৃত্রিমতার অভিযোগ তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠাইয়াছে। দীপ্তি কাব্যছন্দকে প্রাকৃতিক নির্বাচনে উদ্ভূত ও সমস্ত সভ্য সংস্কৃতির অঙ্গীভূত সৌন্দর্যবোধের উন্মেষরূপে সমর্থন জানাইয়াছে। সমীর আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া কৃত্রিমতাই যে মানুষের প্রধান গৌরব ও প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত লাবণ্য অপেক্ষা এই অনুশীলিত প্রসাধনকলা যে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। স্রোতস্বিনী মানবমনে সুকুমার ভাব-সঞ্চারের জন্য ও প্রেমপ্রমুখ সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি উন্মেষের জন্য স্রষ্টাকে যে বিশেষ শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে হয় তাহা অপূর্ব ভাবমুগ্ধতার সহিত ও শব্দযাদুর সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছে। ব্যোম ইহারই সুযোগ লইয়া সমগ্র বিশ্বসংসার যে কৃত্রিম মায়ারচনা এই দর্শনতত্ত্ব-প্রক্ষেপের অবসর পাইয়াছে।

ক্ষিতি আলোচনা যে ক্রমশঃ বাস্তবতার সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া ছন্দঃপ্রিয়তাকে অপরিণত শৈশবের অর্থহীন ছড়ার প্রতি পক্ষপাতের সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছে। সভাপতি গহন আদর্শতত্ত্বের মধ্যে অবতরণ করিয়া ছন্দের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে ইহাকে নিখিল-বিশ্বের মর্মবাণীর সহিত মানবের হৃদয়তন্ত্রীর মিলন-ঝঙ্কাররূপে দেখান হইয়াছে। মানুষের অন্তরোত্থ প্রতিটি ভাবতরঙ্গ প্রকৃতিরাজ্যে প্রবহমান অন্যান্য কম্পন-তরঙ্গের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ও মিলন-প্রয়াসী। সেইজন্য সঙ্গীতের প্রভাব মানবের ভাবোদ্দীপনের পক্ষে সর্বাধিক কার্যকরী; সাহিত্য অর্থের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং মননাপেক্ষী; কাজেই উহার প্রভাব গৌণ। সাহিত্যের অর্থ সঙ্গীতের কম্পনের সহিত যুক্ত না হইলে মানবহৃদয়ের ভাবতরঙ্গ-উদ্দীপনে অসমর্থ। সেই বিশ্বপ্রবাহিত ধ্বনিতরঙ্গের সারূপ্যই ছন্দের আসল পরিচয় ও প্রেরণা। ইহা কবিকৃত কৃত্রিম প্রসাধনকলা নয়, সৌন্দর্য-উদ্বোধনের অপরিহার্য উপায়স্বরূপ বিশ্বসঙ্গীতের অনুরণনের উচ্চতম কলাসম্মত প্রয়োগ। স্রোতস্বিনী এই ব্যাখ্যার পরিপোষকরূপে নাট্যকলার সংশ্লেষমূলক আবেদন-শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করিয়া এই মনোজ্ঞ আলোচনাটির উপর সমাপ্তি-রেখা টানিয়াছে।

ভূতনাথ বাবুর আলোচনাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও হৃদয়গ্রাহী হইলেও ইহা ডায়েরির আবহাওয়া ও পাঁচমিশালী বিতর্কের সহিত খাপ খায় না। ইহা

যেন পাঁচালীর ঘরোয়া পরিবেশ ও দ্রুত উক্তি-প্রত্যুক্তিবিনিময় ছাড়াইয়া মন্ময় গীতিকবিতার নিঃসঙ্গ ভাবরাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছে।

'নরনারী', (চৈত্র ১২৯৯)-র আরম্ভ খুব স্বাভাবিক আকস্মিকতার সহিত। সমীর এই আলোচনার প্রবর্তয়িতা। বাংলা সাহিত্যে পুরুষের সহিত তুলনায় নারীর প্রাধান্য কেন এই প্রশ্নে বিতর্কের সূচনা। ক্ষিতির উত্তর অত্যন্ত সহজ, মানসপ্রধান উপন্যাসে নারীর প্রাধান্য ; আর কার্যপ্রধান উপন্যাসে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, কেননা কর্মে পুরুষ ও হৃদয়ানুভূতিতে নারী প্রকৃতিসুলভ গুণেই অগ্রবর্তী। দীপ্তি তৎক্ষণাৎ এই মন্তব্যের বিরোধী দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিয়াছে ও সমীরও কয়েকটি গভীর চিন্তাশীল মন্তব্যের দ্বারা এই সাধারণীকৃত শ্রেণীবিন্যাসের অযথার্থতার কারণ দিয়াছে। ইতিমধ্যে ব্যোম একটি দার্শনিকজনোচিত, নিত্যঅভিজ্ঞতাবহির্ভূত, চমকপ্রদ উক্তি দ্বারা তাহার বিপরীতভাষণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে। পুরুষ জন্ম-উদাসীন, দার্শনিক, নিঃসঙ্গচিন্তানিমগ্ন। নারীই প্রকৃতপক্ষে কর্মরথনিয়ন্ত্রী। ব্যোম নারীতত্ত্বঘটিত আর একটি গভীর মন্তব্যের অবতারণা করিয়াছে। নারীর অন্তঃপুর-নিবদ্ধ কর্মসীমা তাহার যুগযুগব্যাপী কার্যাবশেষের গণ্ডী-রচিত। তাহার প্রাণশিখাকে যদি এই অভ্যাসের ভস্মাবরোধমুক্ত করিয়া নব ইন্ধনে প্রদীপ্ত করা যায়, তবে তাহার স্বাভাবিক একনিষ্ঠ কর্মপ্রতিভা অসাধ্যসাধন করিতে পারে, সংসারের স্নিগ্ধ দীপটি প্রলয়ঙ্কারিণী বহ্নিজ্বালারূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। সুতরাং সাহিত্যের নবীন কর্মক্ষেত্রে তাহার উল্কারূপে আবির্ভাব তাহার স্বভাবসঙ্গতই হইয়াছে।

বিতণ্ডার এই পর্যায়ে সভাপতি তাঁহার অবিমিশ্র নারীস্তুতিদ্বারা উহার মোড় ঘুরাইয়াছেন। বাঙালী স্ত্রীলোক বাঙালী পুরুষ অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ এরূপ উক্তি তিনি দ্বিধাহীনভাবে করিয়াছেন কেননা স্ত্রীলোকের যে নির্দিষ্ট কার্য সমাজের মনোরঞ্জন ও আনন্দবর্ধন তাহা প্রশংসার দ্বারা তাহাকে খোসমেজাজে রাখিলেই সুসম্পন্ন হইতে পারে। ক্ষিতি কিন্তু এরূপ মনরাখারাখি কথার পক্ষপাতী নয়। সে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে স্ত্রীলোকের সঙ্কীর্ণ কর্মক্ষেত্রে আশু ফল-প্রাপ্তিই প্রার্থনীয়, কেননা জীবনের সঙ্গে কারবারে নগদ বিদায়ই তাহার যোগ্য প্রাপ্য।

স্রোতস্বিনী এই রূঢ় ভাষণের চমৎকার প্রত্যুত্তর দিয়াছে। সে মহৎ ও বৃহতের একার্থবাচকতা অস্বীকার করিয়া স্ত্রীলোকের প্রতিদিনকার ছোটখাট সংসারকার্যে যে গৃহলক্ষ্মীর উন্নততম আদর্শ রক্ষা করা যায় তাহা কবিত্বপূর্ণ ভাষায়, অথচ সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছে।

সভাপতি আবার কবিত্বমণ্ডিত উপমাসাহায্যে তাঁহার পূর্বোল্লিখিত স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে সমীর এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া কলঙ্কিত পুরুষের নির্লজ্জ নারীপূজাগ্রহণের তীব্র নিন্দা করিয়াছে ও দীপ্তিও তাহারই সুরে সুর মিলাইয়াছে। স্রোতস্বিনী কিন্তু নারীসুলভ অনুভূতির সহিত ব্যাপারটির অশোভনতা উপলব্ধি করিয়া স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কটি পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছে। আলোচনার সৌষ্ঠবের জন্য এই অংশটুকুই সর্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী হইয়াছে।

সভাপতি কিন্তু বাংলা দেশে পুরুষের অকর্মণ্যতা ও বৃহৎ কর্তব্যক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত ক্ষুদ্রতার সহিত নারীর প্রেমবিকশিত, কর্তব্যে স্থির, সহজসুষমামণ্ডিত জীবনের তুলনা করিয়া নারী-মহিমাকে কিঞ্চিৎ মাত্রাতিরিক্তভাবে অভ্রভেদী করিয়া তুলিয়াছেন। স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির সভাগৃহত্যাগের পর অপক্ষপাত সত্যনির্ণয়ের যে দায়িত্ব সাধারণতঃ সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকে তাহা ক্ষিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার অপ্রমত্ত বাস্তববুদ্ধি এক্ষেত্রে সভাপতির ভাববিলাসপ্রসূত অতিশয়োক্তির সংশোধন করিয়াছে। সেই এই তুলনামূলক বিচারে যথার্থ মানদণ্ড তুলিয়া ধরিয়াছে। পুরুষের বৃহৎ ও জটিল কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ অত্যন্ত দুরূহ ও প্রমাদাকীর্ণ। পক্ষান্তরে নারীর সঙ্কীর্ণ কর্মপরিধিতে কৃতিত্ব অনায়াসলভ্য ও অশিক্ষিতপটুত্বের দ্বারা অধিগম্য। পুরুষের ত্যাগ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে; নারীর ত্যাগ নিজ হৃদয়ধর্মের অনুসরণে। স্ত্রীলোক যদি পুরুষের অতিস্তুতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তবে তাহা তাহার আত্মজ্ঞানের অভাবই সূচিত করে। নারীকে সর্বত্র আদর্শ গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রচার করা তাহার বাস্তব ভূমিকার অস্বীকৃতি মাত্র।

'অখণ্ডতা' (শ্রাবণ ১৩০০) প্রস্তাবে মনের স্বরূপনির্ণয় উপলক্ষ্যে স্ত্রী-পুরুষের তুলনা আবার উপস্থাপিত হইয়াছে। নারী, প্রকৃতির মত, মনের দ্বিধা-সংশয় ও অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। তাহার মধ্যে যুক্তিতর্কাতীত এক সহজ-সংস্কার ও প্রবল, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশীল। সেই জন্য তাহার আচরণে বৈপরীত্যের চরম সীমা উদাহৃত হইয়া থাকে। এই উক্তিগুলি সমীরের 'মন' নামক তর্কবিষয়ের পরিপূরকরূপে স্থান পাইয়াছে। স্ত্রীলোকের মধ্যে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সচেতন ক্রিয়াশীল বৃত্তির আপেক্ষিক অভাব। ইহাদের স্থান পূরণ করে প্রতিভার সমধর্মী, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সহজসামঞ্জস্য-বিধায়ক, একপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ত ঐক্যগঠনশক্তি।

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী এই মতকে সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ বোধ করিয়াছে। কেননা ইহার মধ্যে নারীর অপকর্ষের ইঙ্গিত নিহিত আছে। সমীর তাহার মতবাদের সমর্থনে আরও সূক্ষ্মতর যুক্তির আশ্রয় লইয়াছে। যেমন চঞ্চল সমুদ্রের ক্রমাগত ত্যাগ, বর্জন ও সঞ্চয়ের শেষ আশ্রয় মহাদেশের দৃঢ় নিশ্চলতার গোপন গুহাতলে, এবং সমুদ্রের সমস্ত বৃথা আন্দোলনের ফলে মহাদেশ গূঢ় জীবনীশক্তিতে ফল-পুষ্পে-সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, তেমনি পুরুষের অবিরত নিষ্ফল কর্মচাঞ্চল্য নারীর অচেতন অন্তরে সৃষ্টিপ্রসবের বীজ বপন করিয়া জীবনকে এক অপূর্ব অনায়াসনৈপুণ্যে নব নব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। পুরুষ পরিবর্তনস্রোতে অস্থির, নারী যুগযুগান্তরের প্রথানুসরণে অনায়াসসুন্দরী ও সম্পূর্ণ বৃত্তের ন্যায় সুষমাময়ী। এক সহজ আকর্ষণশক্তির প্রভাবে সে নিজের চারিদিকে একটি সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত ঐক্য রচনা করিতেছে।

এইখানে ব্যোম হঠাৎ তর্কমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দার্শনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। সে এই ঐক্যকে আত্মারূপে অভিহিত করিয়া উহাকে মন ও বুদ্ধির নিয়ন্ত্রীশক্তিহিসাবে কল্পনা করিয়াছে। সংসারের শ্রীরচনায় রমণীর যে এই নিগূঢ়, অভ্রান্ত আত্মিক শক্তি তাহা সৃষ্টিজগতে কাব্যপ্রতিভা ও অধ্যাত্ম জগতে যোগসাধনার সহিত তুলনীয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ক্ষিতির বস্তুচেতনা নারীকে আদর্শলোক হইতে যে নিম্নতর, হীনতর, প্রবৃত্তি-শাসিত জগতে নামাইতে চাহিয়াছিল, সমীরের নূতন ব্যাখ্যায় তাহা নিবারিত হইয়াছে। নারীর অশিক্ষিত-পটুত্বের পিছনে একটি রহস্যময়, অতীন্দ্রিয় সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া সঙ্কেতিত হইয়াছে।

একেবারে শেষে বস্তুজগতের একটি খোঁচা দীপ্তির স্তব-প্রসন্ন মনে কিছু সংশয়ের রেশ রাখিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-প্রতিভা বাঙালী সন্তান-পালনে এরূপ ব্যর্থতার পরিচয় কেন দেয়? নারী-জাতির অন্ধ স্তাবক সভাপতি ভূতনাথ এখানেও কিন্তু কৈফিয়ৎ লইয়া হাজির। বাঙালী-সন্তান শিব না হইয়া বানর হইয়াছে মাটির দোষে, সৃষ্টিকর্ত্রীর কোন অপূর্ণতার জন্য নয়।

'মনুষ্য' (বৈশাখ ১৩০০) প্রস্তাবেরও একইরূপ আকস্মিক আরম্ভ। স্রোতস্বিনী, যাহাকে লেখক 'জীবন্ত বর্তমানে'র প্রতীক-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ডায়েরিতে তাহার প্রতি আরোপিত বাগ্‌ভঙ্গীর সম্বন্ধে মৃদু প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এই সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ, যুক্তিপরম্পরাগ্রথিত কথাগুলি কি তাহার নিজের উক্তি না লেখকের স্নেহাতিশয্যের দ্বারা তাহার মুখে সন্নিবিষ্ট এই সংশয় তাহার চিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। লেখক তদুত্তরে বলিতেছেন যে তাহার কথাগুলি

তাহার জীবন-সমর্থিত হইয়া যেরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহাতে জীবন-সম্পর্কবিচ্ছিন্নভাবে তাহাদিগকে উদ্ধৃত করিলে তাহাদের প্রকৃত শক্তির কোন ধারণাই দেওয়া যায় না। সুতরাং ফলপ্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথাগুলির উপর ব্যক্তিত্বের বিকল্প হিসাবে কিছুটা প্রসাধনকারুকলার প্রয়োগ করিতে হয়। তথাপি ব্যক্তিসত্তার সবটুকু সৌরভ কি অলংকৃত বাক্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠে? এক ভগবান ছাড়া মানুষের ব্যক্তিরহস্যের সবটুকু কে প্রকাশ করিতে পারে?

আলোচনা এইরূপ বাঁক লইতেই ক্ষিতির তত্ত্ব-অসহিষ্ণু মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তথাপি ভূতনাথবাবু তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াই প্রেম-তত্ত্ব ও বৈষ্ণব ধর্মে উহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা চালাইয়াই চলিলেন।

সমীর কিন্তু তর্কধারাকে এক নূতন শাখাপথে প্রবাহিত করিল। ডায়েরি-রচনার একটা মূল প্রশ্ন লইয়াই এই বিতর্কের অবতারণা। ডায়েরি-তে যে সমস্ত ভাল ভাল উক্তি সন্নিবিষ্ট হয়, তাহাদিগকে যেন আকারঅবয়বহীন, ব্যক্তিসত্তানিঃসম্পর্ক তত্ত্বকথার স্বাদহীন সারাংশ বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের পিছনে কোন প্রাণশক্তির প্রেরণা অনুভূত হয় না। সমীরের এইরূপ জীবন-হীন সুভাষিতপরম্পরার বাহনরূপে পরিচিত হইবার মোটেই ইচ্ছা নাই। সে নিজ ভুল-ভ্রান্তি, পরিবর্তনশীল মতবাদ, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও উদ্ভিদ্যমান মন লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে।

ব্যোমও এই তর্কে যোগ দিয়া মানুষের সহিত তত্ত্ব-তর্কের একটা মৌলিক পার্থক্য আবিষ্কার করিয়াছে। পরিসমাপ্তি ও চূড়ান্ত মীমাংসায় তর্কের শেষ পরিণতি; কিন্তু মানুষের অমরতা চিরগতিশীল, অসমাপ্ত। কাজেই মানুষের মনের সত্য পরিচয় দিতে গেলে উহার এই গতিশীলতা ও ক্রমোদ্ভিদ্যমানতার লক্ষণটুকু রাখিতে হয়। তর্কের পরিসমাপ্তির সঙ্গে মানুষের পরিসমাপ্তি এক সূত্রে গ্রথিত করিলে মানবের অমরতার অমর্যাদা করা হয়।

ইহা হইতেই তর্ক আর এক নূতন পর্যায়ে আসিয়া পড়িল। মানুষের কথার মধ্যে গতির উদ্যত ভঙ্গিটি সংযোজনা করিতে হইবে। সুতরাং মানব-সাহিত্যে বক্তব্য বিষয় অপেক্ষা বলার ভঙ্গিটি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ব্যোম আবার তাহার দার্শনিকতা প্রয়োগ করিয়া বিষয়কে দেহের সঙ্গে ও ভঙ্গিকে নব নব রূপে প্রকাশমান জীবনের সঙ্গে উপমিত করিয়াছে। দীপ্তি এই দার্শনিকতাকে আর্টের ভাষায় অনুবাদ করিয়া ভঙ্গির মধ্যে মনের ও চরিত্রের যে

বিশেষ আকৃতিটি প্রতিবিম্বিত হয় তাহাকে স্টাইল আখ্যা দিয়াছে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সে আরও একটি প্রয়োজনীয় সূত্র সংযোগ করিয়াছে—অনেকের কোন নিজস্ব স্টাইল নাই, ব্যক্তিত্ববিলোপ না হইলে তাহার মধ্য হইতে কোন আলোকরেখা নির্গত হয় না। খুব কম লেখকই হীরকের ন্যায় স্বয়ংপ্রভ। ইহার উত্তরে সমীর বলিয়াছে যে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের অভাব নাই, ইহা কেবল আবিষ্কারের প্রতীক্ষা করে। সভাপতি একটি গল্পের দ্বারা এই মতবাদের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন—একজন সামান্য কেরাণী মৃত্যুমুহূর্তে পিসিমার স্নেহের আলোকে জ্যোতির্ময়রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। স্রোতস্বিনী এই সত্যকে সার্বভৌমরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ও ক্ষিতিও ধূলিকণার মধ্যে হীরকপ্রভার আবিষ্কার যে আধুনিক সাহিত্যের কর্তব্য তাহা ব্যক্ত করিয়াছে। উপসংহারে সমীর নবোদিত সাহিত্যসূর্য এখন যে পর্বতচূড়া ছাড়িয়া নিম্নউপত্যকাস্থিত দরিদ্র কুটিরগুলির উপরেই জ্যোতির্বর্ষণ করিতেছে এই মন্তব্যের সহিত আলোচনার উপর যবনিকা টানিয়াছে।

'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' (ভাদ্র ১৩০০) প্রবন্ধে জমিদারী পুণ্যাহের সানাই-এর বাজনা মনুষ্যস্বভাবের প্রয়োজনকে সৌন্দর্যের আবরণে সজ্জিত করিবার প্রবণতা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করিল। খাজনা দিবার বাধ্যতামূলক কর্তব্যকে উৎসবের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উপহাররূপে দেখাইলে, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধকে প্রীতির সম্পর্করূপে উপস্থাপিত করিলে, মানবপ্রকৃতির মর্যাদা বাড়ে। অবশ্য ক্ষিতি এই প্রয়োজনের শুষ্ক কঙ্কালকে পুষ্পস্তবকাবৃত করার কৌশলের পক্ষপাতী নয়। কিন্তু সমীর ও সভাপতি উভয়েই ব্যবহারজীর্ণ সংসারের ইতরতাকে উহার আদিম যৌবনশ্রীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আকৃতিকে, হাটের কেনাবেচাকে উৎসবের আদর্শসুষমায় গোপন করিবার প্রয়াসকে মানুষের স্বাভাবিক ঔদার্যের প্রমাণরূপে অভিনন্দন জানাইয়াছে। আত্মা দেহবুভুক্ষার নিকট পরাজয় স্বীকার না করিয়া উহারই উপর নিজ গৌরব-নিশান উড়াইয়াছে। স্রোতস্বিনীও এইরূপ হৃদয়সম্পর্কস্থাপনকে জীবনের অনিবার্য দুঃখভারলাঘবের একটা মহনীয় উপায়-রূপেই গ্রহণ করিয়াছে।

ব্যোম অমিতবল প্রাকৃতিক শক্তির নিকট পরাভবের গ্লানিমোচনের উদ্দেশ্যেই জড়প্রকৃতির সহিত মানবের আত্মীয়তা-কল্পনার সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছে এই যুক্তি দেখাইয়াছে। ক্ষিতি উহাকে দুর্বলের আত্মমর্যাদারক্ষার হীন চেষ্টারূপে উপহাস করিয়াছে। কিন্তু স্রোতস্বিনী উহার প্রতিবাদে জানাইয়াছে যে মানুষ

শুধু সবলের সঙ্গে নয়, অসহায় পশু গাভীর সহিতও এইরূপ স্নেহসম্পর্ক পাতাইয়াছে। সমীর নদীর ন্যায় জড়পদার্থের সহিত মানুষের অনুরূপ স্নেহ-সম্পর্কস্থাপনের উল্লেখ করিয়াছে।

ব্যোম এইবার তাহার স্বভাবসিদ্ধ দার্শনিকতার উচ্চ ভাবভূমিতে অধিরূঢ় হইয়া আলোচনাটি ঊর্ধ্বমুখী করিয়াছে। সে সমস্ত প্রক্রিয়াকে আত্মার সৃজন-চেষ্টার পর্যায়ভুক্ত করিয়াছে ও সৌন্দর্যের নূতন সংজ্ঞা দিয়াছে—আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু। কবির ন্যায় আত্মাও জড়ের সহিত অন্য জড়ের ও মানুষের নব নব আত্মীয়তাসম্পর্ক উদ্ভাবন করিয়া পৃথিবীকে একটি আত্মার আবাসযোগ্য প্রেম ও আনন্দের রাজ্যে পরিণত করিতেছে।

সমীর এই সূক্ষ্ম দর্শনচিন্তার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া বাঙালীর সামাজিক শিষ্টাচারে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশক কোন শব্দের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বাঙালীর ভাষার এই দৈন্য যে অকৃতজ্ঞতার নিদর্শন নয়, পরন্তু তাহার সকলের সহিত ব্যাপক আত্মীয়তাচেতনারই পরোক্ষ ফলমাত্র তাহা বুঝাইয়াছে। সভাপতি এই মতের সমর্থন করিয়া আমরা যে ঋণমুক্তির জন্য ব্যস্ত নই তাহাই জানাইয়াছেন। ব্যোম দেবতাসম্বন্ধেও যে আমাদের স্নেহের জোর ও আশাভঙ্গের অভিমান আমাদিগকে ইউরোপীয় জাতি হইতে পৃথক করিয়াছে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছে।

ক্ষিতি ইউরোপীয়দের এই নিন্দায় ঘোরতর আপত্তি জানাইয়া আমাদের প্রকৃতিপ্রেম যে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবজাত ও এ বিষয়ে উহার ঋণস্বীকার আমাদের অবশ্য কর্তব্য এই তথ্য পরিবেশন করিয়াছে। সভাপতি ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াও একটি মৌলিকচিন্তাপ্রসূত সামঞ্জস্য-বিধান করিয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্যে মানব ও প্রকৃতির সম্পর্ক অনেকটা মাতা-পুত্র বা ভাই-ভগিনীর মত একটা সহজ রক্তসম্বন্ধ। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে কিন্তু ইহার মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের অনুরূপ কিছুটা নিগূঢ়তা, একটা গোপন রহস্যভেদের ব্যাকুলতা, অনু-সন্ধানের উৎকণ্ঠা ও আবেগের অবস্থাভেদে তারতম্য, ও একটা অস্থির চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হয়। আমাদের মধ্যে যাহা ঐক্য, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তাহা বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনাকৃতি। আমরা নদী, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতিকে প্রাণময় ও আত্মীয়তার নৈকট্যে একান্ত আপনার করিয়া দেখি, কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রকৃত আত্মার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না। তাই গঙ্গা আমাদের নিকট কেবল ইহকালের আরাম ও পরকালের কল্যাণদাত্রী। তাহার একটি বিশিষ্ট মূর্তি কল্পনা করিয়া আমরা তাহার নিকট কেবল ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা

করি। কিন্তু তাহার সৌন্দর্যসত্তা আমাদের নিকট কোন আধ্যাত্মিক ভাবাবেদন জাগায় না। তাই সভাপতি গঙ্গার প্রাচ্য আদর্শ পরিহার করিয়া তাহার পাশ্চাত্ত্য ভাবানুপ্রাণিত অধ্যাত্ম স্বরূপটিই উদ্বোধন করিতেছেন। তাহাকে পুণ্যদায়িনী, পতিতপাবনী মনে না করিয়া স্মৃতির আনন্দসঞ্চয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই আবাহন জানাইতেছেন। গঙ্গার বিচিত্র স্মৃতি একটি নানাপুষ্পগ্রথিত মাল্যের ন্যায় তিনি জীবনযাত্রার অবসানে চিরসুন্দরের পদে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বিতর্কের উপসংহার করিয়াছেন।

'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' (মাঘ ১৩০১) হিন্দুদের সৌন্দর্যবোধের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে খুব সূক্ষ্মদর্শী ও গভীরস্তরসঞ্চারী আলোচনা। ইহা কৌতুকহাস্য-প্রসঙ্গে উত্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির উদ্ভট মূর্তিকল্পনা ও রূপবর্ণনার জন্য উপমা-নির্বাচন স্বভাবতঃই কৌতুকরস-উদ্রেকের উপযোগী; কিন্তু জাতির অমূর্ত ভাব-নিষ্ঠার জন্য ইহা কৌতুকরসের পরিবর্তে সৌন্দর্যসৃষ্টির উপায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহারা গুণকে বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত তাহাদের মধ্যে কৌতুকবোধ সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ হয় না; কেননা কৌতুকরস নিহিত থাকে গুণের বর্ণহীন ভাবসত্তার মধ্যে নয়, উহার বস্তুময় প্রকাশে। সেইজন্য অনেক হাস্যকর ও অসঙ্গত উপমা ভারতীয় সাহিত্যে রূপমোহ ঘনীভূত করার উদ্দেশ্যে নির্বিচারে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। গজেন্দ্রগামিনী, গৃধিনীর ন্যায় শ্রুতিবিশিষ্টা, সুমেরু ও মেদিনীর ন্যায় উচ্চবর্তুল-অঙ্গসম্পন্না সুন্দরী আমাদের কাব্যসাহিত্যে আবহমান কাল হইতে রূপের পরাকাষ্ঠারূপে কীর্তিত হইয়া আসিতেছেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে সমীরের এই মন্তব্য ক্ষিতি ও ব্যোম এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শ্রোতা কর্তৃক সমভাবে অনুমোদিত হইয়াছে। নারী সদস্যদের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

ব্যোম ও ক্ষিতি উভয়েই প্রায় একই প্রকার যুক্তিপ্রয়োগে কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই মতবাদকে সমর্থন করিয়াছে। ব্যোম উহারই মধ্যে একটু দার্শনিকতার স্পর্শ লাগাইয়াছে। আমরা অন্তর্লোকবিহারী ও বহির্জগতের প্রকৃত আকৃতি সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন। কাজেই বহির্জগতের বিপরীত সাক্ষ্য আমাদের অন্তর্জগতের স্থির ভাবসংস্কারের মধ্যে কোনও ফাটল ধরাইতে পারে না। গ্রীকদের দেবমূর্তিরচনা বহিরঙ্গ-সুষমাসমর্থিত। আমাদের ভাবকল্পনা বহির্জগৎনিরপেক্ষ। তাই গ্রীক দেবতা এপলো অনবদ্য রূপ-সুষমার সহিত

প্রজ্ঞাভাস্বরতার নিখুঁত সমন্বয়। আমাদের মূষিকবাহন, গজানন গণেশ হাস্যকর মূর্তি সত্ত্বেও তাঁহার দেবমহিমায় অটল হইয়া আছেন।

ক্ষিতি প্রাণিজগৎ হইতে দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছে। আমাদের স্বরগ্রামের সপ্ত স্বর এক একটি পশু-পক্ষীর স্বর হইতে গৃহীত বলিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু 'সা' যে গর্দভকণ্ঠের অনুকারী এই প্রত্যয় রাসভকণ্ঠ-কর্কশতার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ও অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

সমীর প্রেম ও ভক্তির মোহ আমাদিগকে বস্তুজগতের অসৌন্দর্য বা অস্বাভাবিকতার প্রতি কিরূপ অন্ধ করে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণের নীলবর্ণ মূর্তির কথা উল্লেখ করিয়াছে। ব্যোম এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের এই মানস প্রবণতাটিকে উচ্চ কলাবিদ্যার অনুকূল না হইলেও ইহার বাস্তবনিরপেক্ষতার জন্য সুকুমার-ভাব-উদ্দীপনের বিশেষ সহায়করূপে অনুমোদন জানাইয়াছে। সুতরাং সমাজে ভক্তিযোগ্য পাত্রের অভাব থাকিলেও ভক্তি-অনুশীলনে কোন ব্যাঘাত হয় না।

সমীর আর এক পা আগাইয়া ভারতীয় মনে দুই বিরোধীভাবের সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত দিয়াছে। দেবতাদের সম্বন্ধে পুরাণে অনেক কুৎসা-কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও তাঁহারা আমাদের ভক্তি হারান না। গাভীর ক্ষেত্রে লগুড়াঘাত ও পদপূজা উভয় প্রকার প্রচেষ্টাই আমাদের নিকট সমান স্বাভাবিক।

এইখানে ক্ষিতিই সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও প্রয়োজনীয় একটি আলোচনা-ধারা-প্রবর্তনের কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে। বহির্জগতের প্রতি এই ঔদাসীন্য আমাদের ভাবজগতে একটি সুলভ সন্তোষ ও আত্মতৃপ্তি জাগ্রত রাখিয়াছে। আমরা আদর্শের বাস্তব মহিমা সম্বন্ধে একান্তভাবে অমনোযোগী। আমরা কল্পিত ভাবের রসে এত মশ্‌গুল থাকি যে জীবনে তাহার সমর্থনের জন্য মোটেই উদ্বিগ্ন নই। যে কোন একটা উপলক্ষ্য অবলম্বনে আমরা একটি ভাব-মরীচিকা সৃষ্টি করি। গুরুমাত্রেই চরিত্র-নির্বিশেষে আমাদের পূজনীয়; হীনচরিত্র স্বামীও স্ত্রীর নিকট পতিদেবতা। এই কঠোর পরীক্ষামূলক ভাব, এই বিরল-তৃপ্ত অসন্তোষের অভাবের জন্য আমাদের আদর্শসমুন্নতি ও সমাজের বাস্তব অবস্থার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। সমীর যদিও বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের পুনর্গঠনচেষ্টায় এই মনোভাবের বিপরীত একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছে তথাপি ইহা বিরল ব্যতিক্রমরূপে ক্ষিতির সাধারণ মন্তব্যেরই পোষকতা করিয়াছে। ক্ষিতির মত একজন নিরেট বস্তুধর্মী ব্যক্তির নিকট এরূপ তীক্ষ্ণ-মনস্বিতাপূর্ণ আলোচনা অপ্রত্যাশিতই মনে হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে সভাপতি

এরূপ মুখরোচক বিষয়েও সম্পূর্ণ নীরব। বোধহয় আলোচনা সর্বসম্মত বলিয়াই সভাপতির ওজন-করা রায় এখানে নিষ্প্রয়োজন।

'কাব্যের তাৎপর্য' (অগ্রহায়ণ ১৩০১) আলোচনায় 'কচ ও দেবযানী' কবিতাটি সম্বন্ধে দীপ্তি উহার তাৎপর্যহীনতার প্রকাশ্য ঘোষণায় কবিকে রূঢ় আঘাত হানিয়াছে। ক্ষিতি যে কবিতাটি পাঠ করে নাই ইহা একটু ভয়ে ভয়ে স্বীকার করিয়াছে। ব্যোম যখন উহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের উপক্রম করিয়াছে ও উহাকে দেহ ও আত্মার রূপক মিলনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছে, তখন ক্ষিতি স্বভাবতঃই ভীত হইয়াছে। দেহ দেবযানী ও আত্মা কচ; দেহবীণায় ধ্বনিত মধুর সঙ্গীত আত্মাকে মুগ্ধ করে ও দেহের রহস্যময় অস্থি-সন্ধির পরিচয়লাভের জন্য আত্মা নানা উপচারে দেহের অর্ঘ্য রচনা করে। দেহও সুকোমল লতাবল্লরীর শত পাকে আত্মাকে জড়াইয়া ধরে। শেষে কিন্তু বিদায়ের দিনে এই অসম প্রণয়লীলার অবসান ঘটে ও দেহের সমস্ত মধুর অনুযোগ উপেক্ষা করিয়া আত্মা আপন নিঃসঙ্গ স্বর্গলোকে ফিরিয়া যায়। দেহ-আত্মার এই আদি প্রেম স্থূল জড়বাদের উপর আনন্দের প্রথম বিজয়-ঘোষণা।

ক্ষিতি এই জটিল দর্শনতত্ত্বকে দুষ্পাচ্য বলিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও সমীর এই মতবাদকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ইহার যাথার্থ্যে সন্দিহান হইয়াছে। ব্যোম উত্তরে বলিয়াছে প্রতি দার্শনিক মতবাদের সারবত্তা উহার জীবনানুকূল্যের উপর নির্ভর করে এবং এই মানদণ্ডে দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদ সমভাবে গ্রহণীয়।

ক্ষিতি নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী কচ ও দেবযানীর ক্ষণিক মিলনকে অভিব্যক্তি-বাদের বৈজ্ঞানিক সত্যের ছাঁচে ঢালিতে চাহিয়াছে। সঞ্জীবনী বিদ্যা এক প্রাণিবংশকে অবলম্বন করিয়া অনুশীলিত হইতে হইতে উহাকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস-কবলিত হইতে দিয়া আর একটি উচ্চতর জীবন-শাখায় সংলগ্ন হয় এবং এইরূপ পর্যায়ক্রমিক ত্যাগ ও আশ্রয়-পরম্পরার মধ্য দিয়া চরম পরিণতিতে পৌঁছায়।

দীপ্তি আরও অনেক অনুরূপ ঘটনা পুঞ্জীভূত করিয়া উপরি-উক্ত মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিল ও ব্যোম ভালবাসা ও ভালবাসার বন্ধনছেদনকে মানুষের দুই পায়ের গতিছন্দের মাধ্যমে অগ্রগতির সহিত তুলনা করিয়া উক্ত নীতির সার্বভৌমতা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিল। সমীর বিদায়-অভিশাপের তাৎপর্য বুঝাইতে নূতন রূপকের আশ্রয় লইল। কচ বিদ্যা অপরকে শিখাইতে পারিবে, কিন্তু নিজে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। ইহার অর্থ হইল যে

নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়া যে বিদ্যা আয়ত্ত হয়, সেই নির্লিপ্ততার পরিবেশে তাহার সার্থক প্রয়োগ সম্ভব নয়। নির্লিপ্ত গুরুর সংসারাভিজ্ঞ শিষ্যই অর্জিত বিদ্যার ফললাভে অধিকারী।

এই বহু-ব্যাপ্ত কূটতর্কের শেষের দিকে স্রোতস্বিনীর সহজ, একনিষ্ঠ বোধশক্তিই শেষ সিদ্ধান্তের সূত্রটি আবিষ্কার করিল। কাব্যের যথার্থ আবেদন মনীষী পাঠকের আরোপিত তত্ত্বনির্ভর নয়, সর্বজনসাধারণ হৃদয়াবেগের রমণীয় অনুভবে। সুতরাং রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় কচ-দেবযানীর কাব্যসৌন্দর্য এই সার্বজনীন ভাবমাধুর্যের বিকিরণ-প্রসূত; উহার মধ্যে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের অনুসন্ধান আর যাহারই হউক কাব্যরসআস্বাদনকারীর পরিচয় বহন করে না। কবি-সভাপতি এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থক মন্তব্য সংযোজনা করিয়া আলোচনার উপসংহার টানিয়াছেন। কবির সৃষ্টিশক্তি পাঠকের মনেও অনুরূপ, অথচ বিচিত্র উপলব্ধির সৃষ্টিশক্তি উদ্বুদ্ধ করে। কাব্যপদ্মের রসকোষ হইতে নানা তত্ত্বের মৃণাল প্রসারিত হইতে পারে। রুচিবৈচিত্র্য ও সঙ্গতি-সুষমা অনুযায়ী সকল প্রকার তত্ত্বব্যাখ্যাই গ্রহণ করার পক্ষে কোন বাধা নাই। কাব্যের আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত ও বহুমুখী; অনেক সময় যাঁহারা বিশুদ্ধ কাব্যরসে আনন্দ না পান তাঁহারা উহার আনুষঙ্গিক তত্ত্ব-আস্বাদনকে অধিকতর উপভোগ্য মনে করেন। সুতরাং উদার সমন্বয়ধর্মী মনোভাবই কাব্যচর্চার পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল।

'কৌতুকহাস্য' (পৌষ ১৩০১) ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' (ফাল্গুন ১৩০১) প্রস্তাব দুইটি শুধু আলোচনার মৌলিক সরসতায় উপভোগ্য নয়, 'পঞ্চভূত'-এর মানস পাদচারণার স্বচ্ছন্দ ছন্দটিও ইহাদের মধ্যে ল্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং ভাব ও ভাববিন্যাসের গঠনকলা—এই উভয়দিকেই ইহাদের দ্বিমুখী আবেদন।

প্রথম প্রস্তাবে এক হাস্য দ্বারা সুখ ও কৌতুক এই উভয় ভাবই প্রকাশ হওয়ায় প্রকৃতির ব্যবস্থাপনার প্রতি কিছুটা কটাক্ষপাত করা হইয়াছে ও এই দুই প্রকার হাস্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য-নির্দেশের চেষ্টা হইয়াছে। সুখ-প্রকাশের জন্য স্মিতহাস্য আর কৌতুক-প্রকাশের জন্য উচ্চহাস্য। ইহা যেন ভৌতিক জগতে কম্পনের মাত্রা অনুসারে আলোক ও বিদ্যুতের পার্থক্যের অনুরূপ। আমোদ ও কৌতুকের স্বরূপ-বিশ্লেষণের ফলে আরও বলা হইয়াছে যে ইহাদের মধ্যে অপ্রত্যাশিতের আঘাতজন্য ঈষৎ পীড়া ও তজ্জনিত দুঃখ বর্তমান। সামান্য নিয়মের ব্যতিক্রমে আমাদের চেতনা অভ্যস্ত জড়তা হইতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া কিঞ্চিৎ সুখদুঃখমিশ্র অনুভূতির কারণ হয়। পীড়নের পরিমাণ মাত্রা

ছাড়াইলে কৌতুক দুঃখে পরিণত হয়। চেতনার পীড়ন ও উত্তেজনার জন্য কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্যের বিস্ফোরণে।

ক্ষিতি এই বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিল না। আনন্দ ও কৌতুকের মধ্যে যে হাস্যের পরিমাণ-পার্থক্য তাহাও তাহার অভিজ্ঞতা-সমর্থিত নয়। স্মিতহাস্যও কৌতুকের লক্ষণ। চিত্তের অসঙ্গতিবোধজাত অনতিপ্রবল উত্তেজনা কৌতুকের ফল না হইয়া উহার কারণরূপে বিবেচিত হইতে পারে। সভাপতি ইহাকে আরও সাধারণীকৃত রূপ দিয়া অনুভবক্রিয়ামাত্রকেই সুখের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে এবং ট্রাজেডির মর্মন্তুদ বেদনাও ব্যক্তিগত দুঃখের সহিত অসংযোগের জন্য একপ্রকার নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ উৎপাদন করে ইহাও বলিয়াছে। দুঃখানুভবে আন্দোলন প্রবলতর হয় বলিয়াও কৌতুকে চিত্তের অতর্কিত আঘাত আসে বলিয়া ইহার অল্প দুঃখ একপ্রকার সুখকর অনুভূতির উদ্রেক করে।

মোট কথা এই আলোচনায় কৌতুকের স্বরূপের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ না করিয়া উহার বহির্লক্ষণ ও উৎপাদনের মধ্যে সুখ-দুঃখের মাত্রা লইয়াই তর্ক আবর্তিত হইয়াছে ও শেষ সিদ্ধান্তে, যে উপাদানের পরিমিতিতে কৌতুক-হাস্যের উদ্ভব তাহারই মাত্রাধিক্যে অশ্রুজল নির্গত হইতে পারে এই অদ্ভুত তত্ত্বটিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ যেন চণ্ডীদাসের পদের প্রেমানুভূতিতে 'সুখ-দুঃখ দুটি ভাই' এই মতবাদেরই সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রস্তাবে পূর্ব আলোচনা যে গভীর হয় নাই তাহার স্বীকৃতি আছে ও এই বিতর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। 'পঞ্চভূত'-এর বিতর্ক-পদ্ধতির স্বরূপটি এখানে উদ্ঘাটিত ও নানা উপমান-প্রয়োগে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে অসঙ্গতি কৌতুকের মর্মগত সত্য, তাহা পূর্ব বিতর্কে নিতান্ত গৌণভাবে একবারমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। নিয়মভঙ্গমাত্রই কৌতুকের উদ্রেক করিতে পারে না, বিশেষতঃ জড়জগৎসম্বন্ধীয় কোন ব্যতিক্রম কৌতুকরসাবহ নয়। যে অসংগতি মানুষের ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত তাহা যদি আকস্মিক ও বিশেষ দুঃখকর না হয়, তবেই তাহা কৌতুকের উৎস হইতে পারে। এই প্রস্তাবেও যে আলোচনা সুখ-দুঃখের তারতম্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহার প্রমাণ আচরণের অসঙ্গতির মধ্যে নিষ্ঠুরতার স্বীকৃতিতে। কিন্তু এই নিষ্ঠুরতা কৌতুকের অঙ্গীভূত উপাদান নয়, ইহার একটা অনভিপ্রেত উপজাত ফল (bye-product) মাত্র। নিষ্ঠুরতার প্রতি সচেতন হইলে

কৌতুকরস জমিবে না। কমেডির অসঙ্গতি প্রকৃত অসঙ্গতিপদবাচ্য; ট্রাজেডির মধ্যে যদি অসঙ্গতিও থাকে, তবে ইহা ক্ষুদ্র নিময়ভঙ্গের উদাহরণ নহে, বিশ্ববিধানের বা মানবের গভীর প্রত্যাশা ও অনুভূতির ভয়াবহ বিপর্যয়। মাতালের অস্থির পদক্ষেপ কৌতুকের সঞ্চার করে, কিন্তু সর্বধ্বংসী ভূমিকম্পে যাহার গতি বিপর্যস্ত সে ভয় ও বিস্ময়ের পাত্র। বিস্ময় যখন হাস্যে ও যখন অশ্রুজলে পরিণত হয় তখন এই পরিণতি কেবল অসঙ্গতির তার চড়ানোর জন্য নয়। অন্ততঃ অসঙ্গতির যে মাত্রাধিক্যে ট্রাজেডির রস উদ্ভূত হয় তাহা উহার একটি নবজন্মগত রূপান্তর। উহার প্রকৃতি-বৈলক্ষণ্য এত বেশী যে উহার নূতন নামকরণ করিতে হইবে। কমেডির অসংগতির প্রকৃত গোত্রান্তর ট্রাজেডিতে নয়, স্নিগ্ধ করুণ humour-এর সূক্ষ্ম হাস্যরসে।

এই আলোচনায় লেখক তাঁহার পূর্বসংস্কারের গণ্ডীতেই পাকে পাকে ঘুর খাইয়াছেন, উহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য যে সভাপতির প্রবন্ধধর্মী এককভাষণ, বিরুদ্ধ মত উপস্থাপনের উত্তেজনায় ইহার প্রাণশক্তি আন্দোলিত হয় নাই।

'প্রাঞ্জলতা' (চৈত্র ১৩০১) একটি ললিতকলাবিষয়ক বিতর্ক। স্রোতস্বিনী কোন একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবির কবিতা তাহার ভাল লাগে না এই সহজ মন্তব্যটির দ্বারাই একটি জটিল সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করিল। দীপ্তি স্রোতস্বিনীকে আরও জোরালো যুক্তিতে সমর্থন করিতে গিয়া প্রতিবাদস্পৃহাকে উগ্রতর করিল। তাহার মতে ভাল কবিতার আকর্ষণ অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় স্বয়ংক্রিয়, সমালোচনার সহায়তানিরপেক্ষ। ক্ষিতির বাস্তববুদ্ধি এখানে সূক্ষ্ম অনুভবের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছে। কবির মন সাধারণের অনুভবশক্তি ছাড়াইয়া এত অধিক অগ্রগামী হয় যে সমালোচনার ঘোড়ার ডাক বসান ছাড়া এই ব্যবধান টুটান সম্ভব হয় না—সে এই যুক্তিরই আশ্রয় লইয়াছে। ব্যোমও তাহার সমর্থনে বলিয়াছে যে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের জ্ঞান, দর্শনের বোধ ও সাহিত্যের আনন্দ-উপলব্ধি সবই স্বতঃস্ফূর্ত না হইয়া বিশেষ-অনুশীলন-সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এখন সাধারণ পাঠকের বোধশক্তির সহিত সমস্তরের সাহিত্য খুঁজিতে গেলে প্রাচীন যুগের নীতিকথার গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে। সমীরও প্রায় একই সুরে কথা বলিয়াছে। এখন সর্বসাধারণের যুগ চলিয়া গিয়া বিশেষজ্ঞের যুগ আসিয়াছে ও কলারসিক ছাড়া অপর কেহ কলাবিদ্যার রসগ্রহণে অক্ষম। ক্ষিতি বিষয়টিকে আরও একটু

সম্প্রসারিত করিয়া মনুষ্যের সর্ব বিষয়ে অগ্রগতির ইতিহাসে সহজ ও দুরূহের একটা স্ববিরোধময় সামঞ্জস্য-প্রয়াস লক্ষ্য করিয়াছে। মানুষ সমস্ত বিষয়কে সহজ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে গিয়া উহাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

স্রোতস্বিনী এ যুক্তি স্বীকার করিয়াও কিন্তু আলোচ্য কবি যে কোন মতেই দুরূহ নহেন এবং তাঁহাকে না বোঝার দোষ পাঠকেরও নয় বা যুগধর্মের অনিবার্য প্রভাবও নয় এই কত ব্যক্ত করিয়াছে, অর্থাৎ কবিকেই সে পরোক্ষভাবে দোষী করিয়াছে।

ব্যোম কিন্তু এবার আপাত-অসম্ভবের আর একটু জটিলতর চক্রব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সে সরল ও সহজের একার্থবাচকতা অস্বীকার করিয়াছে। বরং যাহা সরল শিল্প তাহা কোন কৃত্রিম সৌন্দর্যকলার উপর নির্ভর না করিয়া নিজের অনলঙ্কৃত ভাবাবেদনের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। প্রাঞ্জলতার রসগ্রহণই সর্বাপেক্ষা দুরূহ। কেননা উহা মনের সহিত মধ্যস্থহীন, অব্যবহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। কৃষ্ণনগরের পুতুল রংএর আতিশয্যে ও হাব-ভাব-ভঙ্গীর অতিপ্রকটতায় আমাদের মন ভুলায়। গ্রীক প্রস্তরমূর্তির অলঙ্কারহীন প্রাঞ্জলতাই প্রধান গুণ।

দীপ্তি এই যুক্তিতে কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়াছে। ভাল জিনিসের অতিপ্রশংসা একটা সর্বসম্মত মতের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি মাত্র, মানুষের বোধশক্তির কোন পরিচয় নয়। আর যাহাকে সরলতা বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে অনেক সময় বর্বরতা, মার্জিত রূপের অভাব বহুক্ষেত্রে ভাবরিক্ততারই সূচক।

এবারে স্বয়ং সভাপতি প্রাঞ্জলতার সপক্ষে তর্কে অবতীর্ণ হইল। সে বাংলা সাহিত্যে অতিরঞ্জনপ্রিয়তাকে আদিম বর্বরতার প্রতি আমাদের অনবলুপ্ত মানস প্রবণতার লক্ষণরূপে নির্দেশ করিল। সমীরও সংযমকে সাহিত্যে ও সমাজজীবনে সু-রুচির পোষকরূপে প্রশংসার্হ মনে করে। সভাপতি বলিল যে ভদ্র সাহিত্যে পরিচ্ছন্ন আকৃতি আছে, কিন্তু ভঙ্গিমার কোন আতিশয্য উহাতে লক্ষিত হয় না। স্থির জল পরিপূর্ণ গভীরতাকে অনেক সময় আচ্ছাদন করে; পক্ষান্তরে চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গ অগভীর জলকেও নয়নাকর্ষক করিয়া দেখায়।

দীপ্তি এই অকস্মাৎ-উন্মোচিত পাণ্ডিত্যের জোয়ারে হাবুডুবু খাইয়া খানিকটা বিমূঢ় হইয়া গেল। কিন্তু স্রোতস্বিনী শেষ পর্যন্ত তাহার নিজের মতে অবিচলিত থাকিয়া নারীর যুক্তি-প্রবাহে অটল সংস্কার-দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।

'অপূর্ব রামায়ণ' (আষাঢ় ১৩০২) রাগিণী-আলাপের মাধুর্যময় পরিবেশে মৃত্যু ও মানবজীবনের সম্পর্কটি পুনবিচার করিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীত-রাগিণীর মর্মবাণী যেন একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের সুরময় প্রকাশ। ইহাতে মৃত্যুর অসহনীয় গুরুভার যেন আশ্চর্য কুহকবলে লঘু ও রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে—ব্যক্তির মর্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস যেন করুণা ও সান্ত্বনার রসে অভিষিক্ত হইয়া মৃত্যুভয়লোপী এক অনন্ত সৌন্দর্যের আশ্বাসে রূপান্তরিত হইয়াছে।

মৃত্যুর দার্শনিক মননে আবিষ্ট ব্যোম এই সূত্রের আরও বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছে। জগৎ-রচনাকাব্যে মৃত্যুই একমাত্র স্থায়ী রস। মৃত্যুই জীবনের ভয়াবহ অবিচলত্বের মধ্যে গতিচ্ছন্দ সঞ্চার করিয়া একটি জীবনাশ্রয়ী অসীমের ভূমিকা রচনা করিয়াছে। প্রত্যক্ষের দাসত্ব জীবনকে মুক্তি দিয়া, অনন্তকে গতিসমুদ্রে ভাসমান রাখিয়া ইহা জীবনের সমস্ত আপাতব্যর্থ ও অর্ধস্ফুট সম্ভাবনার পূর্ণতালাভের উপযোগী এক সীমাহীন সঞ্চরণক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে।

সমীর ইহার সহিত একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য সংযোজনা করিয়াছে। মৃত্যু না থাকিলে জীবনের মর্যাদা থাকিত না। ক্ষিতি মৃত্যুর সমর্থনে একটি বাস্তব-বুদ্ধিপ্রণোদিত কারণ দিয়াছে। অমর জীবনের অনন্ত অবসরে কর্মবিরতির কোন প্রেরণা থাকিত না এবং তাহাই মানব-জীবনে সর্বাপেক্ষা ভীতিদায়ক ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিত।

ব্যোম মৃত্যু-প্রশস্তি গাহিতে গাহিতে আমাদের সমস্ত প্রিয়তম আশা-আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা-কামনার শেষ আশ্রয় যে মৃত্যুর কল্পতরুতলে, পরলোকের জ্যোতিরুৎসবে এই সত্য ব্যক্ত করিয়াছে। সমীর মৃত্যুর সহিত সঙ্গীতের একটি নূতন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছে। সঙ্গীতের সকরুণ মূর্ছনা শুধু যে মৃত্যুশোককে লঘু ও সান্ত্বনা-মধুর করিতেছে তাহা নয়, জীবনের অনধিগত ও মৃত্যুর পরপারে নির্বাসিত প্রিয় বস্তুগুলিকে আবার ফিরাইয়া আনিয়া ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। মৃত্যু জীবনের সহিত অসীমের মিলনবাসর রচনা করিয়া সেই অপার্থিব প্রেমের অস্পষ্ট আভাস-ইঙ্গিতে আমাদিগকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছে। সাহিত্য ও কলারস সেই মিলন-বাসরকে পরলোক হইতে আনিয়া ইহলোকেই তাহার স্থান নির্দেশ করিতেছে। সুতরাং নবীন সাহিত্য ও ললিতকলা প্রাচীন বৈরাগ্যের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়া ইহলোকেই আদর্শ প্রেমের আশ্বাসবাহী হইয়াছে।

আলোচনা এই স্তরে পৌঁছিলে ক্ষিতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ পার্থিববন্ধনমুক্ত হইয়া রামায়ণের নূতন ব্যাখ্যায় এক অলৌকিক কল্পনা-সৌকুমার্যের পরিচয়

দিয়াছে। হয়ত কাব্য ও সঙ্গীত তাহারই সৃষ্টি বলিয়া ইহাদের গৌরবে সে নিজ গৌরব অনুভব করিতেছে। রামচন্দ্র কর্তৃক সীতা-নির্বাসন বৈরাগ্যধর্মের ষড়যন্ত্র—অনিত্যসংসর্গদুষ্ট প্রেমের মৃত্যু-তমসাতীরে প্রেরণ। কিন্তু লবকুশের দ্বারা হৃদয়-দ্রবকারী সীতামাহাত্ম্যগান কাব্যমধুরতার মাধ্যমে ইহজীবনে প্রেমের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। বৈরাগ্য ও কাব্যের প্রেম লইয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সংগ্রাম এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান।

'ভদ্রতার আদর্শ' (শ্রাবণ ১৩০০) পোশাক-পরিচ্ছদের সুরুচি সম্বন্ধে লঘু ও সরস আলোচনা। বেশভূষায় ভদ্রতা-রক্ষার প্রয়োজন সম্বন্ধে সদস্যদের মধ্যে কাহারও মতভেদ নাই। সকলেই বাঙলা সমাজের আদব-কায়দাহীন শিথিলতা ও বেশবাসের রুচিহীন কুশ্রীতাকে বর্বরতার লক্ষণ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। এমন কি যে ব্যোমের উদ্ভট পোশাক এই আলোচনার উপলক্ষ্য যোগাইয়াছে, সেও নিজ ব্যবহারিক ঢিলেমি ভুলিয়া উক্ত মতবাদেরই সমর্থক হইয়াছে। পোশাক সম্বন্ধে অমনোযোগিতার কারণস্বরূপ আমাদের আধ্যাত্মিক প্রবণতা ও অর্থকৃচ্ছ্রতার উল্লেখ করা হয়, কিন্তু এই কারণের কোনটাই সত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় না। সাধারণ বাঙালীর তৈলনিষিক্ত, মেদবহুল, মলিন ও অপ্রচুর বস্ত্রে আবৃত বপু কোন অধ্যাত্ম সাধনার উচ্চভাবাবিষ্টতার পরিচয় বহন করে না। এবং বিলাসপ্রিয় ধনীর মধ্যেও গার্হস্থ্য পরিচ্ছন্নতার অভাব দারিদ্র্য অপেক্ষা আলস্যকেই সঙ্গততর কারণরূপে নির্দেশ করে। ভদ্রতার আদর্শ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য মার্জনীয় হইতে পারে কেবল উচ্চভাবলোকবিহারী মনীষীবৃন্দের বিরল ব্যতিক্রম-ক্ষেত্রে। লৌকিক নিয়মের অবহেলা কেবল ইহাদের পক্ষেই শোভনীয়।

এই প্রসঙ্গে ব্যোম প্রকৃত বৈরাগ্য ও মেকী বৈরাগ্যের মধ্যে পার্থক্য করিয়া প্রকৃত বৈরাগ্যই যে কর্মসাধনার অধিকারী ও যে বৈরাগ্যের সহিত কোন মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নাই তাহা যে বৈরাগ্যপদবাচ্য নহে এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছে। আমরা বৈরাগ্যবিলাসী ও গেরুয়ার অন্তরালে আলস্য ও মানস শৈথিল্যকেই প্রশ্রয় দিই—এই তাহার অভিমত। আশ্চর্যের বিষয় ক্ষিতিও এই মতে সম্পূর্ণ সায় দিয়াছে। আসল কথা 'পঞ্চভূত'-আরম্ভের দুই বৎসর পরে লেখকের নাটকীয় অভিপ্রায় ও বিভিন্ন চরিত্রের পার্থক্য সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং চরিত্রানুযায়ী উক্তি-সন্নিবেশ-ব্যাপারে লেখক আর পূর্বের মত সচেতন নহেন।

'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' (ভাদ্র—কার্তিক ১৩০২) আর একটি মনোজ্ঞ যুক্তি-

পরম্পরা-গ্রথিত আলোচনা ; এখানেও কোন বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষ উত্তেজনা সৃষ্টি করে না। ব্যোম ও ক্ষিতির মধ্যে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কিরূপ তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখমাত্র পাই, দৃষ্টান্ত পাই না। কেননা যেখান হইতে আলোচনার আরম্ভ সেখান হইতে তর্কাতীত ঐকমত্য। ব্যোমের প্রধান যুক্তির চারিপাশে ছোট ছোট সমর্থক যুক্তি বিন্যস্ত হইয়াছে। মানুষ নিয়মের রাজ্যে বাস করে, কিন্তু অনিয়মের প্রতি তাহার প্রকৃতিগত আকর্ষণ। নিয়মের জাল ছিন্ন করার প্রয়োজনেই বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যের প্রথম উন্মেষ। নিয়মের অমোঘ আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া কোন খেয়াল খুশির ইন্দ্রলোকে পৌছান যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিতেই মানুষ বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিরহস্যভেদ-অভিযানে সে যত দূরই যাক না কেন, নিয়মের অমোঘতা সর্বত্রই তাহার অনুগামী। নিয়মের সর্বব্যাপিত্বে এই আনন্দ আমাদের একটি কৃত্রিম, অনুশীলিত ভাব ; অনিবার্য প্রয়োজনকে আনন্দের উৎসরূপে কল্পনা করিয়া আমরা আত্ম-প্রতারণা করি মাত্র।

সমীর কথামালার গল্পের দৃষ্টান্তে এই মতেরই পোষকতা করিয়াছে। গুপ্তধন-লাভের আনন্দ আর পরিশ্রমলব্ধ সফলতা ফলে এক হইলেও মানস প্রেরণারূপে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সভাপতি ব্যাপকতর যুক্তি অবলম্বনে এই প্রত্যাশা মানবমনে কিরূপ বদ্ধমূল তাহা দেখাইয়াছে। নিয়মের সীমাবদ্ধতা মানব কল্পনার অমিত আশার পক্ষে পীড়াদায়ক। নিয়মের প্রক্রিয়া ও প্রভাব আমাদের নিকট সুপরিচিত ; অনিয়মই অসম্ভব প্রত্যাশার দ্বার উন্মুক্ত করে। অভিজ্ঞতার আঘাতে নিয়মকে আমরা মানি, কিন্তু সে দায়ে পড়িয়া। ব্যোম ইহার একটি নিগূঢ়তর কারণ উদ্ভাবন করিয়াছে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নিয়মবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে অনুরূপ ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব-অনুসন্ধানে ব্যাকুল। সভাপতি এই সূত্র অনুসরণে বলিয়াছে যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ইচ্ছা ও আনন্দ আবিষ্কার করিতে না পারিলে মানুষের অন্তরাত্মা কখনই স্বস্তি পায় না। সমীর আর একটি উপমা দ্বারা এই যুক্তিকে দূরীভূত করিয়াছে। জড়প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী চীনে প্রাচীরের মধ্যে মানব প্রকৃতি একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র, যাহা দিয়া সে অপরিমেয় আনন্দ ও নিয়মবন্ধনহীন রহস্যবোধ প্রত্যক্ষ করে।

এই ভাবগম্ভীর তর্কের উপসংহার হইয়াছে একটি কৌতুককর ও আপাত-অসংলগ্ন ছোট ঘটনা দিয়া। ইঁদুরে পিয়ানোর বাক্সে রক্ষিত স্বরলিপির বইখানি কুটি কুটি করিয়া কাটিয়াছে। সে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে

কাগজের সঙ্গে সুরের সম্বন্ধনির্ণয়প্রয়াসী। সে হয়ত কাগজ ও তারের বস্তুগত গুণের কিছু নূতন পরিচয় লাভ করিতে পারে—কিন্তু উহাদের মধ্যে যে অনির্বচনীয় ও নিগূঢ় সৌন্দর্য-সম্বন্ধ তাহা বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ দন্তপ্রয়োগে ধরা পড়িবে না। মাঝে মধ্যে এই বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক অপূর্ব সঙ্গীতের অনুরণন শুনিয়া হয়ত অতল রহস্যে মগ্ন হইয়া যাইবে ও অন্যমনস্কের ন্যায় তাহার বস্তুখননকার্য স্থগিত রাখিবে।

'মন' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০) ও 'পল্লীগ্রামে' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০) এই দুইটি রচনা সম্পূর্ণরূপে প্রবন্ধধর্মী—ইহাদের মধ্যে ভাবের একটানা প্রবাহ তর্ক-বিতর্কের আবর্তে উহার সরল গতি পরিহার করে নাই। সুতরাং স্টাইল ও চিন্তাধারার সাধর্ম্য থাকিলেও গঠনকলার দিক দিয়া ইহারা 'পঞ্চভূত'-এর প্রচলিত রীতি হইতে ভিন্ন।

প্রথম প্রবন্ধে মন নামক পদার্থ মানুষের অন্তর্জগতে যে জটিল বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই সহিত বহিঃপ্রকৃতির প্রশান্ত, মনোহীন, সহজ প্রেরণাজাত আত্মবিকাশের সুন্দর পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। গাছের যদি মন থাকিত, বসন্তবায়ু যদি উদ্দেশ্যচালিত হইত তাহা হইলে প্রকৃতিরাজ্যের সহজ সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ শ্যামশ্রীর উপর চিন্তাজালের জীর্ণ বলিরেখা কুঞ্চন বিস্তার করিত ও উহার প্রগাঢ় শান্তি অন্তর্দ্বন্দ্বের উত্তাপে ঝলসিয়া উঠিত। মনের অতিপ্রসার মানুষের সহজ সামঞ্জস্যকে নষ্ট করিয়াছে, মনের রাক্ষসী ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া মানুষের প্রবৃত্তিগুলি বিকৃত ও অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছে। নিম্নশ্রেণীর সরল-প্রকৃতির কোন কোন গ্রাম্য লোকের মধ্যে মন শরীরের মাপে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, তাহার মনের মৃদু বাতাস তাহার দেহবৃত্তির পালকে অতিরিক্ত উৎক্ষিপ্ত-চঞ্চল করিয়া তোলে না।

'পল্লীগ্রামে' স্থির সংস্কারের প্রশান্ত প্রভাব বহিঃপ্রকৃতি হইতে পল্লীবাসী মানুষের জীবনযাত্রায় কেমন করিয়া সংক্রামিত হয় তাহাই দেখান হইয়াছে। জীবনের প্রকৃত স্বাস্থ্য নির্ভর করে সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে স্বভাবের সহিত একীভূত করার সহজ-সুন্দর সামঞ্জস্যের উপর। সভ্য নাগরিক মতবিরোধের দ্বারা কণ্টকিত, অর্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানের চাপে পীড়িত, ছন্দোসুষমাহীন জীবন যাপন করে। পল্লীবাসীর ক্ষুদ্র জীবন-পরিধি কেন বৃহত্তর সংশ্লেষে বিধৃত না হইলেও ফুলের মত সহজ সুষমায় বিকশিত, ছোট একটি বৃত্তের ন্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গসুন্দর। পল্লীবাসীর প্রকৃতির মধ্যে একটি স্থায়ী ভাবের জীবনব্যাপী রোমন্থন তাহার মুখে একটি স্থির লাবণ্যে প্রকাশিত হয়। তাহাদের মুখে অন্তঃ-প্রকৃতির বৎসলতা চিরমুদ্রাঙ্কিত।

পাশ্চাত্ত্য দেশের নবীন সভ্যতায় না আছে একনিষ্ঠ প্রশান্ত ভাবগভীরতা, না আছে নব-অঙ্কুরিত আশার অম্লান উজ্জ্বলতা। উহার বলিষ্ঠ, অশ্রান্ত আত্মপ্রসারের মধ্যে আছে বহু আশাভঙ্গের জ্বালাময় স্মৃতি, বহু জরাজীর্ণ অভিজ্ঞতার ক্লান্ত ছাপ। কাজেই উহা ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়ের মধ্যে কোন বৃহৎ ভাবঐক্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না। উহার বিপুল দেহ কোন সৌন্দর্যবেষ্টনীতে বিধৃত হইতেছে না।

গ্রাম্য সরলতা ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জটিলতা - কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ নয়। এই দুয়ের সমন্বয়েই ভবিষ্যৎ মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। নানা জটিল কর্মজাল ও বিপরীতমুখী চিন্তাধারা যখন আবার একটি অখণ্ডতায় মিলিত, একটি ঐক্যে সুবিন্যস্ত হইবে, নানা শব্দের বেসুরের যন্ত্রে যখন আদিম একতারার এক বিপুল সুরসঙ্গতি ফিরিয়া আসিবে, তখনই কেন্দ্রভ্রষ্ট মানবজীবন আবার এক নূতন আত্মপরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

'পঞ্চভূত' নানা দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা ও বাংলা গদ্য সাহিত্যেও ইহা একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র-গদ্যের পরিপূর্ণ শক্তি-বিকাশ এই গ্রন্থে। ইহার পরিকল্পনার মৌলিকতা, চিন্তার নানামুখী বিস্তার ও বিষয়ের উপর নব-নব আলোকসম্পাতের ক্ষিপ্র মনস্বিতা, বাক্যবিন্যাসের অর্থগূঢ় রমণীয়তা, গাম্ভীর্যের সহিত লঘু প্রকাশরীতির সুষ্ঠু সংমিশ্রণ এবং নাটকীয়তার ঈষৎ ও আকস্মিক প্রক্ষেপে গতিবেগ ও বৈচিত্র্যসঞ্চার—এই গুণ-গুলির যুগপৎ অবস্থান রচনাটিকে অসাধারণত্ব-মণ্ডিত করিয়াছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'লিপিকা'র কোন কোন প্রস্তাব ছাড়া উৎকর্ষের এত উচ্চমান রবীন্দ্র-নাথের আর কোন গদ্যরচনায় উদাহৃত হয় নাই। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নিছক ভাবোচ্ছ্বাসতরঙ্গিত, 'লিপিকা'তে ভাবোদ্বেলতার গদ্য-পদ্যের সীমালোপী প্লাবন-বিস্তার; কোথায়ও মনন-সংযম বা গভীর চিন্তার প্রতিরোধী নিয়ন্ত্রণ সেরূপ পরিস্ফুট নহে। 'পঞ্চভূত'-এ যেমন একদিকে বিষয়বৈচিত্র্য, তেমনি অপর দিকে গূঢ়ানুপ্রবেশী ও ত্বরিতসঞ্চরণশীল মননক্রিয়ার সহিত সূক্ষ্ম-অনুভূতিমূলক সৌন্দর্য-সুষমার অপরূপ সমন্বয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রগদ্যে বিষয়ের প্রতি অত্যধিক মনো-যোগ যে অতিবিস্তারপ্রবণতার উদ্রেক করিয়া শিল্পসুষমিতির বিঘ্ন ঘটায়, এখানে আলোচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য, নানা বক্তার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীপ্রভাবিত উক্তিপরম্পরা-সন্নিবেশ ও যবনিকাক্ষেপের শিল্পকৌশল তাহা প্রতিরোধ করিয়াছে। 'পঞ্চভূত'এ রবীন্দ্রগদ্যশিল্প, তথা সমগ্র বাংলাগদ্যের ক্রমবিকাশ এক পরম সৌন্দর্যময় পরিণতির শিখরদেশে পৌছিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রবীন্দ্রগদ্যের দ্বিতীয়পর্ব—সামাজিক ও রাজনৈতিক রচনা

১৮৮৮—১৮৯৪ (১২৯৪-১৩০১)

১

এই দুই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যেই রবীন্দ্রমানসের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথমতঃ লেখক এই আলোচনার মধ্যে তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী মন, অকুণ্ঠিত বাস্তববোধ ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সমাজনীতি ও রাজনীতি উভয়ত্রই তিনি তথাকথিত জাতীয়তার মোহে কোন ভাবপ্রবণ, আত্মদোষ সম্বন্ধে অন্ধ, প্রচলিত প্রথার গুণানুকীর্তনে মুগ্ধ, পরিছিদ্রান্বেষণতৎপর মনোভাবের প্রশ্রয় দেন নাই। বরং প্রাচীন সমাজ-আদর্শের রমণীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার কবিমন সৌন্দর্যকল্পনায় মাঝে মধ্যে অভিভূত হইয়াছে ও তাঁহার কঠোর যুক্তিবাদনিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার সৌন্দর্যস্বপ্ন টুটিয়াছে ও তিনি আমাদের প্রাচীন আদর্শের আধুনিক জীবন-প্রয়োজনের সহিত অসামঞ্জস্যের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার মনে যে এ বিষয়ে একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহা তিনি সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারেন নাই। 'স্বদেশ'-এর অন্তর্গত 'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধটিতে (১২৯৮) আমাদের প্রাচীন জীবনযাত্রার যে অপূর্ব কাব্যব্যঞ্জনাময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে ও উহার শান্ত, স্থির আদর্শের আশ্রয়ে সমস্ত অহেতুক পরিবর্তনস্রোত হইতে সুরক্ষিত একনিষ্ঠতার যে ভাবোচ্ছ্বসিত প্রশস্তি রচনা করা হইয়াছে তাহাতে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবনের জয় ঘোষিত হইলেও লেখকের ইহার প্রতি মমতাময় স্নেহপক্ষপাতের ইঙ্গিতটি সহজেই ধরা যায়। তথাপি সমাজচিন্তাতেও লেখকের প্রবলতর আকর্ষণ যে আধুনিক প্রগতিশীল জীবনাদর্শের অনুসরণে ও যুগোপযোগী কর্মধারার নির্দেশপালনে, সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। আরও কিছুদিন পরে 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি প্রবন্ধসংগ্রহে লেখক যেরূপ অকুণ্ঠচিত্তে প্রাচীন ভারতীয় জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার মানস পরিণতির বর্তমান স্তরে তাহার পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও আত্মোন্নতিমূলক কর্মানুষ্ঠানেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গোড়া হইতেই আত্মনির্ভরশীলতার পক্ষপাতী

ও বৃথা আবেদন-নিবেদন ও শাসকগোষ্ঠীর তিক্ত সমালোচনার প্রতি একান্ত আস্থাহীন। এমন কি তাঁহার সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধেও—'নব্য বঙ্গের আন্দোলন' (ভারতী, আশ্বিন ১২৯৬) তাঁহার এই মতবাদ তীক্ষ্ণশ্লেষাত্মক যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইংরাজ ভারতবাসীর প্রতি যে অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করে, তাহার প্রকৃত মূল নিহিত আছে আমাদের নিজেরই সামাজিক জীবনের পীড়ন ও আত্মাবমাননায়। আমরা নিজেরা নিজেকে অপমান না করিলে ও পরস্পরের প্রতি আচরণে প্রখর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় দিলে ইংরাজ কখনও আমাদের লাঞ্ছনা করিতে সাহসী হইত না। ইংরাজের বিচারালয়ে ন্যায়বিচারের কোন আশা নাই; সংবাদপত্রে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া কোন সার্থকতর প্রতিবিধান হইতে বিরত থাকিলে ইংরাজের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সুতরাং তিনি একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়াছেন, যাহা কেবল বাস্তবসম্পর্কহীন আদর্শবাদীর পক্ষেই সম্ভব। তিনি বাঙালীকে শক্তি ও আত্মসম্মানের চর্চা করিতে উপদেশ দিয়াছেন ও যে পর্যন্ত এই চর্চার ফলে আমাদের প্রকৃতিগত জড়তা ও নিশ্চেষ্টতা দূর না হয় সে পর্যন্ত ইংরাজের সংসর্গ পরিহার করিতে বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বা তাঁহার ন্যায় অভিজাতশ্রেণীর ব্যক্তির পক্ষে জীবিকার্জনের নির্মম তাড়নায় ইংরাজের বাধ্যতামূলক সাহচর্যের প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাদের পক্ষে এই অসহযোগ নীতি পালন করা কেবল মানসিক দৃঢ়তার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যে হতভাগ্য কুলির সাহেবের পাখা না টানিলে চলে না, অথবা যে বহুসংসারজর্জরিত কেরানীকে সাহেবের অফিসে দৈনিক হাজিরা দিতে হইবেই তাহার পক্ষে এই অজ্ঞাতবাসে শক্তিসঞ্চয় বিশেষ কোন আশার উদ্রেক করিবে না। তাহাদিগকে অপমান হজম করিয়া ও মর্মবেদনার অশ্রুজল গোপন করিয়াই অপমানের পুনরাবৃত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। জাতীয় আত্মসম্মানবোধের ভাণ্ডার পূর্ণ না হইলে এই অসহায় ব্যক্তিগুলি তাহাদের ব্যক্তিগত ভীরুতার অভাব মিটাইতে পারিবে না। যাহা হউক তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য তাহাদের ব্যবস্থাপনার অমোঘতার জন্য নয়, তাঁহার ক্ষুব্ধ আবেগের শক্তিমান প্রকাশে, তীক্ষ্ণ শ্লেষ-ব্যঙ্গের ক্ষুরধার নৈপুণ্যে ও সর্বোপরি তাঁহার জাতীয় চরিত্রনীতির উপর অক্ষুণ্ন আস্থাবোধে।

২

সামাজিক প্রবন্ধ

মননদীপ্তি, তত্ত্বপ্রতিপাদনের গভীরতা ও ভাবাবেগস্ফুরণের দিক দিয়া সামাজিক প্রবন্ধগুলিরই শ্রেষ্ঠত্ব। ইহাদের সহিত তুলনায় রাজনৈতিক আলোচনাগুলির চিরন্তন অপেক্ষা সাময়িক মূল্যই বেশী। 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটি (১২৯৪) ও 'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত' (১২৯৮) হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও নিরামিষ আহারের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর মতখণ্ডন-চেষ্টা দ্বারা অনুপ্রাণিত; লেখকের নিজের কোন মতপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইহাদের মধ্যে ততটা লক্ষণীয় নয়। তরুণ লেখকের উৎসাহাধিক্য চন্দ্রনাথবাবুর ভাবাদর্শ-প্রসূত, তথ্য ও যুক্তিবিরোধী, প্রচলিত বিশ্বাসের দুর্বলতাকে ঐতিহাসিক মানদণ্ডের প্রয়োগে উদ্‌ঘাটিত করার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। হিন্দু বিবাহের আধ্যাত্মিকতা হইতে একান্নবর্তী-পরিবার, অভিভাবকদের নির্দেশ-অনুযায়ী পত্নীনির্বাচন, বাল্যবিবাহের দোষগুণ প্রভৃতি নানা বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে আসিয়া পড়িয়া প্রবন্ধটির কলেবর অপরিমিতভাবে স্ফীত করিয়াছে ও গদ্যরচনার অন্যতম প্রধান গুণ বাক্‌সংক্ষেপের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। চন্দ্রনাথবাবু হিন্দু বিবাহের অতীত মহনীয় আদর্শ ও তৎকালীন সমাজোপযোগিতার উপর নির্ভর করিয়াই উহার গুণগান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যুগপরিবর্তনের ফলে উক্ত প্রথার মধ্যে যে আদর্শবিকৃতি ঘটিয়াছে ও নূতন যুগের সমাজপ্রয়োজনের সহিত উহার অসামঞ্জস্য যে অধিকতর প্রকট হইতেছে তাহা নির্মমভাবে দেখাইয়া এই আত্মতুষ্টির ভাবকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। চন্দ্রনাথবাবু যে এরূপ আধুনিক-অস্ত্র-শস্ত্রসমন্বিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তাহা সহজেই বোঝা যায়। লেখক কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুকে যতটা ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন তাঁহার এই পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী, তথ্যযুক্তিকণ্টকিত, যাহা সূক্ষ্মপ্রমাণসাপেক্ষ ও যাহা সহজ বুদ্ধিতে জলবৎ প্রতীয়মান এই উভয়বিধ বিষয়ের নির্বিচার সংমিশ্রণে বিপুলকায় প্রবন্ধের পাঠককেও তদপেক্ষা কম ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন মনে হয় না।

'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত' প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সেইজন্য পাঠকের রুচিকর। রবীন্দ্রনাথ এখানেও নিরামিষ আহারের দ্বারা যে আধ্যাত্মিকতা পুষ্টিলাভ করে এই সিদ্ধান্তে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কর্মশক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও কল্যাণকর নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার বিকাশ।

প্রবৃত্তির উৎসাদন নয়, হিতকর প্রয়োগই জীবনে কাম্য। ব্রাহ্মণ্য আদর্শই কোন সুস্থ সমাজের সর্বাঙ্গীণ আদর্শ নয়—নানা বৃত্তির অনুশীলনে, নানা কর্মের সংঘাতে জীবনের পরিপূর্ণতা আসে। আহারের সংযমই যে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেণীর সাধনা ছিল তাহা মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ বিষয়ে শাস্ত্রনির্দেশ অপেক্ষা বিজ্ঞানের নির্দেশই অধিক প্রামাণ্য। মোটের উপর রবীন্দ্রনাথের আক্রমণের বিষয় নিরামিষ আহারের শ্রেষ্ঠত্বসম্বন্ধীয় নয়, উহা প্রধানতঃ চন্দ্রনাথবাবুর অবলম্বিত রীতি ও তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমতকে আপ্তবাক্যের ন্যায় প্রামাণ্য সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার দম্ভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অপ্রমাণিত বিশ্বাসকে সার্বভৌম সত্য বলিয়া চালাইতে গেলে যে যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ অপরিহার্য তাহাই এই প্রবন্ধের যথার্থ প্রেরণা। আহারের সংযমই যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংযমপালনের ভিত্তি রচনা করিতে পারে এবং এইখানেই যে ইহার প্রকৃত মূল্য ও সম্ভাবনা তাহা চন্দ্রনাথবাবু বা রবীন্দ্রনাথ কেহই আলোচনা করেন নাই।

'আচারের অত্যাচার' ও 'সমুদ্রযাত্রা' (সমাজ, ১২৯৯) হিন্দুসমাজের আচারমূঢ়তার প্রতিবাদজ্ঞাপক প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য হইতেছে যে আচারের শুদ্ধতার প্রতি অতি-মনোযোগ অনেক সময় আমাদের আসল ধর্মনীতির প্রতি আনুগত্যকে শিথিল করে। আচার-পালনই যে ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য ও আচারনিষ্ঠ ব্যক্তি যে ধর্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও ধার্মিকপদবাচ্য হইতে পারে এইরূপ ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়। আচারের অতি সতর্ক অনুশাসনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমরা স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত ধর্মবোধস্ফুরণের মূল্যের কথা ভুলিয়া যাই। পশুদের ন্যায় মানুষের সহজ অভ্রান্ত সংস্কার নাই—সে ভুল-ভ্রান্তি ও পরীক্ষার মধ্য দিয়াই তাহার সত্যপথ আবিষ্কার করে। মানুষের জীবনের অপরিমেয় বিস্তার আছে বলিয়াই তাহার ভুল-ভ্রান্তি করিবার প্রচুর অবসর আছে। ধর্মে যান্ত্রিক বুদ্ধির প্রাধান্যই লোকাচার-প্রভাবের মূল কারণ। প্রবন্ধটি সুলিখিত ও স্বল্প পরিসরে সমাপ্ত বলিয়া পাঠকের চিন্তাশক্তিকে পীড়িত না করিয়া উদ্রিক্ত করে।

'সমুদ্রযাত্রা' প্রবন্ধটিও শুধু শাস্ত্রবিধি নয়, লোকাচারও যে আমাদের স্বাধীন বুদ্ধিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়াছে তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছে। লোকাচারকে শাস্ত্রবিধি-উদ্ধারের সাহায্যে আক্রমণ প্রকৃতপক্ষে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। শাস্ত্রও অতীতকালের লোকাচার; লোকাচার নামে অভিহিত শাস্ত্রসমর্থনহীন

প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের প্রবর্তন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ লোকাচারের মূলে এক কালে বাস্তবপ্রয়োজনগত প্রেরণা ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই প্রগতিশীল লোকাচারও জীর্ণ, যুগপ্রয়োজননিঃসম্পর্ক প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এই যুগের অনুপযোগী প্রথার উচ্ছেদ করিতে হইলে আরও অতীত প্রথার দোহাই না পাড়িয়া স্বাধীন যুক্তির প্রয়োগই বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার বাধা ছিল না; পরবর্তী দেশাচারে সেই বাধা আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ভ্রান্তিকে সংশোধন করিবার জন্য প্রাচীনতর যুগের সমর্থন খোঁজা কি যুক্তির বিপরীত প্রয়োগ নয়? সুখের বিষয়, ইংরাজী মুক্তবুদ্ধির হাওয়া ও যুগপ্রয়োজনের অদম্য তাগিদ শাস্ত্র ও লোকাচার উভয়বিধ বাধাই ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজ স্বাধীন বিচারপ্রয়োগের পথকে উন্মুক্ত করিয়াছে।

ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে এই সমস্ত সমাজপ্রথাবিষয়ক প্রবন্ধ, যাহা এককালে আগ্নেয়গিরির ন্যায় প্রচুর অগ্নিবৃষ্টি ও ধূম্র উদ্গীরণ করিত, এখন নিস্তেজ নিরুত্তাপ হইয়া সমস্ত বিতর্কমূলক উত্তেজনার বাহিরে সার্বভৌম উপেক্ষার শীতল সমাধি-শয়নে বিলীন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রেরণার জ্বলন্ত অগ্নিশিখা চিরনির্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (সমাজ, ১২৯৮), 'রমাবাঈ-এর বক্তৃতা উপলক্ষে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) ও 'মুসলমান মহিলা ও প্রাচ্য সমাজ' (সমাজ, পরিশিষ্ট, ১২৯৮) —এই প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য সমাজে নারীর মর্যাদা ও জীবনযাত্রায় সন্তোষ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা। পাশ্চাত্ত্য সমাজে সর্বসাধারণের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের ক্রমপ্রসার মানুষকে যন্ত্রবদ্ধ, বিশ্রামহীন শ্রমে শৃঙ্খলিত করিয়াছে। এই স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য গলদ্‌ঘর্ম প্রয়াস শ্রমিকের শ্রমযন্ত্রণাকে অসহনীয়রূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। মনে হয় মানুষের এই মর্যাদালোপ ও যন্ত্রপরিণতিই এক সামাজিক বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিবে। বিশেষতঃ জীবনযাত্রার এই অস্বাভাবিক বিপর্যয়ে ও তজ্জনিত পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রচ্যুতিতে স্ত্রীলোক আশ্রয়হীন হইয়া শান্তি ও আত্মপ্রসাদ হারাইতেছে। ইহারই ফলে স্ত্রীলোকের কেন্দ্রানুগ শক্তি ক্রমশঃ কেন্দ্রাতিগ প্রবণতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তাহাদের অধুনা যে রণচণ্ডী, সমাজ-বিধ্বংসিনী মূর্তি প্রকট হইতেছে তাহার মূল কারণ পারিবারিক সংহতির উন্মূলন ও পরিবার-জীবনের স্থির আশ্রয়চ্যুতি।

ইহার সহিত তুলনায় ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান অধিকতর শান্তিময় ও

মর্যাদাপূর্ণ। পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকেরা আমাদের সংসারের ছোটখাট দারিদ্র্য ও অভাবের চিহ্নগুলিকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিয়া এই আরামহীনতায় ও কুশ্রী পরিবেশে কেহ স্বস্তি উপভোগ করিতে পারে না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। কিন্তু আমাদের দেশে স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত মানসিক শান্তির ও জীবনোপভোগের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ইউরোপীয়দের এই সমবেদনা অশ্রুজলের অপব্যয় মাত্র। আমাদের বিবাহ আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন করে কি না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ইহা যে আমাদের নানা অভাব-অপমানের জ্বালার মধ্যে একটি স্নিগ্ধ শান্তিকুঞ্জ রচনা করে তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

বিলাতী Old maid-এর সঙ্গে তুলনায় আমাদের বালবিধবারা শূন্যতাবোধের দ্বারা কম পীড়িত হন ইহা সুনিশ্চিত। Old maid সময় কাটাইবার কোন সদুপায় না দেখিয়া নানাবিধ খেয়ালের প্রশ্রয় দেন ও নানা অকাজে শূন্যতাপূরণের অবসর খোঁজেন। পক্ষান্তরে হিন্দু বালবিধবারা সংসারজীবনের সহিত স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে আজীবন যুক্ত থাকেন ও তাঁহাদের স্নেহবাৎসল্যরসের পরিপূর্ণ তৃপ্তিসাধনের পর্যাপ্ত সুযোগ পান। মনে হয় এখানে বালবিধবার প্রতি এই সংসারাধিষ্ঠাত্রী স্নেহপ্রতিমা দেবীর মহিমা-আরোপে রবীন্দ্রনাথ খানিকটা ভাববিলাস দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন। ইহাই বালবিধবার যথার্থ চিত্র হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের কোন ন্যায়ানুমোদিত প্রেরণা থাকিত না।

এখানে লেখক খানিকটা প্রসঙ্গচ্যুত হইয়া বিপরীত দিকের কথাও বলিয়াছেন। বাঙালী সংসারে গৃহের কাজ বিপুল হইয়া নারীর ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করিতেছে—সংসারের সেবায় সমর্পিতপ্রাণ হইয়া আমরা কেহই সংসারাতীত বৃহত্তর মনুষ্যত্বের বিকাশে সমর্থ হইতেছি না। আর দ্বিতীয়তঃ একান্নবর্তী পরিবারের ক্রমবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নারী-চরিত্র ও কর্তব্যেরও কিছু অপরিহার্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। নারীকে আর কেবল স্নিগ্ধগুণপ্রধানা, গৃহকল্যাণ-বিধায়িনীরূপে দেখা দিলে চলিতেছে না। শিক্ষা-দীক্ষা ও মানস অভ্যাসের দিক দিয়া তাহার পুরুষের সহযোগিনী-রূপে আবির্ভূত হইবারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তবে ইউরোপীয় গৃহজীবন হইতে আমাদের গৃহজীবন যে এখনও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ তাহা নিঃসন্দেহ। সেখানে গৃহজীবন ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্লাবজীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও আমাদের পরিবার-বৃদ্ধির অনুপাতে সেখানে আরামবৃদ্ধি

হইতেছে। আমাদের দেশে বড় জোর "স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে"—এবং এই ভাবে বরকন্যার রুচি ও শিক্ষার অসামঞ্জস্যের জন্য ঘরে ঘরে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে অবস্থা আরও ভয়াবহ। "আমরা বলি যাবৎ দারপরিগ্রহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্ধেক, ইংরেজ বলে যতদিন একটি ক্লাব না জোটে, ততদিন পুরুষ অর্ধেক।" সেখানে সংসার-মৌচাক ভাঙ্গিয়া গিয়া রাণী মধুমক্ষিকা স্বয়ং মধু-উপার্জনে বহির্গত হইয়াছে।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রগাঢ় চিন্তাশীল মন্তব্য সংযোজনা দ্বারা সমস্ত আলোচনাটিকে একটি উন্নততর পর্যায়ে আরূঢ় করিয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছেন যে ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের মানস রূপান্তর সাধিত হইয়া আমাদের ভারতীয় প্রকৃতিরই একটি সুসমঞ্জস বিকাশ ঘটিবে। যাঁহারা আশঙ্কা করেন যে আমরা ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ বনিয়া যাইব তাঁহাদের আশঙ্কা যে অমূলক তাহা তিনি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাঙলার মাটিতে ইংরাজি বীজ বপন করিলে খাঁটি ইংরাজি শস্য জন্মিবে না, কেননা জলহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্যের ক্রিয়া লুপ্ত হইবে না। যুক্তি অপেক্ষা দৃষ্টান্তটি আরও চমৎকৃতিপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম অনেকটা পাশ্চাত্ত্য জাতির প্রকৃতিবিরোধী; সুতরাং পাশ্চাত্ত্য চরিত্রে খৃষ্টান নৈতিক আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই। ইউরোপীয় শক্তির সহিত প্রাচ্য ধর্মাদর্শের ক্ষমা মিশিয়া যায় নাই। কিন্তু এই প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্যহীন আদর্শ খৃষ্টান জাতিসমূহের অন্তর্জগতে যে গুরুতর ভাবালোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাদের কাব্য-সাহিত্যে, উহাদের জীবনসমীক্ষায়, উহাদের ভাবুকতায় খৃষ্টান আদর্শের দান অপরিসীম। হয়ত উহাদের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়গত আচরণ খৃষ্টধর্মের ভাবসৌকুমার্যের দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয় নাই, কিন্তু উহাদের চিন্তা ও সৃষ্টিপ্রেরণা, উহাদের উচ্চতর ভাবজীবনের উপর খৃষ্টধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট ও অনপনেয়। বাঙালী জীবনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব অনেকটা ঐ জাতীয়ই হইবে আশা করা যায়। আমাদের সনাতন প্রবণতাগুলি এই নবভাবপ্রবাহের দ্বারা নিগূঢ়ভাবে সঞ্জীবিত হইয়া আরও শক্তিশালী হইবে ও আমরা প্রাচীন ও নবীন আদর্শের সমন্বয়ে এক নূতন যুগোপযোগী ও ঐতিহ্যসম্মত জীবনাদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত হইব। দুঃখের মধ্যে 'স্বদেশী সমাজ' ও 'ভারতবর্ষ'-এ প্রকাশিত আশার ন্যায় রবীন্দ্রনাথের এ আশাও এ পর্যন্ত সফল

য় নাই। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ এ পর্যন্ত আমাদের প্রাচীন আদর্শে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে অক্ষম হইয়াছে।

'রমাবাঈ-এর বক্তৃতা উপলক্ষ্যে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) একটি পত্র-প্রবন্ধ। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় মহিলা রমাবাঈ-এর বক্তৃতায় নারী ও পুরুষের শক্তি-সামর্থ্যের অভিন্নতা সম্বন্ধে যে দাবী করা হইয়াছে তাহারই মৃদু প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। সন্তান-ধারণ ও পালন ব্যাপারে স্বয়ং প্রকৃতি নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কর্মবিভাগ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহা উল্টাইবার কোন উপায় নাই। সুতরাং নারীকে জীবনের কিছুটা অংশ অন্ততঃ গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকিয়া পুরুষের উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে। এই বাধ্যতামূলক পুরুষ-সহায়তা নারী যদি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে ও উহাকে একটা প্রীতিপ্রদ মানস সংস্কারে পরিণত করে তবে সংসারের সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে ও বৃথা বিক্ষোভে পারিবারিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয় না। প্রকৃতি-বিধানকে সানন্দ স্বীকৃতি দেওয়া ও অন্তরের সমর্থনে উহাকে স্বভাবসুন্দর করিয়া তোলাই গার্হস্থ্য নীতির আদর্শ হওয়া উচিত। এ প্রবন্ধে নূতন কথা বিশেষ নাই, তবে প্রাচীন প্রথার ও চিরাচরিত সম্পর্কেরই অন্তর্নিহিত শোভনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

'মুসলমান মহিলা ও প্রাচ্যসমাজ' (সমাজ, পরিশিষ্ট, ১২৯৮) প্রবন্ধ দুইটিতে তুরস্কদেশে মুসলমানসমাজে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অমানুষিক শাস্তির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে ও এই বর্বর প্রথা যে মুসলমান ধর্মের ফল নয় বরং ঐ ধর্মের প্রভাবে নারীসমাজের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নসাধনের চেষ্টাই হইয়াছে, আমীর আলি কর্তৃক উপস্থাপিত এই মতবাদের আলোচনা হইয়াছে। আমীর আলি স্বীকার করিয়াছেন যে ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠাতা তৎকালপ্রচলিত নারীর অমর্যাদাকর সমাজপ্রথার সম্পূর্ণ সংস্কার করিতে পারেন নাই, রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাঁহাকে এই কু-প্রথার সহিত কতকটা আপোস করিতে হইয়াছিল। মহম্মদের আরব্ধ সংস্কার সম্পূর্ণ করার মত আর কোন শক্তিশালী নেতা আবির্ভূত না হওয়ায় এখনও মুসলমান সমাজে নারীমর্যাদা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই যুক্তিধারা আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন যে প্রাচ্য সমাজে ধর্মাচরণের দ্বারা এমন কোন প্রাণশক্তি জাগ্রত হয় না যাহাতে উহা যুগসঞ্চিত বিকারগুলিকে সমাজদেহ হইতে উৎসাদিত করিতে পারে। ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা এক ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষের পর যে পর্যন্ত আর একজন মহাপুরুষ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লইয়া আবির্ভূত না হন সে পর্যন্ত এই দুষ্কৃতগুলি অব্যাহতভাবে বিষক্রিয়া

বিস্তার করিতেই থাকে। ধর্মের অনুশীলন আমাদের মধ্যে এমন কোন স্বয়ংক্রিয় শক্তির উন্মেষ ঘটায় না যাহা নিজ স্বাধীন প্রভাবে আত্মশুদ্ধিতে সক্ষম। এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত ও সূক্ষ্ম চিন্তার পরিচয়বাহী।

'আদিম সম্বল' (সমাজ, পরিশিষ্ট, ১২৯৯) একটি সংক্ষিপ্ত ও তাড়াহুড়া করিয়া শেষ করা প্রবন্ধ। তথাপি ইহাতে একটি মূল প্রশ্ন খুব দৃঢ়তার সহিত উপস্থাপিত হইয়াছে। নবজীবনে প্রবিষ্ট জাতি কতকগুলি দৃঢ় নীতিসংস্কারকে জীবনপথের পাথেয় করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিবে। পুরাতন জীর্ণমূল বিশ্বাস বা সতর্কতামূলক, পোড়-খাওয়া জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত সুবিধাবাদ তাহাকে অগ্রগতির প্রেরণা দিবে না। আমরা প্রাচীন হিন্দুজাতি পদে পদে হোঁচট খাইয়া, সংসার-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নবীন জাতিসুলভ আদর্শবাদে আস্থা হারাইয়াছি ও সাংসারিক বিজ্ঞতাকে একমাত্র কার্যকরী নীতিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ উদীয়মান জাতির নিয়ামক শক্তি তাহাদের প্রতি আমরা মুখে আনুগত্য প্রকাশ করি, কিন্তু কার্যতঃ লাভক্ষতির খাদ মিশাইয়া উহাদের প্রয়োগ করি। এই আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতা ও অবিমিশ্র আদর্শবাদে অশ্রদ্ধা আমাদের জরাজীর্ণতারই নিদর্শন। কিন্তু এখন যদি আমাদিগকে নূতন জাতিগঠন করিতে হয়, নবসৃষ্টির স্বপ্ন যদি আমরা অন্তরে পোষণ করি তবে স্থবির জাতির নৈরাশ্যক্লিষ্ট অভিজ্ঞতার রোমন্থন ত্যাগ করিয়া আবার আমাদিগকে তরুণোচিত উৎসাহ-উদ্দীপনা-আশাবাদের অনুশীলন করিতে হইবে। "যেখানে যুক্তির স্বাভাবিক অধিকার সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন যেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা-রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি।" এই অপূর্ব বাগ্মীতার উচ্ছ্বাসে যুক্তিকে অভিষিক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচীন, অভিজ্ঞতার ভারে ক্লিষ্ট জাতিকে নবযৌবনের অভীমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন ও আমাদের বলিকুঞ্চিত ললাটে যৌবনের রাজটীকা মুদ্রিত করিয়াছেন।

'কর্মের উমেদার' (সমাজ, পরিশিষ্ট, ১২৯৮) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন সম্ভাবনাকে রূপ দিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে ইউরোপের স্বাধীনতাপ্রিয় শ্রমিকসম্প্রদায় কখনই যন্ত্ররাজত্বের দাসত্ব স্বীকার করিবে না। বরং ভারতীয়েরা যে ভাবে যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত তাহাতে তাহারাই এই ক্রমপ্রসারশীল যন্ত্রশিল্পের দাবী মিটাইতে, যন্ত্রের যূপকাষ্ঠে আত্মবলিদান দিতে, প্রস্তুত থাকিবে। সুতরাং

ইউরোপীয় কল-কারখানা ভারতীয় মজুরের সর্বতোমুখী বশ্যতাস্বীকারের সাহায্যে চালু থাকিবে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শ্রমশিল্পের ইতিহাস এই আশঙ্কার পোষকতা করে নাই। ইউরোপের শ্রমিক দৃঢ়সংঘবদ্ধ হইয়া মিল-মালিকের বিরুদ্ধে নিজ মানবিক অধিকার ও আরাম, স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভারতীয় মজুরও পাশ্চাত্ত্য শ্রমিকের অনুসরণে নিজ দাবী-দাওয়া বাড়াইতেছে, এমন কি কখনও কখনও অত্যধিক দাবীর দ্বারা ধনিককে বিব্রত করিতেছে। সুতরাং লেখকের আশঙ্কা সত্য হওয়া দূরে থাকুক, কল-কারখানার শ্রমিকসংঘ বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত হইয়া তাহাদের মানবিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতেছে। গ্রামীণ শ্রমিকের জীবনে যন্ত্রবদ্ধতা কল-কারখানার মজুর অপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবশীল।

'শোকসভা' (আধুনিক সাহিত্য, পরিশিষ্ট, জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব মনীষাসম্পন্ন রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে যে শোকসভার আয়োজন করা হয় তাহাতে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয় কোন কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি ছিল যে শোক-সভায় শোকপ্রকাশের যে কৃত্রিম প্রথা তাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের মর্যাদা রক্ষিত হইবে না। সুতরাং তাঁহারা শোকের মহান গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা নষ্ট হইবার আশঙ্কাতেই শোকপ্রকাশের এই পদ্ধতির প্রতি অসমর্থন জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই অসম্মতির যুক্তিগুলির উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি লেখেন। ইহাতে তাঁহার বিষয়টিকে নানা দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিবার আশ্চর্য মানস স্থিতিস্থাপকতা, নানা যুক্তিসমাবেশে সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠার অপূর্ব নৈপুণ্য উদাহৃত হইয়াছে। সর্বশেষে তিনি আলোচনাটিকে এক সার্বভৌম ভাবসমুন্নতির সমুচ্চ শিখরে উন্নীত করিয়া একটি সাধারণ, নব-প্রবর্তিত প্রথার গভীরতর তাৎপর্যটি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে গুরুজনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ শুধু ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের প্রশ্ন নয়, ইহা একটি অবশ্য-পালনীয় সামাজিক কর্তব্যও বটে ও সমাজনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ উপায়ে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কাজেই শ্রাদ্ধ ব্যাপারটি শুধু শোকাভিভূত পরিবারে বেদনার উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, সামাজিক কর্তব্যরূপে উহার অনুষ্ঠানবিধি কঠোর অনুশাসন-নিরূপিত। ইহার মধ্যে যদি কিছু কৃত্রিমতা থাকে তবে তাহা সামাজিক স্থায়িত্ব-বিধানের একটি আবশ্যিক উপাদান। মানুষের সমাজ-জীবনের বিবর্তন বহুলাংশে কৃত্রিম সংগঠনরীতির

প্রভাব হইতে উৎপন্ন; স্বভাবের পায়ে হিতকর প্রথার পাদুকা না পরাইলে উহা দীর্ঘপথভ্রমণের শক্তি লাভ করে না। সুতরাং কোন প্রথাকে কৃত্রিম বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না; উহা প্রয়োজনীয় কি না তাহাও দেখিতে হইবে। এমন কি জীবনের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা নিগূঢ় সম্বন্ধ—ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধ—তাহাকেও প্রথাবদ্ধ রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়।

সম্প্রতি আমাদের দেশে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যবর্তী স্তরে জনসাধারণ নামে একটি সংস্থার উদ্ভব হইয়াছে ও আমাদের সামাজিক কর্তব্যের তালিকায় জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যও নব-সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা নিজ পরিবার ছাড়াও সাধারণের হিতসাধন করিয়া যশোলাভ করেন, তাঁহাদের প্রতি ঋণস্বীকার ও শ্রদ্ধানিবেদনের মধ্যে জনসভায় তাঁহাদের প্রশস্তিজ্ঞাপনের একটি নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সাধারণের নিকট যাঁহারা জনহিতৈষী মনীষীর অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাদের একটি অপরিহার্য কর্তব্য আছে—তাঁহাকে ইহাদের নিকট সমগ্রভাবে পরিচিত করিয়া দেওয়া ও তাঁহার জীবনী ও রচনার পটভূমিকা ও তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত করা। এই কর্তব্যপালনে অস্বীকৃতি তাঁহাদের অমার্জনীয় ত্রুটি বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য। হয়ত এই জনসাধারণ লঘু ও চপলমতি ও উহার শোকাবেগ খুব গম্ভীর বা আন্তরিক নয়। তথাপি মনীষী সম্বন্ধে ইহাদের যে কৌতূহল তাহা প্রশংসনীয় মনোভাব ও তাহা পূর্ণ করিবার দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

আমাদের দেশে যেখানে সাহিত্যসমাজ সেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত নহে ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকের সহিত গুণগ্রাহীদের মিলনের সুযোগ অত্যন্ত অল্প, সেখানে এই দায়িত্ব আরও গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাজ্য। প্রখ্যাত সাহিত্যিকের জীবনের সহিত পরিচিত না থাকিলে তাঁহার সাহিত্যরসোপভোগও অসম্পূর্ণ থাকে। সুতরাং সাহিত্যরসপ্রসারের জন্যও সাহিত্যিকের জীবনকথা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করা প্রয়োজন। কর্তার সহিত কর্মকে সংযুক্ত করিয়া না দেখাইলে কর্মের পূর্ণ আবেদন হৃদয়ে অনুভূত হয় না।

এই সমস্ত কর্তব্যপালনের জন্য যাঁহারা লেখকের বন্ধুস্থানীয় তাঁহাদের সহযোগিতাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। তাঁহারাই কেবল মৃত মনীষীর জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করিয়া লেখকের ব্যক্তিজীবনের প্রতি অপরিচিত অনুরাগীগোষ্ঠীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতারস সঞ্চার করিতে ও তাঁহাদের গ্রহণশক্তিকে উদ্দীপ্ত করিতে

পারেন। প্রস্তরমূর্তি অপেক্ষা বন্ধু কর্তৃক অঙ্কিত আলেখ্য আমাদের মনে আরও গভীরভাবে মুদ্রিত হয়।

মহৎ ব্যক্তির জীবিতকালে পরিচয় নানা ক্ষুদ্র ও সাময়িক ঘটনা দ্বারা খণ্ডিত। কিন্তু মৃত্যুর পটভূমিকায় সেই জীবন সমগ্রতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ তাঁহার স্বরূপদ্যোতনার জন্য তাঁহার জীবনের অতিসন্নিহিত আবিল বায়ুস্তরে মহিমারশ্মিরেখা বিকৃত ও অতিরঞ্জিতরূপে দেখা দিতে পারে, কি মৃত্যুর ব্যবধান সমস্ত আবহকে নির্মল করিয়া যথাযথ সত্যনিরূপণে সহায়তা করে। এখানে রবীন্দ্রনাথের উপমাটি চমৎকার হইলেও সর্বথা গ্রহণযোগ্য কি না সন্দেহ হয়। কেননা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে আবেগের আতিশয্য, যে অশ্রুবাষ্পোচ্ছ্বাস আমাদের দৃষ্টিকে আবিল করে তাহা আমাদের বিচারবুদ্ধির স্বচ্ছতাকেও সমপরিমাণে আচ্ছন্ন করে। মরণোত্তর দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালব্যবধান-সাপেক্ষ। অন্ততঃ শোকসভায় যে স্বাভাবিক অত্যুক্তিপ্রবণতা আমাদের মনোবেদনার একটি অনিবার্য অভিব্যক্তিরূপে শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রত্যাশাপূরণ করে তাহা অপ্রমত্ত মূল্যবিচারের ঠিক অনুকূল অবসর বলিয়া মনে হয় না।

সর্বশেষে, প্রতিভা লোকের মনে স্বভাবতই অনধিগম্য জ্যোতিষ্কলোকে সমাসীন থাকে। মানবসমাজের সহিত উহার শেষবন্ধন ছিন্ন করিয়া উহাকে অমরধামে প্রতিষ্ঠিত করে। কাজেই উহার দৃষ্টান্ত আমাদের অনায়ত্ত আদর্শরূপে অননুকরণীয়ই থাকে। প্রতিভাবান ব্যক্তিকে মানবের নিকট আত্মীয়রূপে উপস্থাপিত করা সেইজন্য মানবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। প্রতিভার এই মানবায়নে, উহার সহিত আমাদের সুখে দুঃখে আন্দোলিত মানবহৃদয়ের আত্মীয়তাবোধের উদ্দীপনে কেবল যাঁহারা তাঁহার নিগূঢ় দৈবশক্তি ছাড়াও তাঁহার সাধারণ মানবিক প্রকৃতির সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন সেই সুহৃদ্‌গোষ্ঠীই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রমনীষার ক্ষিপ্রকারিতা, ইহার নূতন নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে বিচার করিবার আশ্চর্য নৈপুণ্য, উহার যুক্তি-উদ্ভাবনকৌশল আমাদের মনকে বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করে ও এক অভাবনীয় তৃপ্তিরসে ভরিয়া দেয়। লেখক একটি সামান্য বিষয়কে কত সহজে অসামান্য করিয়া তুলিয়াছেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

'শিক্ষার হেরফের' (শিক্ষা, ১২৯৯) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্বন্ধীয় সর্বপ্রথম ও বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক বাঙলার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসঙ্কট-

বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে ও আবেগ ও মননের সার্থক সমন্বিত শক্তির সহিত তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের যৌক্তিকতা আরও বেশী কেননা তিনি এখানে কোন ভাবালুতাপ্রসূত সুলভ সমাধানের নির্দেশ দিয়া সমস্যার গুরুত্বের লাঘব করেন নাই। সাধারণতঃ তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই আমাদের উৎকট শিক্ষাসমস্যার প্রতিবিধান হইবে এইরূপ মত উপস্থাপিত করেন। এখানে কিন্তু সেরূপ সর্বরোগহর ঔষধের প্রতি তিনি বিশেষ আস্থা দেখান নাই। বাংলার শিশুশিক্ষার উপযোগী বইএর অভাব ও এই অভাব যে তাড়াতাড়ি পূর্ণ হইবার নহে তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। শিশুদের আনন্দদায়ক পাঠ-বহির্ভূত বই লেখাও বাংলায় সহজসাধ্য নয়। ইংরাজি ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উহার জন্য আমাদের আয়োজন ও প্রস্তুতির শোচনীয় অপ্রাচুর্য—ইহার কোনটিই তিনি অস্বীকার করেন নাই। শিশুর বিস্ময়োন্মুখ, প্রসারণশীল মনের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি দুইই অবিকশিত থাকিয়া যায়।

এই ত্রুটি ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জনের দ্বারাও সংশোধিত হইতে পারে না। পরবর্তী কালে আমরা কেহ কেহ ইংরাজি ভাল করিয়াই শিখি ও উহা হইতে আনন্দ-আহরণের শক্তি অর্জন করি। কিন্তু প্রথম তারুণ্যের উদার গ্রহণশীলতার যুগে যে স্বীকরণশক্তি বিকশিত হইল না তাহার ফল আমাদিগকে আজীবন ভোগ করিতে হয়। শিক্ষা আমাদের প্রকৃতির সহিত একাত্ম না হইয়া আমাদের জীবনে সার্থক প্রয়োগের দ্বারা অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণতি লাভ না করিয়া জীবনবিবিক্ত বাহ্য উপাদানরূপেই আমাদের সত্তার সহিত একটা শিথিল সংযোগ রক্ষা করে, অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বা দুর্ভর বোঝারূপে আমাদের স্বচ্ছন্দ গতির ছন্দোহানি ঘটায়। এই অনায়ত্ত জ্ঞানের বিপুল ভার আমাদের প্রকৃতিতে কোন সৃষ্টিধর্মিতার প্রেরণা জাগায় না বা জীবনে অনায়াস সুষমার সঞ্চার করে না। অসময়ের ধারাবর্ষণে কোন নবসৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয় না। আমাদের জীবন-প্রতিবেশ ও শিক্ষা-প্রতিবেশ এতই বিভিন্ন ও বিসদৃশ যে শিক্ষার আলোক জীবন হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

একবারমাত্র বঙ্কিমপ্রতিভার মায়াদণ্ডস্পর্শে বাঙালীর অন্তরের সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের একটি আনন্দময় সম্পর্কের সূচনা হইয়াছিল। বঙ্কিম তাঁহার 'বঙ্গদর্শন'-এ পরের বিদ্যাকে আমাদের ঘরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি অন্ততঃ জ্ঞান আত্মসাৎ করার ব্যাপারে বাংলা ভাষায় অপরিহার্য

সহযোগিতা বিষয়ে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষায় তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করাই যে তাঁহাদের পক্ষে যথার্থ সাহিত্যসাধনা এই সত্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু দীনা অথচ অভিমানিনী বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক প্রীতির পরিবর্তে যেন একটা মুরুব্বিয়ানাই বেশী প্রকট হইয়া উঠে। অনুশীলনের অভাবে বাংলা ভাষা তাঁহাদের অনভ্যস্ত হাতে নিজ প্রকাশশক্তির সম্যক্ পরিচয় দেয় না। কাজেই অনুগ্রহপ্রদর্শনকামী উচ্চশিক্ষিত বাঙালী লেখক ও অনুগ্রহ-কুণ্ঠিতা বঙ্গভাষার মধ্যে পূর্বরাগের অভাবে মিলনের পালা জমিয়া উঠে না। ফল হইয়াছে যে বাঙালীর ভাব, ভাষা ও জীবনের মধ্যে এক অনতিক্রম্য ব্যবধান স্থায়ী হইয়াছে। উহাদের পারস্পরিক সহযোগিতা দুরূহ হইতে দুরূহতর হইতে চলিয়াছে। কণ্ঠভরা পিপাসা ও অপেয় জলের মধ্যে কিছুতেই সামঞ্জস্যসাধন হইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও অনুযোগের তীব্রতা হয়ত এখন কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু তিনি যে সামগ্রিক বঞ্চনা ও ব্যর্থতার চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার সত্যতা স্বাধীনতা-লাভের পরেও অনস্বীকার্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষাসঙ্কট' নামে যে প্রবন্ধ 'ভারতী'-তে প্রকাশ করেন তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তররূপে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযোগী। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি' নাম দিয়া ১৩০০ সালে যে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন তাহাও খুব দুর্বল ও আত্মদোষক্ষালনে অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত। মনে হয় এই প্রবন্ধে লেখক যুক্তি অপেক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য ভুল বুঝার জন্য অনুযোগের উপর ও যে সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন। একটি চমৎকার প্রবন্ধের ইহা অত্যন্ত নৈরাশ্যকর উপসংহার।

৩

রাজনৈতিক প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে ইংরাজ ও ভারতীয়দের সম্পর্ক-বিকারের নানা দিক আলোচিত হইয়াছে। এই সম্পর্কবিকৃতির কারণ নির্দেশ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় চরিত্রের মূল পর্যন্ত তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছেন ও আশ্চর্য সমদর্শিতা ও অপক্ষপাত ন্যায়নিষ্ঠার সহিত এই অবাঞ্ছিত

পরিস্থিতির দায়িত্ব শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিভক্ত করিয়াছেন। আলোচনায় তীক্ষ্ণশ্লেষাত্মক মন্তব্যই তাঁহার হাতে প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ও এই শ্লেষনৈপুণ্য ও গভীরতর সূত্রানুসন্ধানই রবীন্দ্ররচনাকে সাধারণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জাতিবৈরমূলক আক্রমণ ও পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উন্নততর সত্যনিষ্ঠা ও দার্শনিকতার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। তথাপি মোটের উপর রাজনৈতিক প্রবন্ধে সাময়িক ঘটনারই উত্তাপ ও উত্তেজনার প্রাধান্য দেখা যায়; বক্তব্য বিষয় ও আলোচনারীতিতে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মননশীলতা ও প্রকাশচারুত্ব সত্ত্বেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ও বৈচিত্র্যের কিছুটা অভাব অনুভব না করিয়া পারা যায় না। রাজনীতি মুহূর্তের দুঃস্বপ্ন ও হঠাৎ জ্বলিয়া-ওঠা বিস্ফোরণ; সমাজনীতি যুগযুগান্তরব্যাপী তাৎপর্যের উৎস ও প্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ—'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' (ভারতী, ১২৯৬ আশ্বিন) বাঙালীর রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারতা ও আত্মাভিমান-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তীব্রশ্লেষাত্মক আক্রমণ। তিনি মনে করেন যে আমাদের প্রাচীন আদর্শ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ও আগ্রহের একান্ত অভাব সত্ত্বেও, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা হঠাৎ হুজুকে পড়িয়া ন্যাশানেল নেশায় মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বিদেশী পণ্ডিতমণ্ডলীর ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যসম্বন্ধীয় গবেষণালব্ধ শ্রদ্ধার ফল আত্মসাৎ করিয়া নিজ অতীত সংস্কৃতির জন্য অবাস্তব আত্মপ্রসাদ ও অহঙ্কার অনুভব করিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের পূর্বপুরুষের কীর্তির জন্য তাঁহাদের বর্তমান অযোগ্যতার কথা ভুলিয়া ইংরাজের নিকট রাজনৈতিক সমতার দাবী করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের এই বংশাভিমান নানা উদ্ভট ও অসঙ্গত দাবীতে সোচ্চার হইয়া উঠিল ও তাঁহাদের জন্য ইংরাজেরই স্বেচ্ছায় অধিকারের আসন ছাড়িয়া দেওয়া একটা অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য এইরূপ কল্পনাবাষ্প তাঁহাদের মনে সঞ্চিত হইতে লাগিল। আমরা তাকিয়া ঠেসান দিয়া অতীত গৌরবের স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিব, আর ইংরাজ তাকিয়া ও আরামশয্যা সমেত আমাদের তুলিয়া ক্ষমতার উচ্চ মঞ্চে বসাইয়া দিবে—আমাদের মনোভাব অনেকটা এইরূপ দাঁড়াইল। আমাদের নিজের ত্রুটি বা অপূর্ণতা স্বীকার বা যোগ্যতা-অর্জনের প্রয়াসের ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন ধারণাকেই আমরা মনে স্থান দিই না। আমরা নিজেরা সততা বা সত্যনিষ্ঠার অনুশীলন করিব না, কেবল দাবী পূর্ণ করিবার জন্য আবদার জানাইব ও ব্যর্থ হইলে বৃথা অভিমানের ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসে আকাশ-বাতাসে ঝড় তুলিব। এরূপ শিশুসুলভ আচরণ যত শীঘ্র

ত্যা। করি ততই আমাদের মঙ্গল। এইরূপ নির্মম আত্মবিশ্লেষণ ও জাতীয় দুর্বলতার উদ্‌ঘাটন যে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা বাড়ায় নাই তাহা নিঃসন্দেহ, হয়ত মন্তব্যের কঠোরতা ও ব্যঙ্গতীক্ষ্ণতা আর একটু কমাইলেও সত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত না। তথাপি এইরূপ জাতীয় আন্দোলন বিরোধিতা যে সৎসাহস ও দুর্দম বিচারস্বাধীনতার পরিচয় দেয় তাহা তরুণ লেখকের কম কৃতিত্বসূচক নয়।

"ইংরাজের আতঙ্ক' (সমূহ, পরিশিষ্ট, ১৩০০) প্রবন্ধে সাঁওতাল বিপ্লবের সময় ইংরাজ শাসকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কেমন করিয়া সুবিচারপ্রার্থী নিরীহ সাঁওতালদের উপর গুলি-গোলা বর্ষণ করিয়া অবশেষে নিজেদের ভুল বুঝিয়া হতভাগ্যদের প্রার্থিত ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছিল এই পূর্বদৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বর্তমান কালেও যে ইংরাজ অনুরূপ আতঙ্কের বশীভূত হইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করিতে উদ্যত হইয়াছে লেখক এই প্রবন্ধে তাহারই সম্ভাবিত কুফল সম্বন্ধে সরকারকে সতর্ক করিতে চাহেন। অবশ্য প্রতিকূলপ্রজাপুঞ্জবেষ্টিত মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য ভেদনীতির প্রয়োগ অপরিহার্য হইতে পারে। আর ভারতে যাহারা শাসননীতির প্রবর্তক সেই সর্বোচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজপুরুষবর্গ এই ভেদনীতি অস্বীকার করেন। তথাপি নিম্নতর কর্মচারীরা শাসনসঙ্কট এড়াইবার জন্য এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন ইহা মনুষ্যস্বভাবানুমোদিত বলিয়াই বিশ্বাসযোগ্য। এই আতঙ্ক-গ্রস্ত শাসননীতি সাময়িকভাবে কার্যকরী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সরকারের দুর্বলতারই লক্ষণ ও শেষ পর্যন্ত নানা অনর্থপাত ঘটায়। ভীতিবিহ্বল ও ন্যায়-ধর্মচ্যুত সরকার শেষ পর্যন্ত প্রজাদের আস্থা হারায় ও শাসনের পথ আরও বিঘ্ন-বহুল করে। প্রশ্রয়প্রাপ্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ কেবল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তিক্ততা সৃষ্টি করে না, ইহার আগুনে শাসনশৃঙ্খলার ভিত্তি পর্যন্ত ভস্মীভূত হইতে পারে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব নূতন কথা না বলিলেও যেমন একদিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের গূঢ় কারণটি বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন তেমনি তাঁহার অভ্যস্ত ন্যায়-নিষ্ঠতার সহিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে উহার সচেতন প্রয়োগের অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

'রাজা ও প্রজা' প্রবন্ধে (সমূহ, পরিশিষ্ট, ১৩০১) লেখকের মূল বক্তব্য এই যে ভারতীয়েরা ইংরাজের ন্যায়বিচারে ক্রমশঃ সন্দিহান হইয়া উঠিতেছে এবং যদি বিরল ব্যতিক্রমরূপে কোথায়ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তবে তাহার জন্য অপরিমিত উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। সুবিচারকে নিজ চিরন্তন অধিকারের

পরিবর্তে যদি ব্যক্তিবিশেষের অনুকম্পার দান বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা মোটেই শুভলক্ষণ নয়। যে তিনটি কারণে বিদেশী শাসক প্রজাশাসনে ন্যায়নীতি অনুসরণ করিতে প্রণোদিত হন, তাহা হইতেছে তাঁহাদের ধর্মবুদ্ধি, কর্মবুদ্ধি ও প্রজাবৃন্দের ন্যায়ান্যায়বোধের প্রভাব। ইংরাজেরা স্বদেশী সমাজ হইতে এত দূরে থাকিয়া ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন ও তাঁহাদের ভারতীয় কর্মদায়িত্ব তাঁহাদের স্বদেশের কর্মধারা হইতে এত স্বতন্ত্র যে কর্মবুদ্ধির আশু প্রয়োজনে তাঁহাদের ধর্মবোধ অনেকটা শিথিল না হইয়া পারে না। অনেকে ধর্ম ও কর্মের সংঘর্ষে পীড়িত হইয়া এমন নীতিও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে পাশ্চাত্য নীতি প্রাচ্য দেশে প্রয়োগের অনুপযোগী। ভারতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের প্রভাব দিন দিন প্রবলতর হইতেছে ও রাডইয়ার্ড কিপলিং-এর মত প্রতিভাশালী লেখক ভারতবর্ষকে একটি বিরাট পশুশালার রূপকে প্রদর্শন করিয়া ভারত-শাসন-সমস্যা যে অনেকটা সার্কাসে হিংস্র পশুসমূহকে বশীভূত রাখার মত একটা ন্যায়নীতিনিরপেক্ষ ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগের ব্যাপার ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। ভারতশাসনে ইংরাজের স্বসমাজনিন্দার প্রভাব হইতে দূরাবস্থান ও ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি তাহার মানবিক মমত্ববোধের অভাব স্বভাবতই তাহার ধর্মবোধকে দুর্বল করিয়া দায়িত্বহীন বলপ্রয়োগের প্রতি পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছে। ভারত স্বাধীন থাকিলে হয়ত ইংরাজ শাসনের বহু হিতকর ফল হইতে বঞ্চিত থাকিত ও দেশীয় রাজন্যবর্গের নানা ছোটবড় অত্যাচার সহ্য করিত। তথাপি রাজা ও প্রজার মধ্যে নাড়ীর যোগ থাকায় এই কুশাসনের মধ্যেও একটা মানবোচিত আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত হইত ও ইহাই তাহাদের নিপীড়িত সত্তার ব্যর্থতাবোধের প্রতিষেধক শক্তিরূপে কাজ করিত। বর্তমানের ন্যায় নিশ্ছিদ্র, আত্মার অবমাননাকর গ্লানির অন্ধকূপে তাহারা নিমজ্জিত হইত না।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাহা তাহাদের আহত আত্মমর্যাদাবোধে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারে, তাহা হইল তাহাদের মধ্যে ন্যায়ান্যায়বোধের সংঘবদ্ধ পরিণতি, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অনমনীয় দৃঢ় সংকল্প ও তাহার জন্য দুঃখবরণ, ন্যায়বিচারে মানবের যে চিরন্তন অধিকার আছে তাহারই দৃপ্ত ঘোষণা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ। আমাদের শাসকেরা যদি আমাদের এই মানস পরিবর্তন বুঝিতে পারেন, তবে তাঁহারা অনুগ্রহপ্রকাশের জন্য নয়, আমাদের সনাতন অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবেই আমাদের ন্যায়বিচারের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিবেন। বিলাতের দূরাপসৃত জনমতের স্থান যদি আমাদের প্রবুদ্ধ জনমত

অধিকার করিতে পারে, তবে আমাদের শাসকবর্গের ধর্মবোধ কর্মপ্রয়োজনের সহিত সংঘর্ষে জয়ী হইবার শক্তি লাভ করিবে ও পাশ্চাত্য ন্যায়নীতি সমুদ্র পার হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নীতি-আদর্শে ও আত্মশক্তি-উদ্বোধনে দৃঢ় আস্থা ও ও সাময়িক সুবিধার প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া জাতীয় চরিত্রের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

'ইংরেজ ও ভারতবাসী' ('রাজা ও প্রজা', ১৩০০) শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক সম্বন্ধে অতিশয় দীর্ঘ প্রবন্ধ। ইংরাজ এতদিন ভারতবর্ষে বাস করিয়াও ভারতবাসীকে চিনিল না বা তাহার সঙ্গে কোন মানবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার কোন ইচ্ছাই দেখাইল না—ভারতশাসনবিষয়ে ইহাই মুখ্য সমস্যা। ইহারই ফলে ভুল বোঝাবুঝি ও জাতিবিদ্বেষ ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। ইংরাজের শাসননীতি ক্রমশঃ দমনমূলক ও ভারতীয় আন্দোলন বাক্‌যুদ্ধের তীব্রতায় নিষ্ফলতা বরণ করিয়া কেবল অক্ষমের গাত্রজ্বালানিবারণের উপায়ে পরিণত হইতেছে। ইংরাজও ভারতীয় আন্দোলনকে জনসাধারণের সহিত নিঃসম্পর্ক কয়েকজন পেশাদার বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির সৃষ্টি ভাবিয়া উহার গুরুত্বকে লঘু করিয়া দেখিতেছে। এইরূপে একটা ভ্রান্তিচক্র উভয় পক্ষকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অন্ধ আক্রোশে চালিত হইয়া রাজনীতির যে সূক্ষ্ম বিধান ডিপ্লোম্যাসি নামে অভিহিত তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ঈপ্সিত ফললাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ইংরাজ আমাদের কেরানীকুলের আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাব লইয়া আমাদিগকে ব্যঙ্গবাণবিদ্ধ করিতেছে, কিন্তু সে জানে না যে আমাদের পারিবারিক দায়িত্ব-বোধই আমাগিকে অপমান-সহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে।

কোন কোন ইংরাজি সংবাদপত্রে বাঙালীর এই সহানুভূতির জন্য কাঙাল-পনাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। কিন্তু বার বার প্রত্যাখ্যানের পর বাঙালী এখন এই অপ্রাপ্য সহানুভূতি আঙুরকে টক বলিয়া বুঝিয়াছে ও সে এখন আর ইংরাজের দয়া-উদ্রেকের জন্য পূর্বের ন্যায় লালায়িত নয়।

রাজকবি টেনিসন মৃত্যুর পূর্বে 'আকবরের স্বপ্ন' নামে একটি কবিতায় আকবরের ভারতবর্ষকে প্রেমবন্ধনে একীভূত করার যে মহান আদর্শ তাঁহার পরবর্তী সম্রাট্‌দের সংকীর্ণ, অনুদার নীতির দ্বারা ব্যর্থ হইয়াছিল তাহাই যে ইংরাজ শাসনের মাধ্যমে সফল হইয়াছে এইরূপ দাবী করিয়াছেন। এই রমণীয়

পরিকল্পনা সত্য হইলে খুবই সুখের হইত। কিন্তু এই একীকরণের যে প্রধান উপাদান প্রেম তাহা ইংরাজের কতটুকু আছে? আকবরের ধর্মবিষয়ক সমদর্শিতা ও ইংরাজের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু ও পৃথক মনোভাবপ্রসূত।

ইংরাজের বর্তমান অহঙ্কৃত আচরণে বাঙালীর যে মানস বিদ্রোহ জাগিয়াছে হয়ত তাহা একটি বিশেষ শুভ পরিণতির নিদর্শন। পৃথিবী যেমন সূর্য হইতে আলোক ও উত্তাপ সংগ্রহ করিয়াও এক নিগূঢ় কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে নিজ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে. আমরাও তেমনি ইংরাজি সভ্যতার আলোকপুষ্ট হইয়াও নিজ প্রাচীন সংস্কৃতিতে অবিচল থাকিব। ইংরাজি অগ্নির উত্তাপে আমাদের বিস্মৃত-প্রায় অতীত জীবনবোধের অদৃশ্য লিপিটি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

যাহা হউক, এখন শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই অন্তরগত ব্যবধান কি উপায়ে দূর করা যায় লেখক তাহাই নির্ধারণ করিতে চাহেন। একদল ভারতীয় প্রস্তাব করেন যে ইংরাজ ও বাঙালীর মধ্যে যে আচার আচরণ বা খাদ্যপোশাক ইত্যাদি বিষয়ে বৈষম্য আছে তাহা ঘুচাইয়া সকল বাঙালীই যদি ইংরাজি প্রথা অনুসরণ করে, তবে উহাদের মধ্যে একটি প্রশস্ত মিলনভূমি রচিত হইতে পারে। লেখক আত্মসম্মানের বিসর্জন ও পরানুকরণের মূল্যে ক্রীত এই মিলনপ্রয়াসকে জাতীয় মর্যাদার পরিপন্থী ও ভবিষ্যৎ অকল্যাণের হেতু বলিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বাহ্য অনৈক্যলোপ অন্তরমিলনসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় নয়। ছদ্মবেশ-ধারণ অন্তররহস্যপ্রকটনের সহায়তা করে না। কৃত্রিম উপায়ে ইংরাজকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে দেশের মধ্যে অন্তর্বিরোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিবে। সুতরাং তিনি এই পথ পরিত্যাগ করিয়া একটি অভিনব, অথচ কৃচ্ছ্রসাধ্য পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। শক্তিসঞ্চয়ের ও আত্মবিশুদ্ধির জন্য আমাদিগকে আপাতত ইংরাজ-সংসর্গ পরিহার করিয়া অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। শিখগুরু গোবিন্দ যেমন দীর্ঘকাল-ব্যাপী নিভৃত সাধনা দ্বারা আপনাকে দেশসেবার ও দুরূহ নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন আমাদের ভবিষ্যৎ নেতাকেও সেইরূপ তপশ্চর্যা ও আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়া দেশনায়কের গৌরবের উপযুক্ত করিতে হইবে। তিনি সাময়িক ঘটনাস্রোতের পঙ্কিল আবর্ত হইতে দূরে সরিয়া, দৈনন্দিন ক্ষুদ্র সংঘর্ষের উত্তেজনা হইতে আত্মসংবৃত থাকিয়া, ভারতের শাশ্বত সাধনায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিবেন ও সময় হইলে পরিপূর্ণ শক্তি ও অভ্রান্ত নেতৃত্বাধিকার লইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টবিধাতারূপে আবির্ভূত হইবেন। এরূপ গুরুদায়িত্বপালনের আর কোনও সহজতর পন্থা নাই।

রবীন্দ্রনাথের এই পথনির্দেশ অনেকটা আদর্শনিষ্ঠ কবি ও নীতিবিদের উদ্ভাবন, বর্তমান যুগের বাস্তব রাজনৈতিক সংগ্রামের সহিত ইহা একেবারেই নিঃসম্পর্ক মনে হয়। তথাপি মনে হয় মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ও নেতৃত্ব-গ্রহণের মধ্যে এই আদর্শেরই প্রভাব কিছুটা লক্ষিত হয়। প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত হইলেও অপরিমিত দৈর্ঘ্যের জন্য ক্লান্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের বক্তব্য বিষয়-পরিধির অতিবিস্তার, তাঁহার আলোচনার সর্বব্যাপী প্রসার পাঠকের চিন্তা ও অনুভবশক্তিকে উদ্দীপ্ত না করিয়া বরং প্রতিহতই করে। পদচারণার এই সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাহাকে অনেকটা দিশাহারা ও লক্ষ্যহীনভাবে সঞ্চরণশীল করিয়া তোলে। সংক্ষিপ্তিই যে মননের দীপ্ত প্রাণস্ফুলিঙ্গ এই সত্য তরুণ লেখক সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদনের আগ্রহাতিশয্যে সাময়িকভাবে বিস্মৃত হইয়াছিলেন মনে হয়।

'রাজনীতির দ্বিধা' ('রাজা-প্রজা', ১৩০০)য় লেখক ইংরাজজাতির ধর্মবোধ ও বিবেকবুদ্ধি কেমন করিয়া তাহার ঔপনিবেশিক শাসনকে দ্বিধা-দুর্বল করিতেছে তাহাই দেখাইয়াছেন। ম্যাটাবিলি-যুদ্ধে ইংরাজের নিষ্ঠুর, পাশবিক আচরণ ইংলণ্ডেরই কিছু ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছিল ও তাঁহারাই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে উহার সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় ইংরাজ কর্তৃপক্ষ বলেন যে খৃষ্টান ক্ষমা ও অহিংসাধর্ম প্রাচ্যশাসন-ব্যবস্থায় প্রযোজ্য নয় এবং যে অন্যায় সুবিধা জাতীয় স্বার্থে গ্রহণ করিতেই হইবে তাহা নিছক বলপ্রয়োগেই সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এখানে ন্যায়-নীতির দোহাই পাড়িলে অন্যায় নিবারিত হইবে না, লাভের মধ্যে শাসনকার্যে কিঞ্চিৎ দ্বিমনাভাব দেখা দিবে মাত্র।

কিন্তু ইংরাজদের ধর্মবোধ দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়াছে; এমন কি স্বার্থবুদ্ধির খাতিরেও উহাকে সম্পূর্ণ বরখাস্ত করা যায় না। এই ধারণা আমাদের মনে সদা-জাগ্রত থাকিয়া আমাদের সংবাদপত্রের প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিতেছে। এমন কি কোন একটা অন্যায়ের প্রতিকারার্থ আমরা ইংলণ্ডের জনমতের নিকটও আবেদন জানাইতেছি। ইংরাজের সুপ্ত বিবেকই প্রতি অন্যায় কার্যের পর শাসকগোষ্ঠীর মনে একটা দ্বিধা ও অনুশোচনার ভাব উদ্রিক্ত করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের ন্যায়বিচারের দাবীকেই সমর্থন করিতেছে। ইংরাজ নীতি লঙ্ঘন করিয়া মনে শান্তি পাইতেছে না, বিবেকের দংশন

তাহার ন্যায়বিগর্হিত আচরণের পিছনে নৈতিক সমর্থনকে হরণ করিতেছে। এই রাজনৈতিক সংগ্রামে উহাই আমাদের সর্বপ্রধান সহায়।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ-চরিত্রের স্বাভাবিক ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি যে উদার স্বীকৃতি জানাইয়াছেন তাহা তৎকালপ্রচলিত অন্ধ বিদ্বেষবুদ্ধির একটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম।

'অপমানের প্রতিকার' ('রাজা-প্রজা', ১৩০১) পূর্ব কথারই পুনরাবৃত্তি। ইংরাজের নিকট আমাদের অপমানের মূল কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্র-দুর্বলতার মধ্যেই নিহিত। যে বাঙালী ব্যারিস্টার খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রহৃত বাঙালী কেরানীর পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন তিনিই এ সম্বন্ধে একটি লজ্জাজনক স্বীকারোক্তি করিয়াছেন। তিনি আর্জি করিয়াছেন যে যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট জানিতেন যে মুহুরি কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারিবে না সেইজন্য এই প্রহার ইংরাজের পক্ষে অযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তিনি যে সমস্ত বাঙালী জাতির মুখে ভীরুতার কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিলেন সে বিষয়ে তিনি সচেতন মাত্র নহেন। আমাদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্য ও সামাজিক আচরণে প্রবলের নিকট নতিস্বীকার ও দুর্বলের প্রতি উৎপীড়নের, আত্মমর্যাদাজ্ঞানের একান্ত অভাবের যে দৃষ্টান্ত পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহা সংশোধিত না হইলে কোন ইংরাজি আদালতে ন্যায়বিচারের আমরা প্রত্যাশা করিতেই পারি না। আর সরকারেরও উচিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অসন্তোষ-প্রকাশকে তুচ্ছজ্ঞান না করা, কেননা তাহারা যদিও শক্তিহীন, তাহারা ইঞ্জিনের বয়লারের মত দেশবাসীর হৃদয়োত্তাপের মাত্রাটি সঠিকভাবে নির্দেশ করিয়া সরকারের যথার্থ উপলব্ধির সহায়তা করে।

এখানেও রবীন্দ্রনাথ সাময়িক অপমানের মূল খুঁজিয়াছেন আমাদের জীবনের চিরাভ্যস্ত অসম্মানপোষণের মধ্যে। তিনি এজন্য ইংরাজের ঔদ্ধত্য অপেক্ষা বাঙালীর চরিত্রদৌর্বল্যকেই প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন ও চরিত্রসংশোধনের মধ্যেই স্থায়ী প্রতিকারসম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

'সুবিচারের অধিকার'-এ ('রাজা-প্রজা', ১৩০১) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতি-অনুসরণের ব্যর্থতা ও আত্মসম্মান ও ঐক্যবোধের দৃঢ়প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার কথাই পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য বিষয় নূতন নয়, কিন্তু স্মরণীয় উক্তিসমাবেশে প্রকাশভঙ্গীটি হৃদয়গ্রাহী। দুই-একটি উক্তি উদ্ধারযোগ্য। "প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে

অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।” বা “গবর্মেণ্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই—হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক অসদ্ভাব গবর্মেণ্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে, এমন অভিপ্রায় গবর্মেণ্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।” অথবা “হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বে-আইন-সহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়—যেমন, নদীস্রোত কঠিন মৃত্তিকাকে পাশ কাটাইয়া স্বতঃই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।” অথবা “এইজন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠা-স্থানকে অধিক আশঙ্কা করি। খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিলবন্ধন ভঙ্গপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।”

উক্তিগুলিতে বিরোধাভাস, উপমা ও দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের নিপুণ প্রয়োগে চমৎকৃতির উৎপাদন হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিণতশক্তির পরিচয় এই প্রবন্ধগুলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ ও ‘লোকরহস্য’-এর তুলনা চলে। বঙ্কিমের রীতিবৈচিত্র্য রবীন্দ্র-নাথের একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতার সহিত তুলনায় অনেক বেশী, বিশেষতঃ তাঁহার রচনার মধ্যে লঘু কল্পনাবিলাস ও সর্বজনভোগ্য পরিহাসরসিকতার অকৃপণ বিকিরণ উহাদিগকে অধিকপরিমাণে আস্বাদনীয় করিয়াছে। বঙ্কিম সর্বত্র কোমর বাঁধিয়া একটা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার সমস্ত মানসিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করেন নাই, বিচিত্র ভঙ্গীতে, পরিবর্তনশীল মেজাজে, নানাবিধ প্রতিবেশ সৌন্দর্যের রস গ্রহণ করিতে করিতে, পাঠকের কৌতূহলের খোরাক যোগাইতে যোগাইতে স্বীয় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ অবিচল নিষ্ঠার সহিত তাঁহার একমাত্র লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়াছেন, লক্ষ্যভেদে একাগ্র অর্জুনের ন্যায় অনন্যমনা হইয়া মূল উদ্দেশ্যের শাসন মানিয়া লইয়াছেন, কোথাও চিত্তবিনোদনের কোন রন্ধ্রপথে আপনাকে উন্মনা বা কর্তব্যবিস্মৃত হইতে দেন নাই। তিনি যুক্তির উপর যুক্তি সাজাইয়া, তথ্যের উপর তথ্য পুঞ্জীভূত করিয়া এক দুর্ভেদ্য নিশ্ছিদ্র সিদ্ধান্ত-দুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে পাঠককে স্বচ্ছন্দভ্রমণের রুচিকর আমন্ত্রণ জানান, রবীন্দ্রনাথ সেখানে তাহাকে দুরারোহ দুর্গ-আরোহণের কৃচ্ছ্রসাধনে উদ্বুদ্ধ করেন।

অবশ্য অন্যদিক দিয়া দেখিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সমাজ ও রাজনীতিবিষয়ক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক গভীরানুপ্রবেশী। বঙ্কিমের সমাজচিন্তা

অতি প্রাথমিক স্তরের ও রাজনৈতিক চিন্তায় প্রজ্ঞা অপেক্ষা ভাবোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। তিনি ইংরাজের সমস্ত বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের বিরুদ্ধে এক অসহ্য জ্বালা পোষণ করিতেন ও তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে পরাধীন জাতির দীর্ঘসঞ্চিত মর্ম-বেদনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুলভ আতিশয্যে, প্রতিপক্ষকে হেয় করিবার প্রাকৃতরুচি-পরিতৃপ্তিতে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে যুগে দার্শনিক সত্যসন্ধানের মনোভাব লইয়া, নিক্তির ওজনে ন্যায়বিচারের শপথ গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখার অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্ট হয় নাই। বাঙালী লেখক নিজ প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাইয়া তাহার নবলব্ধ সাহিত্যিক হাতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে প্রতিপক্ষকে আঘাত হানিয়া নিজ গায়ের জ্বালা মিটাইবার জন্য, ধীর ও সত্যনিষ্ঠ বিচার ও আত্মসমীক্ষার জন্য নয়। বঙ্কিম সেইজন্য ইংরাজকে নাস্তানাবুদ করিয়া জাতিকে কিঞ্চিৎ মানসিক আমোদের উপকরণ দিয়াছেন, তাহার কারাপ্রাচীরে স্নিগ্ধবায়ু প্রবাহের জন্য একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ উন্মোচন করিয়াছেন, হাসিঠাট্টা দিয়া অন্তরের অনির্বাণ দাহকে কিছুটা লুকাইতে চাহিয়াছেন। বাংলা ভাষাব্যুৎপত্তি-বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী তাঁহার এক উপরিওয়ালা সাহেব "Combustible" শব্দটিকে বাংলা "জলীয়" দ্বারা অনুবাদ করিয়া ইস্তাহারে ঐ বাংলা কথাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যখন পৌর-আইন-ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত হইয়া এক করদাতা বঙ্কিমের আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন তখন বঙ্কিম এই অনুবাদ-প্রমাদের সুযোগে তাহাকে বেকসুর খালাস দিয়া উপরিওয়ালার হাস্যকর অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইংরাজের সম্বন্ধে তাঁহার আচরণ অনেকটা এই উপরিওয়ালার প্রতি আচরণের অনুরূপ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যে দার্শনিক মনন ও নিখুঁত সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় মিলে, জাতির দুর্গতির জন্য বিদেশী শাসক ও দেশবাসীর অশ্রদ্ধেয় আচরণ এই উভয় উপাদানের আপেক্ষিক দায়িত্ব-নির্ণয়ের জন্য যে সূক্ষ্ম বিচারনিষ্ঠা দেখা যায়, ইংরাজ-প্রকৃতি ও তাহার রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে যেরূপ গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে প্রকৃত সত্যোদ্‌ঘাটনপ্রয়াস লক্ষিত হয়, বঙ্কিম-যুগের উচ্ছ্বাসবহুল ঝাঁঝালো আন্দোলনের মধ্যে তাহার অনুরূপ কিছু প্রত্যাশা করাই অবাস্তব। তবে সাহিত্যগুণের দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহার শ্লেষনৈপুণ্য, যুক্তিগ্রন্থন-কৌশল ও চিন্তার গভীরতা সত্ত্বেও অতিপল্লবিত, গঠনসুষমাহীন বিস্তারের জন্য কতকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

চতুর্দশ অধ্যায়

উপন্যাস—১৮৭৭-১৮৮৬ (১২৮৪-১২৯৩)

১

রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট'-(১২৮৯, ইংরাজী ১৮৮২)। অবশ্য পাঁচ বৎসর পূর্বে লেখা 'করুণা' নামে 'ভারতী'তে প্রকাশিত (১২৮৪ আশ্বিন হইতে ১২৮৫ ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৭৭-১৮৭৮) একখানি অসম্পূর্ণ উপন্যাস সম্প্রতি 'শনিবারের চিঠি'-তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের আদিমতম উপন্যাস রচনার প্রয়াসরূপে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছে। মনে হয় যেমন 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এ, তেমনি এখানেও তরুণ রবীন্দ্রনাথের চোখে জীবন একটা আকস্মিকতা-সূত্রে গ্রথিত, অতর্কিত ও অকারণ পরিবর্তনে বিস্ময়কর, ও খেয়ালী ও দুঃখী লোকের সহাবস্থানে যুগপৎ কৌতুকময় ও করুণ আবির্ভাব রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। করুণা সাংসারিকজ্ঞানশূন্য, নানা ছেলেমানুষী কল্পনায় আত্মহারা, সরলা বালিকা। সে কিশোরীর মুগ্ধ স্বপ্নাতুরতা ঘাত-সংঘাতময় গার্হস্থ্যজীবন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, সুতরাং সংসারের শত আঘাতে সে বিমূঢ় ও অসহায়। শেষ পর্যন্ত সে নানা প্রতিকূলতরঙ্গতাড়িত হইয়া আত্মরক্ষার শক্তিহীন তরণীর ন্যায় মৃত্যুর উপকূলে ভিড়িয়াছে। ঘটনাস্রোতে সে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কোথায়ও ক্ষীণতম প্রতিরোধ-ইচ্ছা বা শক্তির পরিচয় দেয় নাই। তাহার পিতার আশ্রিত দরিদ্রসন্তান নরেন্দ্র তাহার বাল্যসহচর হইতে পতিত্বে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু সে তাহার অন্তরে লঘু ব্যসনপ্রিয়তা ও স্বার্থান্ধ ভোগস্পৃহা শুধু অভিভাবকদের নিকট হইতে নয়, পাঠকের দৃষ্টি হইতেও সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। তাহার নির্লজ্জ পাপাসক্তি ও উচ্চতর কর্তব্যবোধের একান্ত অভাব তাহাকে স্বভাবদুঃশীল-রূপে আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। করুণার মধ্যে ঔপন্যাসিক কিছু প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য আরোপ করিয়াছেন, তাহাকে প্রথাসিদ্ধ নায়িকার ছাঁচে ঢালেন নাই। তথাপি তাহার আজীবন দুঃখই তাহার চরিত্রস্বাতন্ত্র্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠক তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে কেবল করুণার নৈর্ব্যক্তিক পাত্রী-রূপেই দেখেন।

এই মূল কাহিনীর সহিত মহেন্দ্র-রজনী-মোহিনীর শাখাকাহিনী কেবল

বহির্ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। এই কাহিনীতে কিছুটা চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন স্থান পাইয়াছে। মহেন্দ্র কুরূপা স্ত্রী রজনীর প্রতি উদাসীন ও অবজ্ঞাশীল ও বাল্যবিধবা মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট। মোহিনীর প্রণয়লাভে ব্যর্থ হইয়া সে নরেন্দ্রের দলে মিশিয়াছে ও কুসংসর্গের প্রভাবে তাহার চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছে ও সে উপেক্ষিতা স্ত্রী রজনীর প্রতি কর্তব্যপালনে প্রণোদিত হইয়াছে। রজনী ও মহেন্দ্র উভয়েরই অন্তর্লোক-উদ্‌ঘাটনের জন্য লেখকের কিছুটা আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু আগ্রহের তুলনায় সাফল্যের অনুপাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

ইহা ছাড়া পার্শ্বচরিত্র লইয়া একটি তৃতীয় গোষ্ঠী রচিত হইয়াছে। নরেনের ইয়ারবন্ধুদের মধ্যে স্বরূপচন্দ্র বন্ধুপত্নীর প্রতি প্রেমনিবেদন করিয়া ও তাহাকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিয়া কিছুটা প্রাধান্য অর্জন করিয়াছে। লেখক তাহার মধ্যে প্রণয়রসনিমজ্জিত তরুণ কবির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহের জন্য অত্যুৎসাহী যুবকবৃন্দও তাঁহার ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় সরলপ্রকৃতি এবং পরোপকারী, কিন্তু অতিরিক্ত কাণ্ডজ্ঞানহীনতা পরনির্ভরতার জন্য তাঁহার সদ্‌গুণগুলি ফলতঃ ব্যর্থ। নিধি চতুররূপে পরিচিত, কিন্তু তাহার চতুরতার সহিত মূর্খতার বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। সে পণ্ডিত মহাশয়ের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে বিশেষ পটু। আবার শয়তানী বুদ্ধিতে পরের পেটের কথা বাহির করিয়া তাহার কদর্থ করিতেও তৎপর। তবে পণ্ডিত মহাশয়কে কালিঘাটে হয়রানির হাত হইতে রক্ষা করিবার সময় সে কিছুটা উপস্থিতবুদ্ধি দেখাইয়াছে। মনে হয় তরুণ, কল্পনানির্ভর লেখকের জটিল চরিত্রের আদর্শ নিধিরাম অপেক্ষা এই সময় বেশী অগ্রসর হয় নাই।

সমস্ত কাহিনীটি একেবারে আকস্মিক ও কার্যকারণগ্রন্থিহীন হইলেও, ও চরিত্রগুলি সবই হাস্যজনকরূপে অবাস্তব ও দোষ বা গুণের অবিমিশ্র মূর্ত বিকাশ হইলেও লেখকের বর্ণনাভঙ্গী ও জীবন-সমালোচনার মধ্যে কিছু মানব-প্রকৃতিজ্ঞানের অসংলগ্ন নিদর্শন মিলে। মহেন্দ্রের মার তাঁহার পুত্রবধূর প্রতি আচরণের যে ব্যাখ্যা ঔপন্যাসিক দিয়াছেন তাহা একাধারে কৌতুককর ও মনস্তত্ত্বসম্মত। বৌকে ভর্ৎসনার কোন উপলক্ষ্য না পাইলে শাশুড়ী সেদিন একটু নিরাশই হন, ও উহাতে তাঁহার বধূর প্রতি আক্রোশ যেন বাড়িয়া যায়। নিধিরামের সর্দারির মধ্যে কাজ পণ্ড করার প্রবণতাই বেশী—ইহা কেবল

তাহার সম্বন্ধেই নয়, যাহাদের মোড়লি করার অভ্যাস তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য সাধারণ সত্য। লেখকের ভাষণভঙ্গী সে যুগের বঙ্কিম-প্রবর্তিত ঔপন্যাসিক রীতির অনুসরণে পাঠকের সহিত হৃদ্যতা-সম্পর্ক-স্থাপনের পক্ষে উপযোগী বৈঠকী-ঢংএর অনুকৃতি। ইহার মধ্যে শিল্পচাতুর্য নাই, আছে মুখর প্রগল্‌ভতা। রবীন্দ্রনাথের পরিণত উপন্যাসে এই রীতি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

আরও একটি দিক দিয়া এই শিক্ষানবীশী উপন্যাস-লেখক তাঁহার জীবনরস-উপভোগের পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন - হাস্যকর ঘটনাসৃষ্টির প্রাচুর্য ও চরিত্রসমূহের অপটুজনিত লাঞ্ছনার সরস বর্ণনাবাহুল্য দ্বারা। পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ ও নিধিরামের মুরুব্বিয়ানা, মহেন্দ্রের নৈশ অভিসার, স্বরূপের কাব্যচর্চা ও গদাধরের সমাজ-সংস্কার, গৃহত্যাগিনী কাত্যায়নীর অনুসন্ধানে বহির্গত পণ্ডিত মহাশয়ের দুর্দশা প্রভৃতি ঘটনা হাস্যরসের আতিশয্যে উজ্জ্বল। আবার পক্ষান্তরে করুণার দুর্ভাগ্য, রজনীর স্বগতচিন্তা, মহেন্দ্রের আত্মগ্লানি প্রভৃতি গভীররসাত্মক অংশগুলির বর্ণনাতেও সেই একই প্রকার অসংযম ও মাত্রাহীনতা। লেখকের জীবনবোধে হাসি ও কান্না, আমোদ ও দুঃখ উভয়েই যেন আলো-ছায়ার বিন্যাসে অপটুতার জন্য বর্ণসুষমা ও বস্তুঘনতা হারাইয়াছে। উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ হইলেও ঘটনা-পরিণতির দিক দিয়া করুণার মৃত্যুতে ও রজনীর স্বামিপ্রেমে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় একটি স্বাভাবিক উপসংহারে পৌঁছিয়াছে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' (১২৮৯, ইংরাজী ১৮৮১) 'রবীন্দ্রকাব্যজীবনের উন্মেষপর্বে' পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্বে তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি' (১২৯৩, ইংরাজি ১৮৮৬ সাল) তাঁহার গদ্যরচনায় অগ্রগতির নিদর্শনরূপে এখন আলোচিত হইতেছে। অবশ্য উপন্যাস একটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপ ; উহার অগ্রগতি ঠিক গদ্যরীতির মানদণ্ডে বিচার্য নয়। উহার নিরূপণে চরিত্র-চিত্রণ, হৃদয়-সংঘাতের গভীরতা, আখ্যান-নির্মিতি ও জীবন-সমীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও পরিণতি আবশ্যিক উপাদান। গদ্যরীতির যথাযথতা ও উৎকর্ষ এই সামগ্রিক জীবন-পরিচয়ের সুষ্ঠু বাহনরূপে উপন্যাসের একটি গৌণ অথচ সর্বাঙ্গসঞ্চারী কান্তির ন্যায় ক্রিয়াশীল। সুতরাং প্রথমতঃ এই উপন্যাসের গদ্যরীতির সৌন্দর্যের দিকটা দেখাইয়া পরে উহার উপন্যাসোচিত মানোন্নয়নের নির্দেশচেষ্টা সঙ্গত মনে হইতেছে।

উপন্যাস হিসাবে 'রাজর্ষি' হয়ত শ্রেষ্ঠপর্যায়ের অধিকারী নয়, কিন্তু পূর্ববর্তী

উপন্যাসের সহিত তুলনায় উহার গদ্যরীতি যে আরও শিল্পগুণসমৃদ্ধ ও সর্ববিধ কাজের জন্য বেশী উপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই। 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট'-এর ভাষা অসম, অ-মসৃণ, অতিকথনস্ফীত ও করুণরসের বর্ণনা ছাড়া অন্যত্র সূক্ষ্ম-অনুরণনহীন। অস্বাভাবিক, উৎকট, জীবনচিত্রণের ফলে ভাষাও এখানে কর্কশ ও মাত্রাভ্রষ্ট। শুধু গদ্যরীতির নিদর্শনরূপেও 'রাজর্ষি' 'বউ-ঠাকুরাণীর হাটে'র তুলনায় অনেকখানি প্রাগ্রসর। ইহা সূক্ষ্ম ভাব ও অনুভূতির সার্থক প্রতিবিম্ব। লেখকের প্রকৃতি-চেতনা ও সুকুমার ভাবের অভিব্যক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাইয়াছে। হাসি ও তাতার শৈশব সরলতা ও কল্পনা-মধুর ক্রীড়াশীলতা, জয়সিংহের নিকট রঘুপতির হত্যাতত্ত্বব্যাখ্যা, জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব, গোমতীতীরের নির্জন বনভূমির বর্ণনা ও সেই জনহীন প্রাকৃতিক পরিবেশে নক্ষত্ররায়ের প্রতি রাজা গোবিন্দমাণিক্যের মর্মস্পর্শী আবেদন, রাজ্যত্যাগের পর গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃতি-চেতনা-লালিত অধ্যাত্ম চিত্ত-নির্মলতার বিকাশ—এ সমস্তই যেমন উপন্যাসের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি অনুভূতিময় ভাষার প্রয়োগে সুকুমার ভাব-মননের সার্থক প্রকাশ। ভাষাশিল্পে লেখক যে কতটা অগ্রসর হইয়াছেন এই দৃষ্টান্তগুলিই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

উপন্যাস হিসাবে দ্বিতীয় উপন্যাসটি যে প্রথমের সহিত তুলনায় অনেকটা উচ্চতরমানসম্পন্ন তাহাও সহজে প্রতীয়মান। 'রাজর্ষি'তে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতির মধ্যে যে মূল আদর্শসংঘাত তাহা মানবিক আবেদন ও ঔপন্যাসিক রূপায়ণ উভয় দিক দিয়াই শ্রেষ্ঠ। 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট'-এ প্রতাপাদিত্য এক যান্ত্রিক নির্মমতা ও নির্বিকারত্বের প্রতিমূর্তি। তিনি অকারণেই তাঁহার পরিবারস্থ সকলেরই আনন্দময় আত্মবিকাশের হন্তারক। তাঁহার দম্ভ ও আত্মাভিমান আকাশচুম্বী হইয়া সমস্ত প্রতিবেশের আলো-হাওয়া অবরুদ্ধ করিয়া পাষাণ-কাঠিন্যে দণ্ডায়মান। তাঁহার সহিত পুত্রকন্যা-খুড়া প্রভৃতির বিরোধের কোন সঙ্গত হেতু দেখা যায় না। জামাতার প্রগল্‌ভতা হয়ত তাঁহার রোষের উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু এই লঘু অপরাধে তিনি যে চূড়ান্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ততারই পরিচায়ক। দানবের সহিত মানবের অসম দ্বন্দ্বের ন্যায় এই একতরফা উৎপীড়নে আতঙ্কিত ও নিরুপায় আত্মসমর্পণের মধ্যে করুণরস ছাড়া আর কোন মানবিক রসের অনুভূতি জাগে না। ইহার সহিত তুলনায় রঘুপতি-গোবিন্দমাণিক্যের দ্বন্দ্ব ও জয়সিংহের মর্মচ্ছেদী অন্ত-র্বিপ্লবের ফলে আস্বাদ্য মানবিক রসে অনেক বেশী সমৃদ্ধতর। চরিত্র-পরিবর্তনের

দিক দিয়াও রঘুপতির প্রতিহিংসার অটুট সঙ্কল্প ; গোবিন্দমাণিক্যের সর্বত্যাগী নির্বেদ, প্রকৃতির গূঢ়সঞ্চারী প্রভাব-স্বীকরণের দ্বারা অন্তরে অক্ষুব্ধ শান্তিরস-সঞ্চয়, সর্বমানবের সুখ-দুঃখের মধ্যে প্রগাঢ় সত্তানিমজ্জন এবং নক্ষত্ররায়ের ইচ্ছাশক্তিহীন লঘুচিত্ততা হইতে প্রভুত্বগর্বী, স্বৈরাচারী শাসকে রূপান্তর—এ সমস্তই মনস্তাত্ত্বিক সঙ্গতিবোধের দিক দিয়া উচ্চতর ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের নিদর্শন। প্রাসঙ্গিক বিক্ষিপ্ত জীবনসমালোচনা ও খণ্ডচিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্যও তাঁহার অগ্রগতির সূচক।

উপন্যাসটির প্রধান ত্রুটি যে ইহা প্রায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন দুই অংশে বিভক্ত। রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের নির্বাসনের পর আখ্যায়িকা মূলধারার সহিত সংযোগ হারাইয়া এক সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত হইয়াছে। একদিকে রঘুপতির অতন্দ্র প্রতিহিংসা তাঁহাকে মোগলসৈন্যের অনুগামী করিয়া, বিজয়গড়ের দুর্গাধিপতি ও খুড়া মহারাজের বিশ্বাস অর্জন করিয়া দুর্গের রহস্যভেদে প্রণোদিত করিয়াছে ও বন্দী সুজার উদ্ধারকর্তারূপে ত্রিপুরা-অভিযানে মোগল বাহিনীর সহযোগিতা-লাভে সমর্থ করিয়াছে। অপর দিকে নক্ষত্ররায়ও এক অখ্যাত গ্রামে দৈবলব্ধ স্নেহপ্রতিবেশে অক্ষম ভূস্বামীর বিলাসব্যসন-তৃপ্তিতে ও অসার খেয়াল-খেলায় পরম আরামে দিন কাটাইতেছে। এই সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশে ও নূতন লোকের সংসর্গে লেখক ও পাঠক উভয়েই গোবিন্দমাণিক্যকে বিস্মৃতির অন্তরালে অবলুপ্ত হইতে দিয়াছেন। যেরূপ অতিপল্লবিত বর্ণনাবাহুল্যের সহিত এই শাখাকাহিনীটি বিস্তারিত হইয়াছে ও বাঙলার ও ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস হইতে যেরূপ দীর্ঘ উদ্ধৃতি ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মূল কাহিনীর সহিত উহার সংযোগপ্রসঙ্গটি গৌণ হইয়া গিয়াছে ও উপন্যাসটি ভারসাম্য হারাইয়াছে। অবশ্য রঘুপতির সংকল্পদৃঢ়তা ও উপায়উদ্ভাবনীশক্তি ইহাতে উদাহৃত হইয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে স্পষ্টতর করিয়াছে। কিন্তু তথাপি মনে হয় যাহা উপায় মাত্র তাহাকে মুখ্য উদ্দেশ্যের সমপদবীতে উন্নয়ন মাত্রাজ্ঞানের দিক দিয়া অসঙ্গত। বিল্লন ঠাকুরের নূতন পুরোহিত-রূপে প্রবর্তন ও গোবিন্দমাণিক্যের সাত্ত্বিক পূজাদর্শ ও প্রবাসজীবনে অবলম্বিত সেবাধর্মের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, উপন্যাসের সহিত উহার যোগ-সূত্র নিতান্ত ক্ষীণ। এই সমস্ত অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা উপন্যাসের বিষয়গত ও ভাবগত ঐক্যকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হয়।

উপন্যাসের নামকরণ 'রাজর্ষি' গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসনচ্যুতির পরে যে

সাধনার বলে তাহার আত্মিক রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং একেবারে শেষের দিকের কয়েকটি অধ্যায় উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমন কি তাঁহার সিংহাসন-পুনঃপ্রাপ্তির পরেও তাঁহার রাজর্ষি-প্রকৃতি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বের সর্বাপেক্ষা অখণ্ডনীয় প্রমাণ এই যে শেষ পর্যন্ত সংসারে বীতস্পৃহ রঘুপতিও ইহার উদার মহত্বের নিকট স্বতঃস্ফূর্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছে। 'বিসর্জন'-নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রঘুপতির চিত্ত-পরিবর্তন, কিন্তু সে পরিবর্তন আসিয়াছে জয়সিংহের প্রণয়-পাত্রী অপর্ণাকে জয়সিংহের শূন্যস্থানপূরণের কার্যে আবাহনের মধ্য দিয়া। নাটকে রঘুপতির সত্যকার প্রতিযোদ্ধা কে—গোবিন্দমাণিক্য না অপর্ণা—এবিষয়ে সে নিজেই বিভ্রান্ত। অন্ততঃ জয়সিংহের আত্মবিসর্জনের পর গোবিন্দমাণিক্য ও তাহার উপর প্রতিহিংসার কথা সে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়াছে। মহৎ প্রেম তাহাকে আর এক মহৎ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। উপন্যাসের কিন্তু প্রতিক্রিয়া আসিয়াছে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার পর, ছত্রমাণিক্যের কৃতঘ্নতার আঘাতে। কোনটা বেশী মনস্তত্ত্বসম্মত সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকাই স্বাভাবিক। তবে নাটকে রঘুপতির নির্বাপণ ঘটিয়াছে প্রেমের স্নিগ্ধ সরোবরে, উপন্যাসে উহা ঘটিয়াছে গোবিন্দমাণিক্যের সাধনালব্ধ জীবনাদর্শের শান্ত, অসীমপ্রতিবিম্বী সমুদ্র-গভীরতায়। যদি উপন্যাসে ও নাটকের মূল বস্তু হয় দুই বিরোধী আদর্শের সংঘাত তবে বিরোধী পক্ষের একের মতের দ্বারা অন্যের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকৃতিতেই বিরোধের যথার্থ অবসান এ বিষয়ে সকলেই একমত হইবেন ও সেই দিক দিয়া উপন্যাসই যে নাটক অপেক্ষা সঙ্গততর ভাবপরিণতিদ্যোতক ইহাও স্বীকার্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়

১৮৮৪—১৮৯৫ (১২৯১—১৩০২)

প্রথম পর্যায়

১

এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম দ্বিধা-জড়িত উদ্ভব। 'ঘাটের কথা' (কার্তিক ১২৯১) ও 'রাজপথের কথা' (অগ্রহায়ণ ১২৯১) পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পসংগ্রহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহারা ছোট-গল্পেরই অবিকশিত অঙ্কুররূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তথাপি মনে হয় ইহাদের মধ্যে ছোটগল্পের উপাদান স্বল্প ও উদ্দেশ্য অপরিস্ফুট। ইহারা যেন রবীন্দ্রনাথের তৎকালোচিত ভাবুকতাধর্মী রচনারই উদাহরণ, অলক্ষিতে ইহাদের স্বগতভাষণের মধ্যে ছোটগল্পের এক-আধটুকু ইঙ্গিত সঞ্চারিত হইয়া চকিতে মিলাইয়া গিয়াছে। 'ঘাটের কথা'য় গঙ্গাতটের কালজীর্ণ সোপানশ্রেণী অলস স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়া প্রতিদিন স্নানার্থিনী তরুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে সমষ্টিগত জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের কাহিনী স্মরণ করিয়াছে। আজিকার বালিকার দল কালিকার প্রৌঢ় গৃহিণীতে পরিণত হইয়া পরিচিত পরিবেশ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে কিন্তু আর একদল ক্রীড়া-রঙ্গময়ী বালিকা নিশ্চল, অসাড় সোপানশ্রেণীতে তাহাদের লঘু-চপল পদচ্ছন্দের শিহরণ অঙ্কিত করিয়া অনুভূতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই সমষ্টিগত অস্ফুট চেতনা-প্রবাহ হইতে কুসুমের জীবন-তরঙ্গটি উহার অন্তঃসলিল ঘূর্ণী-চক্র লইয়া স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার জীবনের ব্যর্থ-করুণ প্রেম-কাহিনীটি নানা অস্পষ্ট স্মৃতি-গুঞ্জরণের মধ্যে পাষাণ-ফলকে সুস্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ হইয়াছে। ভাবুকতাময় উচ্ছ্বাসের অসংলগ্ন বিস্তারের মধ্যে মানব-জীবনের সুনির্দিষ্ট দ্বন্দ্ব, মানবহৃদয়ের উদ্বেলিত বেদনার পরিচয় এক নবসৃষ্টির স্থির দ্যুতি বিকীর্ণ করিয়াছে। স্মৃতি-পর্যালোচনার শুক্তিতে ছোটগল্পের মুক্তার সম্ভাবনা ঝিলিক দিয়াছে। সন্ন্যাসীর নির্মম প্রত্যাখ্যানে কুসুমের গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জন একদিকে যেমন অনুক্ত সম্ভাবনার ন্যায় আর্টের মর্যাদা

রক্ষা করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি পাষাণের সীমিত অনুভূতির, উহার ক্ষণিক-ইন্দ্রিয়স্পর্শের অতিরিক্ত কোন বিচারশক্তির অভাবেরও সুন্দর পরিচয় দিয়াছে।

'রাজপথের কথা' প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ভাবুকতাধর্মী, উহাতে ছোটগল্পের কোন বীজ অদৃশ্যপ্রায়। সে দিক্ দিয়া 'ঘাটের কথা'য় যতটুকু গল্পসম্ভাবনা আছে, পরবর্তী রচনায় তাহাও অনুপস্থিত। অবশ্য রাজপথের কোন একটি অংশে প্রেমিকার প্রেমিকের জন্য নীরব প্রতীক্ষার ও শেষ পর্যন্ত এই প্রতীক্ষার ব্যর্থতায় পর্যবসানের একটি করুণ ইঙ্গিত আছে, কিন্তু লেখক মোটেই এই ইঙ্গিতটুকু ফুটাইয়া তুলিতে ব্যস্ত নহেন। ছোটগল্প এখানে ভাবুকতার একটানা. উদ্দেশ্যহীন প্রবাহ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার বিশেষ কোন প্রবণতা দেখায় নাই। ইহার সাতবৎসর পরে যখন ছোটগল্পের এই অর্ধসমাপ্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল, যখন উহার শিল্পসচেতন ও জীবনরসপুষ্ট রঙ্গমঞ্চ হইতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অন্যমনস্কতার যবনিকা উত্তোলিত হইল, তখন যে আলোকোজ্জ্বল, অপূর্ব জীবন-নাট্যাভিনয় সুরু হইল তাহার দৃষ্টান্তে শুধু বঙ্গসাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্যের দিগন্ত পর্যন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পর্যায়

২

গদ্যপরিণতির দ্বিতীয়পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পরচনার প্রতিভা প্রায় সাতবৎসরের বিরতির পর অকস্মাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কোন পূর্বদৃষ্টান্তের সহায়তা ব্যতিরেকেই এই নূতন শিল্পরূপটির অঙ্গসুষমা ও অন্তর-লাবণ্য আবিষ্কার করিয়া ইহার জন্য সাহিত্যজগতে একটি চিরন্তন স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। কোন জীবনপ্রেরণার নবরক্তসঞ্চরণে লেখকের জীবনদৃষ্টিতে এরূপ আশ্চর্য রসানুভূতি ও শিল্পবোধ বিকশিত হইল তাহা ঠিকভাবে নির্ধারণ করা দুরূহ। ঋতুর অস্থিমজ্জায় বসন্তলাবণ্যসঞ্চারের মত কবিচেতনায় সৌন্দর্য-বোধ ও জীবনপ্রজ্ঞার অনুপ্রবেশ রহস্য কোন গাণিতিক নিয়মে ধরা পড়ে না। এই ছোটগল্পের অতর্কিত অন্তঃপ্রেরণা 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র সঙ্গে সমকালীন। ঐ সময়ের 'ছিন্নপত্র'-এ সংগৃহীত চিঠিগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান জীবনকৌতূহল তরঙ্গস্ফীতির চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। তথাপি উহাদের মধ্যে লেখকের অধ্যাত্ম-অনুভূতিরঞ্জিত প্রকৃতিচেতনা যেন বিশুদ্ধ

মানবজীবনাগ্রহকে অধঃকৃত করিয়া প্রবল হইয়াছে। 'ছিন্নপত্র' যেন ছোটগল্প অপেক্ষা কাব্যেরই নিকটাত্মীয় বলিয়া মনে হয়। জমিদারী-তদারকী-সূত্রে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পদ্মাতীরবর্তী পল্লীজীবনের অব্যবহিত সম্পর্কে যুক্ত হইয়াছেন, এই জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আহরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই পর্যবেক্ষণের পিছনে তাঁহার অধ্যাত্মরসবিভোরতা কিছুটা স্বপ্নমুগ্ধতার আবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তরবঙ্গ-প্রবাস তাঁহার ছোটগল্পরচনার বস্তু-উপাদান ও বোধ-পটভূমিকা বিন্যস্ত করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তথাপি এই ছোটগল্পগুলি পড়িলে যে সামগ্রিক ধারণা জন্মে তাহা ততটা বস্তুভিত্তিক নয়, যতটা সূক্ষ্ম-ভাবরস-উদ্বোধক। পল্লী-নৈকট্য রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব ও গভীর জীবনসত্যবোধকে যতটা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহার বাস্তব পর্যবেক্ষণশক্তিকে সে পরিমাণে উদ্রিক্ত করে নাই। প্রকৃতি-তন্ময়তার মধ্যবর্তিতায় কবি পল্লীজীবনের যে গভীর স্তরে অবতরণ করিয়াছেন, যে ভাবমুগ্ধ নর-নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন গ্রামসমাজের বস্তুনির্ভর মানচিত্রে তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। পদ্মাতীরের নদীমাতৃক জীবনযাত্রার সোনার কাঠির স্পর্শে যে অলোকসুন্দরীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে তিনি তাঁহার চিরন্তন প্রেয়সী কাব্যলক্ষ্মী। তবে তিনি 'মানসী'—'সোনার তরী'—'চিত্রা'র ছন্দোবদ্ধ কল্পনাজগৎ হইতে খানিকটা ভিন্ন ছন্দের মানবিকনিয়মানুসারী, মানবের চিন্তা ও চেষ্টার বিস্তৃততর, বহুশাখান্বিত জগতে নামিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই মর্ত্যজগৎবিচরণেও তাঁহার সুকুমার লাবণ্য, বস্তু-অতিসারী রূপসত্তার কোনই ব্যত্যয় হয় নাই।

কোন তরুণ সমালোচক সম্প্রতি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডভ্রমণে যান, তখন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাগার হইতে Edgar Allan Poe-র ছোটগল্পের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং পো-ই প্রথম তাঁহাকে ছোটগল্পের শিল্পরূপের প্রতি অবহিত করেন। এই উক্তির সমর্থনে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' (ফাল্গুন, ১২৯৮) ও 'নিশীথে' (মাঘ, ১৩০১) এই দুইটি গল্পের ঘটনাবিন্যাসের কোন কোন অংশের সহিত পো-র দুইটি গল্পের মিল দেখাইয়াছেন। হয়ত অতিপ্রাকৃত শ্রেণীর কোন কোন গল্পে পো-র কিছু প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়। 'কঙ্কাল' প্রথম দিক্‌কার গল্প এবং উহাতে কিছু বিদেশী ছায়াপাত পড়িয়াছে মনে হয়। যে কঙ্কালভূতা চটুলা সুন্দরী মেয়েটি তাহার পূর্ব প্রেমিকের বিবাহ-প্রস্তাবে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া তাহার পানীয়ের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া ও নিজেও বিষপানে আত্মঘাতী হইয়া একটা

হত্যাবিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে যেন বাঙালী মেয়ে বলিয়া মনে হয় না। তাহার নিজ সৌন্দর্যমুগ্ধতার উৎকট আত্মরতিও বৈদেশিক-দৃষ্টান্ত-অনুপ্রাণিত বলিয়া ঠেকে। বাঙালী সমাজে এ মেয়ে স্বভাবজাতা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। কিন্তু 'নিশীথে'র ভাবাবহ সম্পূর্ণরূপে দেশীয় ও রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি। ইহার মধ্যে যদি কোন তথ্যগত ঋণ থাকেও তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন ও এই স্বাঙ্গীকরণের সম্পূর্ণতায় সমস্ত ঋণ মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। 'কঙ্কাল' ও 'নিশীথে' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ব্যতিক্রম-স্থানীয়। তাহার পূর্বেই তিনি দেশীয় সমাজের সমস্যা লইয়া ছোটগল্পপরম্পরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এগুলিতে না বিষয়ে, না শিল্পরূপে কোথায়ও বৈদেশিক প্রভাবের অনুমাত্রও লক্ষ্যগোচর হয়। বিশেষতঃ ইহাদের সমস্যার প্রকৃতি, আলোচনারীতি ও শেষ ফলশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ও পো-র বিপরীতমুখী। কাজেই বৈদেশিক প্রভাবের গুরুত্ব, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্পের শিল্পরূপের জন্য কোন বিদেশী-গল্পলেখকের নিকট ঋণী এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটগল্পের প্রকৃতি ও উহার অন্তর্নিহিত শিল্পধর্মের দ্বারা খণ্ডিত ও অস্বীকৃত হয়।

এই কালসীমায় রচিত সমস্ত গল্পই পল্লীবিষয়ক নয়। ইহাদের মধ্যে অনেক-গুলি নাগরিক জীবনযাত্রাবিষয়ক ও রোমান্স, ইতিহাস, রূপকথা প্রভৃতি বিচিত্রমুখী ভাবপ্রেরণায় রচিত। সুতরাং এই গল্পগুলি রচনা করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে উত্তরবঙ্গপল্লীজীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় অত্যাবশ্যকীয় ছিল এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না। তাঁহার কতকগুলি পল্লীজীবনাশ্রয়ী গল্প ভাবরস-সর্বস্ব, পল্লীজীবনের মৃত্তিকার সহিত ইহাদের বিশেষ কোন যোগ নাই। এগুলির প্রেরণা আসিয়াছিল তাঁহার কবি-কল্পনা হইতে, তবে ইহাদের ভাবাবহ সৃষ্ট হইয়াছে গ্রাম্যজীবনের সূক্ষ্ম সহযোগিতায়। কবি তাঁহার নভোচারী কল্পনাকে জীবনের শত দৃঢ়বন্ধনে বাঁধিয়া উহাকে পল্লীজীবনসম্ভবরূপে দেখাইয়াছেন, উহার চারিদিকে গ্রামজীবনের বাস্তব ফ্রেম আঁটিয়া উহাকে রুক্ষ-কর্কশ আবেষ্টনে একটি অতি স্বাভাবিক পেলব প্রকাশরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'সুভা' (মাঘ, ১২৯৯) ও 'মহামায়া' (ফাল্গুন, ১২৯৯) এই দুইটি গল্পে বাক্‌শক্তিহীনা সুভা মূক প্রকৃতির সহিত এক বৃহৎ একাত্মতায় লগ্ন হইয়া নিজ ব্যক্তিসীমাকে অতিক্রম করিয়াছে ও প্রকৃতিতন্ময়তার সাঙ্কেতিকগৌরবমণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার

গ্রাম্য পরিবেশকে যতদূর সম্ভব সমবেদনাহীন ও তাহার শুভাশুভের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনরূপে দেখান হইয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহার বিবাহ সারিয়া নির্দায় হইতেই ব্যস্ত ও তাহার স্বামী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করে নাই। তাহার অন্তর-সৌকুমার্যের সহিত তাহার মানবিক পরিবেশ একেবারেই নিঃসম্পর্ক এবং এই উপায়েই এই পেলব সত্তাটির বাস্তবতা রক্ষিত হইয়াছে। মহামায়ার চরিত্রের বিদ্যুৎদীপ্তি বাঙলা দেশের সদ্যো-অতীত ও দীর্ঘকাল-প্রচলিত কৌলীন্যমেঘবিচ্ছুরিত। তাহার মুমূর্ষু বৃদ্ধের সহিত বিবাহের আয়োজন; তাহার সতীদাহের জন্য তাহার একমাত্র অভিভাবক দাদার অনমনীয় দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহার চিতা হইতে পলায়ন ও কঠোর শর্তাধীনে রাজীবলোচনের সহিত বাস করিতে সম্মতি ও এই শর্তভঙ্গ হইলে তাহার ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান—সমস্তই প্রমাণ করে এই দীপ্ত রূপের পিছনে কতটা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কঠোর উপাদান সঞ্চিত ছিল। তাহার চরিত্রে বিদ্যুতের সহিত বজ্র অব্যবহিত নৈকট্যে মিশ্রিত ছিল ও কুলীনকন্যার প্রচণ্ড কুলাভিমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজ্রস্তনিত নিঃস্বনেই আত্মপ্রকাশ করিত। তাহার সম্বন্ধে কবির উক্তি মনে পড়ে—

> যে বিদ্যুৎছটা
> রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে!

মোট কথা, মহামায়া পল্লীলক্ষ্মীর কোন আদর্শপ্রতিমা নয়, কৌলীন্যআবহতন্ত্রের একটা বজ্রবিদ্যুৎ-দীর্ণ, বিস্ময়াবহ মেঘমায়া।

আর একটি গল্প 'অতিথি'-তে (ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২) সংসারবন্ধনহীন, মুক্তস্বভাব তারাপদ বহিঃপ্রকৃতির প্রাণলীলাচঞ্চল, নিয়ত-অগ্রসরশীল মর্মসত্তার একটি অপূর্ব স্ফুরণ। প্রকৃতির আনন্দ-উৎসব ও অবিরত গতিধারার সহিত সে একাত্ম। কোন বিশেষ কাজে আবদ্ধ না থাকায়, পল্লীসমাজের সমস্ত কাজে তাহার অনায়াস-নৈপুণ্য। তাহার মন কোন বিশিষ্ট-উদ্দেশ্য-শৃঙ্খলিত না হওয়ায় সে পল্লীজীবনের স্নেহমধুর সম্পর্কের সহিত নিজ প্রীতিবন্ধন সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে। আর বহিঃপ্রকৃতির ঋতুপরিবর্তনকালে তাহার অতি পুরাতন বক্ষপঞ্জরে যে নূতন জীবনানন্দ সংক্রামিত হয় তাহার আহ্বান তাহার নিকট অমোঘ। বর্ষার বৎসরান্তিক নূতন আবির্ভাবে, যেদিন গ্রামপ্রান্ত-প্রবাহিনী নদীতে বন্যার বেগ অকস্মাৎ ঝাঁপাইয়া পড়ে, আকাশে-আকাশে সঞ্চরমান বিভিন্নবর্ণের মেঘরাশি আকাশমরুতে নবসৃষ্টিচেতনার উন্মেষ করে,

মেঘের মুহুর্মুহু গর্জনে ও নভোলোকে গতিশীল বর্ণবৈচিত্র্যের আবরণের অন্তরালে সমস্ত পৃথিবীর উপর ভগবানের রথযাত্রাতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য দিব্য আদেশ ঘোষিত হয়, তাহারই তীব্র নির্দেশ বালকের মর্মস্থলে অনুপ্রবিষ্ট হয় ও তাহার পূর্বনিবাসের সমস্ত আকর্ষণ ও সমস্ত স্নেহসংস্কারকে সবলে ছিন্ন করিয়া তাহাকে নিরুদ্দেশযাত্রায় প্রকৃতির সহযাত্রী হইতে প্রণোদিত করে। এরূপ চরিত্রের উদ্ভব কবির বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে নয়, তাঁহার মানস কল্পনার উৎস হইতে। কিন্তু এই চরিত্রটিকে স্বাভাবিক করিবার জন্য যে পল্লী-পরিবেশ রচিত হইয়াছে, অন্যান্য মানুষের সহিত তাহার যে সম্পর্ক বর্ণনা ও ঐ সম্পর্কের প্রভাবে তাহার যে মানস প্রতিক্রিয়াগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতা ও শিল্পসঙ্গতির মধ্যে একটি অপূর্ব সমাহার ঘটিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার বৈরাগ্যসাধনাপ্রভাবিত পল্লীসমাজে অনেক তরুণ সংসার-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া অধ্যাত্মমার্গাশ্রয়ী হইয়াছে। যাত্রা ও কবিগানের আকর্ষণেও কোন কোন সঙ্গীতরসপিপাসু বালক ঘরছাড়া হইয়াছে। কিন্তু তারাপদর ন্যায় কোন বালকই বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক আকর্ষণ-মুগ্ধ হইয়া, আবেষ্টনের কলুষিত প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া স্বেচ্ছাবিহারের ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। তাহার মনের পালে কবিমানসের হাওয়া না লাগিলে সে এইরূপ ত্রিভুবনচারী হইতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথ চির-পরিচিত পল্লীদেহের মধ্যে এক চিরমুক্ত, উদাসীন কিশোর কুমারের আত্মা সমাবেশ করিয়া আমাদের বাস্তববোধ ও আদর্শসৌন্দর্য-কল্পনা উভয়েরই যুগপৎ পরিতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন।

পল্লীজীবনসম্পর্কিত আরও কয়েকটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ আদর্শানুরঞ্জন পরিহার করিয়া উহার অপেক্ষাকৃত স্থূল ও ইতর দিকগুলির উপর আলোকপাত করিয়াছেন। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮), 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (অগ্রহায়ণ ১২৯৮), 'সম্পত্তি-সমর্পণ' (পৌষ ১২৯৮), 'মুক্তির উপায়' (চৈত্র ১২৯৮), 'ত্যাগ' (বৈশাখ ১২৯৯), 'জীবিত ও মৃত' (শ্রাবণ ১২৯৯), 'স্বর্ণমৃগ' (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯), 'ছুটি' (পৌষ ১২৯৯), 'দান-প্রতিদান' (চৈত্র ১২৯৯), 'শাস্তি' (শ্রাবণ ১৩০০), 'সমাপ্তি' (আশ্বিন ১৩০০), 'সমস্যাপূরণ' (অগ্রহায়ণ ১৩০০), 'অনধিকারপ্রবেশ' (শ্রাবণ ১৩০১), 'মেঘ ও রৌদ্র' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১), 'আপদ' (ফাল্গুন ১৩০১), 'দিদি' (চৈত্র ১৩০১), 'প্রতিহিংসা' (আষাঢ় ১৩০২) প্রভৃতি পল্লীজীবনপ্রভাবিত ছোটগল্পের তালিকা।

ইহাদের মধ্যে 'মুক্তির উপায়' ও 'শাস্তি' এই দুইটি গল্পে পল্লীর প্রাকৃত

জনসাধারণের জীবনসমস্যাটি অতি বস্তুনিষ্ঠভাবে, অথচ ভাবসুসঙ্গতির সহযোগিতায় বিশদ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে এই সমাজভুক্ত মেয়েদের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখিতেন ইহা আমাদিগকে আশ্চর্য বলিয়াই ঠেকে। এগুলিতে তিনি কাব্যমননের ঘোরা পথে, কল্পনাসারথি রথাধিরূঢ় হইয়া পৌছেন নাই, পরন্তু অপূর্ব জীবনরসিকতালব্ধ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিজস্ব আলোকে পথ চিনিয়া গ্রাম্য সমাজের একেবারে মর্মস্থানে গিয়া পৌছিয়াছেন। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা যে তিনি শহুরে কবি হঠাৎ পল্লীপ্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া গ্রামসমাজের উপর তাঁহার কাব্যকমণ্ডলুসঞ্চিত কিঞ্চিৎ মধুবৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ভ্রান্তি আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা যে ছড়াকাটা কোন্দলপরায়ণতায় সুদক্ষ ও ক্ষুরধার রসনাস্ত্রপ্রক্ষেপে সুনিপুণা, কোন পল্লীবাসী লেখক অপেক্ষা তাঁহার যে সে জ্ঞান মোটেই কম ছিল না, তাহা তাঁহার সপত্নী-বিড়ম্বিত উচ্চবর্ণের গৃহব্যবস্থার নিখুঁত বর্ণনায় ও ব্রাহ্মণ গৃহিণীদের অনর্গল বাগ্মীতার যথাযথ অনুবর্তনে নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণিত। বৈরাগ্যের প্রভাবে গৃহত্যাগী ফকিরচাঁদ দুই সপত্নীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ শৌখীনমেজাজী তাহার এক আত্মীয় মাখনলালরূপে সনাক্ত হইয়া যে মিষ্ট লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার মধ্যে কৌতুকরস ও প্রত্যাশাভঙ্গের উপহাস্যতা প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে। যে একমাত্র সুশীলা স্ত্রীর রঙ্গরসপ্রবণতা ও অধ্যাত্মবিমুখতা দেখিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিল, সে অকস্মাৎ দুই স্ত্রীর প্রখর দাম্পত্য সম্বন্ধের আনুষঙ্গিক দেহনিপীড়নের তপ্তইক্ষুচর্বনবৎ তীক্ষ্ণ আস্বাদন লাভ করিয়া যে গৃহে ফিরিতে ব্যাকুল হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? শেষ পর্যন্ত মাখনলাল এই দুই রমণীর হাত হইতে ফকিরচাঁদকে রক্ষা করিবার জন্য উহাদের উপর নিজ স্বত্ব-স্বামিত্ব স্বীকার করিয়া সমবেত কৌতূহলী প্রতিবেশীবৃন্দকে 'এটি আমার দড়ি' 'আর এইটি আমার কলসী' এই স্বরূপ-পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। গল্পটিতে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের নির্মম রসিকতার, অন্যদিকে গ্রাম্য পুরমহিলাদের ভাষা ও ভাবের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহিত গ্রাম্য সমাজের নিম্নতমস্তরের পরিচয়ও যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহার আশ্চর্য প্রমাণ মিলে 'শাস্তি' (শ্রাবণ ১৩০০) নামে একটি অভিমানবহ্নিগর্ভ নিদারুণ ট্রাজেডির গল্পে। এই গল্পে দিনমজুরখাটা দুই ভ্রাতা ও তাহাদের দুই পত্নী লইয়া গঠিত, একটি ক্ষুদ্র পরিবারের দারিদ্র্যপীড়িত ও অদৃষ্ট-লাঞ্ছিত জীবনরঙ্গভূমে যে সর্বনাশের অভিনয় হইয়াছে তাহার একটি আশ্চর্য

বর্ণনা পাই। এই সর্বনাশের আগমন কেবল ঘটনার চক্রান্তে নয়, চরিত্রের নিগূঢ় প্রভাবও উহাকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে। দুখীরাম ও ছিদাম দুই ভাই এবং বড় বৌ রাধা ও ছোট বৌ চন্দরার প্রকৃতিগত পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উচ্চমহলের বাসস্থান হইতে কি অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টিবলে প্রত্যক্ষ করিতে ও স্বল্পতম ভাষারেখায় ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। বিশেষতঃ ছিদাম ও চন্দরার যে দাম্পত্য জীবনটি সমইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন, অথচ বিপরীতগামী দুই মনের অবিরত সংঘর্ষে বাহিরে চাপা, কিন্তু অন্তরে সদা প্রধূমিত, এক অঘোষিত যুদ্ধের উত্তপ্ত বাষ্পে উচ্ছ্বসিত ছিল তাহার বর্ণনাটি রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম কলাসংযমের সহিত বিবৃত করিয়া আসন্ন ট্রাজেডির ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। এই অন্তর্গূঢ় দাম্পত্য মনোমালিন্য ও সংশয়ের পটভূমিকায় ছিদামের চন্দরার উপর খুনের দায়িত্ব চাপাইবার প্রস্তাব এক মুহূর্তে তাহার রক্তে বিষজ্বালা ধরাইয়াছে ও তাহাকে মিথ্যা স্বীকৃতিদ্বারা আত্মহননসঙ্কল্পে স্থির করিয়াছে। তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ এক বিজাতীয় অভিমান ও অবজ্ঞায় পূর্ণ হইয়াছে ও তাহাকে রক্ষা করিবার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া সে ফাঁসিমঞ্চে প্রাণবিসর্জন দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এই নীচজাতীয়া রমণীর মধ্যে এরূপ অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি ও সংসারের প্রতি নিবিড় ঘৃণা এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন পল্লীপ্রেমিক সাহিত্যিক আবিষ্কার করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অতিদীন কৃষক পরিবারের চিত্রাঙ্কনে কাব্যাভিষেকের একবিন্দু জলও লেখকচিত্তকে আর্দ্র করে নাই। তিনি কঠোর মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে, চরিত্রসঙ্গতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া জীবনদ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতিটুকু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। বাঙলার কোমল মৃত্তিকায় গ্রীক্ ট্রাজেডির পাষাণ প্রতিমা নির্মিত হইয়াছে।

৩

কতকগুলি গল্পে—যেমন 'সম্পত্তি-সমর্পণ' (পৌষ ১২৯৮) ও 'স্বর্ণমৃগ' (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯)-এ দেশের কতকগুলি বদ্ধমূল ধর্মসংস্কার ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস কাহিনীর ভিত্তিরচনা করিয়াছে। দেশে তন্ত্রধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক অভিচারে বিশ্বাস, দৈবানুগ্রহমূলক সম্পদলাভ সাধারণ গৃহস্থের অস্থিমজ্জাগত প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে ও এই সাধনা-প্রক্রিয়ার নৃশংসতা তাহাদের

অন্ধমোহের নিকট বিলুপ্ত হইয়াছে। তাই প্রথম গল্পে যজ্ঞনাথ তাহার গৃহ-বিতাড়িত, অজ্ঞাত-পরিচয় পৌত্রকে যখ দিয়া তাহার প্রেতহস্তে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিতে বিন্দুমাত্র দয়া অনুভব করিল না, সেই আলোহাওয়া-পিয়াসী, মনুষ্যসঙ্গ-উৎসুক বালককে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার ঘরে তিলে তিলে ভয়াবহ, নিঃসঙ্গ মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু এই মৃত্যু-তুহিন, ধর্মের কৃচ্ছ্রসাধনে ক্রূর কাহিনীর পটভূমিকায় আমরা পাই বার্ধক্যের শাসন-উপেক্ষাকারী, কিশোর-কলধ্বনিময় এক আনন্দজগৎ। এই দুই জগতের মধ্যে বৈপরীত্য আমাদের মনে এক অজ্ঞাত ভীতিশিহরণ জাগায়।

'স্বর্ণমৃগ'-এ অপ্রাকৃতের ছম্‌ছমানি ভাব এতটা সুপরিস্ফুট নয়—এ যেন একটা অদৃষ্টনির্ভর জুয়াখেলা। ইহার পরিণতির বঞ্চনায় আমরা মোটেই বিস্মিত হই না ও আমাদের ধারণা যে হতভাগ্য বৈদ্যনাথও তাহার আশাভঙ্গে বিশেষ মর্মান্তিক আঘাত পায় নাই। এই গল্পে যে শক্তি বৈদ্যনাথকে রসাতলের দিকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করিতেছিল তাহা কোন দুর্জ্ঞেয় নিয়তি নয়, তাহা তাহার স্ত্রী মোক্ষদার তীব্ররোষানলস্পৃষ্ট ঘৃণা। স্ত্রীর মুখনিঃসৃত, চিত্তদাহকারী বাক্যপরম্পরা ও কঠিন ঘৃণায় নির্বাক, কুঞ্চিতৌষ্ঠ মুখ সর্বদাই তাহাকে সরব ও নীরব ভর্ৎসনায় বিদ্ধ করিয়া তাহাকে বাধ্য হইয়া অদৃষ্টের বদান্যতার উপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল করিয়াছে। কিন্তু যখন ভাগ্য তাহাকে বিড়ম্বনা করিতেছে, তখনও তাহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে। গল্পটির মূল কেন্দ্র অদৃষ্টনির্ভরতা নয়, যে দয়াহীন, সহানুভূতিবর্জিত দাম্পত্য জীবন তাহাকে ভাগ্যের দুয়ারে ধন্না দিতে বাধ্য করিতেছে তাহাই উহার রসকেন্দ্র।

'সমাপ্তি' (আশ্বিন ১৩০০) প্রেমের মায়াদণ্ডস্পর্শে একটি দুরন্তপ্রকৃতি গ্রাম্য বালিকার মনে প্রণয়ানুভূতির গভীরতার সঞ্চার, একটা শিক্ষা ও সহবৎহীন দস্যু মেয়ের অকস্মাৎ প্রেমারুণা কিশোরীতে রূপান্তর একটি অপূর্ব মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের কাহিনী। বাহিরের উপদেশ-তাড়না-ভর্ৎসনায় যে আত্মতুষ্ট হৃদয়ে কর্তব্যবোধের সঞ্চার হয় নাই, স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেমনিবেদন যাহার হুটোপুটিকরা স্বভাবে বিন্দুমাত্র রং ধরাইতে পারে নাই, অকস্মাৎ একটি মানুষের বিষাদ-ক্ষুণ্ণ বিদায়গ্রহণে তাহার মানস ভারকেন্দ্রের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিল ও প্রেমের রাজকীয় মহিমা তাহার সমস্ত পূর্বপ্রকৃতিকে উন্মূলিত করিয়া সেই শূন্যস্থানে নিজ বিজয়-পতাকা প্রোথিত করিল। তাহার সমস্ত অন্তর এক অপরিমেয় গভীরতায় ও বিষাদগাম্ভীর্যে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল ও শাসনসংযমহীনা, লঘুপ্রকৃতি বালিকা

এক মুহূর্তে প্রেমের শাশ্বত গৌরবে প্রতিষ্ঠিতা হইল। ইহাতে কাহারও কোন হাত ছিল না; তাহার অন্তরের অন্তর্নিহিত বৃহৎ শক্তিই এই বৃহৎ পরিবর্তনের কারণ। পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গেও মৃন্ময়ীর কোন আত্মিক যোগের চিহ্ন দেখা যায় না। সে উহাকে অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন নিগূঢ়তর প্রভাব উপহার দেয় নাই। মৃন্ময়ীর মধ্যে আদর্শানুরঞ্জনের কোন প্রয়াসই নাই। তাহার চিত্তপরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে, তাহার হঠাৎ-প্রবুদ্ধ বিপুল আত্মসংকল্পের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। পল্লজীবনে এরূপ মৃন্ময়ী হয়ত এখনও দেখা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাহারও চোখে সে ধরা পড়ে না।

'মেঘ ও রৌদ্র' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১) ছোটগল্পের সীমা ছাড়াইয়া প্রায় একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের আকার লাভ করিয়াছে। ছোটগল্প হিসাবে ইহার ভাবকেন্দ্র অনেকটা বহু-বিস্তৃত ও শিথিল-বিন্যস্ত। ইহা একটি ছোট অভিমান-প্রবণা বালিকা গিরিবালা ও ক্ষীণদৃষ্টি, বিষয়বুদ্ধিহীন এক উচ্চশিক্ষিত যুবক শশিভূষণের অসম হৃদয়াকর্ষণের কাহিনী। কিন্তু এই কেন্দ্রস্থ বিষয়ের চারিদিকে আরও নানা পরিবেশচিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাহেবের অত্যাচার, পল্লীবাসীর মূঢ় সহিষ্ণুতা, সমাজনেতাদের ক্রূর ষড়যন্ত্র ও নির্লজ্জ সাহেব-স্তাবকতা, সমস্ত মিলিয়া পল্লীসমাজের শ্বাসরোধী হীনতা শশিভূষণকে দেশছাড়া ও কারাবাসী করিয়াছে ও গিরিবালার সহিত তাহার স্নেহমধুরসম্পর্কের অবসান ঘটাইয়াছে। অবশেষে জেল হইতে মুক্তির দিন অচিরবিধবা, বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী গিরিবালা শশিভূষণকে নিজগৃহে সম্মানিত অতিথিরূপে রাখিয়া ঐ নিরীহ, শিশুপ্রকৃতি প্রৌঢ় মানুষটির আজীবন তত্ত্বাবধানের ভার লইয়াছে। একটি মর্মোৎসারিত কীর্তনের সুর এই বহুদুঃখান্তিক মিলনের করুণ রসটি অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ফুটাইয়াছে। সমস্ত গল্পটির মধ্য দিয়া বর্ষাপ্রকৃতির পরিপূর্ণ জলোচ্ছ্বাস যেন মানবজীবনসম্ভূত অনর্গল অশ্রুধারার মত বহিয়া গিয়াছে। এই গল্পে পল্লীপ্রকৃতি নায়ক বা নায়িকার অন্তরঙ্গজীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই বটে, তবে পল্লীসমাজের জীবনব্যাধিবিশ্লেষণে লেখক কতদূর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিলেন তাহার আশ্চর্য প্রমাণ মিলে।

৪

কোন কোন গল্পে পরিবার-সংস্থার কোন বিন্যাস-বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ কোন দায়িত্ববোধ জটিল সংঘাতের হেতু হইয়া গল্পে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে। 'দান-

প্রতিদান' গল্পে (চৈত্র ১২৯৯) একান্নবর্তী পরিবারে দুই দূরসম্পর্কিত ভ্রাতা শশিভূষণ ও রাধামুকুন্দের প্রায় সমান অধিকারে বাস ও বৈষয়িক ব্যাপারে আসল মালিক শশিভূষণের সম্পূর্ণভাবে রাধামুকুন্দের উপর নির্ভরশীলতা স্বভাবতঃই মেয়েমহলে একটা গুরুতর ক্ষোভ ও অভিমানের আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া সাংসারিক শান্তিকে প্রতিদিনই ব্যাহত করিত। এই ঝটিকার মধ্যে কেবল রাধামুকুন্দের অক্ষুণ্ণ ধৈর্য ও স্ত্রীর উপর কড়া শাসন ও শশিভূষণের পরিপূর্ণ বিশ্বাস সংসার-তরীকে ভরাডুবি হইতে দেয় নাই। ইতিমধ্যে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়া গেল ও শশিভূষণের জমিদারী নীলাম হইয়া গেল। তখন সমস্ত সংসারের প্রতিপালন-ভার বুদ্ধিমান ও উপায়কুশল রাধামুকুন্দের উপর পড়িয়াছে ও সে কিছুদিনের মধ্যেই হারানো জমিদারী আবার উদ্ধার করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে রাধামুকুন্দই যে ষড়যন্ত্র করিয়া জমিদারী নীলাম করায় সেই গোপন কথাটি শশিভূষণের কানে পৌছিয়াছে। সুতরাং নির্বাণোন্মুখ দীপে তৈলদানের ন্যায় এই সুসংবাদ শশিভূষণের নিঃশেষিতপ্রায় পরমায়ুকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সে সংসারের প্রতি আকর্ষণ তাহার ছিন্ন হইয়াছিল সেই সংসার হইতে সে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। গল্পটির বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহাতে একটি সম্পূর্ণ নূতন পারিবারিক বন্ধন ও শৃঙ্খলার মূল সূত্র দেখান হইয়াছে। পরকে আপন করিবার যে অনন্য ক্ষমতা হিন্দুপরিবারের ছিল এই গল্পটি তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'দিদি' (চৈত্র ১৩০১) এক স্বামিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিণী নারী কর্তৃক অবস্থাবৈগুণ্যে তাহার নাবালক, অসহায় বৈমাত্র ভাইএর বিষয়রক্ষার জন্য ঐ সম্পত্তি-গ্রাসোদ্যত স্বামীর অন্যায়াচরণের দৃঢ় প্রতিরোধ ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণের কাহিনী। স্বামিপ্রেম ও ভ্রাতৃস্নেহ এই দুই প্রবল আকর্ষণের মধ্যবর্তিনী হইয়া শশীর যে নিদারুণ আত্মদ্বন্দ্ব তাহাই তাহাকে এক অনভ্যস্ত রণভূমিতে সংগ্রাম-পরিচালনার নেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যখন অকালবসন্তে স্বামিপ্রেমের নূতন জোয়ার তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে প্লাবিত করিয়াছে, যখন সে তাহার নববিকশিত অন্তরের সমস্ত প্রীতি-অর্ঘ্য সাজাইয়া স্বামিদেবতার চরণে নিবেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই তাহার স্বামী লুব্ধ দানবের ন্যায় তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহার অন্তরের প্রেমস্বপ্নকে রূঢ়ভাবে টুটাইয়া দিয়াছে ও সমস্ত পূজার আয়োজনকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। বাঙালী পরিবারে এই বহুমুখী ও পরস্পরবিরোধী স্নেহ-কর্তব্যের দাবী উহার আপাত-সরলতার মধ্যে যে জটিলতার প্রবর্তন করে রবীন্দ্র-নাথের কৌতূহলী দৃষ্টি তাহারই আবিষ্কার ও সার্থক প্রয়োগ করিয়াছে।

'প্রতিহিংসা' গল্পটি (আষাঢ় ১৩০২) বাঙালীসমাজসুলভ এক অভিনব সম্পর্ক-স্বীকৃতি, সদ্যোলুপ্ত জমিদারীপ্রথার প্রভাবজাত এক ভাবমুগ্ধ প্রভুভক্তির আদর্শ, কণ্টকবৃক্ষবিকশিত বন্যকুসুমের ন্যায়, অতি-আশ্চর্য মিষ্টগন্ধ বিকীর্ণ করিয়াছে। জমিদারের সঙ্গে দেওয়ান প্রভৃতি উর্ধ্বতন কর্মচারীর যে সম্পর্ক তাহা সাধারণ প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের অনেক উর্ধ্বে; তাহা অনেকটা ভক্ত-ভগবান বা গুরুশিষ্যের সম্পর্কের অনুরূপ। জমিদারের আজ্ঞানুবর্তনেই কর্মচারীর স্বাধীন ইচ্ছার পরিতৃপ্তি, তাহার জন্য ত্যাগস্বীকারেই উহার চরম সার্থকতা, তাহার নিকট আত্মাবমাননাই উহার আত্মসম্মানবোধের উজ্জ্বলতর উদ্দীপক। কর্মচারীর সমস্ত ধন, মান, সামর্থ্য জমিদারের উদ্দেশ্যে চিরনিবেদিত। অবশ্য উনবিংশ শতকের শেষ পাদ নাগাদ এই নিবিড় সম্পর্ক খানিকটা শিথিল হইয়াছে। এখন প্রথার চিরনির্দিষ্ট পবিত্রতার পরিবর্তে চুক্তির স্বাধীনতার দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপিত হইতেছে। কাজেই মুকুন্দবাবু দেওয়ানের নাতজামাই এখন তাঁহার পোষ্যপুত্র বিনোদবিহারীর ম্যানেজার এই নূতন অভিধা গ্রহণ করিয়াছে। এই অভিধা-পরিবর্তনের পিছনে মনোভাব-পরিবর্তনের একটি ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে। নূতন ম্যানেজার অম্বিকাচরণ নিজেকে ষোল আনা জমিদারগোষ্ঠীর বিশ্বস্ত ভৃত্য বলিয়া মনে করেন না। তিনি যখন দিনের কাজ মিটাইয়া কাছারি হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন এই অবসর সময়টুকুর উপর জমিদারী কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তবে তাঁহার কর্তব্য ও অধিকারবোধ যে সীমাটুকুই নির্দেশ করিয়া দিক না কেন সঙ্কটসময়ে দীর্ঘকালের মানস সংস্কার অনিবার্যভাবে আত্ম-ঘোষণা করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গল্পটি নিজ উপকরণ ও প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছে। ইন্দ্রাণীর মুনিবগৃহিণী তাঁহার গৃহে এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে ইন্দ্রাণীর বাক্‌সংযম, অপরূপ সৌন্দর্য ও অলঙ্কার-প্রাচুর্যকে রূপগর্ব ও অলঙ্কারগর্বের লক্ষণরূপে গণ্য করিয়া তাহাকে কটুসম্ভাষণ ও পরিচারিকা-কার্যে নিয়োগের দ্বারা অপমানিত করেন। অম্বিকাচরণ যখন এই অপমানের কথা শুনিয়া কর্মত্যাগে উদ্যত হন, তখন ইন্দ্রাণীরই প্রভুভক্তি তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে। আবার যখন দুর্বলচিত্ত ও অমিতব্যয়ী বিনোদবিহারী স্ত্রী ও কয়েকজন ছোটখাট কর্মচারীর প্ররোচনায় ও অম্বিকাচরণের সতর্ক ব্যবস্থায় অসহিষ্ণু হইয়া অম্বিকাচরণকে গোপনে বরখাস্ত করে, তখন অম্বিকাচরণই বিনোদের আসন্ন সর্বনাশের সংবাদ পাইয়া স্বেচ্ছায় পদপরিত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে ও জমিদারীর জীর্ণ তরীর হাল ধরিয়া

স্বকর্তব্যে রত থাকে। সেই সময়েই সমস্ত জমিদারীকে নীলাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে অলঙ্কাররাশি ইন্দ্রাণীর রূপসজ্জায় একটা চোখ-ধাঁধানো দীপ্তির বিদ্যুৎশিখা আরোপ করিয়া তাহার প্রভুপত্নীর ঈর্ষ্যাদগ্ধ মন্তব্যের উদ্রেক করিয়াছিল তাহাই ইন্দ্রাণীকর্তৃক স্বহস্তে প্রভুসেবায় উৎসর্গিত হইল। এই অপূর্ব প্রতিহিংসাই প্রভুভৃত্যের সম্পর্কের বিনষ্ট ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করিল, উহার উদার মহত্ত্ব অপরপক্ষের ক্রূর নীচতার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিল ও নিরাভরণা ঐন্দ্রাণী-অন্তর্নিঃসৃত জ্যোতির্ময়তায় দ্বিগুণ শোভা পাইতে লাগিল।

৫

কতকগুলি গল্পে—যথা 'রামকানাইএর নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮), 'সমস্যাপূরণ' (অগ্রহায়ণ ১৩০০), 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (অগ্রহায়ণ ১২৯৮), ও 'আপদ' (ফাল্গুন ১৩০১)—গল্পরসের সহিত পল্লীজীবনসংক্রান্ত ছোটখাট কৌতূহলোদ্দীপক বৈশিষ্ট্য মিশিয়া উহাদের আস্বাদ্যতা বাড়াইয়াছে। রামকানাই নিজ ছেলের বিপক্ষে বিধবা ভ্রাতৃবধূর পক্ষে তাহার দাদার উইল সম্বন্ধে সত্য এজাহার করিয়া যে মনোবলের পরিচয় দিয়াছে পল্লীগ্রামের লোকে তাহাকে মূর্খতারই প্রমাণরূপেই গ্রহণ করিয়াছে। এখানেও লেখক স্ত্রী-স্বভাবের প্রগল্‌ভতা ও শোকাভিনয়প্রবণতার এমন তথ্যসমৃদ্ধ পরিচয় দিয়াছেন যাহা তাঁহার পল্লীজীবনাভিজ্ঞতার গভীরতা সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত পূর্বধারণাকে খণ্ডিত করে। 'সমস্যাপূরণ'-এ আধুনিক নব্যজমিদারের প্রজাশাসনপদ্ধতির নিক্তির ওজনে ন্যায়বিচারের সহিত পূর্বতন জমিদারের শিথিল প্রশ্রয়দানের তুলনা করিয়া পূর্বব্যবস্থাই যে প্রজাবর্গের অধিকতর হিতসাধক ছিল প্রজাবৃন্দ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এই বৃহত্তর ব্যবধানের মধ্যে লেখক আর একটি সূক্ষ্মতর নীতিঘটিত প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন—ভূতপূর্ব জমিদার কৃষ্ণগোপাল তাঁহার কাশীধামে বানপ্রস্থ অবলম্বন ও সুপ্রচুর দানশীলতা ও হরিভক্তির মধ্যে এক মুসলমান বিধবার প্রতি কেমন করিয়া না জানি অবৈধ-প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন ও এই অবৈধপ্রণয়জাত সন্তান অছিমদ্দির প্রতি সম্পত্তি বন্দোবস্ত-ব্যাপারে বিশেষ পক্ষপাত দেখাইয়াছিলেন। যখন বিপিনবিহারী মামলা-মোকদ্দমার দ্বারা এই সমস্ত অন্যায়-উপস্বত্বভোগীদের বাড়তি সম্পত্তি জমিদারের খাসতালুকভুক্ত করিতেছিলেন তখন এই অছিমদ্দিই সর্বাপেক্ষা বাধা দেয় ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করে। ইহার নামে যখন দেওয়ানি-ফৌজদারী

আদালতে নানা সাংঘাতিক মোকদ্দমা দায়ের হইল, তখন কৃষ্ণগোপাল কাশী হইতে এক দিনের জন্য আসিয়া পুত্রকে এই মোকদ্দমাগুলি তুলিয়া লইতে আদেশ দিলেন এবং পুত্র বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রের নিকট অসঙ্কোচে নিজ যবনী-আসক্তির কথা স্বীকার করিলেন। সুতরাং তিনি তথ্যগত সমস্যা পূর্ণ করিলেও তাঁহার চরিত্রবিচার সম্বন্ধে নানা কুৎসা-রটনার অবসর দিয়া গেলেন ও তাঁহার চরিত্রে সাধুতার অকৃত্রিমতা-নির্ণয়ের নূতন মানদণ্ড সম্বন্ধে অনেক কল্পনা-জল্পনার উৎসমুখ খুলিয়া দিলেন। এই নূতন সমস্যা পূরণ হইবার প্রতীক্ষায় রহিল।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (অগ্রহায়ণ ১২৯৮) করুণরসপ্রধান গল্প। অনুকূল বাবুর একমাত্র শিশুপুত্রের বর্ষাস্ফীত পদ্মাতরঙ্গ কর্তৃক গ্রাস বর্ণনার দিক দিয়া খুবই সার্থক ও ব্যঞ্জনাময় হইয়াছে। রাইচরণের মত একজন অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন, স্থিরধারণার দ্বারা একান্ত-প্রভাবিত বৃদ্ধ যে নিজের ছেলেকে অনুকূল বাবুর মৃতপুত্রের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া মনে করিবে তাহা হয়ত মনস্তত্ত্বসম্মত। কিন্তু অনুকূলবাবু, তাঁহার স্ত্রী ও ফেলনা নিজে যে এই ভ্রান্তধারণার পোষকতা করিবে, এক অর্ধোন্মাদ বৃদ্ধের ভাবনাবিকার যে সত্য বলিয়া চিরকালের মত চলিয়া যাইবে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য মনে হয় না। লেখক নিজে এই ভ্রমচক্রের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও এই আরামপ্রদ মিথ্যাকে সত্যের সিংহাসনে বসাইতে বিশেষ অনিচ্ছা দেখান নাই।

আরও কয়েকটি গল্প—যথা 'ছুটি' (পৌষ ১২৯৯), 'অনধিকার প্রবেশ' (শ্রাবণ ১৩০১) ও 'আপদ' (ফাল্গুন ১৩০১) গল্পের আকর্ষণের সহিত কোথায়ও বা দৃঢ় চরিত্র-অঙ্কন, কোথায়ও বা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বনির্ভর কোন সাধারণ জীবনসত্য মিশাইয়া অভিনব স্বাদুতা অর্জন করিয়াছে। 'ছুটি' একটি শহর-প্রবাসী বালকের মাতৃহস্তের স্নেহস্পর্শ ও তাহার বাল্যের গ্রাম-পরিবেশের জন্য করুণ-কাতর আকৃতির হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা ও তাহার অকালমৃত্যুর বেদনাবিদ্ধ বিবৃতি। কিন্তু বালকের এই অব্যক্ত মনোবেদনার অন্তরালে লেখক আমাদিগকে প্রথম কৈশোরের স্নেহবুভুক্ষা, তাহার উপবাসী হৃদয়ের গুমরাইয়া-মরা অনির্দেশ্য হাহাকারের ব্যাখ্যারূপে একটা চমৎকার মনস্তত্ত্বসম্মত সাধারণ সত্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। বাল্য হইতে কৈশোরে প্রথম পদার্পণকালে কিশোরের আকৃতি ও প্রকৃতিতে, কণ্ঠস্বরে ও পোশাক-পরিচ্ছদে প্রতিবেশের সহিত একটা অশোভন অসামঞ্জস্য তাহাকে যে অনাদর-কুণ্ঠিত করে তাহারই একটি চমৎকার ব্যাখ্যা

দিয়াছেন। সে যেন সংসারের সর্বত্রই বেমানান, সকলের প্রীতি-সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত, তাহার অঙ্গের পোশাকের মত তাহার প্রতি চেষ্টা ও চিন্তা যেন স্বভাবশ্রীভ্রষ্ট এইরূপ একটা ধারণা তাহার ভালবাসার জন্য কাঙালপনা ও ভালবাসালাভে অক্ষমতাবোধ এই উভয় প্রবৃত্তিকেই সমভাবে উদ্রিক্ত করে ও তাহার মানস অস্বস্তি বাড়ায়। ফটিকের মধ্যেও এই সব প্রবণতার প্রকাশ তাহার নিঃসঙ্গতাকে আরও অসহনীয় করিয়া তোলে ও তাহার ক্ষোভ ও আত্মগ্লানিকে মৃত্যুর সর্বরিক্ততার মধ্যে আত্মবিলোপের প্রেরণা দেয়। কাজেই গল্পটি শুধু ফটিকের ব্যক্তিগত করুণ জীবন-কাহিনী নয়, ইহার পিছনে সমস্ত স্নেহচ্যুত কিশোরের গোপন মর্মবেদনা ইহাকে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মর্যাদা দিয়াছে।

'আপদ' গল্পটিতে লক্ষ্মীছাড়া, যাত্রার দলে সখীসাজা, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন নীলকণ্ঠ এতদিন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে অনির্দেশ্যভাবে দুলিতেছিল। হঠাৎ কিরণের স্নেহস্পর্শে এক মুহূর্তে তাহার অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটিয়া সে আপনাকে যৌবনের দৃপ্ত আত্মমর্যাদায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতরূপে অনুভব করিল। দেখিতে দেখিতে উপাদেয় ও প্রচুর ভোজ্য অপেক্ষা উহার পিছনকার স্নেহ-রসটুকু তাহার নিকট কাম্যতর হইয়া উঠিল। লঘু যাত্রার গান ও অভিনয় তাহার সদ্যঃপ্রবুদ্ধ পৌরুষের নিকট লজ্জাকর ঠেকিল। এমন কি এই স্নেহরসের আসবপানে সে নিজ অধিকারের বাস্তব সীমা সম্বন্ধে জ্ঞান হারাইল, ও সে কিরণের স্নেহের উপর দাবীতে সতীশের সহিত অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতেও ইতস্ততঃ করিল না। যাহার পৌরুষ নিজ কর্মসাধনার দ্বারা বিকশিত হয় নাই, অপরের স্নেহদাক্ষিণ্যে যাহা অকস্মাৎ উদ্বুদ্ধ, সেই পৌরুষ ন্যায্য প্রাপ্তির সীমায় আবদ্ধ থাকে না, নিজ অপরিমিত লোলুপতার জন্যই মান-অভিমানের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অপ্রাপ্তির ক্ষত আরোগ্য করিতে ঈর্ষ্যার প্রলেপই নিজ দগ্ধ অন্তঃকরণে লেপন করে। নীলকণ্ঠের এই গূঢ় চারিত্রিক পরিবর্তন, এমন কি তাহার অন্তরে সতীশের প্রতি-ঈর্ষ্যার অনিবার্য উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য মনস্তাত্ত্বিক কুশলতার সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। নীলকান্তের চরিত্রে কমনীয়তার অভাব সত্ত্বেও লেখক উহার মধ্যে এক অপূর্ব তাৎপর্যগভীরতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

'অনধিকারপ্রবেশ'-এ গল্পাংশ অত্যন্ত ক্ষীণ, এমন কি নাই বলিলেও চলে। এই গল্প-মরুভূমির মধ্যে একমাত্র জয়কালী দেবী তাঁহার চরিত্রের ঋজু কাঠিন্য

ও [illegible] লইয়া একক মহিমায় দণ্ডায়মান আছেন। মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার অতি-সতর্ক পবিত্রতাবোধ কোন্ অজ্ঞাত কোমলবৃত্তির রন্ধ্রপথ দিয়া মন্দির মধ্যে অনধিকারপ্রবেশী এক অপবিত্র শূকরছানাকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ধর্মের বিপরীতমুখী প্রকাশের মধ্যে একটি নিগূঢ় সামঞ্জস্যের অস্তিত্বই এই গল্প দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

৬

কতকগুলি গল্পে শহরে ও পল্লীগ্রামে উভয়ত্রই সামাজিক কুপ্রথার প্রতি প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যপ্রধান গল্পগুলি আর্টের দিক দিয়া প্রায়ই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে না। উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত আলোচনা চরিত্রসৃষ্টি ও মানস স্ফূর্তি উভয় দিক্ দিয়াই কিছুটা প্রতিহত হয়। 'দেনাপাওনা' (১২৯৮) ও 'ত্যাগ' (বৈশাখ ১২৯৯) এইরূপ সমাজ-সমালোচনার দৃষ্টান্ত। প্রথমটিতে রায়বাহাদুর ও তাঁহার পত্নী পণের সমস্ত টাকা দিতে অসমর্থ রামসুন্দরবাবু ও তাঁহার কন্যা নিরুর প্রতি যে অমানুষিক অপমান ও নির্যাতন শাস্তিস্বরূপ দিয়াছেন তাহা হিন্দু সমাজের বর্বরতার এক কলঙ্কময় নিদর্শন। অসহায় রামসুন্দরবাবু বসত-বাটী বেচিয়া বাকি পণের অর্থ সংগ্রহ করিতে বারবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বাধা আসিয়াছে তাঁহার সাবালক পুত্রদিগের নিকট হইতে ও শেষ পর্যন্ত কন্যা নিরুর প্রবল নিষেধে। ইহাতে কাহারও শান্তি, সুখ বা সম্মান বাড়ে নাই। রামসুন্দর নিজ বিবেকের নিকট চির-অপরাধী রহিয়া গিয়াছেন ও নিরুকে শ্বশুরালয়ে সর্বদাই অবহেলা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছে। এই একটানা নিপীড়নের কাহিনীর মধ্যে কিছু নূতন উপাদান-সন্নিবেশ গল্পটিকে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে। রায়বাহাদুরের পুত্র হবু-ডেপুটি বিবাহবাসরে পণ বিনাই বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাকিয়া খানিকটা স্বাধীনচিত্ততার ও মনুষ্যোচিত আচরণের পরিচয় দিয়াছে। সে চাকরি পাইয়া দীর্ঘদিন চাকরিস্থলে একাকী কাটাইয়াছে, সুতরাং নিরুর উপর যে উৎপীড়ন চলিয়াছে তাহার প্রতিবিধানের তাহার কোন সুবিধা ছিল না। তথাপি প্রশ্ন জাগে যে ডাক-তারের মাধ্যমে সংবাদ-আদান-প্রদানের দেশে, বিশেষতঃ রাজধানী কলিকাতায় এই কাহিনীর ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও তাহার কানে পৌছিবার কোন উপায় কি তাহার নিকট খোলা ছিল না? সে সংবাদ পাইল যখন তাহার দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন সব

সম্পূর্ণ ও তাহার হতভাগিনী প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতি চিতায় দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় কথা রায়বাহাদুরের কুলপ্রথা অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর অত্যন্ত সমারোহ-সহকারে শ্রাদ্ধ-সম্পাদন। লেখক এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্র হানিয়াছেন ও ইহাতেই গল্পটি সাধারণ পণপ্রথার নিছক নিন্দা হইতে ঊর্ধ্বতন ভাবস্তরে উন্নীত হইয়াছে।

'ত্যাগ' গল্পটিতে হীনবর্ণা মেয়ের প্রকৃত কুল ছাপাইয়া ব্রাহ্মণযুবকের সহিত পরিণয়ের ষড়যন্ত্র ও উহা ফাঁস হইয়া যাইবার পর তুমুল পারিবারিক বিক্ষোভ ও মেয়েটিকে পরিত্যাগ করিবার কড়া নির্দেশ বর্ণনীয় বিষয়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে সমগ্র ব্যাপারটি পল্লীসমাজের কুখ্যাত দলাদলিপ্রিয়তারই বিচিত্র, বহুশাখায়িত পরিণতি। হেমন্তের বাবা এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের জাতি মারিয়াছিলেন, সুতরাং সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণ প্যারীশঙ্করও এই অসবর্ণ বিবাহের জাল বুনিয়া ও যথাসময়ে উহাকে ব্যক্ত করিয়া কেবল একটি নিরীহ প্রতিহিংসারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে তিনি একজন সুদক্ষ আর্টিস্টের মত বর-কন্যার পারস্পরিক আকর্ষণের ঈষৎ-উদ্ভিন্ন অঙ্কুরাবস্থা হইতে ফল-পরিণতির স্তর পর্যন্ত লালন করিয়াছেন ও শেষ মুহূর্তে এই পরিপক্ক নিষিদ্ধ ফলটিকে দাম্পত্য বৃক্ষ হইতে ভূপাতিত করিতে পত্রপল্লবের মধ্যে যে মৃদু আন্দোলন জাগান প্রয়োজন তাহারও নিখুঁত ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। তরুণ-তরুণী যখন পরস্পরের প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে তখন তিনি প্রণয়কোবিদের মত এই প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের তরঙ্গবেগ নিয়মিত করিয়াছেন, বিশেষতঃ মেয়েটির স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও অনীহাকে তিনি অতি সুকৌশলে প্রবল উন্মুখতায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বিবেক অনেকটা কলঙ্কশূন্যই আছে। স্বভাব যাহা আরম্ভ করিয়াছিল তিনি তাহার পরিসমাপ্তিকেই বিবাহান্তিক নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব দিয়াছেন। এবং যখন তাহার প্রয়োজন বুঝিয়াছেন, তখন সমাজনেতার সমাজ-সংরক্ষণরূপ পবিত্র দায়িত্বও সমান নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। গল্পের রোমান্টিক প্রেম সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কৌতূহলী হই না। যিনি এই তরল হৃদয়াবেগকে এমন চমৎকার শিল্পসম্মত রূপ দিয়াছেন তাঁহারই প্রতি আমাদের সমস্ত কৌতূহল নিবদ্ধ থাকে।

'পোষ্টমাষ্টার' (১২৯৮ ?) ও 'কাবুলিওয়ালা' (অগ্রহায়ণ ১২৯৯) প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ সনাতন মানবিক হৃদয়াকৃতির প্রকাশক দুইটি গল্প ; ইহার একটিতে নদীতীরবর্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে স্বজনসঙ্গচ্যুত, পারিবারিক স্নেহমমতার জন্য ক্ষুধিত

এক তরুণ পোষ্টমাষ্টারের সহিত অনাথা পল্লীবালিকা রতনের এক ক্ষণস্থায়ী, করুণ সম্পর্কের উদ্ভব। আর দ্বিতীয়টিতে কলিকাতার জনাকীর্ণ পরিবেশে একটি বালিকার সহিত রুক্ষদর্শন, প্রকৃতি-পরুষ এক কাবুলিওয়ালার প্রীতিস্নিগ্ধ, হাস্য-পরিহাসমধুর পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা। দুইটি গল্পেই এই অসম সম্পর্কের কোন স্থায়িত্ব না থাকায় ও জীবন-পরিক্রমার অনিবার্য কারণে উহার অবসান ঘটায় এক মর্মান্তিক করুণরসের সৃষ্টি হইয়াছে। পোষ্টমাষ্টার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া রতনের মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কলিকাতা ফিরিয়াছে; হতভাগিনী রতন তাহার স্নেহের দাবীর কোন স্বীকৃতি না পাইয়া এক দারুণ শূন্যতাবোধের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে ও তাহার বেদনাবিদ্ধ জীবন-জিজ্ঞাসা পাঠকচিত্তে অনুরণন তুলিয়াছে। 'কাবুলিওয়ালা'-তে করুণরস এত মর্মভেদী হয় নাই। মিনুর বিবাহান্তিক বিচ্ছেদবেদনা কেবল রহমতের নয়, তাহার সমস্ত পিতৃপরিবারের মনকে ব্যথাতুর করিয়াছে। রহমতের শাশ্বত পিতৃহৃদয় কেবল স্নেহের জোরেই আত্মীয়বর্গের শোকোচ্ছ্বাসের সহিত নিজ অব্যক্ত মনোবেদনা মিশাইবার অধিকার অর্জন করিয়াছে। আমরা পরিবারের সমাজ-সমর্থিত স্নেহের সহিত নিঃসম্পর্ক অনাত্মীয়ের হৃদয়াকুতির সামঞ্জস্য-বিধান করিতে পারি না এই নির্মম জাগতিক সত্যই এই গল্পদ্বয়ে অপূর্বভাবে স্ফুরিত হইয়াছে।

৭

রবীন্দ্রনাথ নাগরিক জীবনের ও হৃদয়-সমস্যার আবিষ্কারে ও উপস্থাপনে অনুরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মানুষের প্রকৃতি শহর ও পল্লীভেদে প্রায় অভিন্ন —হয়ত পল্লীজীবনে প্রতিবেশ-প্রভাব যত সূক্ষ্ম ও ব্যাপক, পল্লীপ্রকৃতির অন্তরাত্মা মানবস্বভাবে যেরূপ আশ্চর্যভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, শহরের নৈর্ব্যক্তিকতায় সেরূপ প্রভাব ও প্রতিফলন প্রকটিত হয় না। সুতরাং মনে হয় না যে শহরের লোকের মনে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহার পক্ষে পল্লীজীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রয়োজন ছিল। শিলাইদহে না গিয়াও কবি আমাদের কলিকাতা-কাহিনী শোনাইতে পারিতেন।

'ব্যবধান'-এ (১২৯৮?) বনমালী-হিমাংশুমালীর মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম, স্পর্শকাতর একটি পরস্পর-নির্ভরতার সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, একটা বৈষয়িক মনোমালিন্যের ঝড়ে সেই স্বর্ণসূত্রটি অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল ও সামাজিক

অধিকারের অভাবে উহার পুনঃসংযোজনার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। শহরের বাগানে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন গাছপালার যেমন একটি বিবর্ণতা দেখা যায়, এই অসম, মনোগহনে উৎপন্ন, কৃপণের সঞ্চয়ের ন্যায় নির্জনে উপভোগ্য প্রীতিসম্পর্কটিকেও তেমনি ম্লান ও কুণ্ঠিত মনে হয়। অকারণ খেয়ালে যাহার জন্ম, নৈরাশ্যক্ষুব্ধ করুণ দীর্ঘশ্বাসেই তাহার অন্তিম পরিণতি।

'মধ্যবর্তিনী' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০) আর একটি নাগরিক জীবনসমস্যার চমৎকার কাহিনী। এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রী মাত্র তিনটি—সদাগরী কোম্পানির বড় বাবু প্রৌঢ় নিবারণ, তাহার প্রথম পক্ষের গৃহিণী ও সংসারের কর্ত্রী হরসুন্দরী ও নিবারণের দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহিতা কিশোরী শৈলবালা অথচ ইহাদেরই কর্ম-ও-ভাবসূত্রের টানা-পোড়েনে এক জটিল ও দুশ্ছেদ্য অদৃষ্টজাল নির্মিত হইয়াছে। নিবারণ ও হরসুন্দরীর ভালবাসায় আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা আছে, কিন্তু ইহা একেবারে গদ্যময় ও রোমান্সকণাবর্জিত। এই নিঃসন্তান, একান্তভাবে গদ্যচ্ছন্দ-নিয়ন্ত্রিত পরিবারের দাম্পত্য প্রীতিও আর পাঁচটা সাংসারিক কর্তব্যের ন্যায় নিরুচ্ছ্বাস ও গতানুগতিকতাধর্মী। কিন্তু একদিন অতি অতর্কিতভাবে সব রকম আবেগ-আতিশয্য হইতে সুরক্ষিত এই গার্হস্থ্য দুর্গে এক অসাধারণ ভাবোচ্ছ্বাস অনভ্যস্ত আলোড়ন জাগাইল। হরসুন্দরী কঠিন রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে সে তাহার সন্তানহীনতার জন্য এই সংসারের পূর্ণতা বিধান করিতে পারে নাই ও সে এক আত্মবিলোপী ত্যাগমহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বামীর উপর নিজ অধিকার স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করিয়া সপত্নীর হাতে তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। নিবারণ ঠিক প্রসন্নচিত্তে তাহাদের পারিবারিক জীবনে এই বিপ্লবটিকে স্বীকৃতি দিল না। প্রেমের মাদকতা যাহার একেবারে অনাস্বাদিত, তাহার পক্ষে সুরাপানের এই আমন্ত্রণ ঠিক রুচিকর মনে হইল না। তথাপি স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে সে শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে মত দিল।

হরসুন্দরীর আত্মবিসর্জনসংকল্প কিছুদিন দৃঢ়ই থাকিল। সে স্বামী ও এই নবাগতা সপত্নীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা-বর্ধনের সর্ববিধ পোষকতা করিল। শেষে নিদারুণ আঘাত পাইয়া একদিন আবিষ্কার করিল যে নিবারণ ও শৈলবালার প্রণয়ের অগ্রগতি কখন তাহার মধ্যবর্তিতার মর্যাদা না রাখিয়া পারস্পরিক আকর্ষণের সূত্রেই, অন্তরের বাষ্পবেগেই সুসম্পন্ন হইতেছে। এমন কি তাহাকে লুকাইয়াই তাহাদের প্রেমলীলা স্বতঃবিকশিত হইয়াছে। সে এখন এই প্রণয়-

নিবেদন-ব্যাপারে দূতী হইবার মর্যাদাও হারাইয়াছে। নিবারণের লজ্জা ও গোপন-চেষ্টাই তাহার অপরাধের স্বীকৃতিরূপে প্রতিভাত হইল।

ইতিমধ্যে হরসুন্দরীও তাহার অন্তরে এক নিগূঢ় পরিবর্তনক্রিয়া অনুভব করিয়াছে। স্বামী ও সপত্নীর প্রণয়মত্ততা তাহাকে বুঝাইয়াছে যে ইতিপূর্বে প্রেম নামক অনুভূতিটি তাহার অপরিচিতই ছিল। তাহার বদান্যতা সঙ্কুচিত হইয়া অধিকারবোধে আসিয়া ঠেকিয়াছে। যে প্রেমের বিশ্ব একমুহূর্তে দান করিয়া দিয়াছিল সে-ই আবার দত্তধনে সত্ত্বপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। আদর্শ প্রেরণা যাহাকে নভোচারী করিয়াছিল, দেহবাদের মাধ্যাকর্ষণে আবার তাহাকে মাটিতে নামাইয়া আনিল।

শৈলবালাও অপরিমিত আদর-সোহাগে সংসারে কর্তব্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। তাই তাহার স্বামী যখন তাহার বিলাস-বাসনা তৃপ্ত করিবার জন্য কোম্পানির তহবিল ভাঙ্গিল, তখন শৈলবালা তাহার অলঙ্কাররাশি লইয়া দূরে সরিয়া রহিল, স্বামীকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টাই সে করিল না।

ইহার পর শৈলবালার যখন মৃত্যু হইল, তখন নিবারণ ও হরসুন্দরী আবার তাহাদের চিরাভ্যস্ত দাম্পত্য জীবনে ফিরিয়া গেল কিন্তু এই পুনর্মিলিত দম্পতির মধ্যে শৈলবালার স্মৃতি এক শাশ্বত দুঃস্বপ্ন ব্যবধান রচনা করিল। ক্ষুদ্র পরিধির ঘটনারিক্ত জীবন-কাহিনীর মধ্যে এরূপ মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য-আরোপ ও গল্পটির এইরূপ অনিবার্য ও ন্যায়নীতিসম্মত পরিসমাপ্তি লেখকের জীবনদৃষ্টির একটি অপূর্ব নিদর্শন।

৮

'বিচারক' (পৌষ ১৩০১) 'মানভঞ্জন' (বৈশাখ ১৩০২) গল্প দুইটিতে জীবন-সমস্যার দুইটি নূতন দিক আলোচিত হইয়াছে। প্রথমটিতে যুবক বিনোদচন্দ্র কেমন করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহের মেয়ে বালবিধবা হেমশশীর সম্মুখে প্রেমের মাদকতাময় সুখস্বপ্নের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে পিতা-মাতার স্নেহাশ্রয় ও ছোট-খাট সংযমপূত গৃহকর্তব্যের পরিচিত গণ্ডী হইতে টানিয়া পাপের রসাতলে নামাইয়াছিল তাহা বর্ণিত। হেমশশীর প্রণয়বিহ্বলতা ও সংসারজ্ঞানহীন সরলতা লেখক চমৎকার ভাবে রূপকব্যঞ্জনার দ্বারা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহার পর সুখস্বপ্ন মর্মান্তিকভাবে টুটিল, বিনোদচন্দ্র তাহাকে ফেলিয়া অন্তর্ধান করিল ও হতভাগিনী রূপোপজীবিনী কলুষিত জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইল।

বিনোদচন্দ্র এখন প্রবলপ্রতাপ ধর্মাধিকরণের অধিদেবতার উচ্চ মঞ্চে আরূঢ়, আর ক্ষীরোদা গণিকাবৃত্তির ক্লেদপঙ্কে আকণ্ঠ-নিমগ্না। ইতিমধ্যে প্রৌঢ়া ক্ষীরোদা উহার শেষ উপপতির আশ্রয়চ্যুত হইয়া জীবনে দারুণ বিতৃষ্ণা অনুভব করিল ও তাহার একমাত্র শিশুপুত্র সহ আত্মহত্যার জন্য কূপে ঝাঁপ দিল। সে বাঁচিয়া উঠিয়া শিশুপুত্রহত্যার ও আত্মহত্যার অভিযোগে কড়া জজ মোহিতচন্দ্রের এজ-লাসে বিচারার্থ প্রেরিত হইল। নারীর সতীত্বধর্মে অবিশ্বাসী জজসাহেব তাহার মৃত্যুদণ্ড বিধান করিলেন। ইতিমধ্যে জেলখানার বাগানে জজের সহিত মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষমানা ক্ষীরোদার সাক্ষাৎ হইল। তাহার চুলে যে একটি আংটি লুকান ছিল, কোন জেলকর্মচারী তাহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলে সে জজ-সাহেবের নিকট সেই আংটি-প্রত্যর্পণের জন্য অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবেদন জানাইল। জজ প্রথমতঃ ইহাকে নারীর স্বাভাবিক অলঙ্কারপ্রিয়তার নিদর্শনরূপে কৌতুক অনুভব করিলেন। তারপর আংটিটি হাতে লইয়া তিনি দেখিলেন যে উহা তাঁহারই প্রদত্ত প্রণয়োপহার। এই এক মুহূর্তের আবিষ্কারে সমস্ত অতীত ইতিহাস তাঁহার মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ও এই প্রেমের বলেই ভোগ-পণ্যা বারনারীও যে শাশ্বত সতীত্ব-মহিমায় ভাস্বর এই সত্য তিনি উপলব্ধি করিলেন। ক্ষীরোদার সমস্ত কাহিনী প্রেমের এই ধ্রুব জ্যোতিটি অনির্বাণ রাখার সাধনায় স্বর্গীয়পবিত্রতামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

'প্রতিহিংসা'-য় বারবনিতাভোগী স্বামী কর্তৃক উপেক্ষিতা সুন্দরী গিরিবালা নিজ সর্বাঙ্গহিল্লোলিত রূপতরঙ্গের মায়ায় একপ্রকার স্বপ্নাবিষ্টতায় অভিভূত। সে যখন কোনক্রমেই স্বামীকে গৃহমুখী করিতে পারিল না, তখন সে থিয়েটারে গিয়া সেখানকার অভিনেত্রীদের সঙ্গে নিজ রূপগুণের তুলনায় নিজ শ্রেষ্ঠতার অবিসংবাদিত চাক্ষুষ প্রমাণ পাইল। তখন সে স্বামীর অজ্ঞাতসারে সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে নায়িকারূপে অবতীর্ণ হইল। দর্শকশ্রেণীর মধ্যে উপবিষ্ট গোপীনাথ যখন তাহার ঘরের স্ত্রীকে অভিনয়কুশলা, হাবভাব পটীয়সী শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে চিনিতে পারিল, তখন তাহার নিদারুণ মানস বিপর্যয়ের মধ্যেই গিরিবালা প্রতিহিংসা-সঙ্কল্পের চরিতার্থতা লাভ করিল। গিরিবালার সৌন্দর্যের উদ্বেলতা, তাহার মুগ্ধ আত্মরতি ও আত্মহারা ভাববিহ্বলতা ও পরিচারিকা সুধার রূপপ্রশস্তির দ্বারা লাবণ্যসরসীতে তরঙ্গ-উচ্ছলতার সৃষ্টি—সবই অপূর্ব কলাকৌশলের সহিত গিরি-বালার রঙ্গালয়ে শত শত মুগ্ধ দর্শকের আঁখির অভিনন্দনস্বীকৃতি ও রূপান্ধ স্বামীর প্রতি রূঢ়তম ধিক্কারপ্রয়োগের অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। অতএব

রূপতৃষ্ণায় জর্জরিত, আপনার সৌন্দর্যে আপনি বিভোর, স্তবস্তুতির জন্য উন্মুখ এই নারী গৃহকোণে বন্দিনী হইয়া হা-হুতাশ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সে নিজ প্রদীপ্ত রূপবহ্নিতে বহু পতঙ্গকে আকর্ষণ ও দগ্ধ করিবে, বহু রূপমুগ্ধ ভক্তের প্রশংসামদিরা পান করিয়া মত্ত হইয়া উঠিবে ইহাই তাহার বিধিনির্দিষ্ট অদৃষ্ট ও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পের মধ্যে এই জীবন-অভিপ্রায়টি চমৎকারভাবে পূর্ণ করিয়াছেন।

'জীবিত ও মৃত' (শ্রাবণ ১২৯৯) ঠিক অতিপ্রাকৃতবিষয়ক গল্প নয়। একটি বিধবা শ্মশান হইতে জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া নিজ চিন্তা ও আচরণে আপনাকে সাধারণ জীবনলীলা হইতে বিচ্ছিন্ন অশরীরী প্রাণী-পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছে। এই অদ্ভুত ধারণার ফলে তাহার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কে একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতা দেখা দিয়াছে। অথচ ইহলোকে তাহার যে কিছু আশ্রয় প্রয়োজন সে কথাও সে স্বীকার করে। এই জৈব প্রেরণার বশবর্তী হইয়া সে প্রথম তাহার সই যোগমায়ার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে কিন্তু এখানে গৃহকর্ত্রী তাহার মানস ঔদাসীন্যের কথা না বুঝিয়া তাহাকে সাধারণ যুবতী স্ত্রীলোকরূপে গ্রহণ করিয়াছে ও নিজ স্বামীর সহিত তাহার অনুচিত ঘনিষ্ঠতার আশঙ্কায় অস্বস্তি বোধ করিয়াছে। কাদম্বিনী নিজেকে ভূত মনে করিয়া নিজের সংসর্গ নিজেই পরিহার করিতে চায়; তাহার এই আত্মভীতি গৃহের অন্যান্য পরিজনের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া অন্য সকলের মধ্যেও একটা অজ্ঞাত-আশঙ্কাপূর্ণ ব্যবধানবোধ জাগাইয়াছে। নিজ শ্বশুর-বাড়ীতে ফিরিয়া পরিচিত প্রতিবেশ, বিশেষতঃ খোকার অপরিবর্তিত স্নেহ-আকর্ষণ তাহার মনে প্রথম জীবনপ্রত্যয় স্ফুরিত করিয়াছে। কিন্তু পরিবারের অন্য সকলের ব্যাকুল অস্বস্তি তাহাকে আবার নূতন করিয়া মৃত্যুবরণে প্রণোদিত করিয়াছে। গল্পটির প্রধান আকর্ষণ কাদম্বিনীর মনস্তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা, তাহার অস্তিত্ববোধ ও মৃত্যুবিভ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব।

'ঠাকুরদা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০২) অভিজাতজীবনের করুণ আত্মবঞ্চনার একটি হৃদয়গ্রাহী কাহিনী। নয়ানজোড়ের জমিদারবংশের শেষ প্রতিনিধি ঐশ্বর্য ও মর্যাদাচ্যুত হইয়া অধুনা কলিকাতা-প্রবাসী। তাঁহার পূর্বতন গৌরবের স্মৃতি-রোমন্থন ও বাস্তব অবস্থা-জীর্ণতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার অতীত সমৃদ্ধি যে এখনও অক্ষুণ্ণ এই অলীক কল্পনার প্রশ্রয় তাঁহার একমাত্র জীবন-পাথেয়। তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশীবৃন্দের নিকট সচ্ছলতার মিথ্যা অভিনয় শ্রোতাদের

মনে কৌতুকরসের সৃষ্টি করে। তথাপি তাঁহার নিরীহ, বন্ধুবৎসল ও সদানন্দময় প্রকৃতির জন্য সকলেই তাঁহার মিথ্যাভাষণে সায় দিয়া যায়—কেহই তাঁহাকে প্রতিবাদ জানাইয়া তাঁহার এই নির্দোষ অভিনয়ে ও সরল উৎসাহে বাধা দেয় না। প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে মাত্র একজন—এক উচ্চশিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল যুবকই—ঠাকুরদাদা সম্বন্ধে কিছুটা বিরক্তি পোষণ করে ও তাঁহাকে অপদস্থ করিবার উপলক্ষ্য খোঁজে। সেই একদিন ঠাকুরদাদাকে জানাইল যে ছোট লাটসাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগামী কাল আসিবেন। সরলপ্রকৃতি ঠাকুরদাদা তাহার ফিকির না বুঝিয়া এই সৌভাগ্যের কথা সহজেই বিশ্বাস করিলেন ও তাঁহার বংশোপযোগী সমারোহে এই মান্য অতিথির অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরের দিন সত্যই ছোটলাট্‌বেশী এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল ও ঠাকুর্দার যে কয়েকটি মূল্যবান্ দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল তাহাদিগকে রাজপ্রতিনিধির নজরানারূপে আত্মসাৎ করিল। এই সময় যুবকটি ঠাকুরদাদার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরদাদার একমাত্র পৌত্রী বালিকা কুসুমের অশ্রুছলছল অনুযোগ ও ধিক্কারে নিজ হৃদয়হীনতার জন্য লজ্জা অনুভব করিল। প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সে ঠাকুরদাদার নিকট তাঁহার পৌত্রীকে বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিল। বৃদ্ধ কৈলাসবাবু এই শুভ প্রস্তাবের জন্য হর্ষাধিক্যে তাঁহার বংশমর্যাদা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তাঁহার দারিদ্র্য অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিলেন ও এই বিবাহ-প্রস্তাবের জন্য তাঁহার প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ জানাইলেন। কৈলাসবাবুর চরিত্রটি লেখকের সমস্ত হৃদয়-ভরা মমতা দিয়া পরিকল্পিত। রবীন্দ্রনাথের নিজের জমিদার-বংশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়াই ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সম্প্রদায়ের করুণ বিভ্রান্তি ও সূক্ষ্ম খেয়ালের এমন একটি মনোহর চিত্র তাঁহার কল্পনায় রূপ পাইয়াছে। গল্প হিসাবে 'ঠাকুরদাদা' ঠিক নির্দোষ নয়। যে যুবকটি ঠাকুরদাদাকে লইয়া তাহার উপহাসবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, তাহার চিত্তপরিবর্তন অনেকটা আকস্মিক মনে হয়। ঠাকুরদাদার পৌত্রীটি যে মানবিক-সহানুভূতি-সম্পন্না ও ঠাকুরদাদাকে অপ্রতিভ করিলে তাহার পক্ষ হইতে যে ক্ষোভ ও অনুযোগ আসিবে তাহা পূর্বাহ্ণে অনুমান করাও বিশেষ কঠিন নয়। সুতরাং আক্রমণাত্মক মনোভাবের শ্রদ্ধা ও সমবেদনায় রূপান্তর যথেষ্ট কারণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। ঠাকুরদাদা হয়ত অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের আনন্দাতিশয্যে তাঁহার আত্মবঞ্চনার মুখোশ খুলিয়া তাঁহার সত্য পরিচয় দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার হবু-নাতজামাইটির এরূপ কোন গূঢ় মানস প্রতিক্রিয়ার কোন পূর্বাভাস মিলে না।

'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' (১২৯৮) ও 'সম্পাদক' (বৈশাখ ১৩৯০) লেখক ও সংবাদপত্রসম্পাদকের খ্যাতি-বিড়ম্বিত জীবন-কাহিনী উপভোগ্য কৌতুকরসের সহিত বিবৃত হইয়াছে। নিছক গল্পহিসাবে উহাদের মান খুব উচ্চ নয়।

৯

১৩০২ পর্যন্ত লেখা অন্যান্য ছোটগল্পগুলি নানা বিষয়াশ্রয়ী—রোমান্স, ইতিহাস, অতিপ্রাকৃত কাহিনী, রূপকাখ্যান প্রভৃতি নানাজাতীয় রচনা লেখকের বিষয়-বৈচিত্র্য ও মৌলিক অনুভূতির সাক্ষ্য বহন করে। 'দালিয়া' (মাঘ ১২৯৮) ইতিহাসাশ্রয়ী, কিন্তু স্বরূপতঃ ঐতিহাসিক নয়। ইহাতে শাহজাদা সুজার কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা ও ছদ্মবেশী নূতন আরাকানরাজের সঙ্গে কেমন করিয়া একটি স্বতঃস্ফূর্ত, মধুর প্রণয়সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই মনোজ্ঞ বর্ণনা। আমিনা তাহার আভিজাত্য-গৌরব ভুলিয়া সরল বন্য যুবক দালিয়ার সহিত প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে। তাহার দিদি জুলেখা আমিনার সন্ধান পাইয়া তাহার আশ্রয়স্থল ধীবরকুটিরে ভগ্নীর সহিত মিলিত হইয়াছে ও ভগ্নীকে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমিনা প্রাকৃতিক শান্তির মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া সমস্ত উগ্রভাব বিসর্জন দিয়াছে। অনার্য বন্য যুবকের সহিত হৃদয়-বিনিময়ে তাহার কোন আপত্তি নাই। প্রকৃতির স্নিগ্ধ প্রলেপের তলে লৌকিকতার সমস্ত দুরূহ কর্তব্য চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আর দালিয়া আরণ্যক বলিয়াই সম্রাটের ন্যায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইহাদের মনের স্বাভাবিক আকর্ষণেই মিলন ঘটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বিবাহের জন্য দুই সম্রাট-দুহিতা অনার্যরাজের শুদ্ধান্তঃপুরে নীত হইয়াছে। সেখানে যখন তাহারা রাজহত্যার জন্য ছুরিকার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষায় ব্যস্ত তখন তাহারা মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত আবিষ্কার করিয়াছে যে দালিয়াই ছদ্মবেশী রাজা। তখন রাজা, দুই সম্রাট-কন্যা এবং তাহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে লুকান মৃত্যু-হাতিয়ার সকলেই এই কৌতুকচ্ছটায় হাসিয়া উঠিয়াছে।

'এক রাত্রি' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) সাধারণজীবন-সম্বন্ধীয় হইলেও প্রকৃতিতে ইহা একটি রোমান্সধর্মী গল্প। বক্তা, একজন দেশোদ্ধারকামী যুবক, অবস্থা-সঙ্কটে তাহার সমস্ত মহনীয় কল্পনা বিসর্জন দিয়া এক পল্লী ইস্কুলে শিক্ষকের পদ-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে। তাহার জীবনে আদর্শ স্বপ্ন ও বাস্তব পরিণতির মধ্যে একটা আকাশ-পাতাল ব্যবধান রচিত হইয়াছে। দেশসেবার মত্ত আবেশে

সে তাহার বাল্যসহচরী সুরবালার প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুরবালা সেই শহরেরই সরকারী উকীল রামলোচনবাবুকে বিবাহ করিয়াছে। কৃত্রিম-গৌরবস্ফীত নায়ক সুরবালাকে হারাইয়া তাহার জীবনে যে অপরিমেয় শূন্যতা বোধ জাগিয়াছে তাহাই অনুতপ্ত চিত্তে বারবার স্মরণ করিতেছে। একদিন এক মহাপ্রলয়ের দুর্যোগ-রাত্রিতে, যখন নদী কূল ছাপাইয়া জনপদকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন প্রাণরক্ষার জন্য বক্তা পুষ্করিণীর উঁচু বাঁধের উপর দাঁড়াইয়াছে। সেই সময় সুরবালাও একই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। এই সর্বনাশের মুহূর্তে দুই প্রেমিকসত্তা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়াছে। শেষে বন্যা অপসারিত হইলে উভয়ে আপন আপন আবাসস্থলে ফিরিয়াছে। এই প্রলয়রাত্রিতে সুরবালার নীরব সান্নিধ্য নায়কের জীবনে একটি অবিস্মরণীয় অনুভূতিরূপে তাহার অক্ষয় স্মৃতি-ভাণ্ডারে চিরসঞ্চিত হইয়াছে। এই রোমান্টিক অনুভূতির নিবিড়তা প্রতিপাদনের জন্যই নায়কের পূর্ব ইতিহাসের মরীচিকা-বিভ্রান্তি একটি যোগ্য পটভূমিকা রচনা করিয়াছে।

'রীতিমত নভেল' (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯) ও 'জয়-পরাজয়' (কার্তিক ১২৯৯) ঐতিহাসিক রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। প্রথমটিতে লেখক তৎকাল-প্রচলিত রোমান্টিক কাহিনীর বর্ণনাভঙ্গী ও ঘটনা-সংস্থাপনের ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ করিয়াছেন মনে হয়। হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই ব্যঙ্গপ্রশস্তির লক্ষ্য হইতে পারেন। 'জয়-পরাজয়'-এ প্রাচীন রাজসভায় যে কবি-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত তাহারই একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাই। উদ্ধত, পাণ্ডিত্যাভিমানী, দিগ্বিজয়ী কবির প্রগল্‌ভ, উচ্চকণ্ঠ মুখরতার নিকট আপন মনে গান গাহিতে অভ্যস্ত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যস্রষ্টা, ভীরুস্বভাব সভাকবির পরাজয় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় বিষয় ও একাধিক কাব্যগ্রন্থে এই অসম দ্বন্দ্বের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। রাজসভার বিচারে শেখর কবির পরাজয় হইয়াছে। কিন্তু অন্তরালবর্তিনী রাজকন্যা তাহাকে নিজ প্রসাদমাল্য উপহার দিয়া তাহার ব্যথিত অন্তরের জ্বালা জুড়াইয়াছেন। রাজসভার বর্ণনা ও পুণ্ডরীক ও শেখরের কাব্যরস-বিতরণের পদ্ধতির পার্থক্যটুকু লেখক চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন। এই গল্পে কাব্যের মেজাজ ও বিষয়বস্তু লেখক অসাধারণ দক্ষতার সহিত ছোটগল্পের আধারে বিধৃত করিয়াছেন।

'একটা আষাঢ়ে গল্প' (আষাঢ় ১২৯৯) একটি রূপকধর্মী রচনা। আমাদের মনু-পরাশর-স্মৃতি-শাসিত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকের কর্তব্য এমন অপরিবর্তনীয়-রূপে বাঁধা, এরূপ লৌহনিয়মজালে নিয়ন্ত্রিত যে কখনও কাহারও মধ্যে নির্দিষ্ট

গণ্ডীর অতিক্রমণ বা স্বাধীন ইচ্ছার স্ফুরণ দেখা যায় না। এই প্রাণহীন, লৌহ-নিগড়বদ্ধ সমাজে হঠাৎ সমুদ্র পার হইয়া তিনটি দুঃসাহসিক যুবকের প্রবেশ সমগ্র দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সৃষ্টি করিল। এই তিন আগন্তুকের প্রাণোচ্ছলতায় ও শাস্ত্রবিধি-উপেক্ষায় কেহ কেহ বা হতবুদ্ধি হইল; কিন্তু বিশেষ করিয়া তরুণ সম্প্রদায়ের মনে নানা নূতন আনন্দ-কল্পনা, জীবনোপভোগের নানা বিচিত্র বাসনা, নানা অনির্দেশ্য আকৃতি-আকাঙ্ক্ষা মুকুলিত হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত হরতনের বিবি নবাগত রাজপুত্রকে স্বয়ংবর-প্রথায় বরণ করিয়া এক নূতন ভাবজীবনের সূত্রপাত করিল। রবীন্দ্রনাথের রূপক-কল্পনা ও উহার সার্থক প্রয়োগ তাঁহার প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। ছোটগল্পের মধ্যে বস্তুরসের পরিবর্তে সূক্ষ্ম ভাবরসও যে উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।

১০

ইহার পর অতিপ্রাকৃতবিষয়ক দুইটি গল্প—'নিশীথে' (মাঘ ১৩০১) ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' (শ্রাবণ ১৩০২) আলোচনা করিলেই বর্তমান পর্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়। ১৩০২-এর পর ১৩০৫ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ আর কোনও নূতন ছোটগল্প রচনা করেন নাই। তিনবর্ষব্যাপী বিরতির পর আবার যখন তিনি ছোটগল্প লেখা স্বরু করিলেন, তখন পুরাতন ধারা অনুবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রচনারীতি ও বিষয়নির্বাচনে নানা নূতন প্রেরণা আত্মপ্রকাশ করিল। সুতরাং এই বিরতির প্রাক্-মুহূর্তে সাময়িক সমাপ্তি-রেখা টানাই সমীচীন মনে হয়।

'নিশীথে' গল্পটি ঠিক অতিপ্রাকৃতবিষয়ক নয়। কেননা ইহার আখ্যান-বস্তুতে ও মানস প্রতিক্রিয়া-বর্ণনায় কোথায়ও স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘিত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে একটি মনোবিকার ও তজ্জনিত ইন্দ্রিয়-বিভ্রমের কাহিনী। দক্ষিণারঞ্জন বাবুর প্রথমা স্ত্রীর প্রতি অপরাধবোধই, তাহার প্রতি একনিষ্ঠতার সাড়ম্বর ঘোষণার অন্তরালে নূতন প্রেমচর্চার গোপন আবেশই তাহার একটি আর্ত জিজ্ঞাসাকে একটা চরাচরব্যাপী বিস্তার ও অনুভূতির গভীরতম স্তরভেদী বিভীষিকায় মণ্ডিত করিয়াছে। প্রথমা স্ত্রীর এই ত্রস্ত প্রশ্ন স্বামীর চেতনাকোষে এরূপ গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে যে আকাশ-পৃথিবীব্যাপী, সর্বত্র সঞ্চরণশীল এক ধ্বনিজাল যেন উহাকে বদ্ধ মুষ্টিতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। স্বামীর ইচ্ছাশক্তি এই অনুভূতি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়াছে ও এক অদৃশ্য, অপ্রতিরোধ্য

প্রেরণা তাহার সমস্ত আত্মদমনচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া তাহাকে অপরাধের স্বীকারোক্তিকরণে অনিবার্যভাবে উত্তেজিত করিয়াছে। লেখকের কৃতিত্ব মনোবিকারের উদ্বোধক প্রতিবেশ-রচনার অভ্রান্ত শিল্পনির্মিতিতে। ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে কোন অসাধারণত্ব না থাকিলেও অনুকূল ভাবাসঙ্গের সহযোগিতায় অবচেতন মনের গভীরে নিহিত এই আগ্নেয় উচ্ছ্বাস বিস্ফোরক শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করে। এখানে কোন ভৌতিক আবির্ভাব নাই, আছে মনের স্প্রিং-বিকল-করা এক রহস্যশক্তির সম্মোহন প্রভাব।

'ক্ষুধিত পাষাণ' (শ্রাবণ ১৩০২) অতিপ্রাকৃত অনুভূতির রোমাঞ্চ-শিহরিত গল্প। এখানে বস্তু-অবলম্বন প্রায় কিছুই নেই; অতীত যুগের বিলাস-বিভ্রম, গোপন অভিসার ও অজ্ঞাত বিপদের সংকেত, অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ও ঈর্ষ্যার আবিলতা সমস্ত মিলিয়া গল্পের একটি বৈদ্যুতীশক্তিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়াছে। একজন আধুনিক সরকারী কর্মচারী ঐ প্রাসাদে বাস করিয়া এই অতীত জীবনযাত্রার বস্তু-বিচ্ছুরিত অতীন্দ্রিয় ভাবপরিমণ্ডলের মোহ-চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়াছে। পূর্বতন ভোগবিলাসের একটি সূক্ষ্মতর রসসত্তা তাহাকে উর্ণনাভজালে আবদ্ধ মক্ষিকার মত বন্দী করিয়াছে। বিদেহী নারীমূর্তিসমূহ তাহাদের প্রসাধনকলা, নূপুর-নিক্কন, নৃত্যছন্দ ও রূপদ্যুতির আভাস লইয়া তাহাকে এক স্বপ্নানুভূতির নিবিড়তায় আচ্ছন্ন ও আবিষ্ট করিয়াছে। পাগলা মেহের আলি তাহার সংসারের অলীকত্বের বদ্ধমূল ধারণা লইয়া বক্তার নিজ ভবিষ্যৎঅদৃষ্টের ইঙ্গিত বহন করিয়াছে। ইহাতে অপ্রাকৃতের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই। কিন্তু অপ্রাকৃত আভাস-ইঙ্গিতের ঘন সন্নিবেশ মেরুদণ্ডের ন্যায় সমস্ত কাহিনীটিকে ঋজু বিন্যাসে ধরিয়া রাখিয়াছে। অপ্রশমিত বাসনার উত্তপ্ত স্পর্শ, ভোগবিলাসের বস্তুভারহীন, অশরীরী সারনির্যাস সমস্ত কক্ষে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত ও প্রাসাদের সমস্ত আকাশ-বাতাস একটি মাদকতাময়, চেতনা-আচ্ছন্নকারী প্রভাবে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্য দ্যোতনাশক্তি প্রয়োগে তথ্য অংশকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া উহার সূক্ষ্মতর ইন্দ্রজালশক্তিটি পাঠকের প্রত্যক্ষগোচর ও সমস্ত কাহিনীটিকে একটি নিখুঁতসঙ্গতিপূর্ণ চিন্ময় ব্যঞ্জনার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ছোটগল্পের মধ্য দিয়া গীতিকবিতার সুরমূর্ছনা ও সাঙ্কেতিক তাৎপর্যময়তা কিরূপ আশ্চর্যভাবে সংক্রামিত হইতে পারে, 'ক্ষুধিত পাষাণ' তাহার অপরূপ দৃষ্টান্ত।

ছোটগল্পের মধ্যে রবীন্দ্রগদ্যরীতি একটি অনুপম সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ভাব-সৌকুমার্যের প্রকাশশক্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার ভাবুকতাময় রচনায়

কাব্যোচ্ছ্বাসের অতিরেক, মননশীল রচনায় যুক্তিপারিপাট্যের দুরূহ সন্নিবেশ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধে অতিপল্লবিত বিস্তার ও শ্লেষব্যঙ্গের আঘাত-প্রবণতা উহাদের গদ্যরীতির মানকে কতকটা অবনমিত ও আদর্শ হিসাবে কিছুটা অনুপযোগী করিয়াছে এইরূপ ধারণা জন্মে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি ও ভাবুক চিত্তের চিন্তাধারার প্রেরণা ব্যতিরেকে ঐরূপ রচনারীতি বিষয়ান্তরব্যাপৃত লেখকের আয়ত্তাধীন নয়। ঐ style রবীন্দ্রমানসের মৌলিক অনুভূতির প্রকাশক্ষম ভাষাপ্রতিরূপ। কিন্তু ছোটগল্পের বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত জীবনমহাগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে বিশেষ কোন তত্ত্বদুরূহতা বা চিন্তাজটিলতা নাই, কেননা ইহার উদ্দেশ্য হইল সকলের মনোরঞ্জন, সকলের চিত্তে রস-আবেদনের সঞ্চার। এইখানে রবীন্দ্রনাথের গদ্য যে আশ্চর্য ভাবপ্রকাশনিপুণতা, বর্ণনাশক্তি, মনোভাব-পরিস্ফুটন ও স্থানে স্থানে মনস্তত্ত্ব-আলোচনাদক্ষতার পরিচয় দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ। এই style-এ কবিত্ব, কাহিনী-বিবৃতি, সূক্ষ্ম ও সুকুমার অনুভূতি, চরিত্র-বৈশিষ্ট্যনির্দেশ প্রভৃতি বিচিত্র প্রয়োজন অতি চমৎকারভাবে সাধিত হইয়াছে। সর্বোপরি, লেখকের humour, স্নিগ্ধ পরিহাস-রসিকতা তাঁহার গল্পগুলিতে একটি অবর্ণনীয় মাধুর্য ও উপভোগ্য কৌতুকরসের সঞ্চার করিয়া গম্ভীর বিষয়কেও সর্বসাধারণের আস্বাদ্য করিয়াছে। humour-এর এই সুষ্ঠু প্রয়োগ উহার সাহিত্যিক আবেদন ছাড়াও কবির রসরুচি ও মানবচরিত্র-জ্ঞানের প্রশংসনীয় নিদর্শন রূপে গৃহীত হইতে পারে। এই style সংক্ষিপ্ত, সুনিয়ন্ত্রিত, বিষয়োপযোগী ও উচ্চতম ভাবাবেদনপ্রকাশের সর্বথা উপযুক্ত। এই humour-সংযোগই 'গল্পগুচ্ছের' রচনারীতিকে অন্যান্য গদ্যগ্রন্থের তুলনায় অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব ও সুরবৈচিত্র্য দিয়াছে।

এই মসৃণ, সুষম, সাধু ও কথ্যভাষার সুষ্ঠু সংমিশ্রণে গঠিত, ছন্দতরঙ্গায়িত, বিচিত্রতন্ত্রীসমন্বিত গদ্যভাষা রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে আর প্রয়োগ করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পরবর্তী স্তরে তিনি শক্তিমত্তার আরও পবিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সে শক্তি আপনাকে উৎকটভাবে প্রকাশ না করিয়া মাধুর্যের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া তাহার উপর তাঁহার অধিকার হয়ত পরে শিথিল হইয়াছে। গদ্যরীতির এই চরম গৌরবের মুহূর্তে আমাদের প্রথম খণ্ডের আলোচনা সমাপ্ত করাই সমীচীন মনে হইতেছে।

নির্ঘণ্ট

খ

গ

ভ